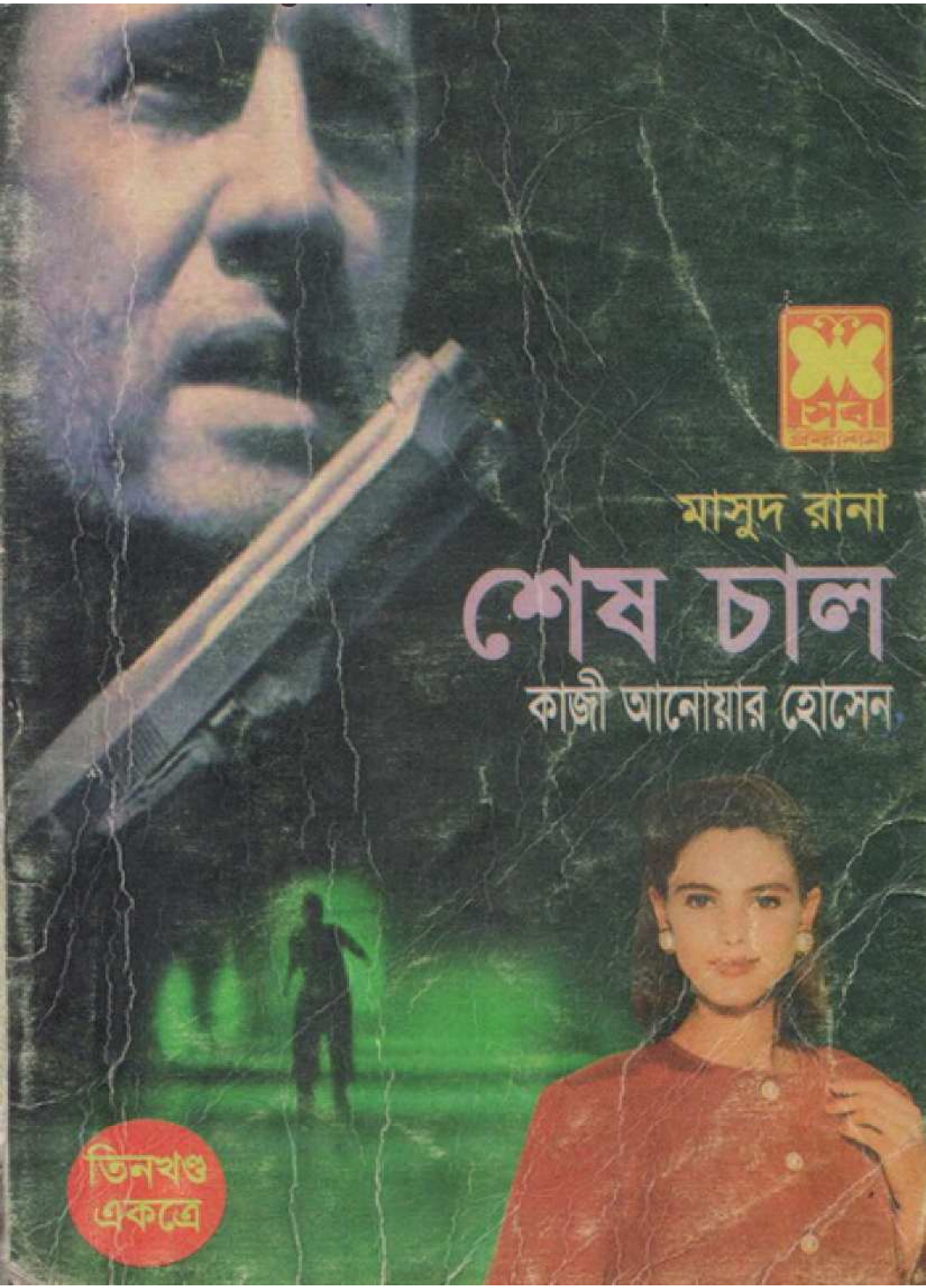
সেবা প্রকাশনী
মাসুদ রানা
শেষ চাল
কাজী আনোয়ার হোসেন
তিনখণ্ড একত্রে

মাসুদ রানা
(তিনখণ্ড একত্রে)

শেষ চাল

কাজী আনোয়ার হোসেন

সুন্দরী মরুকন্যা নিমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে মাসুদ রানা কি চার হাজার বছর আগেকার এক ফারাও সম্রাটের বিত্তবৈভব উদ্ধার করতে আফ্রিকা যাবে? বিপদটা কী ধরনের জানার পরও?

প্রায় চার হাজার বছর আগে ক্রীতদাস টাইটা যা করেছিল, মাসুদ রানাও তাই করতে চাইছে–গিরিখাদের ভিতর ডানভেরা নদীতে একটা বাঁধ দেবে। নদীর তলায়, পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে একটা ফাটল আছে; সেই ফাটলের ভিতর কোথাও থাকলেও থাকতে পারে ফারাও মামোসের সমস্ত ও গুপ্তধন।

সমস্ত বিপদ পায়ে দলে ওরা যখন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত, সরকারি সৈন্য নিয়ে হামলা করে বসলেন কর্নেল ঘুমা, জার্মান ধনকুবের হেস ডুগার্ড ফারাও মামোসের সমস্ত গুপ্তধন রানার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চান। একই সঙ্গে শুরু হলো তুমুল মরশুমি বর্ষণ, সমাধির ভিতর চিরকালের জন্য আটকা পড়তে হলো ওদেরকে। বেইমানীর আভাস পেয়ে রানা, প্রশ্ন উঠল, শেষ হাসিটা কে হাসবে? কে দেবে শেষ চাল?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

শেষ চাল-১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮

এক

মরু থেকে চুপিচুপি গড়িয়ে চলে এল গোধূলি, সারি সারি বালিয়াড়ি ঢাকা পড়ে গেল রক্ত-বেগুনি ছায়ায়। যেন মোটা একটা মখমলের চাদরে চাপা পড়ল সমস্ত শব্দ, আর তাই কোমল প্রশান্তি আর মৌন নিস্তব্ধতার ভেতর বিষণ্ণ সন্ধে ঘনাল।

বালিয়াড়ির চূড়ায় যেখানে ওরা দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে মরূদ্যান আর মরূদ্যানকে ঘিরে থাকা ছোট্ট গ্রামটা পরিষ্কার দেখা যায়। প্রতিটি বাড়িই সাদা, ছাদগুলো সমতল। গায়ে গায়ে প্রচুর খেজুর গাছ, মুসলমানদের মসজিদ আর কপটিক ক্রিশ্চানদের চার্চটাই শুধু ওগুলোর চেয়ে বেশি উঁচু। ধর্মীয় বিশ্বাসের দুই স্তম্ভ লেকের দু'ধারে পরস্পরের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে।

লেকের পানি গাঢ় হচ্ছে, ডানা ঝাপটানোর দ্রুত শব্দ তুলে এক ঝাঁক হাঁস নলখাগড়া ঢাকা পাড়ের কাছাকাছি নামতে ছলকানো পানি সাদা দেখাল।

ভদ্রলোকের বয়স বিয়াল্লিশ, যথেষ্ট লম্বা, কপালের দু'পাশে কিছু চুলে পাক ধরেছে। আজও তিনি বিয়ে করেননি, বোধহয় চিরকুমার থাকারই ইচ্ছে। মেয়েটির বয়েস ছাব্বিশ, একহারা গড়ন, হরিণীর মতই সতর্ক ও প্রাণচঞ্চল। আরব রমণীর সমস্ত সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য ধরা দিয়েছে ওর চেহারায়, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও শালীনতা ও সম্ভ্রম রক্ষার মিশরীয় ঐতিহ্যকে অত্যন্ত মূল্য দেয়।

'চলো, এবার ফিরি। দেরি করলে সালিমা রেগে যাবে।' মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সস্নেহে হাসলেন ভদ্রলোক। তাঁর ভাইঝি ও। সম্পর্ক যাই হোক, দু'জনের একই পেশা, এবং পেশার প্রতি দু'জনেই তারা নিবেদিত, ফলে স্নেহ ও শ্রদ্ধার পাশাপাশি নিবিড় একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। প্রিয় পেশায় ভাইঝিকে সহকারিণী হিসেবে পেয়ে ঘালি হাসলান খুশি ও তৃপ্ত। আর আল নিমা, মেয়েটি, চাচা ঘালি হাসলানের সাংঘাতিক ভক্ত, তাঁকে মিশরের সবচেয়ে সৎ ও আদর্শপুরুষ বলে মনে করে ও।

বালির ঢাল বেয়ে নামার সময় কোঁকড়ানো চুলের ফিতে খুলে দিয়ে ছুটল নিমা, এলো চুল বিশাল কালো পতাকার মত পতপত করছে পিছনে, গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ফুলে উঠল সালোয়ার, চুলের সঙ্গে উড়ছে ওড়নার দুই প্রান্ত। ঢাল বেয়ে ছুটছে আর খিল খিল করে হাসছে নিমা। খানিক দূর নামার পরই তাল হারিয়ে ফেলল, আছাড় খাবার পর দু'বার গড়ান দিয়ে আবার সিধে হয়ে ছুটল, আগের মতই হাসছে।

বালিয়াড়ির মাথা থেকে হাসিমুখে তাকিয়ে আছেন হাসলান। নিমা এখনও মাঝে মধ্যে এরকম শিশু হয়ে ওঠে। তবে তিনি ওর গাম্ভীর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গেও পরিচিত। ভাইঝির এই দু'রকম মূডই তিনি পছন্দ করেন, তবে ওর ভবিষ্যতের কথা ভেবে মনে মনে খানিকটা শঙ্কিতও বোধ করেন। তাঁদের বংশের অনেক মেয়েরই এই সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ব্যক্তিত্ব বা স্বভাব ছিল, তাদের কেউ কেউ বিয়ে

গ্রামের শেষ মাথায় নিজ পরিবারে ফিরে গেছে বৃদ্ধা সালিমা, রাত দশটার দিকে নিজেই দু'কাপ কফি বানাল নিমা। কফির কাপে চুমুক দেয়ার সময় টুকটাক আলাপ হলো। সম্পর্কটা বন্ধুর মত, তাই এমন কোন আলোচ্য বিষয় নেই যা নিষিদ্ধ। ইংল্যান্ড থেকে আর্কিওলজিতে ডক্টরেট নিয়ে মিশরে ফেরার পর পরীক্ষা দিয়ে ডিপার্টমেন্ট অভ অ্যান্টিকুইটিজ-এ চাকরি পেয়েছে নিমা। ঘালি হাসলান ওই ডিপার্টমেন্টেরই ডিরেক্টর।

হাসলান যখন নোবলস উপত্যকায় কবর খনন করেন নিমা তখন তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে ছিল। ওটা ছিল রানী লসট্রিস-এর সমাধি, খ্রিস্টের জন্মের সতেরোশো আশি বছর আগেকার।

সমাধির সমস্ত জিনিস প্রাচীনকালেই চুরি হয়ে গেছে, এটা দেখে হতাশ হন হাসলান। নিমাও খুব কাতর হয়ে পড়ে। থাকার মধ্যে আছে শুধু দেয়াল ও সিলিং ঢাকা মিউরাল বা দেয়ালচিত্র।

স্তম্ভের পিছনের দেয়ালে নিমাই তখন কাজ করছিল, যেখানে এককালে দাঁড়িয়ে ছিল সারকোফ্যাগাস—ভাস্কর্যশিল্প-অলঙ্কৃত ও শিলালিপিসমৃদ্ধ পাথুরে শবাধার। মিউরাল-এর ফটো তুলছে ও, এই সময় একদিকের দেয়াল থেকে প্লাস্টার খসে পড়ল, বেরিয়ে পড়ল দশটা কুলঙ্গি বা দেয়ালে তৈরি ছোট খোপ। দেখা গেল দশটা কুলঙ্গিতে দশটা তেল চকচকে স্বচ্ছ জার রয়েছে। প্রতিটি জারে পাওয়া গেল একটা করে প্যাপাইরাস। ক্ষয়-ক্ষতি কিছু হলেও, প্রায় চার হাজার বছর পর আশ্চর্য অটুট অবস্থায় আজও টিকে আছে।

কি আশ্চর্য ও বিস্ময়কর কাহিনীই না বলা হয়েছে ওগুলোয়। শক্তিশালী ও সুদক্ষ শত্রু-বাহিনী আক্রমণ করল একটা জাতিকে, এবং যুদ্ধে ব্যবহৃত হলো ঘোড়া আর ঘোড়ায় টানা রথ। এর আগে মিশরীয়রা ঘোড়া দেখেনি। হিকসস বাহিনীর দ্বারা পরাজিত ও বিধ্বস্ত নীলনদের আশীর্বাদপুষ্ট মানুষ পালাতে বাধ্য হলো। নেতৃত্ব দিল ওদের রানী, রানী লসট্রিস; বিশাল নদী অনুসরণ করে দক্ষিণ দিকে চলে এল, চলে এল প্রায় নদীর উৎসে, ইথিওপিয়ান হাইল্যান্ডের নির্দয় পাহাড়ী এলাকার গভীরে। এখানে, প্রবেশ নিষিদ্ধ পাহাড়শ্রেণীর ভেতর, রানী লসট্রিস তাঁর স্বামীর মমি করা দেহ সমাধির ভেতর সংরক্ষণ করলেন। তাঁর স্বামী, ফারাও মামোস, যুদ্ধে হিকসস বাহিনীর হাতে নিহত হন।

বহু বছর পর রানী লসট্রিস তাঁর প্রজাদের নিয়ে উত্তর অভিযানে বেরোন, আবার ফিরে আসেন মিশরে। এবার ওঁদের কাছে নিজস্ব ঘোড়া আর রথ আছে, দুর্গম আর নিষ্ঠুর আফ্রিকান প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে দক্ষ হয়েছে যোদ্ধারা, সুদীর্ঘ নদীর তীর ধরে প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের মত ছুটে এসে হানাদার হিকসস বাহিনীকে আরেকবার চ্যালেঞ্জ করে বসল। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে হার হলো হিকসসের, তার কবল থেকে ছিনিয়ে নেয়া হলো আপার ও লোয়ার ঈজিপ্ট।

এই গল্প নিমার অস্তিত্বের অণু-পরমাণুতে শিহরণ জাগায়। প্যাপাইরাসে বদ্ধ ক্রীতদাসের আঁকা চিত্রলিপি বা হায়ারোগ্লিফের অর্থ ধীরে ধীরে একটু একটু করে উদ্ধার করে ওরা, আর প্রতি মুহূর্তে মুগ্ধ বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হতে থাকে ও।

কায়রোয়, মিউজিয়ামে, সারাদিন রুটিন কাজ করার পর এই ভিলায় রোজ

রাতে স্ক্রোল নিয়ে বসে ওরা। দেখতে দেখতে কয়েক বছর কেটে গেছে, তবে নিষ্ঠা আর অধ্যবসায়ের ফলও পেয়েছে, দশটা স্ক্রোলের পাঠোদ্ধার করা গেছে—বাকি আছে শুধু সপ্তম স্ক্রোল। এটা আসলে হেঁয়ালিতে ভরা, লেখক গূঢ় রহস্যময় সাঙ্কেতিক ভাষায় এমন সব ঘটনার কথা পরোক্ষভাবে উল্লেখ করে গেছে যে এত কাল পর কার সাধ্য অর্থ বের করে। নিজেদের কর্মজীবনে হাজার হাজার টেক্সট স্টাডি করেছে ওরা, কিন্তু সপ্তম স্ক্রোলে টাইটা এমন সব সিম্বল বা প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করেছে যা আগে কখনও ওদের চোখে পড়েনি। এখন ওরা দু'জনেই জানে যে টাইটা চেয়েছিল তার প্রিয় রানী ছাড়া আর কেউ যেন এর অর্থ করতে না পারে। মনোহারিণী রানীকে দেয়া এগুলো ছিল তার শেষ উপহার, যে উপহার রানী সঙ্গে করে কবরে নিয়ে যাবেন।

দু'জনের এক করা মেধা, কল্পনাশক্তি আর শ্রম কয়েক বছর ধরে কাজে লাগিয়ে অবশেষে একটা উপসংহারে পৌঁছুতে যাচ্ছে ওরা। অনুবাদে এখনও অনেক ফাঁক রয়ে যাচ্ছে, কিছু অংশের পাঠ সঠিক হলো কিনা সন্দেহ আছে, তবে পাণ্ডুলিপির মূল কাঠামোটা এমন ভঙ্গিতে সাজিয়েছে ওরা যে তা থেকে বক্তব্যের সারমর্মটুকু বের করে নেয়া সম্ভব।

এই মুহূর্তে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছেন আর মাথা নাড়ছেন হাসলান, যেমন আগেও বহুবার করেছেন তিনি। 'সত্যি আমি ভয় পাচ্ছি,' বললেন। 'এটা বিশাল একটা গুরু দায়িত্ব। বছরের পর বছর রাত জেগে যে জ্ঞান আমরা অর্জন করলাম, এটা নিয়ে কি করা হবে। এ যদি মন্দ কোন লোকের হাতে পড়ে...' কথা শেষ না করে চুমুক দিলেন আবার, দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'এমন কি আমরা যদি ভাল কোন লোককেও দেখাই, প্রায় চার হাজার বছরের পুরানো এই গল্প সে কি সত্যি বলে বিশ্বাস করবে?'

'কাউকে দেখাবার দরকার কি?' নিমার কথায় সামান্য হলেও ক্ষোভ বা ঝাঁঝ প্রকাশ পেল। 'যা করার আমরা করলেই তো পারি।' মাঝে মধ্যে এ-ধরনের পরিস্থিতি দেখা দিলে দু'জনের মধ্যে পার্থক্যটা সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হাসলানের বয়েস হয়েছে, কাজেই তিনি সতর্ক ও সাবধান। আর নিমার আচরণে তারুণ্যের অস্থিরতা প্রকাশ পায়।

'তুমি বুঝবে না, নিমা,' বললেন তিনি। যখনই তিনি এ-কথা বলেন, অস্বস্তি বোধ করে নিমা। আরব পুরোপুরি পুরুষদের জগৎ, মর্যাদার সমান ভাগ মেয়েদেরকে তারা এখনও দিতে শেখেনি। অথচ আরেক জগতের সঙ্গে পরিচয় আছে নিমার, যেখানে মেয়েরা সমান মর্যাদা দাবি করে এবং পায়ও—দান হিসেবে নয়, অধিকার হিসেবে। দুই জগতের মাঝখানে আটকা পড়ে গেছে নিমা, পশ্চিমা জগৎ আর আরব জগৎ।

নিমার মা ইংরেজ মহিলা, কায়রোর ব্রিটিশ দূতাবাসে কাজ করতেন। ওর বাবা মিশরীয়, কর্নেল নাসেরের সরাসরি অধীনে একজন তরুণ অফিসার ছিলেন। পরস্পরকে ভালবাসেন ওঁরা, তারপর বিয়ে করেন। যদিও ওদের দাম্পত্য জীবনটা সুখের হয়নি।

ওর মা চেয়েছিলেন তাঁর সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে ইংল্যান্ডের ইয়র্কে, নিজের

জন্মস্থানে। চেয়েছিলেন জন্মসূত্রে তাঁর সন্তানের ব্রিটিশ নাগরিকত্ব থাকা চাই। মা-বাবার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর মায়ের জেদে ইংল্যান্ডে গিয়ে স্কুলে ভর্তি হতে হয় নিমাকে, তবে প্রতিটি দীর্ঘ ছুটি কায়রোয় বাবা ও চাচার সঙ্গে কাটিয়েছে ও। ওর বাবার বিস্ময়কর পদোন্নতি হয়, শেষ দিকে তিনি মোবারক মন্ত্রীসভার সদস্য হতে পেরেছিলেন। বাবাকে অসম্ভব ভালবাসত নিমা, বোধহয় সেজন্যেই বাবা ও আরব সমাজের প্রভাব বেশি পড়ে ওর ওপর। বাল্য ও কৈশোর কাল বেশিরভাগটাই মায়ের সঙ্গে ইংল্যান্ডে কাটালেও মা বা পশ্চিমা সমাজের প্রভাব ওর ওপর খুব কম।

কপটিক সমাজের ঐতিহ্য হলো গুরুজনরা মেয়ের পাত্র ঠিক করবেন। এই ঐতিহ্য মেনে নিয়ে কাউকে ভালবাসার ঝামেলা এড়িয়ে গেছে নিমা। গুরুজন বলতে একমাত্র চাচা হাসলান, তিনি আবার এত বেশি খুঁতখুঁতে যে ভাইঝির উপযুক্ত পাত্র চারদিকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছেন না। তবে এ নিয়ে নিমার মনে কোন ক্ষোভ বা অস্থিরতা নেই। ও জানে যে চাচা তাঁর দায়িত্ব যথাসময়েই পালন করবেন, এবং পাত্র পছন্দ হলে ওর মতামতও চাইবেন।

শুধু যে বিয়ের ব্যাপারে তা নয়, আরব সমাজের আরও অনেক ঐতিহ্য মেনে চলে নিমা। যেমন নিজের স্বাধীনতা বজায় রেখেও আচার-আচরণ ও পোশাক-আশাকে শালীনতা বজায় রাখে ও। গ্রামের মেয়েদের মত বোরখা পরে না, তবে কয়েক প্রস্থ কাপড়ে শরীর এমনভাবে ঢেকে রাখে যে ওর বিরুদ্ধে মুসলমান বা কপটিক ক্রিশ্চান সমাজের কোন অভিযোগ নেই।

হাসলান আবার কথা বলছেন। তাঁর কথায় মন দিল নিমা। 'মন্ত্রীর সঙ্গে আবার আমি কথা বলেছি, কিন্তু তিনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন বলে মনে হয় না। সম্ভবত ফারুকী তাঁকে বুঝিয়েছে যে আমি একটু পাগলাটে।' বিষণ্ন হাসি ফুটল তাঁর ঠোঁটে। করিম ফারুকী তাঁর ডেপুটি, অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী তরুণ, মন্ত্রীসভায় ও প্রশাসনে তার আত্মীয় ও শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যা অনেক। 'মিনিস্টার আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, ফান্ড পাবার কোন সম্ভাবনা নেই। কাজেই আমাকে দেখতে হবে বাইরে থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায় কিনা। সম্ভাব্য স্পনসর হিসেবে তালিকায় চারটে নাম রেখেছি। প্রথমেই বলা যেতে পারে বাফেন মিউজিয়ামের কথা, কিন্তু বিশাল ও নিষ্প্রাণ কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করতে কখনোই আমার ভাল লাগেনি। একা একজন লোকের সাহায্য পেলে খুশি হই। সিদ্ধান্তে আসাটা তাহলে সহজ হয়।' এ-সব কিছুই নতুন নয় নিমার কাছে, তবু মন দিয়েই শুনছে ও।

'তারপর ধরো, হেস ডুগার্ড। তাঁর টাকা আছে, এ বিষয়ে আগ্রহও আছে, কিন্তু তাঁকে আমি এত ভালভাবে চিনি না যে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি।'

'আর আমেরিকান ভদ্রলোক? তিনি তো বিখ্যাত একজন কালেক্টর।'

'ফ্রেড ম্যাকমোহনের সঙ্গে কাজ করা অত্যন্ত কঠিন। নিজের ভাগ বাড়াবার দিকে এত বেশি ঝোঁক তাঁর, তাঁকে আমার রাক্ষস বলে মনে হয়। সত্যি ভয় পাই।'

'তাহলে বাকি থাকল কে? তালিকার প্রথম নামটা?'

হাসলান জবাব দিলেন না, কারণ উত্তরটা দু'জনেরই জানা। ওঅর্ক টেবিলের দিকে তাকালেন তিনি, জিনিস-পত্র সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। 'দেখে মনে হচ্ছে কত সাধারণ আর নগণ্য। পুরানো একটা প্যাপাইরাস স্ক্রোল, কয়েকটা ফটোগ্রাফ আর নোট বুক, একটা কমপিউটর প্রিন্ট আউট। বিশ্বাস করা কঠিন মন্দ লোকের হাতে পড়লে এই সামান্য ক'টা জিনিস কি বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।' আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি।

তারপর হেসে উঠলেন। 'আমি বোধহয় একটু বেশি ভয় পাচ্ছি। হয়তো রাত জেগে কাজ করার প্রতিক্রিয়া। কি, মা, কাজে ফিরে যাই আবার? আগে পাজি বুড়ো টাইটার পুরো বক্তব্য অনুবাদ করি, তারপর অন্যান্য বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা যাবে, কি বলো?' সামনের স্তূপ থেকে ওপরের ফটোটা হাতে নিলেন। স্ক্রোলের মাঝখানের অংশ দেখানো হয়েছে এতে। 'ভাগ্যই খারাপ, তা'না হলে ঠিক এই জায়গার প্যাপাইরাস ভেঙে খসে পড়বে কেন।' চোখে চশমা পরলেন। পড়ছেন নিমাকে শোনাবার জন্যে।

> "সিঁড়ে বেয়ে হাপির (HAPI) ঠিকানায় পৌঁছুতে হলে অনেকগুলো ধাপ নামতে হবে। কঠিন পরিশ্রম আর অনেক চেষ্টার পর দ্বিতীয় ধাপে পৌঁছুলাম আমরা, তারপর আর এগোলাম না, কারণ এখানেই রাজকুমার একটা দৈববাণী পেল। স্বপ্নের ভেতর তার বাবা, মৃত দেবতা ফারাও, দেখা দিলেন তাকে, এবং জানালেন, 'দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এই জায়গাতেই আমি অনন্তকাল বিশ্রাম নেব।'"

চোখ থেকে চশমা খুলে নিমার দিকে তাকালেন হাসলান। 'দ্বিতীয় ধাপ,' বললেন তিনি। 'অন্তত এই একবার স্পষ্ট একটা বর্ণনা দিয়েছে টাইটা। সে তার স্বভাবসুলভ হেঁয়ালি এখানে ব্যবহার করেনি।'

'এসো, স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফগুলো দেখি,' বলল নিমা, গ্লসি শিটগুলো নিজের দিকে টেনে নিল। টেবিল ঘুরে ওর পিছনে এসে দাঁড়ালেন হাসলান। 'একটা গিরিখাদে ওরা বাধা পেল। খাদের ভেতর স্বাভাবিক বাধা কি হতে পারে? খানিক পরপর নদীর তলায় ঢাল থাকতে পারে, স্রোত ওখানে প্রবল হবে। কিংবা একটা জলপ্রপাত থাকতে পারে। ওটা যদি দ্বিতীয় জলপ্রপাত হয়, তাহলে এই জায়গায় ছিল ওরা–' স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফের এক জায়গায় আঙুল ঠেকাল নিমা। ওখানে বিশাল দুই পাহাড়ের মাঝখানে সাপের মত এঁকেবেঁকে এগিয়েছে সরু একটা নদী।

হঠাৎ মনোযোগ ছুটে গেল নিমার, মাথা তুলল। 'শুনছ, চাচা?' গলার স্বর বদলে গেছে, তীক্ষ্ণ ও সতর্ক শোনাল

'কি?' হাসলানও মুখ তুললেন।

'কুকুর,' বলল নিমা।

'ওই ব্যাটা দোআঁশলাটা,' বললেন হাসলান, 'ঘেউ ঘেউ করে রাতটাকে ভৌতিক করে তোলে। ওটাকে আর না তাড়ালেই নয়।'

হঠাৎ কারেন্ট চলে গেল। অন্ধকার ঘরে বিস্ময়ে স্থির হয়ে গেল ওরা। পিছন দিকে পাম গাছের তলায় শেডের ভেতর জেনারেটরের নরম শব্দ থেমে গেছে।

মরু রাতের স্বাভাবিক অংশ হয়ে ওঠায় শুধু থেমে গেলে ওটার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে ওরা।

টেরেসের দরজা দিয়ে তারার অস্পষ্ট আলো ঢুকছে ভেতরে। উঠে গিয়ে দরজার পাশের একটা শেলফ থেকে তেল ভরা ল্যাম্পটা নামালেন হাসলান, জ্বালার পর চেহারায় কৃত্রিম বা সকৌতুক হতাশা ফুটিয়ে নিমার দিকে তাকালেন। 'যাই, দেখে আসি...'

'চাচা,' বাধা দিল নিমা, 'কুকুরটা!'

কয়েক সেকেন্ড কান পেতে শোনার পর একটু উদ্বিগ্ন দেখাল হাসলানকে। কুকুরটা একদম চুপ মেরে গেছে। 'ও কিছু না,' বলে দরজার দিকে এগোলেন তিনি।

তেমন কোন কারণ ছাড়াই হঠাৎ পিছন থেকে ডাক দিল নিমা, 'চাচা, সাবধান কিন্তু!'

গুরুত্ব না দেয়ার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন হাসলান, বেরিয়ে এলেন টেরেসে।

বাইরে একটা ছায়া নড়তে দেখল নিমা, ভাবল বাতাসে মাচার ওপর কোন লতা বা ডাল দোল খাচ্ছে। তারপর ওর খেয়াল হলো, রাতটা একদম স্থির, এতটুকু বাতাস বইছে না। এই সময় লোকটাকে দেখতে পেল, ফ্ল্যাগস্টোনের ওপর দিয়ে দ্রুত ও নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে। মাছ ভর্তি পুকুরটা পাকা টেরেসের মাঝখানে, ওটাকে ঘুরে এগোচ্ছেন হাসলান; লোকটা তার পিছন দিকে চলে আসছে। 'চাচা!' নিমার চিৎকার শুনে দ্রুত আধ পাক ঘুরলেন হাসলান, উঁচু করলেন ল্যাম্পটা।

'কে তুমি?' গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'এখানে কি চাও?'

আগন্তুক নিঃশব্দে তার কাছে চলে আসছে। গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা আলখেল্লা ফুলে উঠছে পায়ের চারপাশে, এক প্রস্থ কাপড়ে মাথাটা ঢাকা। ল্যাম্পের আলোয় হাসলান দেখলেন মাথার সাদা কাপড়ের একটা প্রান্ত মুখের ওপর নামিয়ে এনে লোকটা তার চেহারা ঢেকে রেখেছে।

লোকটা নিমার দিকে পিছন ফিরে রয়েছে, তার হাতের ছুরিটা তাই দেখতে পায়নি ও। তবে হাসলানের পেট লক্ষ্য করে ছোরা মারার ভঙ্গিটা চিনতে পারল। ব্যথায় কাতরে উঠলেন হাসলান, কুঁজো হয়ে গেলেন। আততায়ী ছুরিটা বের করে নিয়ে আবার ঢোকাল, তবে এবার ল্যাম্প ফেলে দিয়ে তার হাতটা ধরে ফেললেন হাসলান।

খসে পড়া ল্যাম্পের শিখা দপদপ আওয়াজ করছে। আলো ও ছায়ার ভেতর ধস্তাধস্তি করছে দু'জন। নিমা দেখতে পেল ওর চাচার সাদা শার্টের সামনের দিকটায় গাঢ় একটা দাগ ছড়িয়ে পড়ছে।

'দৌড় দাও!' চিৎকার করছেন হাসলান। 'যাও, নিমা, যাও! লোকজনকে ডাকো! ওকে আমি ধরে রাখতে পারছি না!' নিমা জানে ওর চাচা নেহাতই শান্ত শিষ্ট একজন ভদ্র মানুষ, জীবনের বেশিরভাগ সময় ঘরে বসে বই-পত্র নিয়ে কাটিয়েছেন। বোঝাই যাচ্ছে লোকটার সঙ্গে তিনি পারছেন না।

'যাও, নিমা, যাও! প্লীজ, নিজেকে বাঁচাও!' গলার আওয়াজই বলে দিল

নিমাকে, হাসলান দুর্বল হয়ে পড়ছেন, তবে এখনও তিনি আততায়ীর ছুরি ধরা হাতটা ছাড়েননি।

আতঙ্কে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল নিমা, হঠাৎ সংবিৎ ফিরতে ছুটল দরজার দিকে। টেরেসে বেরিয়ে এল বিড়ালের মত ক্ষিপ্র বেগে–আততায়ীকে হাসলান আটকে রেখেছেন, লোকটা যাতে নিমার পথ আগলাতে না পারে।

নিচু পাঁচিল টপকে ঝোপের মাঝখানে নামল নিমা, প্রায় সেঁধিয়ে গেল দ্বিতীয় লোকটার আলিঙ্গনের ভেতর। তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে মোচড় খেলো, ছিটকে সরে গিয়ে ছুটল আবার। লোকটার লম্বা করা হাতের আঙুল আঁচড় কাটল ওর মুখে। নিজেকে প্রায় ছাড়িয়ে নিয়েছে নিমা, এই সময় আঙুলগুলো বাঁকা হয়ে আটকে গেল গলার কাছে ওর সূতী কামিজে।

এবার লোকটার হাতে ছুরি দেখতে পেল নিমা, তারার আলো লেগে ঝিক করে উঠল রূপালি একটা লম্বা আকৃতি। ওটা দেখামাত্র মৃত্যু ভয় নতুন শক্তি যোগাল ওকে। ফড় ফড় করে ছিঁড়ে গেল কামিজ, নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটছে নিমা–তবে তারপরও একটু দেরি হয়ে গেছে ওর, ছুরির ফলাটাকে পুরোপুরি এড়াতে পারল না। বাহুর ওপর দিকটা চিরে গেছে, বুঝতে পেরে বাঁচার আকুলতা আরও তীব্র হয়ে উঠল, সমস্ত শক্তি এক করে লোকটাকে লাথি মারল নিমা। লাগল শরীরের নিচের দিকে নরম কোথাও, তবে ঝাঁকি খেলো ওর গোড়ালি আর হাঁটু। লোকটা গুঙিয়ে উঠে হাঁটু গাড়ল মাটিতে।

পাম বীথির ভেতর দিয়ে ছুটছে নিমা। প্রথম দিকে খেয়াল থাকল না কোন দিকে যাচ্ছে বা কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছে। ছুটছে যতক্ষণ শক্তিতে কুলায় দূরে সরে যাবার চেষ্টায়। তারপর ধীরে ধীরে আতঙ্কটা নিয়ন্ত্রণে আনল। ঝট করে পিছন দিকে তাকাল, কেউ ওর পিছু নেয়নি। লেকের কিনারায় পৌঁছে ছোটার গতি কমাল, বুঝতে পারছে তা না হলে হাঁপিয়ে যাবে। অনুভব করল কাঁধের নিচে বাহু থেকে গরম রক্ত গড়াচ্ছে, হাত বেয়ে নেমে এসে আঙুলের ডগা থেকে ঝরে পড়ছে টপ টপ করে।

থামল নিমা, বসে হেলান দিল একটা পাম গাছে। এক ফালি কামিজ ছিঁড়ে বাহুর ক্ষতটা বাঁধল, অক্ষত হাতটা এত বেশি কাঁপছে যে কাজটা শেষ করতে অনেক সময় লাগল। বাম হাত আর দাঁত দিয়ে ধরে গিঁট বাঁধল ব্যান্ডেজে, এখন আর আগের মত রক্ত বেরুচ্ছে না। কোন দিকে যাবে বুঝতে পারছে না নিমা। এদিক ওদিক তাকাতে একটা জানালা দেখতে পেল, ভেতরে ল্যাম্প জ্বলছে। কাছাকাছি সেচ খালটার পাশে ওটা সালিমার ঘর, চিনতে পারল ও। উঠে দাঁড়িয়ে সেদিকেই এগোল।

একশো কদমও এগোয়নি, শুনতে পেল পাম বীথির ভেতর কে যেন কাকে আরবীতে বলছে, 'মোমিন, মেয়েলোকটা তোমার এদিকে আসেনি তো?'

সঙ্গে সঙ্গে নিমার সামনের অন্ধকারে একটা টর্চ জ্বলে উঠল, শোনা গেল আরেক লোকের গলা, 'না, এদিকে আসেনি।'

ভাগ্যক্রমে সামনের লোকটার হাতে গিয়ে পড়েনি নিমা। ঝপ করে বসে পড়ল, মরিয়া হয়ে চারদিকে তাকিয়ে পালাবার পথ খুঁজছে। ওর পিছনের পাম

বীথির ভেতর থেকে আরেকটা টর্চের আলো এগিয়ে আসছে, ওর ফেলে আসা পথ ধরে। নিশ্চয়ই এই লোকটাকেই লাথি মেরেছিল, তবে এরইমধ্যে আঘাতটা সামলে নিয়েছে।

দু'দিকে বাধা, কাজেই লেকের দিকে ফিরে এল নিমা। রাস্তাটাও ওদিকেই। এত রাতে গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে, তবে ঈশ্বর চাইলে ত্রাণকর্তা হিসেবে পেয়েও যেতে পারে কাউকে। ছুটতে গিয়ে আছাড় খেলো নিমা, হাঁটুর চামড়া উঠে গেল, লাফ দিয়ে সিধে হয়ে আবার ছুটল।

দ্বিতীয়বার আছাড় খাবার পর হাতে ঠেকল কমলালেবু সাইজের একটা পাথর। আবার ছোটার সময় মুঠোয় থাকল ওটা, অস্ত্র হিসেবে খানিকটা অভয় দিচ্ছে ওকে।

বাহুর ক্ষতটা ব্যথা করছে। চাচার কথা ভেবে কান্না পাচ্ছে। তাঁর আঘাত যে গুরুতর, ও জানে। বাঁচবে তো? যেভাবে হোক চাচার কাছে সাহায্য নিয়ে ফিরতে হবে ওকে। ওর পিছনে পাম বীথির ভেতর টর্চ নিয়ে খোঁজাখুঁজি করছে লোক দু'জন। ক্রমশ এদিকেই এগিয়ে আসছে তারা। খানিক পর পর পরস্পরের সাড়া নিচ্ছে।

একটা নালা থেকে অবশেষে রাস্তার ওপর উঠে এল নিমা। বোধহয় স্বস্তি পাওয়াতেই পা দুটো কাঁপতে শুরু করল, মনে হলো এই পা নিয়ে আর হাঁটতে পারবে না। তবু চেষ্টা করল নিমা। গ্রামের দিকে ঘুরল ও। হাঁটা শুরু করেছে, তবে প্রথম বাঁকে এখনও পৌঁছায়নি, এই সময় গাছপালার আড়াল থেকে ধীরগতিতে এগিয়ে আসতে দেখল একজোড়া হেডলাইটকে। রাস্তার মাঝখান ধরে গাড়িটার দিকে ছুটল নিমা। 'বাঁচান! আরবীতে চিৎকার করছে। 'সাহায্য করুন, প্লীজ!'

বাঁক ঘুরল গাড়িটা। হেডলাইটের আলো চোখ ধাঁধিয়ে দেয়ার আগে নিমা দেখল গাঢ় রঙের ছোট একটা ফিয়াট ওটা। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ড্রাইভারকে থামানোর জন্যে হাত নাড়ছে ও, হেডলাইটের আলোয় রাস্তাটাকে মনে হচ্ছে থিয়েটারের স্টেজ। সামনে থামল ফিয়াট, ছুটে পাশে চলে এল নিমা, দরজার হাতল ধরে টান দিল : 'প্লীজ, বাঁচান! ওরা...'

দরজা খুলে গেল, লাফ দিয়ে নিচে নেমে নিমার আড়ষ্ট ডান হাতটা খপ করে ধরে ফেলল ড্রাইভার। হ্যাঁচকা টানে ব্যাক ডোরের দরজা খুলল সে। 'মোমিন! আলিজান!' পাম বীথির দিকে মুখ ঘুরিয়ে ডাক দিল। 'মেয়েটাকে পেয়েছি!' মোমিন আর আলিজান সাড়া দিচ্ছে, শুনতে পেল নিমা। দেখল টর্চের আলো ঘুরে গিয়ে এদিকেই সরে আসছে দ্রুত।

ওর ঘাড়ের পিছনে হাত দিয়ে ওকে নত করার চেষ্টা করছে ড্রাইভার, গাড়ির ব্যাক সীটে ঢোকাতে চায়। হঠাৎ খেয়াল হলো নিমার, বাম হাতের মুঠোয় পাথরটা এখনও আছে। একটু ঘুরল ও, শক্ত করল পেশী, মুঠোয় ধরা পাথরটা সজোরে ঠুকে দিল লোকটার মাথার পাশে। শেষ মুহূর্তে খুলি বাঁচাবার চেষ্টা করল সে, ফলে পাথরটা গুঁড়িয়ে দিল তার কপালের হাড়। বিনা প্রতিবাদে রাস্তার ওপর ঢলে পড়ল লোকটা, তারপর আর নড়ল না।

পাথরটা ফেলে দিয়ে আবার ছুটছে নিমা। হঠাৎ খেয়াল হলো, হেডলাইটের তৈরি আলোর পথ ধরে ছুটছে সে, তার প্রতিটি নড়াচড়া আলোকিত। পাম বীথি থেকে বেরিয়ে এসে ওর পিছু নিয়েছে অপর দুই লোক, চিৎকার করে কি যেন বলছে তারা। পিছন দিকে তাকাতে নিমা দেখল, দ্রুত কাছে চলে আসছে খুনীরা। বুঝতে পারল, বাঁচার একমাত্র উপায় অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া। ঘুরে রাস্তার কিনারায় চলে এল, ঢাল বেয়ে তর তর করে নামছে। নামার গতি নিয়ন্ত্রণে থাকল না, লেকের কোমর সমান পানিতে চলে এল নিমা। আতঙ্ক ও অন্ধকারে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, বুঝতে পারেনি রাস্তার পাশে লেকের কাছে চলে এসেছে। এখন আর ঢাল বেয়ে রাস্তায় ওঠার সময় নেই। তবে মনে পড়ল, সামনে প্যাপাইরাস আর নল খাগড়া আছে, লুকানোর জায়গা পাওয়া যেতে পারে।

লেকের গভীরে চলে এল নিমা, পায়ের নিচে মাটি পাচ্ছে না। সাঁতরাচ্ছে ও। গলায় ওড়নাটা নেই, কোথায় খসে পড়েছে বলতে পারবে না। কামিজ আর সালোয়ার খুব বেশি ঢোলা হওয়ায় সাঁতার কাটতে অসুবিধে হচ্ছে। পানির ওপর থাকা নিরাপদ নয় মনে করে কিছুক্ষণ ডুব সাঁতার দিল। সন্দেহ নেই, ইতিমধ্যে রাস্তার কিনারায় পৌঁছে লেকের দিকে তাকিয়ে আছে লোকগুলো।

মাথার ওপর নল খাগড়া ঝোপ পেয়ে থামল নিমা। আরও খানিকটা ভেতরে সরে এল। পানির ওপর শুধু নাকটা তুলে রেখেছে, মুখটা রাস্তার উল্টোদিকে ফেরানো। নিমা জানে ওর কালো চুলে টর্চের আলো প্রতিফলিত হবে না।

কান দুটো পানির নিচে থাকলেও রাস্তার ওপর থেকে লোকগুলোর জোরাল গলা শুনতে পাচ্ছে নিমা। কিনারায় দাঁড়িয়ে নল খাগড়ার ওপর টর্চের আলো ফেলছে, খুঁজছে ওকে। একবার টর্চের আলো ওর মাথার চারপাশে ঘোরাফেরা করল, ডুব দেয়ার জন্যে বড় করে শ্বাস নিল নিমা। তবে না, আলোটা সরে গেল।

মাথা একটু তুলল নিমা, কান দুটো পানির ওপর উঠে এল। লোকগুলো আরবীতে কথা বলছে। যে লোকটার নাম আলিজান তার গলা চিনতে পারল। মনে হলো সেই ওদের লীডার, কাকে কি করতে হবে বলে দিচ্ছে। 'মোমিন, যাও, বেশ্যাটাকে তুলে আনো।'

ঢাল বেয়ে নেমে আসার আওয়াজ পেল নিমা। ছপ ছপ শব্দ তুলে পানিতে নামল মোমিন। 'আরও সামনে,' রাস্তা থেকে বলল আলিজান। 'ওদিকে, নল খাগড়ার ভেতর, আমি যেখানে টর্চের আলো ফেলছি।'

'পানি ওদিকে অনেক গভীর। কেউ আমরা সাঁতার জানি না—তুমিও না।'

'ওই তো, তোমার ঠিক সামনে। নল খাগড়ার ভেতর। আমি ওর মাথা দেখতে পাচ্ছি।' আলিজান উৎসাহ দিল তাকে। ধরা পড়ে গেছে, বুঝতে পেরে যতটা সম্ভব পানির নিচে মাথা নামাল নিমা।

চারদিকে প্রচুর পানি ছিটিয়ে ওর দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে মোমিন। অকস্মাৎ 'আল্লাহ রে, আল্লাহ' বলে চিৎকার দিল সে, ঘুরে উঁচু পাড়ের দিকে পালাচ্ছে। কিছু না, নল খাগড়ার ভেতর থেকে এক ঝাঁক হাঁস ভয় পেয়ে সশব্দে ডানা মেলেছে আকাশে। রাস্তা থেকে আলিজান হুমকি-ধামকি দিলেও কাজ হলো না, ইতিমধ্যে ঢালের ওপর উঠে পড়েছে মোমিন, সে আর পানিতে নামতে রাজি

নয়। ঢাল বেয়ে রাস্তায় উঠেছে সে, বলল, 'আসল গুরুত্ব ক্রোলের, মেয়েটার তেমন গুরুত্ব নেই। ক্রোল ছাড়া টাকা পাওয়া যাবে না। মেয়েটাকে পরে কোথায় পাওয়া যাবে জেনে নিতে পারব।'

রাস্তার কিনারা থেকে গাড়ির কাছে ফিরে গেল লোকগুলো। উঠে বসল সবাই, গ্রামের দিকে চলে গেল গাড়ি। তারপরও ভয়ে পানি থেকে উঠছে না নিমা, ভাবছে অন্ধকার রাস্তায় ওরা কাউকে পাহারায় রেখে গেছে কিনা। খানিক পর ঠাণ্ডায় কাঁপুনি ধরে গেল, পানি থেকে না উঠলে মারা যেতে পারে। কিন্তু সাহসে কুলাচ্ছে না, শরীরে শক্তি আছে বলেও মনে হলো না। মরি মরব, দিনের আলো না ফোটা পর্যন্ত পানি ছেড়ে আমি উঠব না।

এভাবে আরও বেশ কিছুক্ষণ কাটল। আগুনের আভায় আকাশটাকে রাঙা হয়ে উঠতে দেখল নিমা। পাম গাছগুলোর ভেতর কমলা রঙের শিখাও মাঝে মধ্যে দেখা যাচ্ছে। কি ঘটছে বুঝতে পেরে নিজের নিরাপত্তার কথা ভুলে গেল নিমা। কিভাবে শক্তি ফিরে পেল বলতে পারবে না, লেকের পাড়ে উঠে এসে কাদায় দাঁড়িয়ে থাকল। ঠক ঠক করে কাঁপছে, ভেজা চুলের ফাঁক দিয়ে অকিয়ে আছে আগুনের দিকে, পানি গড়াচ্ছে চোখ দুটো থেকে। 'ভিলায় আগুন দিয়েছে ওরা!' বিড়বিড় করল নিমা। 'চাচা! ওহ্ গড, প্লীজ! নো, নো!'

ঢাল বেয়ে উঠল নিমা, জ্বলন্ত বাড়িটার দিকে ছুটছে।

দুই

শেষ বাঁকটা ঘোরার আগেই হেডলাইট আর এঞ্জিন বন্ধ করে দিল আলিজান, ভিলার চালু ড্রাইভওয়ে ধরে গড়িয়ে এসে টেরেসের নিচে থামল ফিয়াট। পাথুরে ধাপ বেয়ে তিনজনই তারা টেরেসে উঠে এল। আলিজান যেখানে ফেলে গেছে সেখানেই পুকুরের পাশে পড়ে রয়েছেন হাসলান। সেদিকে একবারও না তাকিয়ে পাশ কাটাল তারা, সরাসরি স্টাডিরুমে ঢুকল। নাইলনের সস্তা টোট ব্যাগটা টেবিলের ওপর রাখল আলিজান। 'এরইমধ্যে অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। এবার তাড়াতাড়ি কাজ সারো।'

'দোষটা মোমিনের,' ফিয়াটের ড্রাইভার কথা বলছে, 'সে-ই তো মেয়েটাকে পালাতে দিল।'

'রাস্তায় তুমিও একটা সুযোগ পেয়েছিলে,' খেঁকিয়ে উঠল মোমিন। 'কিছু করতে পারোনি।'

'থামো!' দু'জনকেই ধমক দিল আলিজান। 'টাকা পেতে চাইলে কোন ভুল করা চলবে না।' টর্চের আলোয় টেবিলে পড়ে থাকা ক্রোলটা দেখাল সে। 'এটাই সেটা।' নিশ্চিতভাবেই জানে, চিনতে পারার জন্যে ক্রোলের ফটোগ্রাফ দেখানো হয়েছে তাকে। প্রতিটি জিনিস চেয়েছে ওরা—প্রতিটি ম্যাপ আর ফটো। কাগজ-পত্র, বই, কিছুই রেখে যাওয়া চলবে না।' দ্রুত হাতে টেবিলের সমস্ত জিনিস টোট ব্যাগে ভরে ফেলা হলো। আলিজান বলল, 'এবার ডাক্তারের ব্যবস্থা করতে হয়।

নিয়ে এসো তাকে।'

টেরেসে বেরিয়ে এল দু'জন, হাসলানের গোড়ালি ধরে টেনে নিয়ে এল স্টাডিতে। আনার সময় তাঁর মাথা পাথুরে ধাপের ওপর আর দোরগোড়ায় ঘন ঘন বাড়ি খেলো, তাঁর রক্ত মেঝেতে লাল ও ভেজা দাগ ফেলে দিল, টর্চের আলোয় চকচক করছে।

'ল্যাম্পটা আনো!' নির্দেশ দিল আলিজান। হাসলানের ফেলে দেয়া ল্যাম্পটা কুড়িয়ে আনল একজন। অনেক আগেই নিভে গেছে সেটা। কানের কাছে তুলে নাড়ল আলিজান। 'তেলে ভর্তি হয়ে আছে,' বলল সে, প্যাঁচ ঘুরিয়ে ছিপি খুলল। 'যাও, ব্যাগটা গাড়িতে রেখে এসো।'

সবাই বেরিয়ে গেল স্টাডি থেকে, আলিজান ল্যাম্পের প্যারাফিন ঢালল হাসলানের শার্ট আর ট্রাউজারে। কাজটা শেষ করে শেলফগুলোর সামনে এসে দাঁড়াল সে, বাকি তেল দিয়ে বই আর পাণ্ডুলিপিগুলো ভেজাল। ল্যাম্প ফেলে দিয়ে আলখেল্লার ভেতর থেকে দেশলাই বের করে জ্বালল। প্রথমে বুককেসে আগুন দিল সে। দপ করে জ্বলে উঠল প্যারাফিন, স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখা পাণ্ডুলিপিতে আগুন ধরে গেল। হাসলানের কাছে ফিরে এল সে। দেশলাইয়ের আরেকটা কাঠি জ্বেলে তাঁর প্যারাফিন আর রক্তে ভেজা কাপড়ে ফেলল।

হাসলানের বুকের ওপর নীল কয়েকটা শিখা নাচতে শুরু করল। কাপড় পুড়ে যাচ্ছে, আগুন ধরছে মাংসে, সেই সঙ্গে বদলে যাচ্ছে ওগুলোর রঙ। এক সময় কমলা দেখাল, মাথা থেকে ঝুল বা ভুসা ভর্তি ধোঁয়া উঠছে।

ছুটে বেরিয়ে এসে গাড়িতে চড়ল আলিজান। চলে গেল ওরা।

অসহ্য ব্যথা জাগিয়ে দিল হাসলানকে। গভীর অতল জীবনের প্রান্তসীমা থেকে ফিরিয়ে আনার জন্যে এরকম তীব্রতারই প্রয়োজন ছিল। গুঙিয়ে উঠলেন তিনি। জ্ঞান ফেরার পর্যায়ে প্রথমেই তিনি নিজের মাংস পোড়ার গন্ধ পেলেন, তারপরই নিদারুণ যন্ত্রণা পুরো শক্তিতে আঘাত করল তাঁকে। একটা ঝাঁকি খেয়ে কাঁপুনি শুরু হবার পর তা আর থামছে না। চোখ মেলে নিজের দিকে তাকালেন তিনি।

কালো ছাই হয়ে যাচ্ছে কাপড়, কুঁকড়ে উঠছে। আর ব্যথা যে এত তীব্র হতে পারে, তাঁর কোন ধারণা ছিল না। অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারলেন, কামরার ভেতর তাঁর চারপাশে আগুন জ্বলছে। ধোঁয়া আর উত্তাপের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে তাঁর ওপর দিয়ে, এ-সবের ভেতর দিয়ে দোরগোড়ার আকৃতিটা কোন রকমে দেখা গেল। যন্ত্রণার অবসান চাইছেন তিনি, মৃত্যু কামনা করছেন। তারপর নিমার কথা মনে পড়ল। দগ্ধ, কালো ঠোঁট খুলে ভাইঝির নামটা উচ্চারণ করতে চাইছেন, কোন আওয়াজ বেরুল না। শুধু নিমার চিন্তা নড়াচড়ার শক্তি এনে দিল তাঁকে, কারণ নিমাকে তিনি নিজের চেয়েও বেশি ভালবাসেন। একটা গড়ান দিলেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে আগুনের আঁচ ঝলসে দিল পিঠ। গুঙিয়ে উঠে আবার গড়ালেন, দরজার দিকে একটু এগোলেন।

নড়তে প্রবল ইচ্ছাশক্তি লাগছে, প্রতিটি নড়াচড়া নতুন করে বর্ণনাতীত যন্ত্রণা বয়ে আনছে। তবে গড়ান দিয়ে আবার যখন চিৎ হলেন, তাজা ও ঠাণ্ডা বাতাস

পাওয়ায় একটু আরাম বোধ হলো। বাড়তি শক্তিটুকু ধাপগুলোর ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা পাকা টেরেসে নেমে আসতে সাহায্য করল তাঁকে।

কাপড় আর শরীরে এখনও আগুন জ্বলছে। নিস্তেজ ব্যাড়ি মেরে শিখাগুলো নেভাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু হাত দুটো জ্বলন্ত, কালো ধাবা হয়ে আছে। তারপর পোনা ছাড়া পুকুরটার কথা মনে পড়ল। শরীরটাকে ঠাণ্ডা পানিতে ফেলে দেয়ার চিন্তা আরেকটু শক্তি এনে দিল মনে। ক্রল করে সেদিকে এগোলেন, শিরদাঁড়া ভাঙা সাপের মত।

মাংস থেকে উৎকটগন্ধী ধোঁয়া উঠছে, গলায় বেধে যাওয়ায় কাশি শুরু হলো, তবু মরিয়া হয়ে একটু একটু করে এগোচ্ছেন। পাথুরে মেঝের খাঁজে ফোস্কা ওঠা ত্বকের কিছুটা রয়ে গেল, শেষ একটা গড়ান দিয়ে পুকুরে পড়লেন তিনি। হিস্‌স্ করে শব্দ হলো, বাষ্প উঠল খানিকটা, ম্লান মেঘ মুহূর্তের জন্যে অন্ধ করে দিল তাঁকে। জ্বলন্ত মাংসে ঠাণ্ডা পানির আলিঙ্গন অসহনীয় ব্যথার জন্ম দিল, প্রায় অচেতন হয়ে পড়লেন হাসলান।

আবার যখন সচেতন হলেন, ভেজা মাথা তুলে দেখলেন শেষ প্রান্তের ধাপ বেয়ে টেরেসে উঠে আসছে একটা ছায়ামূর্তি। কে চিনতে পারলেন না, তবে আসছে বাগানের দিক থেকে। তারপর জ্বলন্ত ভিলার আলো পড়ল ছায়ামূর্তির গায়ে, এবার নিমাকে চিনতে পারলেন তিনি। ভেজা চুল লেপ্টে আছে মুখে, ছেঁড়া ও কাদামাখা কামিজ থেকে লেকের পানি ঝরছে। ডান হাতের ওপর দিকে ব্যান্ডেজ, এখনও সামান্য রক্ত চোয়াচ্ছে।

নিমা তাঁকে দেখতে পায়নি। টেরেসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত স্টাডিরুমের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ দুটো বিস্ফারিত। চাচা কি ওই আগুনের ভেতর? প্রশ্নটা মনে জাগতেই সামনে বাড়ল নিমা, কিন্তু আগুনের আঁচ নিরেট পাঁচিলের মত, ঠেকিয়ে দিল ওকে। সেই মুহূর্তে খসে পড়ল ছাদ, গর্জে উঠে আকাশের দিকে লাফ দিল শিখাগুলো, চারদিকে টুকরো টুকরো আগুন ছড়িয়ে পড়ল। পিছিয়ে এল নিমা, হাত তুলে মুখ ঢাকল।

মুখ খুলে নিমাকে ডাকছেন হাসলান, কিন্তু ধোঁয়ায় পোড়া গলা থেকে কোন আওয়াজ বেরুল না। ঘুরে ছুটল নিমা, ধাপ বেয়ে নেমে যাচ্ছে। হাসলান বুঝতে পারলেন, লোকজনকে ডাকতে যাচ্ছে নিমা। ওর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে শেষ একবার চেষ্টা করলেন তিনি, কাকের মত কর্কশ কা-কা আওয়াজ বেরুল গলা থেকে।

বন করে ঘুরে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকল নিমা। চিৎকারটা শুরু হলো কয়েক সেকেন্ড পর। হাসলানের ঘাড়ের ওপর ওটা কোন মানুষের মাথা নয়। খুলির চুল অদৃশ্য হয়েছে, পুড়ে ছাই হবার পর বেশিরভাগই খসে পড়েছে; সেদ্ধ মাংসের ফালি ঝুলছে গাল আর চিবুক থেকে। গোটা মুখ কালো, ভেতরে কাঁচা মাংস দেখা যাচ্ছে। পিছু হটছে নিমা, হাসলান যেন কুৎসিত একটা প্রাণী।

'নিমা,' আওয়াজটা এত কর্কশ, কোন রকমে চেনা গেল। আবেদনের ভঙ্গিতে একটা হাত তুললেন তিনি। থামল নিমা, আতঙ্ক কাটিয়ে উঠে ছুটে এসে বাড়ানো হাতটা ধরল।

'ওহ্, গড! ওহ্, গড!' ফোঁপাচ্ছে নিমা। টেনে চাচাকে পুকুর থেকে তোলার চেষ্টা করল, কিন্তু তাঁর হাতের চামড়া চলে এল ওর মুঠোর ভেতর, সার্জিকাল রাবার গ্লাভের মত। চামড়া ছাড়ানো নগ্ন ও রক্তাক্ত তালু বীভৎস দেখাচ্ছে।

পুকুরের কিনারায় হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে স্থির হলো নিমা, চাচাকে দু'হাতের ভেতর তুলে নিতে চাইছে। ও জানে, চাচার ভারী শরীরটা তুলতে পারবে না। সে চেষ্টা করলে আরও বেশি ব্যথাও পাবেন হাসলান। এখন শুধু জড়িয়ে ধরে আরাম দেয়ার চেষ্টা করতে পারে ও। সন্দেহ নেই মারা যাচ্ছেন উনি, এভাবে পুড়ে যাবার পর কোন মানুষ বাঁচতে পারে না।

'লোকজন এখুনি ছুটে আসবে,' আরবীতে ফিসফিস করছে নিমা। 'নিশ্চয়ই কেউ আগুন দেখেছে। চাচা, ও চাচা, আমি তোমাকে ভালবাসি।'

নিমার আলিঙ্গনের ভেতর মোচড় খাচ্ছেন হাসলান, মরণঘাতি জখমের ব্যথায় আর কথা বলার চেষ্টায়। 'স্ক্রোল?' কোন রকমে শুনতে পেল নিমা। জ্বলন্ত ভিলার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল ও।

'নেই,' বলল নিমা। 'সব শেষ। হয় পুড়ে গেছে, নয়তো চুরি হয়ে গেছে।'

'হাল··· ছেড়ো-না,' বললেন হাসলান, শব্দের চেয়ে ফুসফুস আওয়াজের সঙ্গে বাতাসই বেশি বেরুচ্ছে গলা থেকে। 'এত পরিশ্রম··· এত সাধনা···'

'সব শেষ,' আবার বলল নিমা। 'ওগুলো ছাড়া কেউ বিশ্বাস করবে না···'

'না!' অস্পষ্ট আওয়াজ, তবে প্রতিবাদের সুরটা তীব্র। 'আমার জন্যে···আমার শেষ ইচ্ছে···'

'এ-সব বোলো না, চাচা!' মিনতি করল নিমা। 'তুমি ভাল···সুস্থ হয়ে উঠবে।'

'কথা দাও,' বললেন হাসলান। 'কথা দাও আমাকে!'

'কোন স্পনসর নেই। আমি একা। একা আমার পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়।'

'রানা!' বললেন হাসলান। ঝুঁকে তার আরও কাছে সরে এল নিমা, ওর কানে অগ্নিদগ্ধ ঠোঁট ঠেকল। 'মাসুদ রানা!' আবার বললেন তিনি। 'কঠিন মানুষ···বুদ্ধিমান মানুষ···সাহসী···' এতক্ষণে তাঁর কথা ধরতে পারল নিমা। হ্যাঁ, অবশ্যই, সম্ভাব্য স্পনসরদের তালিকায় মাসুদ রানার নামটা সবার আগে আছে। নিমা জানে, হাসলান এই মাসুদ রানাকেই পুরোপুরি বিশ্বাস করেন। এই ভদ্রলোক যে তাঁর প্রথম পছন্দ, তা তিনি অনেকবার নিমাকে জানিয়েছেন। 'আমার জুনিয়র বন্ধু' বলে সম্বোধন করেন, অথচ স্নেহের পাশাপাশি শ্রদ্ধার ভাবটাও চাপা থাকে না।

'কিন্তু কি বলব তাঁকে আমি? তিনি তো আমাকে চেনেনও না। কি করে তাঁকে বিশ্বাস করাব? আসলে স্ক্রোলই তো নেই!'

'ওর ওপর আস্থা রাখবে,' ফিসফিস করলেন হাসলান। 'ভাল মানুষ। আস্থা রাখবে···' আবার ব্যাকুল আবেদন প্রকাশ পেল তাঁর কথায়, 'আমাকে কথা দাও!'

হঠাৎ মনে পড়ল নিমার। কায়রোয়, ওদের ফ্ল্যাটে, একটা নোটবুক আছে; আরও আছে টাইটা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য ভর্তি হার্ড ড্রাইভ, ওর পি. সি.-তে। না, সব শেষ হয়ে যায়নি। 'ঠিক আছে,' রাজি হলো ও। 'কথা দিচ্ছি, চাচা।'

শরীরের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাতে মানবিক কোন অনুভূতি প্রকাশ পাবার কথা নয়, তা সত্ত্বেও ফিসফিস করার সময় হাসলানের গলায় ক্ষীণ সন্তুষ্টির আভাস থাকল। 'সুখী হও··· সফল হও···' মাথাটা সামনের দিকে নত হলো, নিমার আলিঙ্গনের ভেতর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি।

গ্রামের কৃষকরা নিমাকে ওই অবস্থাতেই দেখতে পেল, পুকুরের কিনারায় চাচাকে জড়িয়ে ধরে আছে, কথা বলছে ফিসফিস করে। ইতিমধ্যে ভিলার আগুন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, আগুনের আভার চেয়ে ভোরের আলো এখন আরও বেশি উজ্জ্বল।

মিউজিয়াম আর অ্যান্টিকুইটিজ ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র সব স্টাফই শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্যে মরুদ্যানে হাজির হলেন। এমন কি আতাহার আবু কাসিম, সাংস্কৃতিক ও পর্যটন মন্ত্রীও কায়রো থেকে কালো এয়ার-কন্ডিশনড মার্সিডিজ নিয়ে চলে এলেন। মন্ত্রী হবার সূত্রে তিনিই ঘালি হাসলানের বস্।

মুসলমান, তাই চার্চের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন তিনি। কারিফ ফারুকী তাঁর মামার পাশে দাঁড়িয়ে। তাঁর মা মন্ত্রীর ছোট বোন। হাসলান প্রায়ই হাসিমুখে বলতেন, আর্কিওলজিতে ভাগ্নের সমস্ত যোগ্যতা আর অভিজ্ঞতার অভাব এই আত্মীয়তার সম্পর্ক পুষিয়ে দিয়েছে। প্রশাসক হিসেবেও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। তবে সে-সব প্রকাশ্যে উচ্চারণ করতে সাহস পায় না কেউ।

চার্চের ভেতর ধূপের ধোঁয়ায় শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে নিমার। কালো পোশাক পরা প্রিস্ট বাইবেল পাঠ করছেন। ডান বাহুর ক্ষত শুকাতে শুরু করায় টান পড়ছে স্টিচে, নতুন করে শুরু হয়েছে জ্বালা-পোড়া। অলঙ্কৃত, গিলটি করা বেদির সামনে লম্বা কালো কফিন যতবার দেখছে নিমা, ততবার চুলবিহীন খুলি ছাড়ানো হাসলানের মাথাটা ভেসে উঠছে চোখের সামনে। টলে উঠছে ও, তাল সামলাবার জন্যে সীটের হাতল আঁকড়ে ধরতে হচ্ছে।

অবশেষে চার্চের অনুষ্ঠান শেষ হলো। তবে নিমার কাজ এখনও শেষ হয়নি। সেই একমাত্র নিকটাত্মীয়, কাজেই শব মিছিলের সামনে থাকতে হলো ওকে। পাম বীথির ভেতর দিয়ে এগোল মিছিল, শেষ মাথায় পারিবারিক গোরস্থানে হাসলানের আত্মীয়স্বজনরা অপেক্ষা করছে।

কায়রোয় ফিরে যাবার আগে আতাহার আবু কাসিম নিমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে এলেন। দু'একটা সান্ত্বনার কথাও শোনালেন তিনি। 'আইন-শৃঙ্খলার কি সাংঘাতিক অবনতি! স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছি। এই জঘন্য অপরাধের জন্যে দায়ী ক্রিমিন্যালদের অবশ্যই গ্রেফতার করা হবে। প্লীজ, যে-ক'দিন ইচ্ছে ছুটি নিন আপনি।'

'আমি সোমবারে মিউজিয়ামে আসছি,' জবাব দিল নিমা।

পকেট ডায়েরী বের করে পাতা ওল্টালেন মন্ত্রী, বললেন, 'তাহলে বিকেল চারটের সময় দেখা করবেন আমার সঙ্গে।' বিদায় নিয়ে মার্সিডিজের দিকে এগোলেন তিনি।

এরপর হ্যান্ডশেক করতে এলেন কারিফ ফারুকী। ফ্যাকাসে চামড়ায় অসংখ্য

তিল আর চোখের নিচে কষি রঙের দাগ থাকলেও ফারুকী যথেষ্ট লম্বা। মাথায় ঢেউ খেলানো চুল, দাঁতগুলো খুব সাদা। দামী স্যুট আর সেন্ট ব্যবহার করেন তিনি। তাঁর বাড়ানো হাতটা দেখতে না পাবার ভান করল নিমা। গম্ভীর ও বিষণ্ণ হয়ে উঠলেন ফারুকী। 'ভাল মানুষরা তাড়াতাড়ি চলে যায়,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন। 'হাসলানকে আমি শ্রদ্ধা করতাম।' মাথা ঝাঁকাল নিমা, মুখে কিছু বলল না, জানে তাহা মিথ্যে কথা বলছেন ফারুকী। হাসলান আর তাঁর ডেপুটির মধ্যে কোনকালে সদ্ভাব ছিল না। টাইটার স্ক্রোল নিয়ে কতবার কাজ করতে চেয়েছেন ফারুকী, কিন্তু হাসলান অনুমতি দেননি। বিশেষ করে লক্ষ রাখতেন, ফারুকী যাতে সপ্তম স্ক্রোল ছুঁতে না পারেন। এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটিও হয়েছে কয়েকবার। 'তুমি বোধহয় ডিরেক্টর পদটার জন্যে অ্যাপ্লাই করবে, তাই না, নিমা? ওই পদ পাবার যোগ্যতা তোমার আছে।'

'ধন্যবাদ, ফারুকী, ইউ আর ভেরি কাইন্ড। ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনও কিছু ভাবিনি আমি। তবে তুমিও বোধহয় অ্যাপ্লাই করছ, তাই না?'

'অবশ্যই,' নিচু গলায় হেসে উঠে মাথা ঝাঁকালেন ফারুকী। 'কে জানে, তুমি হয়তো আমার নাকের সামনে থেকে পদটা কেড়ে নেবে।' তার হাসিতে সংশয় বা উদ্বেগের লেশমাত্র নেই। আরব সমাজে নিমা একটা মেয়ে, তার ওপর ক্রিশ্চান, আর ফারুকী মন্ত্রী মহোদয়ের ভাগ্নে। তিনি জানেন পরিস্থিতিটা সম্পূর্ণই তাঁর অনুকূলে। 'বন্ধুরাও পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে, আমরাও তাই করব, কি বলো? তুমি আর আমি, আমরা তো পরস্পরের বন্ধুই, তাই না?'

'হ্যাঁ, ভবিষ্যতে অনেক বন্ধু দরকার হবে আমার,' বিড়বিড় করল নিমা।

'ডিপার্টমেন্টের কে তোমার বন্ধু নয়? সবাই তোমাকে পছন্দ করে, নিমা।' ফারুকীর অন্তত এই কথাটা সত্যি। 'তোমাকে আমি লিফট দিতে পারি? আমি জানি মামা আপত্তি করবেন না।'

'আজই আমি কায়রোয় ফিরছি না, ফারুকী, তবু ধন্যবাদ। চাচার ব্যক্তিগত কিছু বিষয় দেখাশোনা করতে হবে আমাকে।' কথাটা সত্যি নয়। আজ সন্ধের দিকে কায়রোয় ওদের ফ্ল্যাটে ফিরবে নিমা। তবে কারণটা নিজেও ভাল জানে না, ফারুকীকে ওর প্ল্যান সম্পর্কে জানতে দিতে মন চাইছে না।

'তাহলে সোমবার বিকেলে মিউজিয়ামে আবার দেখা হচ্ছে।'

আত্মীয়স্বজন, পারিবারিক বন্ধু আর গ্রামের কৃষকদের সময় দিতে হলো, সবাই তারা নিমার সঙ্গে দেখা করে শোক প্রকাশ করল। নিঃসঙ্গ আর অবশ লাগছে নিজেকে, এত লোকের এত শোক আর সান্ত্বনা অর্থহীন মনে হলো নিমার। সন্ধের খানিক আগে হাসলানের গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, মনটা অশান্ত হয়ে আছে। ডান হাতটা স্লিঙে ঝুলছে, গাড়ি চালাতে তেমন কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

কায়রোর কাছাকাছি এসে ট্রাফিক জামে পড়ল নিমা। গিজা-র অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে পৌঁছুতে রাত হয়ে গেল। চাচার রেনোয়া আন্ডার-গ্রাউন্ড গ্যারেজে রেখে এলিভেটরে চড়ে উঠে এল টপ ফ্লোরে।

ফ্ল্যাটে ঢুকে দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়াল নিমা। সিটিংরুম তছনছ করা হয়েছে—এমন কি কার্পেট গুটিয়ে ফেলা হয়েছে, দেয়াল থেকে নামানো হয়েছে সব

ক'টা পেইন্টিং। যেন একটা ঘোরের মধ্যে ভাঙাচোরা ফার্নিচার আর ছড়ানো-ছিটানো অর্নামেন্টের ভেতর দিয়ে হাঁটছে নিমা। প্যাসেজ ধরে এগোবার সময় বেডরুমের ভেতর তাকাল। বেডরুমটাও বাদ দেয়া হয়নি। ওর আর চাচার কাপড়চোপড় মেঝেতে পড়ে আছে, কাবার্ডের দরজাগুলো খোলা। একটা কাবার্ডের দরজা কব্জা সহ খুলে ফেলা হয়েছে। বিছানাটা ওল্টানো, চাদর আর বালিশ মেঝেতে পড়ে আছে।

একই অবস্থা বাথরুমের। কসমেটিকস আর পারফিউমের বোতল সব ক'টা ভাঙা। তবে ভেতরে ঢুকল না নিমা, জানে ঢুকলে কি দেখতে পাবে। প্যাসেজ ধরে বড় কামরাটার দিকে এগোল। ওটাই ওরা স্টাডি আর ওঅর্কশপ হিসেবে ব্যবহার করে।

এখানেও সব ভেঙেচুরে তছনছ করা হয়েছে, তবে প্রথমেই নিমার চোখ পড়ল অ্যান্টিক দাবা সেটটার ওপর। চাচার দেয়া উপহার, ওর খুব শখের জিনিস। জেট আর আইভরি দিয়ে তৈরি বোর্ডটা ভেঙে দু'টুকরো করা হয়েছে, ঘুঁটিগুলো অকারণে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে কামরার চারদিকে। ঝুঁকে সাদা কুইনটা তুলে নিল নিমা। মোচড় দিয়ে রানীর ঘাড় ভাঙা হয়েছে।

অক্ষত হাতে রানীকে নিয়ে নিমা যেন ঘুমের ঘোরে হাঁটছে। জানালার নিচে ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল। সম্ভবত হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মেরে চুরমার করা হয়েছে ওর পি. সি.। স্ক্রীন ফেটে চৌচির, মেইনফ্রেম চিড়ে-চ্যাপ্টা। দেখেই বোঝা যায়, হার্ড ড্রাইভে কোন তথ্য নেই। এ কমপিউটর মেরামত করা সম্ভব নয়।

দেরাজগুলো খোলা, ভেতরের সব জিনিস মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। তবে ফ্লপি ডিস্কগুলো কোথাও পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল না কোন নোটবুক বা ফটোগ্রাফ। সপ্তম ক্রোলের সঙ্গে ওর সম্পর্ক ও যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তিন বছরের কঠিন পরিশ্রম আর সাধনা, সব শেষ। এখন প্রমাণ করাই অসম্ভব যে ওগুলোর অস্তিত্ব ছিল।

ডেস্কের ওপর বসে দু'হাতে মুখ ঢাকল নিমা। কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠছে পিঠ।

[illegible] সকালের মধ্যে নিজের জীবনে খানিকটা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারল [illegible] এসে ওর জবানবন্দি নিয়ে গেছে পুলিস। আবর্জনা ফেলে দিয়ে [illegible] যতটা সম্ভব গুছিয়ে নিয়েছে। সাদা রানীর বিচ্ছিন্ন মাথাটা খুঁজে [illegible] দিয়ে ঘাড়ে বসিয়ে দিয়েছে। ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে সবুজ [illegible] ডান হাতের ক্ষতটায় প্রায় কোন ব্যথাই নেই। মনটা খুশি, তা বলা যাবে না। [illegible] অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে পেরেছে, নিশ্চিতভাবে জানে এখন কি [illegible]।

মিউজিয়ামে পৌঁছে [illegible] হাসলানের অফিসে ঢুকল নিমা। ওর আগেই ওখানে পৌঁছে গেছেন কার্লিক [illegible]। দেখে বিব্রত ও অস্বস্তি বোধ করল। দু'জন সিকিউরিটি গার্ডকে কাজে লাগিয়েছেন ফারুকী, তারা হাসলানের ব্যক্তিগত জিনিস-পত্র সব বের করে নিয়ে যাচ্ছে। ক্ষোভ চেপে রেখে নিমা শান্ত সুরে বলল,

'তোমার উচিত ছিল এই কাজটা আমাকে করতে দেয়া।'

অমায়িক হেসে ফারুকী বললেন, 'দুঃখিত, নিমা। ভাবলাম আমার সাহায্য পেলে তুমি খুশি হবে।' মোটা টার্কিশ চুরুট ফুঁকছেন। এই চুরুটের ধোঁয়া আর ঝাঁঝাল গন্ধ একদমই সহ্য করতে পারে না নিমা।

হাসলানের ডেস্কের পিছনে এসে দাঁড়াল ও, একটা দেরাজ খুলল। 'চাচার ডে বুকটা এখানে ছিল। এখন দেখছি নেই। তুমি দেখেছ?'

'না, ওই দেরাজে কিছুই পাওয়া যায়নি।' গার্ড দু'জনের দিকে তাকালেন ফারুকী, যেন সাক্ষী দিতে বলছেন। ঘাড় ও নাক চুলকে মাথা নাড়ল তারা। নিমা জানে, ডে বুকে গুরুত্বপূর্ণ খুব বেশি কিছু ছিল না। গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত তথ্য রেকর্ড ও জমা করার দায়িত্ব নিমার ওপর দিয়ে নিশ্চিত ছিলেন হাসলান। আর নিমা সেগুলো যত্নের সঙ্গে ওর পি. সি.-তে তুলে রাখত।

'ধন্যবাদ, ফারুকী,' বলল নিমা। 'বাকি যা করার আমি করছি। তোমাকে আর আটকে রাখতে চাই না।'

'কোন সাহায্য দরকার হলে বলবে, নিমা, প্লীজ।' কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে সম্মান দেখিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেন কারিফ ফারুকী।

হাসলানের অফিস খালি করতে খুব বেশি সময় লাগল না। ব্যক্তিগত জিনিস-পত্র বেশিরভাগ আগেই বাক্সে ভরা হয়েছিল, গার্ডদের বলতে তারা সেগুলো নিমার অফিসের ভেতর দেয়াল ঘেঁষে রেখে এল। লাঞ্চ আওয়ারে নিজের কাজ নিয়ে বসল নিমা, শেষ করার পরও দেখা গেল মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাবার আগে হাতে এক ঘণ্টা সময় আছে।

চাচাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি যদি রক্ষা করতে হয়, দীর্ঘ একটা সময় মিউজিয়াম ছেড়ে দূরে থাকতে হবে নিমাকে। শ্রদ্ধেয় ফারাও আর পুরানিদর্শনগুলোর কাছ থেকে বিদায় নেয়ার একটা তাগাদা অনুভব করল ও।

বিশাল বিল্ডিঙের পাবলিক সেকশনে চলে এল নিমা। সোমবার, কাজেই মিউজিয়ামের এগজিবিশন হলগুলো ট্যুরিস্টে গিজগিজ করছে। তিনতলার কয়েকটা কামরায় রয়েছে তুতেনখামেন ট্রেজার, প্রচণ্ড ভিড়ে ওখানে দু'মিনিটের বেশি টিকতে পারল না নিমা। অনেক ঠেলাঠেলি করে কোন রকমে একবার ডিসপ্লে কেবিনেটের সামনে পৌঁছুতে পারল, কেবিনেটের ভেতর শিশু ফারাও-এর সোনালি ডেথ-মাস্ক রয়েছে।

ওখান থেকে বেরিয়ে প্রাচীন রাজার কাছ থেকে বিদায় নিতে এল নিমা। তিন হাজার বছর পরও দ্বিতীয় রামেসিসের সরু মুখে কোন ক্লান্তির ছাপ নেই, দেখে মনে হবে প্রশান্তচিত্তে ঘুমিয়ে আছেন তিনি। তাঁর ত্বকে হালকা চকচকে একটা ভাব আছে, মার্বেলে যেমন দেখা যায়। তাঁর চুল সোনালি, তবে হেনা বা মেহেদি দিয়ে রাঙানো। একই জিনিস দিয়ে রঙ করা হাত লম্বা, সরু এবং সুগঠিত। তবে পরনে শুধু লিনেন-এর তৈরি একটা ফালি। কবর চোররা তাঁর মমির প্যাঁচও খুলে ফেলেছিল, লিনেন ব্যান্ডেজের তলা থেকে মন্ত্রপূত কবচ আর গুবরে পোকা আকৃতির মণি পাবার লোভে, কাজেই তাঁর শরীর প্রায় নগ্নই বলা যায়। আঠারোশো একাশি সালে এল বাহারির পাহাড় প্রাচীরের একটা গুহায় অন্যান্য

রাজার মমির সঙ্গে যখন পাওয়া গেল তাঁকে, শুধু প্যাপাইরাস পার্চমেন্টের একটা টুকরো সাঁটা ছিল বুকে—ওই টুকরোটা থেকেই তাঁর বংশধারা সম্পর্কে সব কথা জানা যায়।

বংশধারা উল্লেখ করার মধ্যে এক ধরনের গৌরব তো আছেই, আরও আছে নীতিবোধ। প্রাচীন যে-কোন মমির সঙ্গে তথ্য ও বার্তা থাকে, সেগুলো কতটুকু সত্য বা অতিরঞ্জিত নয়, সেটাই হলো প্রশ্ন। এই প্রশ্ন নিয়ে অনেক আলোচনা করেছে ওরা চাচা-ভাইঝি—লেখক টাইটা সত্যি কথা লিখে গেছে কি? তার বর্ণনামত সত্যিই কি বহুদূর নির্দয় আফ্রিকান পাহাড়ের গভীরে সমস্ত গুপ্তধন সহ আরেকজন মহান ফারাও নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে আছেন? চিন্তাটা উত্তেজিত ও রোমাঞ্চিত করে নিমাকে, গায়ের রোম দাঁড়িয়ে যায়।

হাতে পনেরো মিনিট সময় থাকতে মিউজিয়ামের মূল সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিমা। এক পাশের একটা হলে ঢুকবে ও, ট্যুরিস্ট বা গাইডরা ওদিকে খুব কমই যায়। গেলেও শুধু আমেনহোটেপ-এর স্ট্যাচু দেখতে।

সরু কামরাটায় ঢুকে কাচ মোড়া ডিসপ্লে কেসের সামনে দাঁড়াল নিমা, কেসটা মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত লম্বা। ছোটখাট আর্টিফ্যাক্ট, যন্ত্রপাতি আর হাতিয়ার; কবচ, মৃৎপাত্র ও তৈজস-পত্রে ঠাসা ভেতরটা। এগুলোর মধ্যে আছে নিউ কিংডম-এর বিশতম রাজবংশের জিনিস-পত্র, এক হাজার একশো খ্রিস্টপূর্ব আমলের। আর ওল্ড কিংডম-এর জিনিসগুলো প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরানো। এ-সব সংগ্রহের ক্যাটালগ নিখুঁত নয়, অনেক জিনিসের কোন পরিচয়ই উল্লেখ করা হয়নি।

শেষ প্রান্তে, নিচের শেলফে, সাজানো রয়েছে অলঙ্কার, আঙটি আর সীল। প্রতিটি সীলের পাশে মোমের ওপর ওই সীলের একটা করে ছাপ। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে এই আর্টিফ্যাক্টগুলোর একটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে নিমা। ডিসপ্লের মাঝখানে নীল ল্যাপিস ল্যাজিউলাই দিয়ে তৈরি একটা খুদে সীল। প্রাচীনকালে ল্যাপিস মূল্যবান ও দুর্লভ ছিল, যেহেতু মিশরীয় সাম্রাজ্যে জিনিসটা পাওয়া যেত না। ওই সীল থেকে মোমের ওপর যে ছাপ দেয়া হয়েছে তাতে ডানা ভাঙা একটা শ্যেন বা বাজপাখি দেখা যাচ্ছে, বাজ পাখির নিচে লেখাটা পরিষ্কার পড়তে পারল নিমা: 'টাইটা, মহারানীর লেখক'।

নিমা জানে, এ সেই একই লোক, কারণ স্ক্রোলে নিজেই সই হিসেবে ডানাভাঙা শ্যেন পাখি ব্যবহার করেছে সে। নিমা ভাবছে এই খুদে আর্টিফ্যাক্ট কোত্থেকে এখানে এল। সম্ভবত কোন গ্রামবাসী বৃদ্ধ লেখক তথা ক্রীতদাসের হারানো সমাধি থেকে চুরি করেছে। তবে কে সে, কবে বা ঠিক কোত্থেকে পেল, আজ আর তা জানার কোন উপায় নেই।

'তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ, টাইটা? এ কি মাথা খাটিয়ে তৈরি করা একটা বিরাট ধাঁধা? তুমি কি তোমার সমাধি থেকে আমার উদ্দেশে হাসছ?' আরও কাছে সরে এল নিমা, ঠাণ্ডা কাচে কপাল ঠেকে গেল। 'তোমার সমাধি যেখানেই থাকুক, তুমি যেখানেই থাকো, আমার বন্ধু হবে? নাকি আমার প্রতিপক্ষ হওয়াই তোমার ইচ্ছে?' দাঁড়িয়ে কামিজ থেকে ধুলো ঝাড়ল নিমা। 'ঠিক আছে, দেখা

যাবে। তোমার সঙ্গে খেলব আমি, দেখব কে কাকে হারাতে পারে।'

গাঢ় রঙের চকচকে সিল্ক সুট পরে ডেস্কে বসে আছেন আতাহার আবু কাসিম, তবে নিমা জানে আলখেল্লা পরেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন মন্ত্রী মহোদয়, স্বস্তি পান গালিচার ওপর কুশনে হেলান দিয়ে বসতে। ওর চোখের কৌতুক লক্ষ করে হাসলেন তিনি, বললেন, 'আজ দুপুরে কয়েজন আমেরিকানের সঙ্গে মীটিং ছিল।'

নিমা তাঁকে পছন্দ করে। ওর সঙ্গে সব সময় ভাল ব্যবহার করেন তিনি, মিউজিয়ামে চাকরিটাও তাঁর ব্যক্তিগত অনুমোদন ছাড়া পেত না ও। তাঁর পজিশনে অন্য যে-কোন লোক মহিলা অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে নিমার আবেদন প্রত্যাখ্যান করত, বিশেষ করে স্ত্রীর আপত্তির মুখে।

ওর কুশলাদি জানতে চাইলেন তিনি। হাতের ব্যান্ডেজটা দেখিয়ে নিমা বলল, 'এক হপ্তা পর স্টিচ খোলা হবে।'

'আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সত্যি খুব খারাপ,' বলে একটা চুরুট ধরালেন আবু কাসিম। 'মৌলবাদীরাই দায়ী!'

পরিবেশ একটু আড়ষ্ট হয়ে আছে, তাই ভূমিকা না করে সরাসরি নিজের কথা বলে গেল নিমা। 'চাচাকে হারিয়ে আমি এখন বুঝতে পারছি না জীবনটা নিয়ে কি করব। তাই ভাবছি দূরে কোথাও একা থাকব কিছুদিন। আমাকে ছ'মাসের ছুটি দিতে হবে। ভাবছি ইংল্যান্ডে মায়ের কাছে চলে যাব।'

মন্ত্রীর উদ্বেগ অকৃত্রিম মনে হলো। নিমাকে তিনি অনুরোধ করলেন, 'তবে প্লীজ, আমাদেরকে ছেড়ে বেশিদিন থাকবেন না। আপনাদের গবেষণা অমূল্য অবদান রেখেছে। হাসলানের অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে হলে আপনার সাহায্য ছাড়া চলবে না।' মুখে যাই বলুন, নিমার কথায় তিনি যে স্বস্তি পাচ্ছেন সেটা পুরোপুরি চাপা থাকল না। তিনি আশা করেছিলেন আজই তাঁর সামনে ডিরেক্টরশিপের জন্যে আবেদন-পত্র জমা দেবে নিমা। এ-ব্যাপারে নিশ্চয়ই ভাগ্নে কারিফ ফারুকীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে তাঁর। নিমা আবেদন-পত্র জমা দিলে সান্ত্বনাসূচক কিছু বাণী শুনিয়ে অবশ্যই সেটা বাতিল করা হত। দু'জনেই ওরা জানে ডিরেক্টরের পদটা কারিফ ফারুকীই পেতে যাচ্ছেন।

বিদায় নেয়ার সময় নিমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন আবু কাসিম, ডেস্কে ঘুরে দরজা পর্যন্ত হেঁটে এলেন। এলিভেটরে চড়ে নিচে নামার সময় নিজেকে নিমার বন্ধনহীন ও স্বাধীন লাগল।

রেনোয়া নিয়ে গেট থেকে বেরুতেই কায়রো ট্রাফিক গ্রাস করল ওকে। অলস পিঁপড়ের মত এগোচ্ছে গাড়ি, আরোহী উপচে পড়া একটা বাস ওর সামনে, অবিরত নীল ধোঁয়া ছাড়ায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে রেনোয়া। শহরের ট্রাফিক সমস্যার যেন কোন সমাধান নেই। রিয়ার-ভিউ মিররে চোখ রেখে পিছন দিকে তাকাল নিমা। ওর ব্যাক বাম্পার থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে, ওটার পিছনে যানবাহনের ভিড় নিরেট ও সম্পূর্ণ অচল। শুধু মোটরসাইক্লিস্টরা চলাচলের স্বাধীনতা ভোগ করছে। সেরকম একজনকে আত্মহত্যার ঝুঁকি নিয়ে ছুটে আসতে দেখল নিমা। লাল তোবড়ানো একটা টু-

হানড্রেড সিসি হোন্ডা, গায়ে এত ধুলো জমেছে যে রঙটা কোন রকমে চেনা গেল। ব্যাকসীটে একজন আরোহী বসে আছে, ড্রাইভারের মত তারও মুখের নিচের অংশ মাথায় জড়ানো কাপড় নামিয়ে আড়াল করা, ধোঁয়া আর ধুলো থেকে রক্ষা পাবার জন্যে।

রঙ সাইড দিয়ে ছুটে আসছে মোটরসাইকেল, আসছে ট্যাক্সি আর ফুটপাথ ঘেঁষে পার্ক করা কারগুলার সরু ফাঁক গলে, ফাঁকটার দু'পাশে অতিরিক্ত এক ইঞ্চি জায়গাও নেই। মোটরসাইক্লিস্টের উদ্দেশ্যে অশ্লীল একটা ইঙ্গিত করল ট্যাক্সি ড্রাইভার, তারপর চিৎকার করে যা বলল তার অর্থ দাঁড়ায়, তার এই পাগলামি আর বোকামির জন্যে আল্লাহ তাকে অবশ্যই নরকে পাঠাবে।

নিমার রেনোয়ার পাশে চলে এসে মুহূর্তের জন্যে মন্থর হলো হোন্ডার গতি, ব্যাক সীটে বসা আরোহী একটু ঝুঁকে খোলা দরজা দিয়ে ওর পাশের প্যাসেঞ্জার সীটের ওপর কি যেন একটা ছুঁড়ে দিল। পরক্ষণে গতি এমন বাড়ল, মুহূর্তের জন্যে রাস্তা ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়ল মোটরসাইকেলের সামনের চাকা। বাম দিকে সরু একটা গলি পেয়ে স্যাঁৎ করে ঢুকে পড়ল সেটায়, চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। অদৃশ্য হবার আগে পিছনে বসা আরোহী ঘাড় ফিরিয়ে নিমার দিকে তাকাল একবার, আর ঠিক সেই সময় বাতাস লেগে সরে গেল তার মুখের কাপড়। ছ্যাঁৎ করে উঠল নিমার বুক। লোকটাকে চিনতে পেরেছে ও। মরুদ্যানে একেই দেখেছিল, ফিয়াটের আলোয়। 'মোমিন!'

ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে পাশের সীটে পড়ে থাকা জিনিসটার দিকে তাকাল নিমা। কালচে সবুজ রঙের জিনিসটা টিভির ওঅর মুভিতে অনেকবার দেখেছে ও, রঙটা মিলিটারি গ্রীন। এটা যে একটা গ্রেনেড, বুঝতে পারল নিমা। দেখল, পিন খোলা। তারমানে এখুনি ওটা বিস্ফোরিত হবে।

কিছু চিন্তা না করেই দরজার হাতল ঘুরিয়ে লাফ দিল নিমা। খুলে হাঁ হয়ে গেল দরজা, রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ল ও। ক্লাচে পা না থাকায় সচল হলো রেনোয়া, সরাসরি ধাক্কা দিল স্থির দাঁড়িয়ে থাকা বাসের পিছনে।

পিছনের ট্যাক্সিটা এগিয়ে এসেছিল, সেটার দুই চাকার আড়ালে রাস্তার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে নিমা, এই সময় বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। ড্রাইভারের দরজা দিয়ে কমলা শিখা আর সাদাটে ধোঁয়ার মেঘ বেরিয়ে এল, সেই সঙ্গে প্রচুর আবর্জনা। পিছনের জানালা বিস্ফোরিত হলো বাইরের দিকে, হীরের কণার মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল কাচের টুকরো। বিস্ফোরণের শব্দে নিমার কানে তালা তো লেগেইছে, ব্যথাও করছে। বিকট আওয়াজটার পর অটুট নিস্তব্ধতা নেমে এল, তারপরই শুরু হয়ে গেল কাতর গোঙানি আর চিৎকার-চেঁচামেচি। বসল নিমা, আহত হাতটা বুকের সঙ্গে চেপে ধরল। রেনোয়া ধ্বংস হয়ে গেছে, তবে দেখা গেল ওর স্লিং ব্যাগটা রাস্তার ওপর নাগালের মধ্যে পড়ে রয়েছে। সেটা নিয়ে কোন রকমে দাঁড়াল। চারদিকে দিশেহারা মানুষ, কে কি করবে বুঝতে পারছে না। বাসের ভেতর কয়েকজন আরোহী আহত হয়েছে, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ছোট্ট মেয়ের কপালে শ্র্যাপনেল লাগায় ঝর ঝর করে রক্ত ঝরছে, মেয়ের ক্ষতে রুমাল চেপে ধরেছে মা। নিমার দিকে খেয়াল নেই কারও, তবে জানা কথা এখুনি

পুলিস চলে আসবে। ও জানে, ওকে পেলে জেরা করার জন্যে আটকে রাখা হবে, হয়তো কয়েক দিনই। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে আস্তে করে কেটে পড়ল ও, কয়েক পা এগিয়ে ঢুকে পড়ল সরু গলির ভেতর, যেটার ভেতর একটু আগে হোন্ডা মোটরবাইক অদৃশ্য হয়ে গেছে।

গলিটার শেষ মাথায় পাবলিক ল্যাভেটোরি, একটা কিউবিকলে ঢুকে বন্ধ দরজায় হেলান দিল নিমা, চোখ বন্ধ করে ধাতস্থ হবার চেষ্টা করছে। চাচা হাসলানের বীভৎস হত্যাকাণ্ডের আঘাত এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি ও, সেজন্যেই নিজের নিরাপত্তার কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবেনি। আজ এইমাত্র ঘটনাটা ঘটার পর ওর মনে পড়ছে, সেদিন ওকেও খুন করতে চেয়েছিল তারা। অন্ধকারে শোনা একজন আততায়ীর গলা এখনও ওর কানে বাজছে, 'মেয়েটাকে পরে কোথায় পাওয়া যাবে জেনে নিতে পারব।'

ওর প্রাণের ওপর দ্বিতীয় আঘাতটা অল্পের জন্যে ব্যর্থ হয়েছে। সন্দেহ নেই, এরকম আঘাত একের পর এক আসতে থাকবে। ফ্ল্যাটে ফিরে যাওয়া উচিত হবে না, উপলব্ধি করল নিমা। কি করা উচিত আধ ঘণ্টা ধরে ভাবল। তারপর ওয়াশবেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে মুখ-হাত ধুয়ে চুল আঁচড়াল, মেকআপ ঠিকঠাক করল। রাস্তায় বেরিয়ে এসে উদ্দেশ্য-হীন হেঁটে বেড়াল কিছুক্ষণ, লক্ষ রাখছে কেউ পিছু নিয়েছে কিনা। তারপর একটা ট্যাক্সি থামাল।

ব্যাংক থেকে পাঁচ হাজার মিশরীয় পাউন্ড তুলল নিমা। টাকাটা অল্পই, তবে ইয়র্কের লয়েড ব্যাংকে আরও টাকা আছে ওর। তাছাড়াও আছে মাস্টারকার্ড। এরপর সেফ ডিপোজিট থেকে একটা প্যাকেট সংগ্রহ করল, ওটায় ওর ব্রিটিশ পাসপোর্ট আর লয়েড ব্যাংকের কাগজ-পত্র আছে।

কায়রোয় নিমার পিতৃকুলের অনেক আত্মীয়স্বজন আছে, তারা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই আশ্রয় দেবে ওকে, কিন্তু নিজের বিপদের সঙ্গে তাদের কাউকে জড়াতে চাইছে না ও। ছোটখাট একটা টু-স্টার ট্যুরিস্ট হোটেল খুঁজে নিল, নদীর কাছ থেকে অনেকটা দূরে।

হোটেল রুমে নির্জনতা পেয়েই ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের রিজার্ভেশন-এ ফোন করল নিমা। কাল সকাল দশটায় হিথরোর উদ্দেশে একটা প্লেন ছাড়বে। ওয়ান-ওয়ে ইকনমি সীট বুক করল, ওদেরকে নিজের মাস্টারকার্ডের নাম্বার জানাল।

ইতিমধ্যে ছ'টা বেজে গেছে, তবে ইংল্যান্ডে এখনও অফিস-আদালত খোলা। নোটবুক খুলে নম্বরটা দেখে নিল নিমা। লীডস-ইউনিভার্সিটিতেই লেখাপড়া শেষ করেছে ও। তিনবার রিঙ হতে অপরপ্রান্তে সাড়া পাওয়া গেল। 'আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্ট। প্রফেসর সিন কটনউড।'

সরাসরি প্রফেসরকে পেয়ে খুশি হলো নিমা। নিজের পরিচয় দিল ও।

'নিমা, সত্যি তুমি?' প্রফেসর কটনউড বিস্মিত। 'আমার ফেভারিট স্টুডেন্ট?' শুনে হাসছে নিমা। অনেক আগেই অবসর নেয়ার কথা প্রফেসরের, বয়েস সত্তরের ওপর। এখনও তিনি শক্ত-সমর্থ, অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী, আর সব সুন্দরী ছাত্রীকেই ফেভারিট বলে মনে করেন।

'ইন্টারন্যাশনাল কল, প্রফেসর,' মনে করিয়ে দিল নিমা। 'আমি শুধু জানতে চাই অফারটা এখনও বহাল আছে কিনা।'

'মাই গুডনেস, আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করবে না।'

'পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। যদি দেখা হয় সব আপনাকে খুলে বলব।'

'অবশ্যই তোমার লেকচার আমরা শুনতে চাই। কবে নাগাদ আসতে পারবে?'

'কাল আমি ইংল্যান্ডে আসছি। ইয়র্কে, মায়ের কাছে থাকব। আপনি ফোন নম্বরটা লিখে রাখুন। তবে কয়েকদিনের মধ্যে আমিই আপনাকে কল করব।'

ক্রেডলে রিসিভার রেখে দিয়ে বিছানায় কাত হলো নিমা। দু'মাস আগে রানী লসট্রিস-এর সমাধি ও স্ক্রোল আবিষ্কার এবং খনন কাজ সম্পর্কে লেকচার দেয়ার জন্যে প্রফেসর কটনউড আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ওকে। গোটা বিষয়টা সম্পর্কে তিনি জানতে পারেন একটা বই পড়ে–বিশেষ করে বইটার শেষে যোগ করা ফুটনোট পড়ে। বইটা প্রকাশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন মহলে বিরাট আলোড়ন উঠেছিল। অ্যামেচার ও প্রফেশনাল, দু'ধরনের ইজিপ্টলজিস্টই খোঁজ-খবর নিতে শুরু করেন। এমনকি টোকিও আর নাইরোবির মত দূর দেশ থেকেও প্রচুর চিঠি আর ফোন আসে। সবারই একটা প্রশ্ন, উপন্যাসের কাহিনী সত্যের ওপর ভিত্তি করে রচিত কিনা।

নিমা আসলে কোন গল্প লেখককে ট্র্যান্সক্রিপসন দেখাতে একদমই রাজি হয়নি, বিশেষ করে ওগুলো তখনও সম্পূর্ণ না হওয়ায়। ওর মনে হয়েছিল, গোটা ব্যাপারটাকে সিরিয়াস অ্যাকাডেমিক সাবজেক্ট হিসেবে গণ্য করা উচিত। অথচ সেটাকে জনপ্রিয় বিনোদনের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হলো। ওর আপত্তিতে এমন কি চাচা হাসলানও কান দেননি। কারণটা অবশ্যই টাকা। বড় কোন কাজ তো দূরের কথা, টাকার অভাবে ওদের ডিপার্টমেন্ট ছোটখাট কোন কাজেও হাত দিতে পারছিল না। বইটার নাম রিভার গড, লেখক উইলবার কিথ। আগেই কথা হয়ে যায়, রয়্যালটির অর্ধেক টাকা ডিপার্টমেন্ট পাবে। সেই টাকা দিয়ে এক বছর গবেষণা আর অনুসন্ধানের কাজ চালানো সম্ভব হয়েছে। তবু লেখকের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেনি নিমা। তার কারণ, স্ক্রোলে যা লেখা আছে তার ওপর রঙ চড়িয়েছেন তিনি, ঐতিহাসিক চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে দিয়ে এমন সব কথা বলিয়েছেন বা এমন সব কাজ করিয়েছেন, যা করা বা বলা হয়েছে কিনা প্রমাণ নেই। প্রাচীন লেখক টাইটাকে আধুনিক লেখক উইলবার কিথ চিত্রিত করেছেন মিথ্যে বড়াইকারী ও দাম্ভিক হিসেবে, বিশেষ করে এখানেই নিমার আপত্তি।

পরে অবশ্য নিমাকে মেনে নিতে হয়েছে। একজন লেখক তাঁর পাঠককে প্রাঞ্জল ভাষায় মুখরোচক গল্পের খোরাক পরিবেশন করবেন, এ তো জানা কথা। সন্দেহ নেই, সে কাজে উইলবার কিথ পুরোপুরি সফল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল নিমা। ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে, এ নিয়ে চিন্তা করলে শুধু শুধু মাথা ব্যথাই বাড়বে।

ওর বরং এখন জরুরী সমস্যা নিয়ে চিন্তা করা দরকার। লীডস-এ লেকচার দিতে হলে ওর স্লাইডগুলো লাগবে, কিন্তু সেগুলো মিউজিয়ামে ওর অফিসে

আছে। কিভাবে ওগুলো ওখান থেকে বের করা যায় ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল নিমা, কাপড় না পাল্টেই।

শেষে সহজ সমাধানটাই বেছে নিল নিমা। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসে ফোন করে কি করতে হবে বলে দিল ও, ওই অফিসের একজন সেক্রেটারি স্লাইডগুলো নিয়ে হাজির হলো ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের চেক-ইন ডেস্কে। ওকে ওগুলো দেয়ার সময় সে জানাল, 'আজ সকালে অফিস খোলার পর পুলিস এসেছিল। কথা বলার জন্যে আপনাকে খুঁজছিল তারা।'

বোঝাই যায়, বিধ্বস্ত রেনোয়ার রেজিস্ট্রেশন চেক করেছে পুলিস। ভাগ্য ভাল যে নিমার কাছে ব্রিটিশ পাসপোর্ট আছে। মিশরীয় পাসপোর্ট নিয়ে দেশত্যাগ করতে হলে সমস্যা এড়ানো যেত না। পাসপোর্ট কন্ট্রোল পয়েন্টে পুলিস সম্ভবত রেসট্রিকশন অর্ডার দিয়ে রেখেছে। যাই হোক, চেক পয়েন্টে কোন অসুবিধে দেখা দিল না। ডিপারচার লাউঞ্জে ঢুকে নিউজ-স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়াল নিমা।

স্থানীয় সবগুলো দৈনিকে ওর গাড়িতে বোমা ছুঁড়ে মারার ঘটনাটা ছাপা হয়েছে, সেই সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে ঘালি হাসলানের হত্যাকাণ্ড। রিপোর্টাররা বলতে চেয়েছে ঘটনা দুটোর মধ্যে যোগসূত্র আছে, এবং কোন দলের নাম উল্লেখ না করে মৌলবাদী ধর্মীয় গ্রুপগুলোকে দায়ী বলে আভাস দেয়া হয়েছে। নিমা প্রতিটি দৈনিকেরই একটা করে কপি কিনল।

প্লেন তখন আকাশে, নোটবুক বের করে চাচা হাসলান মাসুদ রানা সম্পর্কে যা যা বলেছে সব লিখে রাখছে নিমা। লন্ডনে পৌঁছে এই ভদ্রলোককে খুঁজে বের করতে হবে, যদি তিনি ইংল্যান্ডে থাকেন।

একটা কথা কয়েকবারই ওকে বলেছেন হাসলান, 'মাসুদ রানা খোলা বই নয়। জুনিয়র হলেও সে আমার বন্ধু, অথচ আমিও তার সম্পর্কে সব কথা জানি না। তার সবটুকু পরিচয় না জানলেও চলে, বড় কথা হলো সে আমাদের কোন সাহায্যে আসবে কিনা।'

নিমা জানে, লন্ডনে ভদ্রলোকের একটা বাড়ি ও একটা ফ্ল্যাট আছে। বাংলাদেশের নাগরিক, সরকারী চাকুরে, তবে ব্রিটিশ নাগরিকত্বও আছে তাঁর। পেশা যা-ই হোক, পৃথিবীর এমন দেশ খুব কমই আছে যেখানে তিনি ভ্রমণ করেননি। খুবই সৌখিন ব্যক্তি, বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন। খানিকটা অ্যাডভেঞ্চারাস টাইপের, আবার পুরানিদর্শন সংগ্রহের দিকেও বেশ কিছুটা ঝোঁক আছে। আরবী জানেন, সোয়াহিলি ছাড়াও অন্য কয়েকটা আফ্রিকান ভাষায় দখল আছে।

চাচা হাসলানের সঙ্গে ভদ্রলোকের পরিচয় হয় কয়েক বছর আগে। ঘটনাচক্রেই পরিচয়, সে-সময় দু'জনেই তাঁরা একটা বেআইনী কাজে উৎসাহী হয়ে পড়েছিলেন। পিউনিক অর্থাৎ প্রাচীন কার্থেজ-নগরীর একাধিক ব্রোঞ্জ কাস্টিং উদ্ধার করতে হবে লিবিয়া থেকে। অভিযানে নেতৃত্ব দেন এই মাসুদ রানা।

তাঁর আরও একটা অভিযান সম্পর্কে জানতেন হাসলান। সেটাও বেআইনী কাজ। গোপনে ইসরাইলে ঢুকতে হয়েছিল। ইসরায়েলি পুলিসের নাকের ডগা

থেকে একজোড়া পাথুরে ব্যাসরিলীফ ফ্রীজ উদ্ধার করে আনেন তিনি। ফ্রীজ হলো স্তম্ভ বা কার্নিসের মধ্যবর্তী কারুকার্যময় অংশ। হাসলান জানিয়েছেন, জোড়ার একটা নাকি পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে বিক্রি করা হয়েছে, এবং পুরো টাকাটাই জমা করা হয়েছে সরকারী তহবিলে। অপরটা তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন এখনও, সম্ভবত ভাল দাম না পাওয়ায় বিক্রি করেননি।

এ-সবই কয়েক বছর আগের ঘটনা। চাচার মুখে সব শোনার পর বেআইনী কাজের প্রতি রানার এই আকর্ষণ নিমাকে খানিকটা চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। তবে হাসলান ওকে আশ্বস্ত করেন এই বলে, 'এমন সৎ মানুষ আজকাল হয় না। লিবিয়া আর ইসরাইয়েল ওগুলো আসলে চুরি করেছিল, তা-ও চোরেদের কাছ থেকে, রানা আসলে অন্য কাজে ওই দুই দেশে গিয়ে চোরের ওপর বাটপারি করে—এবং সেটা নিজের দেশের স্বার্থে।'

সৎ ও পবিত্র থাকার একটা ঝোঁক আছে নিজের মধ্যে, নিমা জানে। কথাটা ভেবে আপনমনে হাসল ও। মাসুদ রানা যদি ওকে সাহায্য করতে রাজি হন, সাংঘাতিক ঝুঁকি নিতে হবে তাঁকে। প্রশ্ন হলো, কোন স্বার্থ ছাড়া কেন কেউ নিজের জীবনের ওপর ঝুঁকি নেবে? তাছাড়া, যে কাজটায় তাঁর সাহায্য চাইতে যাচ্ছে, সেটাও কোন অংশে কম বেআইনী নয়। ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসি নিয়েই ঘুমিয়ে পড়ল নিমা।

এয়ার হোস্টেস ওর ঘুম ভাঙিয়ে সীট বেল্ট বাঁধার তাগিদ দিল। ওদের প্লেন হিথরোতে ল্যান্ড করতে যাচ্ছে।

হাসলানের নিহত হবার খবরে নিমার মা সাবরিনা ডার্ক আঘাত পেলেন ঠিকই, তবে মেয়ের নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হলেন আরও বেশি। নিমা তাঁকে অভয় দিয়ে বলল, 'ইংল্যান্ডে আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

ইয়র্কে, মায়ের গ্রামের বাড়িতে লেকচার তৈরি করার জন্যে স্লাইড আর নোটগুলো সাজাতে কয়েকটা দিন ব্যয় করল নিমা। রোজ বিকেলে পোষা কুকুর ম্যাডকে নিয়ে গ্রামের পথে হাওয়া খেতে বেরোয় ও। মেয়ে অভয় দিলেও, একা ওকে কোথাও যেতে দেন না সাবরিনা, তিনিও সঙ্গে থাকেন। ইয়র্ক লন্ডন থেকে বেশ খানিকটা দূরে হলেও, নিমা জানে লন্ডনে নিয়মিত আসা-যাওয়া করেন সাবরিনা, নাম করা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে খবর রাখেন। এক বিকেলে হাঁটতে বেরিয়ে মাসুদ রানার নামটা উচ্চারণ করল, জানতে চাইল, 'এই ভদ্রলোক সম্পর্কে তুমি কিছু জানো?'

বিস্মিত সাবরিনা মাথা নাড়লেন। 'না তো। কেন? কে তিনি?'

প্রশ্নগুলো এড়িয়ে গেল নিমা। নিজের প্ল্যান সম্পর্কে এখুনি কিছু জানতে দিতে চায় না।

লীডস ইউনিভার্সিটিতে লেকচারটা ভালই দিল নিমা। ওর বাচনভঙ্গি চমৎকার, নিজের সাবজেক্টের ওপর ভাল দখল আছে। রানী লসট্রিসের সমাধি খোঁড়া ও ক্রোল আবিষ্কারের বর্ণনা মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখল শ্রোতাদের। তাদের অনেকেই বইটা পড়েছে, ফলে স্বভাবতই প্রশ্নোত্তর পর্বে জানতে চাওয়া হলো

কাহিনীর কতটুকু সত্য। এই পর্যায়ে খুব সাবধানে কথা বলতে হলো নিমাকে, লেখকের নিন্দা করা থেকে সযত্নে বিরত থাকল ও। শ্রোতারা বাছাই করা, তবে প্রফেশনালদের সঙ্গে কয়েকজন অ্যামেচারও আছে, বেশিরভাগই প্রৌঢ়। বোধহয় সেজন্যেই এক তরুণের ওপর চোখ আটকে গেল নিমার। তরুণ ব্রিটিশ নয়, ল্যাটিন আমেরিকান বা আরব বেদুইনদের সঙ্গে মিল আছে চেহারার। তবে তার নামটা নিমার জানা হলো না।

অনুষ্ঠান শেষ হবার পর সাবরিনা আর নিমাকে ডিনার খাওয়ালেন প্রফেসর কটনউড। ডিনার পরিবেশনের আগে ওয়াইন দিয়ে গেল ওয়েটার। নিমা খাবে না শুনে বিস্মিত হলেন প্রফেসর, তারপর ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বললেন, 'তুমি কি ধর্মান্তরিত হয়েছ? মানে মুসলমান হয়েছ?'

হেসে ফেলে নিমা বলল, 'আমি কন্ট। তবে মদ না খাবার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। টেস্টটা আমার ভাল লাগে না।'

'আমার লাগে,' বলে ওয়াইন ভর্তি গ্লাসটা ঠোঁটে তুললেন সাবরিনা।

'ও, ভুলেই গেছি,' হঠাৎ বললেন প্রফেসর। 'তোমার লেকচার শোনার পর এক ভদ্রলোক একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছেন। আমি বলেছি, তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। উনি তোমার চাচা হাসলানকে চিনতেন।'

'কে ভদ্রলোক?' জানতে চাইল নিমা।

'মাসুদ রানা। উনি তাঁর ফ্ল্যাটের ফোন নম্বর দিয়ে গেছেন আমাকে।'

'ওহ্ গড!' নিমাকে অস্থির দেখাল। 'আপনি আমাকে আগে বলেননি কেন? এই ভদ্রলোককেই তো খুঁজছি আমি।'

'সুদর্শন এক যুবককে তুমি দেখোনি? প্রথম সারিতেই তো বসেছিলেন।'

'প্রফেসর, প্লীজ, আপনি এখুনি ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।'

কিন্তু ফ্ল্যাটে ফোন করে রানাকে পাওয়া গেল না। ওটা শুধু ফ্ল্যাট নয়, অফিসও বটে: ওর সেক্রেটারি স্বাতী চৌধুরী জানাল, বিশেষ জরুরী কাজে আজ কিছুক্ষণের মধ্যে প্যারিসে চলে যাচ্ছেন মাসুদ রানা, ফিরবেন তিন দিন পর। অগত্যা তিন দিন পরের অ্যাপয়েন্টমেন্টেই সন্তুষ্ট হতে হলো নিমাকে।

রিজেন্ট পার্কের কাছাকাছি ফ্ল্যাটটা। রোববার হলেও সেক্রেটারি স্বাতী চৌধুরীকে সন্ধের দিকে আসতে বলে দিয়েছিল রানা, ঘালি হাসলানের ভাইঝি আল নিমার আসার অপেক্ষায় বসিয়ে রেখেছে।

মেজর মাসুদ রানা একজন স্পাই, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর অন্যতম দুর্ধর্ষ এজেন্ট। ওর রক্তে অ্যাডভেঞ্চার আর রোমাঞ্চের নেশা আছে, তবে শুধু এই কারণে পেশাটা বেছে নেয়নি, পবিত্র মাতৃভূমির সেবা করাটাই মূল উদ্দেশ্য। রানা একজন মুক্তিযোদ্ধাও বটে, পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে নিজের দেশ স্বাধীন তো করেছেই, নিপীড়িত ও অধিকার বঞ্চিত বহু জাতির স্বাধীনতা-যুদ্ধেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানের প্রতি প্রবল ঝোঁক, তবে ঢেঁকি যেমন স্বর্গে গিয়েও ধান ভানতে ভোলে না, তেমনি রানাও

কোন অভিযানে গেলে দেশের স্বার্থের কথা সব সময় মাথায় রাখে।

ছ'টায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট, ঘড়ির কাঁটা ধরে নিমাকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন সাবরিনা। রানার সঙ্গে কথা বলার সময় মাকে সামনে রাখতে চায় না নিমা, ঠিক হয়েছে তিনি তাঁর বান্ধবীদের সঙ্গে আড্ডা দেবেন, ফেরার সময় হলে তাঁকে ফোন করবে নিমা, তিনি ওকে নিতে আসবেন।

কলিংবেল বাজতে দরজা খুলল স্বাতী চৌধুরী। নিমাকে দেখে একটু থতমত খেয়ে গেলেও, চেহারায় তা প্রকাশ পেল না। সে বলল, 'আসুন, মিস নিমা, মাসুদ ভাই আপনার জন্যে ড্রইংরুমে অপেক্ষা করছেন।' কেউ স্যার বলবে, এটা একদমই পছন্দ করে না রানা। ওর সব কর্মচারীই ওকে ভাই বলে। তেমনি রানাও কাউকে স্যার বলে সম্বোধন করতে পছন্দ করে না। ব্যতিক্রম শুধু মেজর জেনারেল (অবসর প্রাপ্ত) রাহাত খান, বিসিআই চীফ।

ছুটির দিন অফিস বন্ধ, তাই ফ্ল্যাটের আবাসিক অংশে নিমাকে সাক্ষাৎদান করছে রানা। সোফায় বসে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল ও, দরজার বাইরে থেকে স্বাতীর গলা ভেসে এল, 'মিস নিমা, মাসুদ ভাই।'

ম্যাগাজিন রেখে দিয়ে সোফা ছেড়ে দাঁড়াল রানা। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল নিমা। ওকে দেখে স্বাতীর মতই মনে মনে একটা ধাক্কা খেলো রানা। অস্বাভাবিক লম্বা মেয়েটা, পাঁচ ফুট সাড়ে আট বা নয়। সালোয়ার আর কামিজ সাদা সিল্ক। বিশাল কোঁকড়ানো ক্রেপ ওড়নাটা শুধু বুক নয়, কাঁধ সহ মাথাও ঢেকে রেখেছে। ক্রিশ্চান কোন মেয়েকে এ-ধরনের পোশাকে আগে কখনও দেখেনি ও। রীতিমত পরদানশিন মনে হচ্ছে। একটু ইতস্তত করে ডান হাতটা বাড়াল ও। 'মাসুদ রানা।'

মিষ্টি হেসে নিমা বলল, 'আমি নিমা, আল নিমা–ঘালি হাসলানের ভাইঝি। দেখুন না কি কাণ্ড, আপনাকে আমি মনে মনে খুঁজছি অথচ একদম কাছ থেকে দেখেও চিনতে পারলাম না।' রানার বাড়ানো হাতটা দেখেও না দেখার ভান করল।

তাড়াতাড়ি হাতটা নামিয়ে নিল রানা। 'প্লীজ, বসুন,' ইঙ্গিতে একটা সোফা দেখাল। নিমা বসার পর আবার বলল, 'আমিও আপনার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম।'

'সেদিন আপনি নিজের পরিচয় জানালে প্রাথমিক আলাপটা তখনই সেরে ফেলতে পারতাম।'

মাথা নাড়ল রানা। 'ঘালি হাসলান খুন হয়েছেন, এটা আমার জন্যে খুব বড় একটা আঘাত। নিজের শোক আমি ব্যক্তিগতভাবে, একান্তে প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম। এই ঘটনা কেন ঘটল, কিভাবে ঘটল, এ-সবও আমার জানার ইচ্ছে।'

'চাচা আপনার কথা প্রায়ই বলতেন। তাঁর ভাষায়, আপনি তাঁর জুনিয়র বন্ধু।'

'বয়েসের পার্থক্য সত্ত্বেও তিনি আমার বন্ধুই ছিলেন,' বলল রানা। 'ভাল একজন বন্ধুকে হারিয়েছি আমি। বেশ কয়েকটা অ্যাডভেঞ্চারে তিনি আমার সঙ্গে

ছিলেন। এমন সৎ মানুষ খুব কমই দেখেছি।'

ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল স্বাতী। প্লেট ভর্তি ক্রীম ক্র্যাকার আর ধূমায়িত কফির কাপ রেখে নিঃশব্দে ফিরে গেল।

নিমা বলল, 'আমি কেন আপনাকে খুঁজছিলাম সেটা ব্যাখ্যা করতে হলে অনেক কথা বলতে হবে। সংক্ষেপে, হাসলান চাচার শেষ ইচ্ছে ছিল আমি আপনার কাছে আসি।'

'অন্তত আজকের দিনটা আমি ফ্রী,' বলল রানা। 'আপনি সব কথা খুলে বলুন।'

বড় করে শ্বাস নিল নিমা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আপনি নিশ্চয়ই প্রাচীন এক মিশরীয় রানী, রানী লসট্রিস-এর নাম শুনেছেন। আমি সেকেন্ড ইন্টারমিডিয়েট পিরিয়ডের কথা বলছি, হিকসস ইনভেশন-এর সময় বেঁচে ছিলেন।'

হেসে ফেলল রানা। 'ও, আপনি ওই বইটার কথা বলছেন–রিভার গড।' সোফা ছেড়ে লম্বা একটা শেলফের সামনে চলে এল ও। বইটা হাতে নিয়ে আবার ফিরে এল সোফায়, ট্রের পাশে নিচু টেবিলে রাখল ওটা। 'পড়েছি আমি।'

'পড়ে আপনার কি ধারণা হলো?' নিমার চোখে কৌতূহল।

'স্বীকার করছি, লেখক আমাকে বোকা বানিয়েছেন। পড়ার সময় বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল নিশ্চয়ই সত্য ঘটনার ওপর ভিত্তি করেই লেখা হয়েছে।' হেসে উঠল রানা। 'কিন্তু তা কি করে সম্ভব। এটা আমি মাস চারেক আগে পড়া শেষ করি, তারপর হাসলানকে ফোনও করেছিলাম।' বইটা তুলে নিয়ে পাতা উল্টে শেষ দিকে চলে এল ও। 'লেখকের নোট সত্যি বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে। শেষ বাক্যটা তো আমি ভুলতেই পারি না। পড়ি, কেমন? "নীলনদের উৎসমুখের কাছাকাছি অ্যাবিসিনিয়ান পাহাড়ে কোথাও ফারাও মামোস-এর অনাবিষ্কৃত ও সুরক্ষিত সমাধির ভেতর টানাস-এর মমি আছে"।'

চোখে প্রশ্ন, রানার দিকে তাকিয়ে আছে নিমা।

বইটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল রানা। 'পড়া শেষ হতে ভাবলাম, সত্যি হলে কি ভালই না হত। আসলে অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেলেই নেশাটা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, যদিও জানি সময় কোথায় যে ফারাও মামোসের সমাধি খুঁজতে বেরুব! তবু হাসলানকে ফোন করি। কিন্তু তিনি যখন বললেন এ-সব স্রেফ ভিত্তিহীন অনুমান, মনটা খারাপ হয়ে যায়।'

'না, ভিত্তিহীন অনুমান নয়,' প্রতিবাদ করল নিমা, তারপর নিজেই দ্রুত সংশোধনী আনল, 'মানে, অন্তত সবটুকু নয়।'

'কিন্তু হাসলান তো মিথ্যেকথা বলার মানুষ ছিলেন না!'

'চাচা মিথ্যে কথা বলেননি, সত্যি কথাটা বলার জন্যে একটু সময় নিচ্ছিলেন। পুরো কাহিনীটা আপনাকে বলার প্রস্তুতি ছিল না তাঁর। স্বভাবতই আপনি অনেক প্রশ্ন করতেন, কিন্তু উত্তরগুলো তাঁর জানা ছিল না। তৈরি হবার পর আপনার কাছেই আসার কথা ছিল। পনসরদের একটা তালিকা তৈরি করি আমরা, তাতে আপনার নামটাই ছিল সবার ওপরে।'

'সব প্রশ্নের উত্তর হাসলানের জানা ছিল না, তারমানে কি আপনার জানা আছে?'

'স্ক্রোল আবিষ্কার মিথ্যে নয়। ওগুলোর নয়টা আছে কায়রো মিউজিয়ামের ভল্টে। রানী লসট্রিসের সমাধি থেকে আমিই ওগুলো আবিষ্কার করি।' লেদার পিং ব্যাগ থেকে একগাদা কালার ফটোগ্রাফ বের করল নিমা, একটা বেছে ধরিয়ে দিল রানার হাতে। 'সমাধির পিছনের দেয়ালের ছবি। কুলঙ্গিতে রাখা চকচকে জারগুলো অস্পষ্ট হলেও দেখতে পাবেন। ছবিটা তোলা হয় আমরা ওগুলো নামানোর আগে।'

'ভাল ছবি, কিন্তু এটা যে-কোন জায়গায় তোলা হতে পারে।'

মন্তব্যটা কানে না তুলে রানার হাতে আরেকটা ফটো ধরিয়ে দিল নিমা। 'এটায় দশটা স্ক্রোলই দেখতে পাচ্ছেন, মিউজিয়াম ওয়ার্করুমে, যেখানে বসে কাজ করতেন হাসলান চাচা। বেঞ্চের পিছনে দাঁড়ানো ভদ্রলোকদের আপনি চিনতে পারছেন?'

'হাসলান আর উইলবার কিথ।' রানার চেহারায় একাধারে সন্দেহ ও কৌতুক ফুটে উঠল। 'ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন বলুন তো!'

'এই যে, লেখক বড় ধরনের পোয়েটিক লাইসেন্স নিলেও, তিনি তাঁর বইতে যা লিখেছেন তা সত্যের ওপর ভিত্তি করে লেখা। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব সপ্তম স্ক্রোলের, চাচার খুনীরা যেটা চুরি করে নিয়ে গেছে।'

'কেন ওটা বাকিগুলোর চেয়ে আলাদা?' খানিক পর জিজ্ঞেস করল রানা।

'এইজন্যে যে ওটায় ফারাও মামোসকে কবর দেয়ার বিবরণ দেয়া হয়েছে। এবং, আমাদের বিশ্বাস, দিক নির্দেশনাও আছে, সেটা ধরে সমাধির সাইট খুঁজে পাওয়া সম্ভব।'

'বিশ্বাস করেন, নিশ্চিতভাবে জানেন না?'

'সপ্তম স্ক্রোলের বেশিরভাগটাই এক ধরনের সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা। আমি আর হাসলান চাচা যখন কোড ভাঙার কাজটা শেষ করে এনেছি, ঠিক তখনই...চাচাকে ওরা খুন করল।'

'এত দামী জিনিস, নিশ্চয়ই আরও কপি আছে?'

মাথা নাড়ল নিমা। 'সমস্ত মাইক্রোফিল্ম, আমাদের সব নোট, অরিজিনাল স্ক্রোলের সঙ্গে চুরি হয়ে গেছে। হাসলান চাচাকে যারাই খুন করে থাকুক, তারা কায়রোয় আমাদের ফ্ল্যাটে গিয়ে আমার পিসি ধ্বংস করে দিয়েছে। ওই পিসিতে আমাদের গবেষণার সমস্ত তথ্য জমা ছিল।'

টেবিলে একবার আঙুল নাচাল রানা। 'তারমানে আপনার কাছে কোন প্রমাণ নেই। এমন কিছু নেই যা দেখে বোঝা যায় কথাগুলো সত্যি?'

'না, নেই,' বলল নিমা। 'তবে এখানে সবই টুকে রাখা আছে।' চাঁপা কলার মত আঙুল দিয়ে নিজের কপালে টোকা দিল সে। 'আমার স্মরণশক্তি খুবই ভাল।'

নক করে ঘরে ঢুকল স্বাতী, কাপ-পিরিচ নিতে এসেছে। 'কফি দেখছি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে,' অবাক ভাবটা চেপে রেখে বলল সে। 'আরও দু'কাপ বানিয়ে আনি?'

'হ্যাঁ, প্লীজ,' বলল রানা। স্বাতী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে নিমার দিকে

তাকাল। 'যদি খুব কষ্ট না হয়, হাসলান কিভাবে মারা গেলেন বলুন আমাকে।'

মাথা ঝাঁকাল নিমা। মরু গ্রামে সেই রাতে ঠিক যা ঘটেছিল সংক্ষেপে তার হুবহু বর্ণনা দিল সে। শেষ দিকে নিঃশব্দে কেঁদে ফেলল। পকেট থেকে পরিষ্কার রুমাল বের করে তার দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা, বলল, 'আপনি খুব সাহসী মেয়ে, নিমা। সাধারণ কোন মেয়ে হলে বাঁচত না। কিন্তু আমি ভাবছি, মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ বা পুলিস তদন্ত করে বের করতে পারল না কারা দায়ী?'

কর্তৃপক্ষ বা পুলিস কি ভূমিকা নিয়েছে তারও একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিল নিমা। মিশরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই খারাপ, অপরাধীর চেয়ে পুলিসের সংখ্যা কম। বিচার ব্যবস্থাটাই এমন যে অপরাধীরা ধরা পড়লেও পুলিস সাক্ষী-প্রমাণ হাজির করতে না পারায় ছাড়া পেয়ে যায় তারা।

নিমা থামতে রানা জানতে চাইল, 'এবার বলুন, আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন? আপনার জন্যে কি করতে পারি আমি?'

'আমার জন্যে আপনাকে কিছুই করতে হবে না। আমি প্রস্তাব নিয়ে এসেছি ফারাও মামোসের সমাধিটা আপনি দেখুন।'

এ শুধু অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ নয়, রহস্য আর রোমাঞ্চে ভরপুর একটা অভিযান হাতছানি দিয়ে ডাকছে রানাকে। নেশাটা হঠাৎ যেন গ্রাস করে ফেলতে চাইল ওকে। কিন্তু না, ব্যাকুল হওয়া চলবে না। হাতে অনেক কাজ আছে। 'দেখুন, আপনার সঙ্গে এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়তে পারলে আমার চেয়ে সুখী কেউ হত না,' বলল ও। 'কিন্তু আমি খুব ব্যস্ত মানুষ, জরুরী সব কাজে এমন জড়িয়ে আছি, সময় বের করা প্রায় অসম্ভব।'

কিন্তু নিমাও সহজে হাল ছাড়ার পাত্রী নয়। 'আপনি সময় করতে পারবেন কি পারবেন না, সেটা পরের প্রশ্ন,' বলল সে। 'তার আগে আপনাকে আমার জানানো দরকার ঠিক কি চাই আমি। তারপর শোনা যাবে আপনি কি চান। আমি ধরে নিচ্ছি, চাচার সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব ছিল, কাজেই আপনি আমাকে সাহায্য করবেন—দু'জন আমরা একসঙ্গে কাজটা করতে পারব। আর কাজটা করতে হলে কয়েকটা ব্যাপারে সমঝোতা হতে হবে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আলোচনায় রাজি হলো রানা।

শুধু কি চায় তা নয়, কি ধরনের চুক্তিতে আসতে চায় তাও ব্যাখ্যা করল নিমা। কয়েকটা বিষয়ে একমত হলো রানা, কিছু বিষয়ে তর্ক করল। এভাবে সময় গড়াল, তারপর দেখা গেল রাত বাজে একটা। ক্লান্তির কাছে নিমাই হার মানল প্রথম, বলল, 'আমি আর মাথা ঘামাতে পারছি না। ভাবছি আবার কাল-সকালে শুরু করলে কেমন হয়?'

একটু ইতস্তত করে রানা বলল, 'এ-ধরনের অভিযানে বেরতে হলে হাতে প্রচুর সময় থাকতে হয়। সত্যি দুঃখিত, কাজ ফেলে আমি আসলে যেতে পারব না। লন্ডনে বসে সাহায্য করার ব্যাপার হলে কোন সমস্যা ছিল না। তাই ভাবছি, যেতেই যখন পারছি না, আলোচনা করে কি লাভ?'

'কাজটা আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়,' বলল নিমা। 'বিশ্বাস করতে পারি, এমন লোকের সাহায্য নিতে হবে। তেমন কোন লোককে আমি চিনি না। হাসলান

চাচা শুধু আপনার কথা বলে গেছেন। এখন সময় করতে পারছেন না··· ঠিক আছে, আমি অপেক্ষা করব।'

'কিন্তু কতদিন?'

'দরকার হলে ছ'মাস, কিংবা একবছর···'

'ঠিক আছে, তাহলে এক হপ্তা পর আবার আসুন আপনি,' বলল রানা। 'হয়তো মাস ছয়েকের মধ্যে সময় বার করতে পারব, তবে আলোচনাটা আমরা শেষ করে ফেলি। ঠিক আছে?'

'আমি খুশি,' বলল নিমা। 'কখন আসব বলে দিন।'

'রোববারে আসুন, এই এগারোটার দিকে।' হাতঘড়ির দিকে তাকাল রানা। 'এত রাতে ইয়র্কে ফিরবেন?' তারচেয়ে ফোন করে আপনার মাকে জিজ্ঞেস করুন এখানে আপনারা রাতটা কাটাবেন কিনা। ফ্ল্যাটে অনেকগুলো অতিরিক্ত কামরা আছে।'

'না!' লজ্জা পেল নিমা। 'আমার মা রাত করে ইয়র্কে ফিরতে অভ্যস্ত। ধন্যবাদ। ফোনটা দেবেন, প্লীজ?'

নিমাকে বিদায় দেয়ার সময় অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের নিচতলা পর্যন্ত নামল রানা। অনেক রাত হয়েছে, চায়নি মায়ের জন্যে একা অপেক্ষা করুক নিমা। অবশ্য কয়েক মিনিট পরই সবুজ ও পুরানো একটা ল্যান্ড রোভার নিয়ে হাজির হলেন সাবরিনা। বিদায় নেয়ার আগে মায়ের সঙ্গে রানার পরিচয় করিয়ে দিল নিমা।

তিন

ফোনে আগেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে, পরিচিত ডাক্তারের কাছে নিমাকে নিয়ে যাচ্ছেন সাবরিনা, ওর হাতের সেলাই কাটতে হবে। ব্রেকফাস্ট সেরেই নিজেদের কটেজ থেকে বেরিয়ে পড়ল মা ও মেয়ে, সঙ্গে কুকুরটাও রয়েছে। সেলাই কাটার পর নিমাকে লন্ডনে পৌঁছে দেবেন সাবরিনা। আজ রোববার, রানার সঙ্গে নিমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে এগারোটায়।

গ্রামের রাস্তায় বাঁক ঘোরার সময় নিমা বিরাট একটা ট্রাক দেখতে পেল, পোস্ট অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তবে ওটাকে নিয়ে আর কিছু ভাবল না। গ্রাম ছেড়ে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে আসার পর কুয়াশা দেখতে পেল ওরা, কোথাও কোথাও বেশ গাঢ়, ত্রিশ গজের বেশি দৃষ্টি চলে না। সাবরিনা জোরে গাড়ি চালাতে অভ্যস্ত, কুয়াশা থাকলেও গ্রাহ্য করছেন না। ল্যান্ড রোভার ফুল স্পীডে ছুটছে। তবে পুরানো হওয়ায় গাড়িটা সম্ভবত ঘন্টায় ষাট মাইলের বেশি ছুটতে পারে না, কৃতজ্ঞচিত্তে আন্দাজ করল নিমা।

পিছনের রাস্তা চেক করার জন্যে ঘাড় ফেরাল ও। দেখতে পেল সেই ট্রাকটা ওদের পিছনে রয়েছে। নিচের দিকে কুয়াশা জমে থাকায় ট্রাকের শুধু ক্যাব দেখা

যাচ্ছে। নিমা তাকিয়ে রয়েছে, হঠাৎ পুরো ট্রাকটাই কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গেল। ঘাড় সোজা করে মায়ের কথায় মন দিল নিমা।

'তুমি কি সত্যি একটা লেবার গভর্নমেন্ট চাও?' মাথা নাড়ল ও।

'আমি চাই থেচার ফিরে আসুক, কারণ থেচারের সময় পেনশন নিয়ে কোন ঝামেলা হয়নি,' বললেন সাবরিনা। ফরেন সার্ভিসের পেনশনই তাঁর একমাত্র আয়।

সীটে একটু সরে বসে বোংরা পিছনের জানালা দিয়ে আবার তাকাল নিমা। ট্রাকটা এখনও ওদের পিছনে কুয়াশার মধ্যে ভেসে রয়েছে। আগের চেয়ে অনেক কাছাকাছি চলে আসায় এখন ল্যান্ড রোভারের নীলচে ধোঁয়াও খেতে হচ্ছে ড্রাইভারকে। হঠাৎ সেটার গতি আরও বাড়ল। 'মামি, ট্রাকটা বোধহয় তোমাকে পাশ কাটাতে চাইছে,' মৃদু গলায় বলল ও।

ওদের রিয়্যার বাম্পার থেকে ট্রাকের প্রকাণ্ড বনেট মাত্র বিশ ফুট দূরে। ট্রাকের রেডিয়েটর ক্রোম লোগো দিয়ে সাজানো, ক্যাপিটাল লেটারে পাশাপাশি তিনটে শব্দ–এমএএন। লোগোটা ল্যান্ড রোভারের ক্যাব-এর চেয়ে বেশি লম্বা, কাজেই নিমা যেখানে বসে আছে সেখান থেকে ড্রাইভারের চেহারা দেখা যাচ্ছে না।

'সবাই আমাকে পাশ কাটাতে চায়,' অভিযোগ করলেন সাবরিনা। 'সত্যিকারে এটাই আমার জীবনকাহিনী।' জেদের বশে সরু রাস্তার মাঝখানটা দখল করে রাখলেন তিনি।

আবার পিছন দিকে তাকাল নিমা। একটু একটু করে আরও কাছে চলে আসছে ট্রাক। পিছনের জানালা পুরোপুরি ঢেকে দিল ওটা। ক্লাচ ছেড়ে দিয়ে দৈত্যাকৃতি এঞ্জিনের আবর্তন বাড়াল ড্রাইভার, ভীতিকর গর্জন শোনা গেল। 'পথ ছাড়লে ভাল করবে,' মাকে বলল নিমা। 'লোকটা মনে হচ্ছে রেগে গেছে।'

'অপেক্ষা করুক,' ঠোঁটের এক কোণ থেকে কথা বলছেন সাবরিনা, আরেক কোণে সিগারেট ঝুলছে। ধৈর্য একটা সদ-গুণ। তাছাড়া, এখানে ওকে পথ ছাড়া সম্ভব নয়। সামনে সরু একটা পাথুরে ব্রিজ আছে। এদিকের রাস্তা-ঘাট খুব ভাল চিনি আমি।'

ট্রাক ড্রাইভার এত কাছে থেকে ইলেকট্রিক হর্ন বাজাল, কানে তালা লেগে গেল নিমার। পিছনের সীটে লাফালাফি আর চিৎকার শুরু করল ম্যাড। 'স্টুপিড বাস্টার্ড!' তিক্ত গলায় গাল দিলেন সাবরিনা। 'উল্লুকটা ভেবেছে কি! নিমা, ওর নাম্বার প্লেট লিখে রাখো। ইয়র্ক পুলিসকে রিপোর্ট করব আমি।'

'প্লেটে কাদা, পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে না, তবে মনে হচ্ছে কন্টিনেন্টাল রেজিস্ট্রেশন। সম্ভবত জার্মান।'

যেন সাবরিনার প্রতিবাদ শুনতে পেয়েই ট্রাকের গতি সামান্য কমাল ড্রাইভার, ধীরে ধীরে দুই গাড়ির মাঝখানের দূরত্ব বিশ গজে দাঁড়াল। ঘাড় ফিরিয়ে এখনও পিছন দিকে তাকিয়ে আছে নিমা।

'হুঁ-হুঁ, হুন ব্যাটা ভদ্রতা শিখছে,' সন্তুষ্টচিত্তে বললেন সাবরিনা। কুয়াশার ভেতর দিয়ে সামনে তাকালেন তিনি। 'ওই দেখা যায় ব্রিজ...'

এই প্রথম ট্রাকের ক্যাব দেখতে পাচ্ছে নিমা। ড্রাইভার এমন একটা হেলমেট পরে আছে, চোখ আর নাকের ফুটো ছাড়া মুখের সবটুকুই নীল উলে ঢাকা। হেলমেটটা তার চেহারায় অশুভ আর শয়তানি একটা ভাব এনে দিয়েছে। 'সাবধান! সর্বনাশ!' অকস্মাৎ চিৎকার শুরু করল নিমা। ট্রাক সোজা আমাদের ওপর উঠে আসছে!' এঞ্জিনের আওয়াজ বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে দাঁড়াল, ওদেরকে যেন ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সাগরের গর্জন গ্রাস করে ফেলেছে। চকচকে ইস্পাত ছাড়া এক মুহূর্ত কিছুই দেখতে পেল না নিমা। তারপরই ট্রাকের সামনের অংশ ল্যান্ড রোভারের পিছনটা চুরমার করে দিল।

ধাক্কা খেয়ে সীটের পিঠে নিমার অর্ধেক শরীর উঠে এল। কোন রকমে তাল সামলে সিধে হলো ও, দেখল ট্রাকটা ওদেরকে শিয়ালের চোয়ালে আটকানো পাখির মত তুলে নিয়েছে। চকচকে ক্রোম রেডিয়েটর স্টীল বুল বার দিয়ে সুরক্ষিত, বারগুলো প্রায় তুলে নিয়েছে ল্যান্ড রোভারকে, ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সামনে।

হুইলের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছেন সাবরিনা, নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। 'পারছি না! ব্রিজ··· সরে যেতে চেষ্টা করো···'

সেফটি-বেল্টের কুইক রিলিজ বাকলে টান দিয়ে ডোর হ্যান্ডেলের দিকে হাত বাড়াল নিমা। ব্রিজের পাথুরে পাঁচিল তীর বেগে ছুটে আসছে ওদের দিকে। রাস্তার ওপর আড়াআড়ি হয়ে যাচ্ছে ল্যান্ড রোভার, পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

নিমার হাতের ধাক্কায় কিছুটা খুলে গেল দরজা, কিন্তু পুরোটা খুলল না, কারণ ব্রিজ শুরু হবার আগে পাহারাদারের মত দাঁড়িয়ে থাকা পাথরের দু'সারি স্তম্ভের মাঝখানে পৌঁছে গেছে ল্যান্ড রোভার।

গাড়ি চ্যাপ্টা হতে শুরু করায় মা ও মেয়ে একযোগে চিৎকার দিচ্ছে, ধাক্কা খেয়ে দু'জনেই ছিটকে পড়ল সামনের দিকে। পাথরের স্তম্ভে বাড়ি খেয়ে চুরমার হয়ে গেল উইন্ডস্ক্রীন, ল্যান্ড রোভারের বডি এমব্যাঙ্কমেন্ট ধরে নেমে যাবার সময় ডিগবাজি খেতে শুরু করল।

একটা গড়ান দিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ছিটকে বাইরে পড়ল নিমা। ঢালের মধ্যে পড়ায় শরীরটা স্থির থাকল না, তা থাকলে হাড়গোড় সব গুঁড়ো হয়ে যেত। পড়ার পর গড়াতে শুরু করল, কিনারা থেকে খসে পড়ল ব্রিজের নিচে ঠাণ্ডা হিম স্রোতের মধ্যে।

পানির নিচে মাথাটা ডুবে যাবার আগে ওপরে আকাশ আর ব্রিজ দেখতে পেল নিমা। গর্জন তুলে বিদায় নেয়ার আগে ট্রাকটাকেও দেখতে পেল। একজোড়া বিশাল কার্গো ট্রেলার টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওটা। ট্রেলার দুটোর লম্বা বডিওঅর্ক ব্রিজের গার্ড রেলকে ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে আছে। দুটো ট্রেলারই গাঢ় সবুজ নাইলন তারপুলিন দিয়ে মোড়া। কাছাকাছি ট্রেলারের এক পাশে কোম্পানীর লাল ট্রেডমার্ক দেখতে পেল নিমা, কিন্তু নামটা পড়ার সময় পাওয়া গেল না, তার আগেই পানির নিচে তলিয়ে গেল ও।

আবার যখন পানির ওপর মাথা তুলল, দেখল ভাটির দিকে খানিকটা সরে এসেছে। তীরে উঠে এসে কাদার মধ্যে শুয়ে কাশছে নিমা। কাশির সঙ্গে প্রচুর

পানি বেরিয়ে এল, হালকা লাগল শরীরটা। কোথায় আঘাত লেগেছে পরীক্ষা করছে, এই সময় উল্টে পড়া ল্যান্ড রোভারের দিক থেকে সাবরিনার যন্ত্রণাকাতর চিৎকার ভেসে এল।

কাদা, তারপর ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটল নিমা। এমব্যাঙ্কমেন্টের গোড়ায় চিৎ হয়ে রয়েছে ল্যান্ড রোভার। বডিটা শুধু তোবড়ায়নি, ভেঙে বা ছিঁড়ে গেছে কয়েক জায়গায়। এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে, তবে ফ্রন্ট হুইল এখনও ঘুরছে। 'মামি! মামি, তুমি কোথায়?' ফুঁপিয়ে উঠল নিমা। আহত পশুর মত সাবরিনার গোঙানি থামছে না। তোবড়ানো বডি ধরে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে নিমা, গোঙানির উৎসের দিকে এগোচ্ছে, জানে না কি দেখতে হবে।

সাবরিনা ভিজে মাটিতে বসে আছেন, ল্যান্ড রোভারের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে। পা দুটো সরাসরি সামনের দিকে সোজা করা। তবে তাঁর বাম পা হাঁটুর কাছাকাছি মোচড় খেয়ে আছে, ফলে জুতো পরা গোড়ালি বাঁকা হয়ে কাদার দিকটা নির্দেশ করছে। সন্দেহ নেই ওই পা-টা হাঁটু বা হাঁটুর খুব কাছাকাছি ভেঙে গেছে।

গোঙানোর বা বিলাপ করার সেটা কারণ নয়। সাবরিনা বসে আছেন ম্যাডকে কোলে নিয়ে। শোকে আকুল ভঙ্গিতে কুকুরটার ওপর ঝুঁকে রয়েছেন তিনি, লাশের গায়ে হাত বুলাচ্ছেন আর দোল খাচ্ছেন, বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে আহাজারি। কুকুরটার বুক ইস্পাত আর মাটির মাঝখানে পড়ে গুঁড়িয়ে গেছে। মুখের কোণ থেকে বেরিয়ে এসেছে জিভের ডগা, গোলাপী ওই ডগা থেকে এখনও ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ঝরছে। নিজের স্কার্ফ দিয়ে তা মুছে ফেলছেন সাবরিনা।

পাশে বসে মায়ের কাঁধ দুটো একহাতে জড়িয়ে ধরল নিমা। মাকে আগে কখনও কাঁদতে দেখেনি ও। আদরের হাত বুলিয়ে জননীকে সান্ত্বনা দিতে চাইছে, কিন্তু সাবরিনার বিলাপধ্বনি থামছে না।

এভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে বলতে পারবে না নিমা। তবে এক সময় বাঁকা হয়ে থাকা মায়ের অবশ পা দেখে আঁতকে উঠল, সেই সঙ্গে ভাবল কাজটা শেষ করার জন্যে ট্রাক ড্রাইভার আবার ফিরে আসতে পারে। ক্রল করে ঢালের মাথায়, সেখান থেকে রাস্তার মাঝখানে চলে এল নিমা, ব্রিজে উঠে আসা প্রথম গাড়িটাকে থামাবে।

•

এগারোটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট, দু'ঘন্টা পর বেলা একটার দিকে উদ্বিগ্ন রানা ইয়র্ক পুলিসকে ফোন করল। ভাগ্য ভাল যে ল্যান্ড রোভারের লাইসেন্স প্লেটটা গত রোববারে লক্ষ করেছিল। পুলিস স্টেশনের মহিলা কনস্টেবল কমপিউটর চেক করে জানাল, 'দুঃখিত, স্যার। ল্যান্ড রোভারটা আজ সকালে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। ড্রাইভার ও প্যাসেঞ্জার ইয়র্ক হসপিটালে...'

হাসপাতালে পৌঁছুতে চল্লিশ মিনিট লাগল। নিমাকে পাওয়া গেল মেয়েদের সার্জিকাল ওয়ার্ডে, মায়ের বেডের পাশে বসে আছে। অ্যানেসথেটিকের প্রভাব এখনও কাটেনি, সাবরিনা সচেতন নন। রানাকে দেখে মুখ তুলে তাকাল নিমা। 'আপনি সুস্থ তো? কি ঘটল?'

'মা...মায়ের পা ভেঙে গেছে। সার্জেনকে বাধ্য হয়ে উরুতে একটা পিন

আটকাতে হয়েছে।'

'আপনি কেমন আছেন?'

'এখানে সেখানে কেটে-ছিঁড়ে গেছে। সিরিয়াস কিছু না।'

'কিভাবে ঘটল?'

'একটা ট্রাক···ঠেলে রাস্তা থেকে ফেলে দিল আমাদেরকে।' পুরো ঘটনাটা বর্ণনা করল নিমা।

'পরিষ্কার মেরে ফেলার চেষ্টা,' বলল রানা। বিচলিত হওয়া ওর স্বভাব নয়, চেহারায় কাঠিন্য ফুটে উঠল। 'পুলিসকে জানিয়েছেন?'

'আরও সকালে পুলিসকে রিপোর্ট করা হয়েছিল ট্রাকটা চুরি গেছে—ঘটনাটা ঘটার অনেক আগে। গ্রীন সুপার কাফের সামনে থেমেছিল ড্রাইভার, তখন। লোকটা জার্মান, ইংরেজি জানে না।'

'এবার নিয়ে ওরা তিনবার আপনাকে খুন করার চেষ্টা করল,' বলল রানা। 'কাজেই আপনার নিরাপত্তার দিকটা এখন আমাকে দেখতে হবে।'

হাসপাতালের ওয়েটিং রুমে এসে কাউন্টির চীফ কনস্টেবলকে ফোন করল রানা। দু'বছর আগে ইংল্যান্ডে বিশেষ একটা ট্রেনিং নিতে এসে ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ওর। হাসপাতালের পরিচালকের সঙ্গেও ওর পরিচয় আছে।

ওয়ার্ডে ফিরে এসে দেখল সাবরিনার জ্ঞান ফিরেছে। এখনও একটু আচ্ছন্ন বোধ করছেন তিনি, তবে কোন রকম কষ্ট পাচ্ছেন না। রানা যেমন আয়োজন করেছে, চাকা লাগানো বেডে শুইয়ে সাবরিনাকে প্রাইভেট ওয়ার্ডে নিয়ে আসা হলো। কয়েক মিনিট পর তিনজন পুলিস কনস্টেবল ও অর্থোপেডিক সার্জেন একই সঙ্গে ঢুকলেন কেবিনে।

'হ্যালো, রানা, এখানে তুমি কি করছ?' সার্জেন বললেন। নিমা অবাক হয়ে ভাবছে, কত মানুষই না চেনে ওকে। সাবরিনার দিকে ফিরলেন সার্জেন, বললেন, 'কেমন লাগছে এখন? কিছু না, সত্যি ভাঙেনি—শুধু ফেটে গেছে। আবার আমরা জোড়া লাগিয়ে দিয়েছি, তবে আমাদের সঙ্গে অন্তত দশ দিন থাকতে হবে আপনাকে।'

'আপনার আপত্তি আমি গ্রাহ্য করছি না,' সাবরিনা ঘুমিয়ে পড়ার পর নিমাকে রানা নিজের গাড়িতে তুলে নিয়েছে, ফিরছে নিজের ফ্ল্যাটে। 'মানলাম লন্ডনে আপনার মায়ের অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে, কিন্তু সে-সব জায়গা আপনার জন্যে মোটেও নিরাপদ নয়। আপাতত আপনাকে আমার ফ্ল্যাটেই থাকতে হবে। কথা দিচ্ছি, আপনার কোন অসুবিধে হবে না।'

আগেই ফোন করে স্বাতীকে সতর্ক করে দিয়েছিল রানা, ফ্ল্যাটে ফিরেই নিমাকে নিয়ে খেতে বসল ও। খাওয়া শেষ হতে হাতে দুটো পীপিং ট্যাবলেট গুঁজে দিয়ে একটা বেডরুমে ঢুকিয়ে দেয়া হলো নিমাকে।

সন্ধের দিকে ঘুম ভাঙার পর নিমা দেখল ওর প্রচুর কাপড়চোপড় ও নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস ওয়ারড্রোবের ওপর নিখুঁতভাবে সাজানো। সন্দেহ নেই, এগুলো ওদের কটেজ থেকে আনানো হয়েছে। সদ্য পরিচিত সুদর্শন এক পুরুষ,

স্বেচ্ছায় ওর দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে এতটা করবে, ভাবতে গিয়ে বিস্মিত হলো নিমা-নিজেকে চোখ রাঙালেও, শরীরটার পুলকিত হওয়া ঠেকানো গেল না।

বাথরুমে ঢুকে শাওয়ারের নিচে দাঁড়াল নিমা, সুযোগ পেয়ে ছয় ফুট লম্বা আয়নায় নিজের নগ্ন শরীরটা পরীক্ষা করে নিল। বাহুর ক্ষতটা এখনও ভেজা ভেজা, পুরোপুরি শুকায়নি, উরু আর পাঁজরের এক পাশে গাঢ় দাগ ফুটে আছে, কার অ্যাক্সিডেন্টের অবদান। হাঁটুর নিচেও এক ইঞ্চি লম্বা একটা সরু দাগ, চামড়া উঠে গেছে। কাপড়চোপড় পাল্টে ডাইনিং রুমে আসার পথে খেয়াল করল, একটু খোঁড়াচ্ছে।

করিডরে দেখা হলো স্বাতীর সঙ্গে। 'ঝুল-বারান্দায় কফি দেয়া হয়েছে। ওদিকে,' হাত তুলে দেখাল সে। 'মাসুদ ভাই আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। ওঁকে মনে করিয়ে দেবেন, সাড়ে সাতটায় ডিনার, প্লীজ।'

ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে এসে নিমা দেখল রানা পত্রিকা পড়ছে। 'হাসপাতালে একবার ফোন করা দরকার।'

মুখ তুলল রানা। 'করা হয়েছে। দু'বার। সাবরিনা ভাল আছেন। শেষ খবর, বেডে বসে তিনি তাঁর বান্ধবীদের সঙ্গে খোশগল্প করছেন।'

হাসল নিমা। 'তাহলে আর চিন্তার কিছু নেই। কেবিন ছেড়ে ওঁরা কেউ নড়বেন বলে মনে হয় না।'

কফি পর্ব শেষ হতে রানা বলল, 'আজকের দিনটা বিশ্রাম নিন, কথা যা হবার কাল সকালে হবে, কি বলেন?'

'না, কেন!' প্রতিবাদ করল নিমা। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের মধ্যে একটা এগ্রিমেন্ট হওয়া দরকার।'

কিন্তু আলোচনা শুরু করার পর দেখা গেল মতের মিল হচ্ছে না। প্রায় এক ঘন্টা তর্ক করল দু'জন।

'লুঠের মাল বা উদ্ধার করা আর্টিফ্যাক্ট আপনি কতটুকু পাবেন, নির্ধারণ করা সত্যি কঠিন, যতক্ষণ না আমি জানছি উদ্ধার করার পিছনে আপনার অবদান কতটুকু হবে,' কফির কাপ দুটো আবার ভরার সময় বলল রানা। 'ভুলে যাবেন না, অভিযানের সমস্ত খরচ আমি দিচ্ছি, প্ল্যানটাও আমার তৈরি।'

'আপনি ধরে নিন আমার অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে, তা না হলে লুঠের মাল বা উদ্ধার করা আর্টিফ্যাক্ট বলে কিছু থাকবে না। শুধু একটা ব্যাপারে নিশ্চিত থাকুন, এগ্রিমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত আর একটি কথাও আপনাকে আমি বলছি না।'

'একটু যেন কর্কশ লাগছে আপনাকে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

নিমার ঠোঁটে দুষ্ট হাসি ফুটল।

'আপনি যদি আমার শর্তে রাজি না হন, স্পনসরদের তালিকায় আরও তিনজনের নাম আছে,' হুমকি দিল নিমা। 'অগত্যা তাদেরকেই আমার বিশ্বাস করতে হবে।'

'ধরা যাক, আপনার প্রস্তাবে আমি রাজি হলাম, কিন্তু সমান ভাগ কিভাবে সম্ভব?'

'আর্কিওলজিকাল আর্টিফ্যাক্টস থেকে প্রথমে আমি বেছে নেব,' বলল নিমা।

পরের বার বেছে নেয়ার সুযোগ পাবেন আপনি। এভাবে চলতে থাকবে।'

'প্রথমে আমি বাছার সুযোগ নিলে অসুবিধে কি?' একদিকের ভুরু উঁচু করে জানতে চাইল রানা।

'আসুন তাহলে টস করি,' বুদ্ধি দিল নিমা, সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে এক পাউন্ডের একটা কয়েন বের করল রানা।

'কল!' আঙুলের টোকায় কয়েনটা শূন্যে ছুড়ে দিল রানা।

নিমা চিৎকার দিল, 'হেডস!'

'ধ্যেত!' কয়েনটা আলগোছে পকেটে ভরল রানা। 'ঠিক আছে, আপনিই আগে বেছে নেবেন–আদৌ যদি আর্টিফ্যাক্ট পাওয়া যায়। আপনার শেয়ার নিয়ে কি করবেন আপনি? সরি, প্রশ্নটা অনধিকার চর্চার মত হয়ে গেল। আপনার জিনিস নিয়ে আপনি যা খুশি করুন, আমার কিছু বলার থাকবে না। ইচ্ছে করলে সব আপনি কায়রো মিউজিয়ামকে দান করতে পারেন। তো, ডিল?' নিচু টেবিলের ওপর ডান হাতটা চিৎ করে রাখল ও।

'ডিল!' রানার হাতের ওপর হাত রাখল নিমা। 'পার্টনার।'

'এবার শুরু করুন। কোন কিছু গোপন করা যাবে না। যা জানেন সব বলে ফেলুন।'

'বইটা আনুন,' বলল নিমা। রিভার গড নিয়ে ফিরে এসে রানা দেখল, টেবিল পরিষ্কার করে ফেলেছে নিমা। 'বইয়ের যে অংশটুকু হাসলান চাচা সম্পাদনা করেছিলেন, প্রথমে সেটার ওপর চোখ বুলানো যাক।' পাতা ওল্টাচ্ছে নিমা। 'এখান থেকে। এখান থেকে চাচার অস্পষ্টকরণ শুরু হয়েছে।'

'যা বলার সরল ভাষায় বলুন,' বলল রানা। 'এরইমধ্যে আমি আপনার হেঁয়ালিকরণের শিকার।'

নিমা হাসল না। 'এ পর্যন্ত গল্পটা আপনি জানেন। হিকসস বাহিনীর কাছে উন্নতমানের চ্যারিয়াট বা রথ থাকায় রানী লসট্রিস হেরে গেলেন, তিনি তাঁর লোকজন সহ ঈজিপ্ট থেকে বিতাড়িত হলেন। নীল নদ ধরে দক্ষিণে গেলেন ওঁরা, পৌঁছুলেন সাদা ও নীল নদের সঙ্গমে। অন্য ভাষায়, আজকের দিনের খার্তুমে। এ-সবই ক্রোলে পাওয়া তথ্যের সঙ্গে মিলে যায়।'

'মনে পড়ছে। বলে যান।'

'ওঁদের রণতরীতে রানী লসট্রিসের স্বামী অষ্টম ফারাও মামোসের মমি করা লাশ ছিল। বারো বছর আগে, হিকসস বাহিনীর একটা তীর ফুসফুসে নিয়ে তিনি যখন মৃত্যুশয্যায়, স্বামীকে লসট্রিস কথা দিয়েছিলেন তাঁর সমাধির জন্যে তিনি একটা সুরক্ষিত জায়গা খুঁজে বের করবেন, সেখানে সমাধির ভেতর লাশের সঙ্গে তাঁর বিপুল ধন-সম্পদও থাকবে। খার্তুমে পৌঁছে রানী লসট্রিস সিদ্ধান্ত নিলেন, স্বামীকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পালনের সময় হয়েছে। তিনি তাঁর চোদ্দ বছরের ছেলে প্রিন্স মেমননকে সমাধির স্থান খুঁজে বের করতে পাঠালেন, সঙ্গে থাকল এক স্কোয়াড্রন চ্যারিয়ট। মেমননের সঙ্গে তার পরামর্শদাতা ছিল, অক্লান্ত পুরুষ ইতিহাস লেখক–টাইটা।'

'হ্যাঁ, এই অংশটুকু আমার মনে আছে। মেমনন আর টাইটা বন্দী নিগ্রো

ক্রীতদাসদের সঙ্গে আলোচনা করে, তাদের পরামর্শেই নদীর বাম বাহু ধরে এগোয়–এই বাহুটাকেই আমরা নীল নদ বলে জানি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে আবার শুরু করল নিমা, 'পুবদিকে চলে এল ওরা, এবং বাধা পেল ভীতিকর পাহাড়ে, এত উঁচু যে নীল দুর্গ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত বইতে যা পড়েছেন ক্রোলের সঙ্গে মেলে, কিন্তু এখানে এসে,' খোলা বইয়ের পাতায় টোকা দিল, 'চাচার হেঁয়ালিপনা শুরু হলো। তিনি যে ফুটহিল বা পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে দাঁড়ানো পাহাড়ের বর্ণনা দিয়েছেন...'

বাধা দিল রানা, 'পড়ার সময়ই ভেবেছি, বর্ণনায় ভুল আছে। ইথিওপিয়ান হাইল্যান্ডের যে জায়গা থেকে নীল নদ বেরিয়েছে সেখানে কোন ফুটহিল বা ফুটহিলস নেই। অসংখ্য পর্বতের একটা স্তূপ হিসেবে কল্পনা করতে হবে জায়গাটাকে, শুধু পশ্চিমে খাড়া ও বন্ধুর উতরাই বা ঢল আছে। বর্ণনাটা যে-ই দিক, নীল নদের কোর্স তার জানা নেই।'

'যেন মনে হচ্ছে আপনি জানেন?' জিজ্ঞেস করল নিমা, শুনে হেসে উঠল রানা।

'কম বয়েসে বোকার মত সাহস করে মানুষ, আমিও এক আধবার করেছিলাম,' বলল রানা। 'সবাইকে চমকে দেয়ার জন্যে লেক টানা থেকে ভাটির দিকে সুদানের রোজিরেস ড্যাম পর্যন্ত বোট নিয়ে গিয়েছিলাম অ্যাবে গিরিখাদের তলা দিয়ে। অ্যাবে হলো নীল নদের ইথিওপিয়ান নাম।'

'কিন্তু, কেন আপনি...'

'আগে কেউ যেতে পারেনি, তাই। মেজর চেসম্যান, ব্রিটিশ কনসাল, উনিশশো বত্রিশ সালে চেষ্টা করতে গিয়ে প্রায় মারাই পড়েছিলেন। ভেবেছিলাম অভিযানটা সফল হলে একটা বই লিখব, তা থেকে এত বেশি রয়্যালিটি পাব যে সারাজীবন আর কাজ করতে হবে না, মনের ফুর্তিতে দুনিয়াটা চষে বেড়াব। অ্যাবে নদীর পুরোটা কোর্স আমি স্টাডি করেছি, শুধু ম্যাপ দেখে নয়। একটা সেসনা একশো আশি ভাড়া করি, খাদের ওপর দিয়ে উড়ে যাই, লেক টানা থেকে ড্যাম পর্যন্ত পাঁচশো মাইল। আমার তখন পঁচিশ কি ছাব্বিশ বছর বয়েস, সাংঘাতিক ডানপিটে।'

'কি ঘটেছিল?' নিমা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। হাসলান চাচা এ-সম্পর্কে কিছু বলে যায়নি, তবে নিমা জানে ঠিক এ-ধরনের একটা অ্যাডভেঞ্চারেই ওদেরকে বেরুতে হবে।

'সামরিক বাহিনীতে ভর্তি হয়ে আমি তখন সুদানে ট্রেনিং নিতে গেছি,' বলল রানা। 'সব মিলিয়ে আটজন ছিলাম আমরা। গিরিখাদের নিচের পানিকে এক কথায় হিংস্র বলব। মাত্র দু'দিন টিকেছিলাম। দুনিয়ার বুকে নরকতুল্য যে ক'টা জায়গা আছে, ওই গিরিখাদ তার মধ্যে একটা। অ্যারিজোনার গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ গভীর ও এবড়োখেবড়ো ওটা। পাঁচশো মাইলের মধ্যে বিশ মাইল পেরতে না পেরুতেই ভেঙে চুরমার করে দেয় আমাদের সব ক'টা কাইয়্যাক। সমস্ত ইকুইপমেন্ট ছেড়ে আসতে বাধ্য হই আমরা, সভ্য জগতে আবার ফেরার জন্যে খাদের দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠতে হয়েছিল।'

চেহারা ম্লান হয়ে গেল, বিষণ্ণ সুরে বলল আবার, 'দুই বন্ধুকে হারাই আমরা। পারভেজ নদীতে ডুবে যায়, কায়সার পাহাড় থেকে পড়ে যায়। আমরা এমন কি ওদের লাশও খুঁজে পাইনি।'

'নীল নদের ওই খাদে আর কেউ নেভিগেট করতে পেরেছে?' জিজ্ঞেস করল নিমা, দুঃখজনক স্মৃতি থেকে রানার মনটা ফেরাতে চাইছে।

'হ্যাঁ। আরও কয়েক বছর পর ফিরে যাই আমি। দ্বিতীয়বার লীডার হিসেবে নয়, অফিশিয়াল ব্রিটিশ আর্মড ফোর্সেস এক্সপিডিশন-এর ফ্রেন্ডলি ফরেন মেম্বার হিসেবে। নদীটাকে বশ মানাতে আর্মি, নেভী আর এয়ারফোর্সের সাহায্য নিতে হয়েছিল।'

নিমার এই মুহূর্তের অনুভূতি সশ্রদ্ধ বিস্ময়। রানা আক্ষরিক অর্থেই অ্যাবেতে নৌকো বেয়েছে। এ যেন নিয়তিই ওর কাছে টেনে এনেছে রানাকে। হাসলান চাচা ঠিক কথাই বলে গেছেন। এই কাজের জন্যে সব দিক থেকে উপযুক্ত লোক রানা ছাড়া আর বোধহয় নেই কেউ। 'তাহলে গিরিখাদটার স্বভাব-চরিত্র ভালই জানেন আপনি। ভেরি গুড। এবার আপনাকে আমি সপ্তম স্ক্রোলে টাইটা যা বলে গেছে সে-সম্পর্কে একটা ধারণা দেব। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, স্ক্রোলের এই অংশের কিছুটা নষ্ট হয়ে গেছে, ফলে ফাঁকগুলো পূরণ করতে হয়েছে অনুমানের ওপর নির্ভর করে। আপনাকে বলতে হবে, আপনার জানার সঙ্গে বর্ণনাটুকু মেলে কিনা।'

'দেখা যাক।'

'বন্ধুর উতরাই বা ঢল সম্পর্কে আপনি যে বর্ণনা দিচ্ছেন, টাইটার বর্ণনার সঙ্গে সেটা মেলে—খাড়া একটা পাঁচিল, ওই পাঁচিল থেকেই বেরিয়ে এসেছে নদীটা। ওরা ওদের চ্যারিয়ট ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, ক্যানিয়নের খাড়া ও এবড়োখেবড়ো এলাকায় ওগুলো চলছিল না। ভারবাহী ঘোড়া নিয়ে হাঁটা শুরু করে ওরা। কিছুক্ষণের মধ্যে খাদটা এত গভীর আর বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, কয়েকটা ঘোড়া নিচে পড়ে যায়। ওই সময় প্রাচীন একটা ট্র্যাক অনুসরণ করছিল ওরা, পাহাড়ী ছাগলের আসা-যাওয়ায় তৈরি। ঘোড়াগুলো নদীতে পড়ে গেলেও, প্রিন্স মেমননের নির্দেশে সামনে এগোতে থাকে ওরা।'

'জায়গাটা আমি কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছি। সত্যি ভীতিকর।'

'এরপর টাইটা কয়েকটা বাধার কথা লিখেছে, তার ভাষায় সেগুলো "ধাপ"। আমি ও চাচা সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি ওগুলো আসলে কি। তবে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য অনুমান, ওগুলো আসলে জলপ্রপাত।'

'অ্যাবে গিরিখাদে জলপ্রপাতের কোন অভাব নেই,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল রানা।

'এই অংশটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। টাইটা বলছে, খাদের ভেতর দিয়ে বিশ দিন এগোবার পর তারা "দ্বিতীয় ধাপ"-এর সামনে পড়ল। এখানেই প্রিন্স মেমনন তার মৃত বাবার মেসেজ পায়, স্বপ্নের ভেতর—মামোস তাঁর ছেলেকে জানান, এই জায়গাতেই তাঁকে সমাহিত করা হোক। টাইটা বলছে, এরপর তারা আর এগোয়নি। আমরা যদি নিশ্চিতভাবে জানতে পারি কিসে তারা বাধা পেয়েছিল, তাহলে খাদের কতটা ভেতরে তারা ঢুকতে পেরেছিল তার একটা নিখুঁত হিসেব

বেরিয়ে আসবে।'

'ম্যাপ আর পাহাড়ের স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফ দরকার,' বলল রানা। 'আরও দরকার আমার এক্সপিডিশন নোট ও ডায়েরী।' রেফারেন্স লাইব্রেরী আপ-টু-ডেট করে রাখে ও, স্যাটেলাইট ফটো পেতে অসুবিধে হবে না। নোট আর ডায়েরী আছে ঢাকায়, ফ্যাক্সের মাধ্যমে যখন তখন আনিয়ে নিতে পারবে। 'আমার শ্রদ্ধেয় এক ভদ্রলোক, সামরিক বাহিনী থেকে অবসর নেয়া মেজর জেনারেল, তিনিও ইথিওপিয়ায় শিকার করতে গিয়েছিলেন। হয়তো তাঁর নোটও আমাদের কাজে লাগবে। ডেবরা মারকসের কাছে নীল নদ পেরিয়েছিলেন তিনি।' চেয়ার ছেড়ে আড়মোড়া ভাঙল রানা।

ঠোঁটে ক্ষীণ আড়ষ্ট হাসি নিয়ে নিমাও চেয়ার ছাড়ল, তারপর বলল, 'দুটো প্রশ্ন আমাকে বিরক্ত করছে। আপনার সম্পর্কে প্রায় কিছুই আমি জানি না। আপনি কি বা কে, এ-সব জানতে চাইলে অনধিকার চর্চা হয়ে যাবে?'

'না। আগেই জেনেছেন আমি আর্মিতে ছিলাম। বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের একজন অফিসার, ফরেন সার্ভিসে আছি, মিশন নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নটা কি?'

'আপনার সঙ্গে এখানে থাকছি, লোকে কি বলবে?'

'আপনি যে খানিকটা রক্ষণশীল, সেটা বুঝতে পেরে আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি স্বাতীকেও এখানে থাকতে বলেছি, সে আপনার পাশের কামরাতেই শোবে। আর লোকে কি বলল না বলল আমি গ্রাহ্য করি না।' নিমা কিছু বলছে না দেখে হাতঘড়ি দেখল রানা। 'একটু তাড়াতাড়ি, সাড়ে সাতটায় ডিনার। রাতে লম্বা একটা ঘুম দিন, কাল সকালে আপনার অনেক কাজ।'

সকালে ব্রেকফাস্ট শেষ করে নিমা বলল, 'মাকে একবার ফোন করতে হয়।'

'করা হয়েছে,' বলল রানা। 'রাতে ভাল ঘুম হয়েছে তাঁর। বলেছি আপনি তাঁকে সন্ধের দিকে দেখতে যাবেন।'

'সন্ধের দিকে?' নিমা অবাক হলো। 'এত দেরি করে কেন?'

'তার আগে পর্যন্ত আপনাকে আমি ব্যস্ত রাখতে চাই। আপনার কথায় এতগুলো টাকা আর সময় খরচ করব, জানতে হবে না কিসের পিছনে ছুটছি?' একটু থেমে কাজের কথা শুরু করল রানা। 'মরুভূমিতে আপনাদের ভিলায় প্রথম হামলাটা হলো। আততায়ীরা জানত কি চায় তারা, জানত কোথায় খুঁজতে হবে। বেশ। এবার দ্বিতীয় হামলার প্রসঙ্গে আসি। কায়রোয় আপনার গাড়ির ভেতর হ্যান্ড গ্রেনেড ছোঁড়া হলো। সেদিন বিকেলে আপনি মন্ত্রণালয়ে যাচ্ছেন, এ খবর কে জানত? মন্ত্রী ভদ্রলোক ছাড়া?'

'ঠিক মনে নেই। সম্ভবত হাসলান চাচার সেক্রেটারিকে বলেছিলাম, আর হয়তো বলেছিলাম রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টদের একজনকে।'

ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়ল রানা। 'তারমানে তো মিউজিয়ামের অর্ধেক স্টাফই আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা জানত। ঠিক আছে, এবার বলুন কে জানত আপনি মিশর ত্যাগ করছেন? কাকে বলেছেন ইংল্যান্ডে এসে আপনি আপনার

মায়ের কটেজে উঠবেন?'

'অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের একজন ক্লার্ক আমার পাইডগুলো এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেয়।'

'তাকে আপনি জানিয়েছিলেন কোন্ ফ্লাইট ধরবেন?'

'কেন জানাব!'

'কাউকেই জানাননি?'

'না...হ্যাঁ, ইন্টারভিউয়ের সময় শুধু মিনিস্টারকে বলেছিলাম, ছুটি চাওয়ার সময়। কিন্তু তিনি...না, অসম্ভব!' প্রতিবাদ করলেও নিমার চেহারায় আতঙ্ক ফুটে উঠল।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'দুনিয়াটা বড় বিচিত্র জায়গা, নিমা। ভাল কথা, আপনিও আমাকে শুধু রানা বলে ডাকবেন। আপনি আর হাসলান সপ্তম স্কোলের ওপর কাজ করছিলেন, এ বিষয়ে মিনিস্টার সবই জানতেন, তাই না?'

'বিশদ জানতেন না, তবে জানতেন আমরা কি নিয়ে ব্যস্ত।'

'ঠিক আছে, পরবর্তী প্রশ্ন—চা, না কফি?' নিমার কাপে কফি ঢালল রানা, তারপর আবার শুরু করল, 'আপনি বলেছেন সম্ভাব্য স্পনসরদের একটা তালিকা ছিল। সন্দেহভাজনদের সংখ্যা কমিয়ে আনার জন্যে ওটা কাজে লাগতে পারে।'

'বাফেন মিউজিয়াম,' বলল নিমা, শুনে হাসল রানা।

'তালিকা থেকে বাদ দিন ওটা। কায়রোর রাস্তায় গ্রেনেড ফাটিয়ে বেড়ানো ওদের কাজ নয়। তালিকায় আর কে ছিল?'

'হেস ডুগার্ড।'

'হ্যামবুর্গ। হেভী ইন্ডাস্ট্রি। মেটাল ও অ্যালয় রিফাইনারি। বেস মিনারেল প্রোডাকশন।' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তালিকার তৃতীয় লোকটা কে?'

'ফ্রেড ম্যাকমোহন,' বলল নিমা। 'টেক্সান।'

'আরেক বিলিওনেয়ার। ফোর্ট ওয়ার্থে বাস করেন। গোটা আমেরিকা জুড়ে ফাস্ট ফুডের ব্যবসা, কারখানায় দশ হাজার লোক খাটে। মেইল অর্ডার রিটেইল। কালেক্টর হিসেবে রাক্ষস বলা হয় তাঁকে। আর্কিওলজিক্যাল এক্সপ্লোরেশনে অঢেল টাকা খাটান।' পেশার খাতিরেই সারা দুনিয়ার বিলিওনেয়ারদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখতে হয় রানাকে। এদের মধ্যে যারা আর্টিফ্যাক্ট কালেক্টর তাদের ওপর বিশেষ নজর রাখতে হয়। সব মিলিয়ে সংখ্যায় দুই ডজনের বেশি হবে না। বিভিন্ন নিলাম অনুষ্ঠানে ঘুরে-ফিরে দেখা-সাক্ষাৎও হয়। দু'জনেই এঁরা চোখ বোজা ডাকাত। পছন্দ হয়ে গেলে এঁরা তাঁদের সন্তানকেও খেয়ে ফেলতে পারেন। এঁদের পথে আপনি যদি বাধা হন, কি করবেন এঁরা? বইটা ছাপা হবার পর দু'জনের কেউ হাসলানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন কিনা জানেন?'

'জানি না, করতেও পারেন।'

'ধরে নিতে হবে হাসলান কি করছিলেন ওঁরা তা জানতেন। সন্দেহের তালিকায় দু'জনই থাকছেন। এবার চলুন আমার স্টাডিতে যাই।'

রানার স্টাডিতে ঢুকে বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেলো নিমা। সন্দেহ নেই এত সব আয়োজন করতে হওয়ায় রাতে রানা ঘুমায়নি। কামরাটাকে মিলিটারি-টাইপ

হেডকোয়ার্টার বানিয়ে ফেলেছে ও। কামরার মাঝখানে বড় একটা ইজেল ও ব্ল্যাকবোর্ড দাঁড়িয়ে আছে, গায়ে একটার ওপর একটা পিন দিয়ে আটকানো স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফ। কাছাকাছি এসে সেগুলো দেখল নিমা, তারপর অন্যান্য জিনিসের দিকে তাকাল। প্রথমেই দৃষ্টি কেড়ে নিল একটা লার্জ-স্কেল ম্যাপ, স্যাটেলাইট ফটোগুলোর মত দক্ষিণ-পশ্চিম ইথিওপিয়ার একই এরিয়া কাভার করেছে। ম্যাপের পাশেই নাম-ঠিকানা, ইকুইপমেন্ট আর রসদের তালিকা–বোঝা গেল, এগুলো রানা ওর আগের আফ্রিকান অভিযানে ব্যবহার করেছে। দূরত্বের মাপজোক ও হিসাব সহ একটা শিটও দেখল নিমা। অপর একটা শিটে ধারণা দেয়া হয়েছে সম্ভাব্য খরচের, ওটাকে বাজেট শিট বলা যেতে পারে। ব্ল্যাকবোর্ডের মাথার দিকে শিরোনাম লেখা হয়েছে–'ইথিওপিয়া–জেনারেল-ইনফরমেশন'। নিচে গায়ে গায়ে সাঁটানো টাইপ করা পাঁচটা ফুলসক্যাপ শিট। পুরো শেডিউল পড়ল না নিমা, তবে রানার প্রস্তুতির বহর দেখে মুগ্ধ হলো।

হাতে স্টিক নিয়ে বোর্ডের পাশে দাঁড়াল রানা, ইঙ্গিতে সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলল নিমাকে। 'ক্লাসে শৃঙ্খলা থাকতে হবে।' বোর্ডে পয়েন্টারের বাড়ি মারল। 'আপনার প্রথম কাজ আমাকে বিশ্বাস করানো কয়েক হাজার বছর আগে মুছে যাওয়া টাইটার পায়ের ছাপ আবার আমরা অনুসরণ করতে পারব। আসুন সবচেয়ে আগে অ্যাবে গিরিখাদের জিয়োগ্রাফিকাল দিকগুলো বিবেচনা করি।'

পয়েন্টার দিয়ে স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফে নদীর কোর্স ব্যাখ্যা করল রানা। 'এই সেকশন ধরে নদীটা এগিয়েছে কালো আগ্নেয় শিলায় তৈরি মালভূমি ডুবিয়ে দিয়ে। পানি থেকে ওঠা পাহাড়-প্রাচীর কোথাও কোথাও একদম খাড়া, দু'দিকে চারশো থেকে পাঁচশো ফুট উঁচু। আরও কঠিন শিসট শিলার স্তর যেখানে, প্রবাহ সেখানে সুবিধে করতে পারেনি। কাজেই নদীর চলার পথে বিশাল আকারের বেশ কিছু ধাপ তৈরি হয়েছে। টাইটার "ধাপ" যে আসলে জলপ্রপাত, আপনাদের এই ধারণা সম্ভবত সত্যি।'

টেবিলের দিকে এগিয়ে এল রানা, কাগজের অনেকগুলো বান্ডিল পড়ে রয়েছে ওপরে, সেগুলোর ভেতর থেকে একটা ফটোগ্রাফ তুলে নিল। 'ব্রিটিশ আর্মড ফোর্সেস এক্সপিডিশনের সময় এই ছবিটা তুলি আমি। খাদের ভেতর জলপ্রপাতগুলো কি রকম, সে-সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারবেন।'

সাদা কালো ছবি, দু'পাশে আকাশ ছোঁয়া পাহাড়-প্রাচীর দেখা যাচ্ছে, নিচে অর্ধনগ্ন খুদে কিছু মূর্তি ও বোট, তাদের ওপর আকাশ থেকে নেমে আসছে বিপুল জলরাশি রোমহর্ষক একটা দৃশ্য। 'আমার কোন আইডিয়া ছিল না! এরকম দেখতে!' হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল নিমা।

'জায়গাটা কি রকম দুর্গম আর নির্জন, ছবি দেখে আপনি ধারণা করতে পারবেন না,' বলল রানা। 'একজন ফটোগ্রাফারের দৃষ্টিতে, ওখানে দাঁড়াবার এমন একটা জায়গা নেই যেখান থেকে খাদ বা জলপ্রপাতের সমস্ত বৈশিষ্ট্য ক্যামেরায় বন্দী করা যায়। তবে এটুকু অন্তত বুঝতে পারবেন যে উজানের দিকে পায়ে হেঁটে আসা মিশরীয় একদল অভিযাত্রীকে কিভাবে থামিয়ে দেবে ওই জলপ্রপাত।

সাধারণত জলপ্রপাতের পাশে কোন না কোন ধরনের পথ তৈরি হয়, হাতি বা অন্য কোন বন্য প্রাণী আসা-যাওয়া করায়। তবে, এ-ধরনের জলপ্রপাতকে পাশ কাটানোর মত কোন পথ বা উপায় থাকে না।'

মাথা ঝাঁকাল নিমা। 'আমরা তাহলে একমত হলাম একটা জলপ্রপাতই আরও সামনে এগোতে বাধা দেয় ওদেরকে—পশ্চিম দিক থেকে যেতে দ্বিতীয় জলপ্রপাতটা।'

স্যাটেলাইট ফটোয় নদীর কোর্স পয়েন্টার দিয়ে অনুসরণ করল রানা, সেন্ট্রাল সুদানের গাঢ় গোঁজ আকৃতির রোজিরেস ড্যাম থেকে। সীমান্তের ইথিওপিয়ান দিকটায় বন্ধুর উতরাই বা ঢাল আরও উঁচু হয়েছে, মূল গিরিখাদ শুরু হয়েছে ওখান থেকেই। 'ওদিকে কোন রাস্তা বা শহর নেই, বহুদূর উজানের দিকে শুধু দুটো ব্রিজ আছে। পাঁচশো মাইলের মধ্যে কিছুই নেই, আছে শুধু নীল নদের খরস্রোত প্রবাহ আর ভয়ালদর্শন কালো ব্যাসল্ট শিলা। খাদের গভীরে প্রধান জলপ্রপাতগুলো স্যাটেলাইট ফটোয় চিহ্নিত করে রেখেছি আমি।' পয়েন্টার তুলে সেগুলো দেখাল রানা, লাল মার্কার পেন দিয়ে তৈরি বৃত্তের ভেতর প্রতিটি।

নিমা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে ও দেখছে।

'এখানে দ্বিতীয় জলপ্রপাত, সুদানিজ বর্ডার থেকে একশো বিশ মাইল উজানে। তবে আমাদেরকে আরও অনেক ফ্যাক্টর বিবেচনায় রাখতে হবে। যেমন, টাইটা ওদিকে গেছে আজ থেকে চার হাজার বছর আগে, ইতিমধ্যে নদী তার কোর্স বদলে থাকতে পারে।'

'কিন্তু ক্যানিয়নটা চার হাজার ফুট গভীর, ওটার ভেতর থেকে নদী পালাবে কি করে?' নিমার প্রশ্নের মধ্যে প্রতিবাদের সুর। 'নীল নদ যতই বেয়াড়া হোক।'

'ঠিক, কিন্তু নদীর তলা যে বদলেছে এটা নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায়। বন্যার মরশুমে প্রবাহের বিপুলতা ও শক্তি ব্যাখ্যা করা যায়, এমন ভাষার ওপর আমার দখল নেই। সাইড ওয়ালের বিশ মিটার পর্যন্ত ফুলে ওঠে নদী, ছোটে ঘণ্টায় দশ নট গতিতে।'

'নদীর ওই ভরা মাসে আপনি দাঁড় টেনেছেন?' নিমার গলায় সন্দেহ।

'আরে না, বন্যার মরশুমে না। ওই সময় কিছুই ওখানে টিকবে না।'

ছবিটার দিকে এক মিনিট চুপচাপ তাকিয়ে থাকল ওরা, সমস্ত আক্রোশ নিয়ে ফুলে-ফেঁপে থাকা বিপুল জলরাশির আস্ফালন কল্পনা করতে গিয়ে আতঙ্ক অনুভব করছে।

তারপর রানাকে মনে করিয়ে দিল নিমা, 'দ্বিতীয় জলপ্রপাত।'

'সেটা এখানে, উপনদীগুলোর একটা যেখানে অ্যাবের মূল প্রবাহে এসে মিলিত হয়েছে। ওটার নাম ডানডেরা নদী, বারোশো ফুট অলটিচ্যুড পর্যন্ত উঠে এসেছে, চোক রেঞ্জের সানসাই পাহাড় চূড়ার নিচে, গিরিখাদের একশো মাইল উত্তরে।'

'আপনার মনে আছে, ঠিক কোন স্পটে ওটা অ্যাবের প্রবাহে মিলিত হয়েছে?'

'সে অনেক বছর আগের কথা। তাছাড়া, ওই খাদের তলায় প্রায় এক মাস ছিলাম তো, অসংখ্য দুঃস্বপ্নের মধ্যে নির্দিষ্ট একটাকে স্মরণ করা মুশকিল।

মাইলের পর মাইল একঘেয়ে পাহাড়-প্রাচীর আর দেয়ালের ঘন জঙ্গল স্মৃতিগুলোকে ঝাপসা করে দিয়েছে। প্রচণ্ড গরম আর পোকামাকড়ের অত্যাচারে আমাদের অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। বিরতিহীন বৈঠা চালাবার কথা মনে আছে, আর কানে এখনও লেগে আছে পানির অন্তহীন গর্জন। তবে অ্যাবে আর ডানডেরার মিলিত হবার জায়গাটা দুটো কারণে মনে আছে আমার।'

'ইয়েস?' ব্যগ্র ভঙ্গিতে সামনের দিকে ঝুঁকল নিমা, কিন্তু রানা মাথা নাড়ল।

'ওখানে আমরা একজনকে হারাই। দ্বিতীয় অভিযানের একমাত্র বলি। রশি ছিঁড়ে যায়, একশো ফুট নিচে পড়ে যায় বেচারা। পাথরের একটা স্তূপের ওপর পিঠ দিয়ে পড়ে।'

'দুঃখিত। আর কি কারণ?'

'ওখানে কপটিক ক্রিশ্চান সন্ন্যাসীদের একটা মঠ আছে, পাথরের অবয়বে তৈরি, নদীর সারফেস থেকে চারশো ফুট ওপরে।'

'গিরিখাদের ওই গভীরে?' অবিশ্বাসে ভুরু কোঁচকাল নিমা। 'ওখানে তারা মঠ বানাতে গেল কেন?'

'ইথিওপিয়া সবচেয়ে পুরানো ক্রিশ্চান দেশগুলোর মধ্যে একটা। দেশটায় নয় হাজারেরও বেশি চার্চ আর মঠ আছে। দুর্গম পাহাড়ে, পৌঁছুনো যায় না, এমন মঠের সংখ্যা অনেক। ডানডেরা নদীর ওপর এই মঠটা সেন্ট ফ্রুমেনটিয়াস-এর সমাধি ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত।'

'আপনি ওই মঠে গেছেন?'

'অস্তিত্ব রক্ষায় ব্যস্ত ছিলাম, যাই কি করে! মঠ বলতে নদী থেকে আমরা শুধু দেখতে পেয়েছি পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে পাথর কাটা গহ্বর, আলখেল্লা পরা সন্ন্যাসীরা সারি সারি গুহার মুখে বসে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে আমাদের আত্মহত্যা করার প্রচেষ্টা লক্ষ করছিলেন। আমাদের কেউ কেউ শুভেচ্ছা জানিয়ে হাতও নাড়েন, কিন্তু পাল্টা সাড়া না পেয়ে অভিমান করেন।'

'কিন্তু নদীর যে ভয়ঙ্কর ছবি দিচ্ছেন, ওই স্পটে আমরা পৌঁছুব কিভাবে?'

'এরই মধ্যে হতাশ?' হাসল রানা। 'দাঁড়ান, আগে ওখানকার মশককুলের সঙ্গে পরিচিত হোন। ওরা আপনাকে তুলে নেবে, উড়িয়ে নিয়ে যাবে নিজেদের আস্তানায়, তারপর সমস্ত রক্ত শুষে ছিবড়ে বানিয়ে ফেলবে।'

'প্লিজ, সিরিয়াস হোন। সত্যি, ওখানে যাব কিভাবে?'

'সন্ন্যাসীদের খাবার যোগান দেয় গ্রামবাসীরা, ওরা বাস করে গিরিখাদের ওপর হাইল্যান্ডে। পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে বুনো ছাগলের তৈরি ট্র্যাক আছে। ওদের কাছ থেকে জেনেছি, গিরিখাদের কিনারা থেকে ওই ট্র্যাক ধরে ওখানে নামতে তিন দিন লাগে।'

'পথ চিনে আপনি নামতে পারবেন?'

'না, তবে এ বিষয়ে মাথায় কয়েকটা আইডিয়া আছে, পরে আলোচনা করা যাবে। তার আগে প্রথম প্রশ্ন, চার হাজার বছর পর ওখানে পৌঁছে ঠিক কি পাবার আশা করব আমরা।' রানার চোখে প্রত্যাশা। 'এবার আপনার পালা। কনভিন্স মি।' রূপোর মাথা মোড়া পয়েন্টারটা নিমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে পাশের চেয়ারটায়

বসে পড়ল ও, ভাঁজ করা হাত বাঁধল বুকে।

'প্রথমে আপনাকে বইটার কাছে ফিরে আসতে হবে,' পয়েন্টার রেখে দিয়ে রিভার গড তুলে নিল নিমা। 'গল্পের টানাস চরিত্রটির কথা আপনার মনে আছে?'

'রানী লসট্রিসের অধীনে মিশরীয় আর্মির কমান্ডার ছিলেন, টাইটেল ছিল গ্রেট লায়ন অভ ঈজিপ্ট। হিকসস তাড়া করায় লসট্রিস বাহিনীকে তিনিই নেতৃত্ব দিয়ে মিশর থেকে সরিয়ে নিয়ে যান।'

'টানাস সেই সঙ্গে রানীর গোপন প্রেমিকও ছিলেন। এবং, আপনি যদি টাইটার বক্তব্য বিশ্বাস করেন; রানীর বড় ছেলে প্রিন্স মেমননের পিতাও বটেন।'

'আরকাউন নামে এক ইথিওপিয়ান চীফকে শায়েস্তা করতে গিয়ে দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় মারা যান টানাস, তাঁর মমি করা লাশ রানীর কাছে ফিরিয়ে আনে টাইটা,' গল্পের আরও খানিক অংশ স্মরণ করল রানা।

'এ থেকে আরেকটা সূত্রে চলে আসা যায়, চাচা আর আমি বহু কষ্টে উদ্ধার করেছি।'

'সপ্তম স্ক্রোল থেকে?' বুক থেকে হাত নামিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকল রানা।

'না, কোন স্ক্রোল থেকে নয়, রানী লসট্রিসের সমাধিতে পাওয়া দেয়াল লিপি থেকে।' ব্যাগ থেকে একটা ফটোগ্রাফ বের করল নিমা। 'এটা সমাধিকক্ষে পাওয়া মিউরাল-এর আংশিক ছবি, এনলার্জ করা। দেয়ালের ওই অংশ পরে ভেঙে পড়ে, হারিয়ে যায় চিরকালের জন্যে। জারগুলো তখনই পাই আমরা। চাচা ও আমার বিশ্বাস, টাইটা এই লিপি সম্মানজনক জায়গায় রেখেছিল, এবং এটার বিশেষ তাৎপর্য আছে। সম্মানজনক জায়গা বলছি এই জন্যে যে, স্ক্রোল যেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল তার ঠিক ওপরেই ছিল এই লিপি।'

ছবিটা নিয়ে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করল রানা।

হায়ারাগ্লিফিক নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে রানা, নিমা বলে যাচ্ছে, 'বইটা থেকে আপনি জেনেছেন, হেঁয়ালি করতে ভালবাসত টাইটা, শব্দ নিয়ে কৌতুক করতে বা খেলতে পছন্দ করত। বহু জায়গায় নিজের বুদ্ধির তারিফ করেছে সে। বলেছে, সেই শ্রেষ্ঠ বাও খেলোয়াড়।'

চোখ থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস সরিয়ে রানা বলল, 'হ্যাঁ। বাও সম্ভবত দাবারই প্রাচীন সংস্করণ। মিশর ও আফ্রিকার দক্ষিণ থেকে পাওয়া কিছু বোর্ডও আমি দেখেছি।'

'বাও খেলা হয় রঙিন পাথর দিয়ে, প্রতিটি পাথরের আলাদা পদমর্যাদা। সে যাই হোক, আমরা জানি ধাঁধা তৈরি করার নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে উত্তর-পুরুষকে জানাবার একটা ঝোঁক ছিল টাইটার মধ্যে। নিজেকে বুদ্ধিমান বলে দাবি করার ভঙ্গিটায় কিন্তু গর্বের ভাব নেই, বরং যেন সতর্ক করে দেয়ার চেষ্টা। তার প্রমাণ, ফারাও-এর সমাধিতে ইচ্ছে করেই অনেক সূত্র রেখে গেছে সে শুধু স্ক্রোলে নয়, মিউরালেও। টাইটা আমাদের বলছে, সে তার প্রিয় রানীর সমাধিতে দেয়ালচিত্রগুলো নিজের হাতে এঁকেছে বা রঙ চড়িয়েছে।'

'এটা ওই সূত্রগুলোর একটা বলে আপনার ধারণা?' ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে ফটোটার ওপর টোকা দিল রানা।

'পড়ুন না,' বলল নিমা। 'আমি তো বলি ক্ল্যাসিকাল হায়ারাগ্লিফিকস–তার দুর্বোধ্য কোডের তুলনায় কঠিন নয়।'

'আমি পড়ব? আমি হায়ারাগ্লিফিকের অর্থ করতে জানি?'

'ইস, জানি না বললেই শুনব নাকি! চাচা মিথ্যে কথা বলার লোক ছিলেন না!'

থেমে থেমে অনুবাদ করছে রানা, "রাজপুত্রের জনক, যিনি কিনা জনক নন–নীল দাতা, যে নীল তাঁকে খুন করেছে–হাপির সঙ্গে হাতে হাত ধরে অনন্ত কাল পাহারা দিচ্ছেন পাথুরে শেষ ইচ্ছাপত্র, যে ইচ্ছাপত্রে আভাস দেয়া হয়েছে রাজপুত্রের জনককে কোথায় রাখা হয়েছে, যিনি কিনা জনক নন, রক্ত এবং ছাই দাতা।" মাথা নাড়ল রানা, 'না, কোন অর্থ পাওয়া যাচ্ছে না। আমি বোধহয় অনুবাদে ভুল করছি।'

'হতাশ হবেন না। এই তো সবে টাইটার সংস্পর্শে এলেন। এটা নিয়ে আমরা কয়েক হপ্তা মাথা ঘামিয়েছি। ধাঁধাটা ধরতে হলে রিভার গডে ফিরে যেতে হবে। মানে ট্যানাস প্রিন্স মেমননের জনক নন, তবে রানীর প্রেমিক হিসেবে তার বায়োলজিক্যাল ফাদার। মৃত্যুশয্যায় তিনি মেমননকে নীল তলোয়ার উপহার দিয়েছিলেন, এই নীল তলোয়ারের আঘাতেই তিনি গুরুতর জখম হন, আরকাউনকে শায়েস্তা করতে গিয়ে, আরকাউনের দ্বারাই। বইটায় যুদ্ধের বিশদ বর্ণনা আছে।'

'হ্যাঁ, বইটা পড়ার সময় আমি ভেবেছিলাম নীল তলোয়ারটা নিশ্চয়ই ওই ব্রোঞ্জ যুগে একটা বিস্ময়কর বস্তু ছিল। কাজেই রাজপুত্রকে দেয়ার মত একটা উপহার হতেই পারে। তাহলে, "রাজপুত্রের জনক, যিনি কিনা জনক নন" আসলে ট্যানাস?' বড় একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল রানা। 'আপাতত আপনার করা অর্থ আমি মেনে নিলাম।'

'ধন্যবাদ। ফারাও মামোস নামেমাত্র মেমননের জনক ছিলেন, রক্তসম্পর্কিত বাবা নন। এখানেও আবার বলা হচ্ছে, রাজপুত্রের জনক, যিনি কিনা জনক নন মামোস প্রিন্সকে ইজিপ্টের ডাবল ক্রাউন দান করে যান, আপার অ্যান্ড লোয়ার কিংডম–রক্ত ও ছাই।'

'এটুকু হজম করতে তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। বাকিটুকু?'

'এবার আসুন, হাতে হাতে ধরে। প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় এর অর্থ হতে পারে, কাছাকাছি, অথবা দৃষ্টিসীমার ভেতর। হাপি হলেন নীল নদের উভলিঙ্গ দেবতা বা দেবী, তিনি কখন কি জেন্ডার গ্রহণ করবেন তার ওপর নির্ভর করে। স্ক্রোলের [illegible] জায়গায় নদীটার বিকল্প নাম হিসেবে হাপিকে ব্যবহার করেছে টাইটা।'

'তাহলে সপ্তম স্ক্রোল আর রানীর সমাধিতে পাওয়া দেয়াললিপি এক করে পুরো বক্তব্যটা কি দাঁড়াচ্ছে?' জানতে চাইল রানা।

'সংক্ষেপে এই–দ্বিতীয় জলপ্রপাতের কাছাকাছি কোথাও অথবা দৃষ্টিসীমার ভেতর কোথাও ট্যানাসকে কবর দেয়া হয়েছে। তাঁর সমাধির বাইরে বা ভেতরে কোথাও একটা মনুমেন্ট অথবা লিপি আছে, যাতে মামোসের সমাধিতে যাবার পথনির্দেশ পাওয়া যাবে।'

দাঁতের ফাঁক দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। 'লাফ দিয়ে শূন্য থেকে অর্থ [illegible]

নিচ্ছি, ফলে আমি ক্লান্ত। আমার জন্যে আর কি সূত্র রেখেছেন আপনি?'

'আর কোন সূত্র নেই।'

'কি বলছেন! আর কোন সূত্র নেই মানে?' রানা হতভম্ব।

'সত্যি নেই।'

'আসুন ধরা যাক, নদীটা চার হাজার বছর পরও আকৃতি ও নকশায় একই রকম আছে। আরও ধরা যাক, টাইটা আসলেও ডানডেরা নদীর দ্বিতীয় জলপ্রপাতের দিকটা নির্দেশ করছেন। ওখানে পৌঁছে তাহলে আমরা ঠিক কি খুঁজব? যদি শিলা-লিপি থাকে, তা কি অটুট অবস্থায় পাব? নাকি স্রোত আর রোদ-বৃষ্টির অত্যাচারে ক্ষয়ে গেছে সব?'

নিমা বলল, 'হাওয়ার্ড কার্টারের কাছেও এরকম অস্পষ্ট ও দুর্বল একটা সূত্র ছিল। মাত্র এক টুকরো প্যাপাইরাস, তা-ও সেটার অথেনটিসিটি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। অথচ ওই সূত্রই আমাদেরকে তুতানখামেনের সমাধিতে পৌঁছে দিয়েছে।'

'হাওয়ার্ড কার্টারকে শুধু ভ্যালি অভ দ্য কিংস সার্চ করতে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও দশ বছর লেগে যায় তাঁর। আর আপনি আমাকে ইথিওপিয়া দিচ্ছেন, আকারে ফ্রান্সের দ্বিগুণ। কতদিন লাগবে আমাদের, ধারণা করতে পারেন?'

চেয়ার ছেড়ে আড়মোড়া ভাঙল নিমা। 'এত বাড়ান কেন? গোটা ইথিওপিয়া নয়, আপনাকে আমি শুধু একটা গিরিপথ দিচ্ছি। ভাল কথা, কবে রওনা হব ঠিক করেছেন?'

চিন্তা করছে রানা। কাল রাতেই বিসিআই হেডকোয়ার্টার চাকার ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়েছে ও। রাহাত খানের সঙ্গে প্রাথমিক আলাপটাও সেরে ফেলেছে, আশা করা যায় আজকালের মধ্যেই মঞ্জুর করা হবে ছুটি। 'ঠিক আছে, নাসিমের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখা যাক,' বলে হাত বাড়াল ফোনের দিকে।

নাসিম ওর এক বন্ধুর স্ত্রী, স্বামী মারা যাবার পর নিজেই একটা প্লেন কিনে চার্টার সার্ভিস চালাচ্ছে। ইদানীং সাইড ব্যবসা হিসেবে সাফারির আয়োজনও করে সে।

ওভাল সাফারির কায়রো অফিসে নাসিমকে পাওয়া গেল না, দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় আমস্টারডামের অফিসে পাওয়া গেল। রানার গলা চিনতে পেরেই অভিমান উথলে উঠল তার, অভিযোগ করল, 'রানা, তুমি তো দেখছি আমাদের কথা একদম ভুলেই গেছ!'

'কেমন আছ তুমি? ভুলে গেলে ফোন করতাম?'

'ভাল আছি, রানা। আশা করি তুমিও ভাল আছ। জানি কোনও কাজের কথা বলবে।'

'ঠিক ধরেছ,' বলল রানা, তারপর অনুরোধটা জানাল।

'ইথিওপিয়ায়?' জিজ্ঞেস করল নাসিম, গলার আওয়াজ একটু ম্লান শোনাল 'কবে যেতে চাও?'

'এই ধরো আগামী হপ্তায়।'

'ঠাট্টা করছ নাকি? ওখানে আমরা মাত্র একজন হান্টার গাইডকে দিয়ে কাজ

করাই, দু'বছরের জন্যে বুক হয়ে আছে সে।'

'আর কেউ নেই? বর্ষা শুরু হবার আগেই ঢুকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাকে'।'

'শিকার কি হবে?'

'ঢাকা মিউজিয়ামের জন্যে এটা হবে আমাদের ক্যালেকটিং ট্রিপ, অ্যাবে-নদীপথে,' এরবেশি আর কিছু বলতে প্রস্তুত নয় রানা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল নাসিম। 'আগেই বলে রাখছি, এতে আমাদের সায় নেই। এত অল্প সময়ের নোটিশে মাত্র একজন গাইডকে তুমি পেতে পারো, তবে আমি জানি না নীল নদে তার কোন ক্যাম্প আছে কিনা। লোকটা রাশিয়ান, তার বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযোগও শোনা গেছে। কেউ কেউ বলে স্যাবেক কেজিবি-র লোক, মেনজিসটুর পাণ্ডাদের একজন।'

মেনজিসটুকে 'কালো স্টালিন' বলা হয়, উৎখাত করার পর বুড়ো সম্রাট হাইলে সেলাসিকে হত্যা করেন। ষোলো বছর মার্ক্সিস্ট শাসনে ইথিওপিয়াকে নতজানু অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর স্পনসর ছিল সোভিয়েত রাশিয়া, ওখানে কমিউনিজমের পতন ঘটার পর মেনজিসটুকে উৎখাত করা হয়, দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান তিনি। 'আমার খুব ঠেকা, যে-কোন একজন গাইড হলেই চলে। কথা দিচ্ছি, পরে অভিযোগ করব না।'

'ঠিক আছে, তবে মনে থাকে যেন।' রানাকে আদ্দিস আবাবার একটা ফোন নম্বর দিল নাসিম।

আবার ডায়াল ঘোরাল রানা। আদ্দিসের লাইন পাওয়া এত সহজ হবে ভাবেনি রানা, একবার ডায়াল করতেই অপরপ্রান্ত থেকে ইথিওপিয়ান বাচনভঙ্গিতে মিষ্টি একটা নারীকণ্ঠ সাড়া দিল। রানা ভ্লাদিমির উস্তাডকে চাইতেই মেয়েটা ভাষা বদলে ইংরেজিতে কথা বলল।

'বর্তমানে তিনি সাফারিতে আছেন,' বলল সে। 'আমি তাঁর স্ত্রী, শেফতা রুবি।' রানা জানে, ইথিওপিয়ার মেয়েরা স্বামীর নাম উচ্চারণ করে না। 'আপনি যদি সাফারি সম্পর্কে কিছু জানতে চান, আমি জবাব দিতে পারব।'

হাসপাতালের বাইরে থেকে নিমাকে রেঞ্জ রোভারে তুলে নিল রানা। 'কেমন আছেন সাবরিনা?' জানতে চাইল ও।

'পায়ের অবস্থা ভাল, কিন্তু ম্যাডের জন্যে এখনও খুব কাতর।'

'ওরকম একটা ছানা কালই কিনে দিন।' তারপর রানা জিজ্ঞেস করল, আমরা যদি আফ্রিকায় যাই, মায়ের কাছ থেকে আপনি বিদায় নিতে পারবেন?'

হেসে ফেলল নিমা। 'বলতে পারেন বিদায় আমি নিয়েই রেখেছি। বান্ধবীরা আছেন, মামির কোন অসুবিধে হবে না।' সীটে একটু ঘুরে বসে রানার দিকে সরাসরি তাকাল নিমা। 'সারাদিন কোথায় ছিলেন? আপনার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটেছে।'

'আগে ফ্ল্যাটে ফিরি, তারপর বলব।'

ফ্ল্যাটে ফিরে সরাসরি স্টাডিতে চলে এল রানা। দেরাজ থেকে একটা ফ্যাক্স

কপি বের করে ধরিয়ে দিল নিমার হাতে। 'শিটটায় একটা ছোট্ট প্রাণীর ছবি রয়েছে। এটাকে বলা হয় থান'স ডিক-ডিক, ডোরাকাটা ডিক-ডিক হিসেবে পরিচিত।'

প্রাণীটির তেমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই, আকারে বড় একটা খরগোশের মত। কাঁধ আর পিঠের ব্রাউন চামড়ার ওপর চকলেট রঙের ডোরা, নাকটা এত লম্বা যে শুঁড় বলে মনে হয়। রানার চেহারায় গর্বের ভাব দেখে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকল নিমা, শুধু বলল, 'এটার কি বিশেষ কোন তাৎপর্য আছে?'

'তাৎপর্য নেই মানে? এই প্রজাতির এটাই সম্ভবত শেষ নমুনা। এতই দুর্লভ, জুলজিস্টরা সন্দেহ করে এটা একটা কাল্পনিক প্রাণী, কোন কালেই অস্তিত্ব ছিল না। ছবি দেখে তারা কি বলেছিল, জানেন? সাধারণ একটা ডিক-ডিকের কাঠামোয় বেজির চামড়া পরানো হয়েছে। এরচেয়ে জঘন্য অভিযোগ কখনও শুনেছেন?'

'আমি হতভম্ব, এরকম অন্যায় কেউ করতে পারে!' হেসে উঠল নিমা।

'ঠাট্টা নয়,' বলল রানা। 'দাঁড়ান, ডায়েরীর অংশটুকু পড়ে শোনাই আপনাকে।' দেরাজ খুলে আরও একটা ফ্যাক্স শিট বের করল রানা। 'তার আগে বলে রাখি, বহু বছর আগে এই বিরল প্রজাতির ডিক-ডিক যিনি শিকার করেছিলেন তিনি আমার পরম শ্রদ্ধেয় বস্—নামটা না-ই জানলেন। ডিক-ডিকটা তাঁর ব্যক্তিগত আবিষ্কার ও কালেকশন, ডায়ারামা করে শো কেসে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আমার অনুরোধে ঢাকা থেকে এটা পাঠিয়েছেন, তাঁর ডায়েরীর একটা অংশ সহ। পড়ছি...'

> "২ ফেব্রুয়ারি, ১৯—। অ্যাবে নদীর ক্যাম্প থেকে। আজ সারাদিন বিশাল দুটো হাতিকে ধাওয়া করি, কিন্তু নাগালের মধ্যে পেলাম না। সাংঘাতিক গরম। হাল ছেড়ে দিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এলাম। ফেরার পথে দেখি ছোট একটা হরিণ নদীর তীরে ঘাস খাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল তুলে ফেলে দিলাম ওটাকে। তারপর কাছ থেকে পরীক্ষা করে দেখি, এটা আসলে জীনাস মাডুকা-র সদস্য। এই প্রজাতিটা আগে কখনও দেখিনি আমি। সাধারণ ডিক-ডিকের চেয়ে আকারে এটা বড়, গায়ে ডোরা আছে। এটা সম্ভবত নতুন একটা আবিষ্কার।"

কাগজটা থেকে মুখ তুলল রানা। 'অ্যাবে গিরিখাদে যেতে হলে আমাদের একটা অজুহাত দরকার, ডিক-ডিক সেটা এনে দিচ্ছে।'

'হ্যাঁ, আমিও এই বিষয়টা নিয়ে ভাবছিলাম। ইথিওপিয়া সরকার অনুমতি দেবে তো?'

'আমাদের উদ্দেশ্য জানতে পারলে অবশ্যই দেবে না,' বলল রানা। 'সেজন্যেই তো ডিক-ডিককে ব্যবহার করব আমরা। অনুমতি নিয়ে বহু সাফারি কোম্পানী ইথিওপিয়ায় অপারেশন চালাচ্ছে। প্রয়োজনীয় পারমিট, সরকারের নো অবজেকশন সার্টিফিকেট, যানবাহন, ক্যাম্পিং ইকুইপমেন্ট, আইনগত পরামর্শ ইত্যাদি সবই তাদের আছে। এই অভিযানের প্ল্যান ও আয়োজন যদি আমরা করি,

কয়েক মাস সময় লেগে যাবে। সাফারি কোম্পানীর সীল-ছাপ্পড় ছাড়া গেলে লোকাল জঙ্গী গ্রুপগুলোও হুমকি হয়ে দেখা দেবে।'

'তাহলে ডিক-ডিক শিকারী হিসেবে যাব আমরা, যাব একটা সাফারি কোম্পানীর অধীনে?'

'একজন সাফারি অপারেটরের সঙ্গে আদ্দিস আবাবায় এরইমধ্যে যোগাযোগ করেছি আমি, অন্তত প্রথম পর্যায়ে আমরা তার সাহায্য নেব,' বলল রানা। 'প্রয়োজনীয় সূত্র হাতে এলে দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবে, তখন আমরা নিজেদের লোকজন আর ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করব। তৃতীয় পর্যায়টা হবে ইথিওপিয়া থেকে লুঠের মাল বের করে আনা। অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, কাজটা সহজ হবে না।'

'সত্যিই তো, বের করব...'

'জিজ্ঞেস করবেন না, কারণ এই মুহূর্তে জবাব দিতে পারব না।'

'কবে রওনা হচ্ছি আমরা?'

'তার আগে আরেকটা প্রসঙ্গ। টাইটার ধাঁধার যে অর্থ আপনারা বের করেছেন, ভিলা থেকে চুরি যাওয়া আপনার নোটে সেটা লেখা ছিল?'

'হ্যাঁ, ছিল। সব কিছুই হয় নোটে নয়তো মাইক্রোফিল্মে ছিল। দুঃখিত।'

'তারমানে আমরা যা জানি প্রতিপক্ষও তাই জানে।'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আমার সিদ্ধান্ত ঠিক আছে,' বলল রানা। 'অ্যাবে গিরিখাদে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে চাই আমি, প্রতিপক্ষ পৌঁছুবার আগেই। ওরা আপনার ধারণা ও উপসংহার চুরি করেছে প্রায় এক মাস হয়ে এল। কে জানে, হয়তো এরইমধ্যে রওনা হয়ে গেছে।'

'কবে?' আবার জিজ্ঞেস করল নিমা।

'নাইরোবি হয়ে আদ্দিস আবাবায় যাচ্ছি, শনিবারে। প্লেনের টিকিট কাটা হয়ে গেছে। হাতে মাত্র দু'দিন সময়, ব্যক্তিগত প্রস্তুতি এর মধ্যেই শেষ করতে হবে আপনাকে। ইয়েলো ফিভার আর হেপাটাইটিস ইঞ্জেকশন নেয়া আছে?'

'আছে।'

'গুড। কায়রো থেকে সবেমাত্র এসেছেন, কাজেই আপনার পাসপোর্ট ঠিক আছে। ইথিওপিয়ার ভিসা লাগবে আমাদের, তবে জানাশোনা লোক আছে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পেয়ে যাব। আর কিছু?'

খপ করে রানার হাতটা ধরে ফেলল নিমা। পরমুহূর্তে মনে মনে জিভ কেটে ছেড়ে দিল। 'সত্যি আমরা যাচ্ছি, তাই না? ওহ্ গড, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না!'

নিমার আনন্দ ও উত্তেজনায় বাদ সাধার কোন ইচ্ছে নেই রানার, তবে রওনা হবার আগে শেষ আরেকটা প্রসঙ্গ না তুললেও নয়। 'নিমা,' বলল ও, 'কেন আমরা ওখানে যাচ্ছি সে-সম্পর্কে আপনার পরিষ্কার একটা ধারণা থাকা দরকার। কিসের মধ্যে জড়াতে যাচ্ছেন তা-ও আপনার জানা উচিত।'

'কিসের মধ্যে জড়াতে যাচ্ছি?'

'যদি ভেবে থাকেন,' বলল রানা, 'আর্টিফ্যাক্টের লোভে যাচ্ছি আমি, ভুল হবে। হাসলানকে আমি চিনতাম, তাঁর মত সৎ ও ভালমানুষ আমি খুব কম

fb.com/groups/BoiLoversPolapain

দেখেছি। তাঁকে কিভাবে খুন করা হয়েছে শোনার পর আমি সিদ্ধান্ত নিই, সুযোগ পেলে অবশ্যই প্রতিশোধ নেব। আপনার সঙ্গে আবে গিরিখাদে যেতে চাওয়ার সেটাই প্রধান কারণ।'

'ধন্যবাদ,' ম্লান সুরে বলল নিমা। 'আমি কৃতজ্ঞ।'

'দ্বিতীয় কারণটা আপনি জানেন, অ্যাডভেঞ্চার–তার সঙ্গে ব্যবসাও। এবার ঝুঁকির প্রসঙ্গে আসি। ওখানে প্রকৃতি স্বয়ং একটা হুমকি, তবে সেটার কথা বাদ দিচ্ছি এই জন্যে যে জেনেশুনেই ঝুঁকিটা নেব আমরা। কিন্তু ওখানে আরও যে-সব বিপদ আছে, সেগুলো সম্পর্কে ভেবেছেন আপনি?'

'কি ধরনের বিপদ?'

'গেরিলারা কয়েক গ্রুপে ভাগ হয়ে ওখানে যুদ্ধ করছে, কখনও নিজেদের মধ্যে, কখনও সরকারী বাহিনীর সঙ্গে। বিদেশী লোকজনকে একদমই সহ্য করতে পারে না ওরা, বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গদের। তার ওপর আপনি একটা মেয়ে।'

চেহারা দেখে বোঝা গেল নিমার ভয় লাগছে। জোর করে হাসল, বলল, 'হাসলান চাচা আপনার ওপর আস্থা রাখতে বলে গেছেন।'

'আরেকটা বিপদ, এটাই আসল বিপদ,' বলল রানা, 'প্রতিপক্ষরা। ওরা যে কতটুকু মরিয়া, হাসলান আর আপনার ওপর হামলার ধরন দেখেই বোঝা যায়। এরকম হামলা একের পর এক আসতেই থাকবে। আমি বলতে চাইছি, নিমা, এখনও সময় আছে, অভিযান বাতিল করে দিতে পারেন।'

'প্রশ্নই ওঠে না!' প্রতিবাদ করল নিমা। 'যত বিপদই থাকুক, আমি যাব।' রানার চোখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজল ও। তারপর ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'বিপদে আপনি আমাকে রক্ষা করবেন না?'

'প্রাণ থাকতে আপনার কোন ক্ষতি হতে দেব না,' আশ্বস্ত করল রানা। 'কিন্তু তবু ভেবে দেখুন...'

'না। এর মধ্যে ভাবনার আর কিছু নেই।'

চার

শনিবার সকালে হিথরোর চার নম্বর টার্মিন্যালে পৌঁছে লাগেজগুলো পরীক্ষা করল রানা। নিমার কাঁধে একটা স্লিং ব্যাগ, আর নিয়েছে নরম একটা ক্যানভাস ব্যাগ। রানার হান্টিং রাইফেলটা লেদারে মোড়া, আলাদা একটা প্যাকেটে রয়েছে একশো রাউন্ড অ্যামুনিশন। ওর সঙ্গে আর শুধু একটা লেদার ব্রীফকেস রয়েছে। মাথায় পানামা হ্যাট, চেক-ইন কাউন্টারে থেমে বসে থাকা মেয়েটার উদ্দেশে মুচকি হাসল।

প্লেন ছাড়ার পর নিমার অনুরোধে দাবার ঘুঁটি সাজাল রানা, বোর্ডটা খোলা হয়েছে দুই সীটের মাঝখানের আর্ম-রেস্টে। কেনিয়ার জোমো কেনিয়াত্তা

এয়ারপোর্টে যখন প্লেন নামছে, তৃতীয় গেমটা তখনও শেষ হয়নি। দু'জনেই একটা করে জিতেছে, শেষটা অমীমাংসিত থেকে গেল।

নাইরোবির শেরাটন হোটেলে একজোড়া গার্ডেন বাংলো বুক করেছে রানা। নিমা বিছানায় উঠেছে দশ মিনিটও হয়নি, পাশের বাংলো থেকে রানার ফোন পেল। 'আজ রাতে ব্রিটিশ হাই কমিশনে ডিনার খাচ্ছি আমরা। পুরানো বন্ধু, একসঙ্গে অক্সফোর্ডে পড়েছি। নরমাল ড্রেস পরলেই চলবে।'

নাইরোবি থেকে আদ্দিস আবাবা অতটা দূরে নয়, তবে নিচের প্রকৃতি একের পর এক এমন সব বিচিত্র শোভা মেলে ধরছে যে এয়ার কেনিয়া ফ্লাইটের জানালার সঙ্গে আঠার মত সেঁটে থাকল নিমা। মাউন্ট কেনিয়ার চূড়াটাকে অনেক বছর পর মেঘমুক্ত দেখল রানা, তুষার মোড়া জোড়া শৃঙ্গ রোদ লেগে চকচক করছে। তারপর শুরু হলো মরুভূমি, মরুভূমি শেষ হতে ইথিওপিয়ান মালভূমি দেখা গেল। 'আফ্রিকায় ইথিওপিয়ার চেয়ে পুরানো সভ্যতা শুধু মিশর,' নিমাকে বলল রানা।

'হ্যাঁ। চার হাজার বছর আগে টাইটা যখন এই পথ দিয়ে গেছে এই এলাকার লোকজন তখনও সভ্য ছিল। এদের খুব প্রশংসা করেছে ক্রোয়ে, বলেছে, তার কালচারের মতই এদের কালচার উন্নত। এটা একটা ব্যতিক্রমই বলব, কারণ অন্য প্রায় সব জাতিকে নিকৃষ্ট বলে উল্লেখ করেছে সে।'

প্লেন থেকে নেমে টার্মিন্যাল বিল্ডিঙে চলে এল ওরা। 'স্যার···স্যার মাসুদ রানা!' দু'জনেই ওরা লম্বা এক তরুণীর দিকে ঘুরে দাঁড়াল, ওদের দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে, হাঁটার ভঙ্গিতে নৃত্যশিল্পীর মনকাড়া সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। একেই বোধহয় কলঙ্কবিহীন ত্বক বলে, গাঢ় মধুর মত রঙ, লাবণ্যে ভরপুর। মেয়ে হাসতেও জানে, যেন কতদিনের পরিচয়। ঐতিহ্যবাহী পূর্ণ-দৈর্ঘ্য স্কার্ট পরে আছে, হাঁটার সময় ফুলে উঠছে। 'আমার দেশ ইথিওপিয়ায় স্বাগতম, স্যার রানা। আমি শেফতা রুবি।' কৌতূহল আর আগ্রহ নিয়ে নিমার দিকে তাকাল সে। 'আপনি নিশ্চয়ই আল নিমা।' নিমার দিকে ডান হাত বাড়াল সে। রানা লক্ষ করল, প্রথম দর্শনেই মেয়ে দুজন পরস্পরকে পছন্দ করছে।

ওদের পাসপোর্ট নিয়ে চলে যাচ্ছিল রুবি, ফিরে এসে একটা খবর দিল। 'আপনারা ভিআইপি লাউঞ্জে বিশ্রাম নিন। ব্রিটিশ এমব্যাসীর এক ভদ্রলোক ওখানে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। জানি না কিভাবে খবর পেলেন ওঁরা।'

ভিআইপি লাউঞ্জে মাত্র একজন লোককে দেখা গেল, ট্রপিকাল সুট পরা ব্রিটিশ স্যুবজেক্ট। রানাকে দেখেই সোফা ছেড়ে এগিয়ে এল সে। 'কেমন আছ, দোস্ত? ভাবিনি এত থাকতে এখানে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। প্রায় বারো বছর পর, তাই না?'

'হ্যাল্লো, গর্ডন। জানতাম না এখানে চাকরি করছ তুমি।'

'মিলিটারি অ্যাটাশে। হিজ এক্সেলেন্সী নাইরোবি থেকে খবর পান তুমি আসছ। আমাকে জানালেন, কারণ উনি জানেন তুমি আমার পুরানো বন্ধু, ব্রিটিশ মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে একসঙ্গে ট্রেনিং নিয়েছি।' আগ্রহ চেপে রাখতে পারছে না, বারবার নিমার দিকে তাকাচ্ছে। খানিকটা হতাশ ভঙ্গি করে তার সঙ্গে নিমার

পরিচয় করিয়ে দিল রানা।

'ব্যারি গর্ডন। আপনাকে একটু সাবধানে থাকার পরামর্শ দেব। বিষুব রেখার উত্তরে সবচেয়ে নামকরা প্লেবয়। ওর আধ মাইলের মধ্যে কোন মেয়েই নিরাপদ নয়।'

'হয়েছে, এতটা বাড়িয়ে বলতে হয় না!' রানা তার যে পরিচয় দিল, তাতে গর্ডনকে গর্বিত ও তৃপ্ত মনে হলো। 'প্লীজ, এই লোক যা বলছে তার একটা কথাও বিশ্বাস করবেন না, ডক্টর আল নিমা। কুখ্যাত নিন্দুক।'

রানাকে টেনে একপাশে সরিয়ে আনল গর্ডন। রাজধানীর বাইরে দেশের অবস্থা সম্পর্কে ভীতিকর একটা ধারণা দিল সে। 'এইচ.ই. একটু উদ্বিগ্ন। বিশেষ করে গোজাম-এর ওদিকে শয়তানদের বসবাস। উনি চান না আল নিমাকে নিয়ে ওদিকে যাও তুমি। আমি অবশ্য বলেছি, নিজেকে তুমি রক্ষা করতে জানো।'

খুব অল্প সময়ের ভেতর কাজ সেরে ফিরে এল শেফতা রুবি। 'আপনাদের লাগেজ, ফায়ার আর্মস আর অ্যামুনিশনের কাস্টমস ক্লিয়ার্যান্স পাওয়া গেছে। এটা আপনাদের সাময়িক পারমিট, ইথিওপিয়ায় যতক্ষণ থাকবেন সঙ্গে রাখতে হবে। পাসপোর্টগুলোও রাখুন, ভিসায় সীল মারা হয়েছে। এক ঘণ্টা পর লেক টানা ফ্লাইট, কাজেই হাতে কিছুটা সময় আছে।'

'যদি কখনও চাকরি পেতে অসুবিধে হয়, আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন,' মেয়েটার দক্ষতার প্রশংসা করল রানা।

ওদের সঙ্গে ডিপারচার গেট পর্যন্ত হেঁটে এল গর্ডন। 'বিপদ হলে আমরা আছি। তবে খবরটা সময়মত পেতে হবে।'

'আমার মনে থাকবে,' বন্ধুর সঙ্গে করমর্দন করল রানা।

টুইন অটার বিমান ওদেরকে সুউচ্চ গগনে তুলে আনলেও নিচের জমিন এত কাছে যে গ্রাম আর খেতগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এর কারণ পাহাড়ী এলাকার ওপর রয়েছে প্লেন। তারপর নিচে একটা মালভূমি দেখা গেল, অকস্মাৎ সেটার সামনে মুখ ব্যাদান করে থাকতে দেখা গেল বিশাল এক গিরিখাদকে, আকারে এতই বড় যে কল্পনাকেও যেন হার মানায়। 'অ্যাবে নদী!' সীট থেকে সামনের দিকে ঝুঁকতে হলো নিমাকে রানার কাঁধে টোকা দেয়ার জন্যে।

খাদটার কিনারা বা ধার খাড়া ও স্পষ্টভাবে কাটা, আর তারপরই ত্রিশ ডিগ্রী কোণ সৃষ্টি করে নেমে গেছে ঢাল। মালভূমির ফাঁকা ও নিঃস্ব সমতল জমিন জায়গা ছেড়ে দিয়েছে ঘন বন-জঙ্গলে আচ্ছাদিত খাদের পাঁচিলগুলোকে। এখানে সেখানে জঙ্গল ভেদ করে মাথাচাড়া দিয়ে আছে বাতিদানে সাজানো লম্বা মোমের মত পাথরের বিশাল সব স্তম্ভ, একেকটা পাঁচ-সাত তলা বাড়ির মত বড়। কোথাও কোথাও ধসে পড়েছে পাঁচিল, সেখানে শুধু কোটি কোটি টন আলগা পাথর ছড়িয়ে আছে। পাঁচিলের গায়ে ব্লাফ তৈরি হয়েছে, সেগুলোর বিস্তার ক্রমশ ওপর দিকে, মাথার দিকে কোনটার চেহারা সুচের মত, কোনটা আবার প্রকৃতির তৈরি ভাস্কর্য শিল্প, ঠিক যেন মানুষের আকৃতি।

ঢাল নেমেছে তো নেমেছেই, যেন কোন শেষ নেই, তারপর দুই ঢাল যেখানে

দৃষ্টিভ্রমের কারণে মিলিত হয়েছে বলে মনে হলো, এক মাইল বা আরও বেশি গভীরে, সেখানে চিকচিক করতে দেখা গেল সাপের মত আঁকাবাঁকা নদীটাকে। কুপি বা চিমনি আকৃতির ওপরের পাঁচিল দ্বিতীয় একটা কিনারা তৈরি করেছে নীল নদের পানি থেকে পাঁচশো ফুট ওপরে, এই অংশটাকে উপ-খাদ বলা যেতে পারে। উপখাদের পাঁচিলগুলো একদমই খাড়া, মাঝখানে লাল স্যান্ডস্টোনের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে নদী। কোথাও কোথাও খাদটা চল্লিশ মাইল চওড়া, আবার কোথাও মাত্র দশ। তবে পুরো দৈর্ঘ্য জুড়েই ভীতিকর গাম্ভীর্য আর অশেষ নির্জনতা বাসা বেঁধে আছে। মানুষের কোন চিহ্ন চোখে পড়ে না।

'ওখানেই আপনারা নামতে যাচ্ছেন,' ভয় ও শ্রদ্ধা মেশানো কণ্ঠস্বর, ফিসফিস করল শেফতা রুবি। রানা বা নিমা কথা বলছে না। এ-ধরনের আদিম, রোমহর্ষক ও রহস্যময় প্রকৃতির মুখোমুখি হলে সব ভাষাই হারিয়ে যায়।

প্রায় স্বস্তির সঙ্গে দেখল, ওদের নাগাল পাবার জন্যে উঠে আসছে উত্তরের পাঁচিল–দীর্ঘ নীল আফ্রিকান আকাশের গায়ে মাথা তুলে দাঁড়াল চোক রেঞ্জের সারি সারি উঁচু পাহাড়, ওদের খুদে ও ভঙ্গুর প্লেনের চেয়ে অনেক ওপরে।

বাঁক ঘুরে সেই পবর্তশ্রেণীর ভেতর ডাইভ দিল প্লেন। স্টারবোর্ড উইংটিপের দিকে হাত তুলল রুবি।

'লেক টানা,' বলল সে। চওড়া পাত্রে ঢালা পারদের মত টলটল করছে লেকের পানি। টানা লেক লম্বায় পঞ্চাশ মাইল, এখানে সেখানে মাথা তুলেছে কয়েকটা দ্বীপ, প্রতিটিতে একটা করে মঠ বা প্রাচীন চার্চ আছে। ল্যান্ড করার জন্যে লেকের ওপর দিয়ে শেষবার ওড়ার সময় প্যাপাইরাসের তৈরি খুদে বোটে সাদা আলখেল্লা পরা পাদ্রীদের দেখতে পেল ওরা, এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে যাচ্ছে।

লেকের পাশে মেঠো স্ট্রিপে ল্যান্ড করল অটার, পিছনে ধুলোর মেঘ উঠল। তাল পাতার গায়ে রঙিন নকশা করা কয়েকটা ঘর, এটাই এখানকার টার্মিন্যাল বিল্ডিং। রোদ এত উজ্জ্বল যে খাকি জ্যাকেটের পকেট থেকে সানগ্লাস বের করে পরতে হলো রানাকে। প্লেন থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে ও। সাদা ও নোংরা টার্মিন্যাল ভবনের গায়ে বুলেটের গর্ত দেখা গেল, রানওয়ের কিনারায় ঘাসের ওপর পড়ে রয়েছে একটা রাশিয়ান টি-থারটিফাইভ ব্যাটল ট্যাংকের পোড়া খোল। রানাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে অন্যান্য আরোহীরা বেরিয়ে এল, বিল্ডিঙের পাশে ইউক্যালিপটাস গাছের ছায়ায় তাদের অস্থির আত্মীয়স্বজনরা দাঁড়িয়ে আছে। ওখানে একটাই মাত্র গাড়ি, বালি রঙের টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার। ড্রাইভারের দরজায় বড় বড় হরফে লেখা–'ওয়াইল্ড গেম সাফারি'।

মেয়ে দুজনকে নিয়ে নিচে নামল রানা। গাড়ি থেকে নেমে অপেক্ষা করছে ড্রাইভার। তার পরনে রঙচটা বুশ সুট। লম্বা সে, রোগা না হলেও গায়ে চর্বি নেই, হাঁটার সময় সামান্য ঝাঁকি খায় শরীর। রানা আন্দাজ করল চল্লিশের কাছাকাছি বয়েস হবে। কটা রঙের চুল ছোট করে ছাঁটা, চোখ নিষ্প্রভ ও নীলচে। মুখে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন আছে, নাক ছুঁয়ে দেয়ায় সেটা বিকৃত দেখাচ্ছে।

রুবি প্রথমে তার সঙ্গে নিমার পরিচয় করিয়ে দিল।

নিমা করমর্দন না করায় ভুরু কুঁচকে বাউ করল লোকটা। এরপর রুবি রানার পরিচয় দিল। 'ইনি আমার স্বামী, ভ্লাদিমির উস্তাভ। মির, ইনি মাসুদ রানা।'

'আমার ইংলিশ ভাল নয়,' বলল উস্তাভ। 'ফ্রেঞ্চ খানিকটা ভাল।'

'কোন অসুবিধে নেই,' ফ্রেঞ্চ ভাষায় জবাব দিল রানা। 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।' হাত বাড়াল ও।

হ্যান্ডশেকের অজুহাতে রানার হাতটা মুচড়ে দিতে চেষ্টা করল উস্তাভ। সতর্ক ছিল রানা, এ-ধরনের আধ-বুড়ো শয়তানদের চেনা আছে, মুঠোয় এতটা জোর ছিল যে সুবিধে করতে পারল না উস্তাভ। রানার ঠোঁটে অলস হাসি। প্রথমে ঢিল দিতে হলো উস্তাভকে, ক্ষীণ হলেও শ্রদ্ধার ভাব ফুটল নীলচে চোখে।

'আপনি তাহলে ডিক-ডিকের খোঁজে এসেছেন?' প্রশ্ন তো নয়, প্রায় খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'অথচ লোকে আমার কাছে আসে বড় হাতি শিকার করার জন্যে।'

'বড় হাতিকে ভয় পাই,' হাসল রানা। 'ডিক-ডিক আমার জন্যে মানিয়ে যায়।'

'খাদে আগে কখনও নেমেছেন?'

'দু'বার,' জবাব দিল নিমা, দু'জনের মাঝখানে নীরব উত্তেজনা অনুভব করতে পারছে ও।

স্ত্রীর দিকে ফিরল উস্তাভ। 'আমার অর্ডার মত সমস্ত রসদ আনা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, মির,' কেমন যেন ভয়ে ভয়ে জবাব দিল রুবি। 'প্লেনে আছে সব।'

টয়োটার সামনের সীটে বসল পুরুষরা, অসংখ্য প্যাকেট আর রসদ নিয়ে মেয়েরা বসল পিছনে। 'ঘুরে ফিরে সব কিছু তাহলে দেখার ইচ্ছে নেই আপনাদের?' রানাকে জিজ্ঞেস করল উস্তাভ, গলার আওয়াজ হুমকির মত শোনাল।

'মানে?'

'লেকের আউটলেট, পাওয়ার স্টেশন, খাদের ওপর পর্তুগাল ব্রিজ, নীল নদের উৎসমুখ—দেখার জিনিস অনেকই আছে। দেখতে চাইলে সন্ধের আগে ক্যাম্পে ফেরা সম্ভব নয়।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'তবে এ-সব আগেই দেখা আছে আমার।'

সারি সারি পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে পশ্চিম দিকে চলে গেছে রাস্তাটা। এলাকাটার নাম গোজাম, রাস্তার ধারে প্রচুর লোকজন দেখা গেল। সবাই খুব লম্বা, ছাগল বা ভেড়া চরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পুরুষ ও নারী সবাই প্যান্ট পরা, তবে মেয়েদের ব্লাউজের ওপর উলেন শাল আছে। ইথিওপিয়ার সব এলাকার মত গোজামের লোকজনও দেখতে খুব সুন্দর। মেয়েরা কালো হলে কি হবে, রূপ-যৌবন যেন উথলে পড়ছে। পুরুষরা বেশিরভাগই সশস্ত্র। একে-ফরটিসেভেন অ্যাসল্ট রাইফেল তো আছেই, আরও আছে দু'ধারি তলোয়ার।

গ্রামের কুঁড়েগুলো গোল, ইউক্যালিপটাস অথবা সাইসল গাছের নিচে।

চোক রেঞ্জের চূড়ায় লালচে-বেগুনি মেঘের তুমুল আলোড়ন শুরু হলো। চাঁদির তৈরি সিকির মত বৃষ্টির ফোঁটাগুলো, কিছুক্ষণ ঝরেই থেমে গেল। তাতেই কাদায় থকথকে হয়ে উঠল রাস্তা।

খানিক পর শুরু হলো পাথুরে খানা-খন্দ। এমনকি ফোর-হুইল ড্রাইভ টয়োটার পক্ষেও এ-সব বাধা পেরিয়ে এগোনো সম্ভব নয়। ঘুরপথ ধরতে হলো, মাঝে মধ্যে গাড়ি এগোচ্ছে হাঁটা গতিতে, তাসত্ত্বেও অনবরত ঝাঁকি খাচ্ছে আরোহীরা।

'কালাদের জানোয়ার বললেই হয়,' উস্তাভের গলায় ঘৃণা। 'রাস্তা মেরামত করার কথা চিন্তাও করে না।' কেউ কিছু বলছে না, তবে রিয়ার-ভিউ মিররে চোখ রেখে মেয়ে দুটোকে দেখল রানা। দু'জনেই নির্লিপ্ত।

সামনে আরও খারাপ রাস্তা পড়ল। ভারী যানবাহন চলাচল করায় চাকার ঘর্ষণে দীর্ঘ নালা তৈরি হয়েছে। 'মিলিটারি ট্রাফিক?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কিছু কিছু,' জবাব দিল উস্তাভ। 'এদিকে শুফতাদের তৎপরতা খুব বেশি। শুফতা হলো ডাকাত সর্দার আর দলত্যাগী সমর নায়ক। প্রসপেক্টিং কোম্পানীর ট্রাকও আসা-যাওয়া করে। বড় একটা মাইনিং কোম্পানী গোজামে কনসেশন পেয়েছে, ড্রিলিং করার জন্যে পৌঁছে গেছে তারা।'

'আমরা কিন্তু এখনও কোন সিভিলিয়ান ভেহিকল্ দেখিনি,' বলল নিমা। 'এমনকি পাবলিক বাসও না।'

ব্যাখ্যা দিল রুবি, 'এক সময় ইথিওপিয়াকে আফ্রিকার রুটির ঝুড়ি বলা হত, কিন্তু মেনজিসটু ক্ষমতায় এসে ইকোনমির বারোটা বাজিয়ে দিয়েছেন। খাদ্য এখানে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। দেশ এখন স্বৈরাচার মুক্ত হলেও, দুর্দশা কাটতে আরও সময় লাগবে। মোটর কিনবে এমন সঙ্গতি হাতে গোনা মাত্র কয়েকজনের আছে। ছেলেমেয়েদের কি খাওয়াবে, এই চিন্তাতেই পাগল হয়ে আছে সবাই।'

'আদ্দিস ইউনিভার্সিটি থেকে ইকোনমিক্সে ডিগ্রী নিয়েছে রুবি,' কর্কশ হাসির সঙ্গে বলল উস্তাভ। 'সব কিছু জানে সে, একটু বেশিই জানে!' স্ত্রীর প্রতি এটা তার ধমকও বলা যায়, বিদ্রূপও বলা যায়। রুবি আর কোন কথা বলল না।

বিকেলের দিকে ম্লান সূর্য উঠল। ফাঁকা একটা এলাকার মাঝখানে গাড়ি থামাল উস্তাভ। 'আঙুল মটকাবার বিরতি। পানি ছাড়ার সময়।'

মেয়ে দুজন ট্রাক থেকে নেমে বোল্ডারের আড়ালে চলে গেল। ফিরে এল কাপড় পাল্টে। ঢোলা প্যান্টের ওপর ব্লাউজ পরেছে, ব্লাউজের ওপর উলেন চাদর। 'এগুলো রুবি আমাকে ধার দিয়েছেন,' রানাকে বলল নিমা।

'কাজের জন্যে সালোয়ার-কামিজের চেয়ে এগুলোই ভাল,' মন্তব্য করল রানা।

ট্রাক যখন আরেকটা পাথুরে উপত্যকায় নেমে যাচ্ছে, দিগন্তে নেমে আসছে সূর্যও। পাশেই একটা নদী, পাড় ক্ষয়ে গেছে। নদীর ওপর একটা চার্চ, নল খাগড়া আর পাতায় ছাওয়া ছাদের ওপর কাঠের কপটিক ক্রস বসানো হয়েছে, দেয়ালগুলো সাদা। গ্রামটা দাঁড়িয়ে আছে চার্চকে ঘিরে।

'ডেবরা মারিয়াম,' বলল উস্তাভ। 'ভার্জিন মেরীর পাহাড়। আর নদীর নাম ডানডেরা। বড় একটা ট্রাকে আমার লোকজনকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি। ক্যাম্প রেডি করে অপেক্ষা করছে তারা। আজ রাতে এখানেই আমরা ঘুমাব, কাল ভাটি

ধরে এগোব যতক্ষণ না খাদের কিনারায় পৌঁছাই।'

গ্রামের ঠিক সামনে ক্যাম্প ফেলা হয়েছে। 'দ্বিতীয় তাঁবুটা আপনাদের,' রানাকে জানাল উস্তাভ।

'ওটা নিমার জন্যে,' বলল রানা। 'আমার নিজের একটা আলাদা তাঁবু দরকার।'

'ডিক-ডিক শিকার করতে এসে আলাদা তাঁবু?' উস্তাভের চোখে নগ্ন বিস্ময়। 'আপনি আমাকে তাজ্জব করলেন, স্যার!' চেঁচামেচি করে লোকজনকে ডাকল সে, আরেকটা তাঁবু টাঙাবার নির্দেশ দিল। দ্বিতীয়টার পাশেই টাঙানো হলো সেটা। 'রাতে আপনার সাহস বাড়তে পারে। চাই না বেশি দূর হাঁটতে হোক আপনাকে।'

বু গাম গাছের নিচু ডালে একটা ড্রাম ঝোলানো হয়েছে, ড্রামের নিচে শুকনো পাতার তৈরি অসংখ্য ফুটোঅলা দেয়াল, ওপরে ছাদ নেই–এটাই ওদের বাথরুম বা শাওয়ার। প্রথমে ব্যবহার করল নিমা, বেরিয়ে এল তাজা চেহারা নিয়ে, মাথায় ভিজে তোয়ালে জড়ানো, মুখে হাসি। 'আপনার পালা, রানা!' রানার তাঁবুকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় হাঁক ছাড়ল। 'পানি খুব গরম!'

রানার শাওয়ার সেরে কাপড় বদলাতে সন্ধে হয়ে গেল। সোজা হেঁটে এসে ডাইনিং তাঁবুতে ঢুকল, আগেই এখানে জড়ো হয়েছে সবাই। আগুনের চারপাশে ফেলা হয়েছে ক্যাম্পচেয়ার, একটাতে বসল রানা। মেয়ে দুটো বসেছে উল্টোদিকে, কথা বলছে নিচু গলায়। হাতে গ্লাস নিয়ে নিচু টেবিলে পা তুলে দিয়েছে উস্তাভ। রানা বসতেই ইঙ্গিতে ভদকার বোতলটা দেখাল। 'বাস্কেটে বরফ আছে।'

কথা না বলে মাথা নাড়ল রানা। গলাটা অবশ্য শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে, মনে মনে ভাবল বিয়ার পেলে মন্দ হত না।

'গোপন একটা কথা বলি,' রানাকে বলল উস্তাভ। 'আজকাল ডোরা কাটা ডিক-ডিক বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। আদৌ কোন কালে ছিল কিনা তা-ও আমার সন্দেহ আছে। আপনি টাকা আর সময় অপচয় করতে এসেছেন।'

'অসুবিধে কি,' বলল রানা। 'ওগুলো তো আমারই।'

'দশ দিন আগে তিনটে হাতির ছাপ দেখেছি, মদ্দা হাতি,' বলল উস্তাভ। 'একেকটা দাঁত একশো পাউন্ডের কম নয়।'

কথা কাটাকাটি চলছে, উস্তাভের ভদকার বোতল নীল নদ থেকে বন্যা নেমে যাবার মত দ্রুত খালি হয়ে যাচ্ছে। রুবি যখন বলল ডিনার রেডি, বোতলটা সঙ্গে নিয়ে চেয়ার ছাড়ল সে। টেবিলের দিকে এগোবার সময় টলতে দেখা গেল তাকে। খেতে বসে রুবিকে কথায় কথায় ধমক দেয়া ছাড়া আর কোন অবদান রাখল না। 'ভেড়ার মাংস সেদ্ধ হয়নি কেন? কুকের ওপর চোখ রাখোনি কেন? ওরা তো কুত্তার বাচ্চা, তুমি জানো।'

'আপনার মাংস কি সেদ্ধ হয়নি, স্যার রানা?' স্বামীর দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল রুবি। 'বললে কুককে দিয়ে সেদ্ধ করে আনাই।'

'একদম নিখুঁত রান্না হয়েছে,' আশ্বস্ত করল রানা। 'তুলোর মত নরম মাংস আমি পছন্দ করি না।'

ডিনারের শেষ দিকে দেখা গেল উস্তাভের বোতল খালি হয়ে গেছে। টকটকে লাল হয়ে উঠেছে তার চেহারা, মনে হলো ফুলেছেও। টেবিল থেকে উঠে কারও সঙ্গে কথা বলল না, নিজের তাঁবুর দিকে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

'ওর হয়ে ক্ষমা চাইছি আমি। এ শুধু সন্ধের দিকে ঘটে। দিনের বেলা একদম শান্ত ভদ্রলোক। ভদকা ওদের রাশিয়ান ঐতিহ্য।' উজ্জ্বল হাসি দিল রুবি, শুধু চোখ দুটোয় বিষাদের ছায়া লেগে থাকল। নিস্তব্ধতা ভারী হয়ে উঠতে চার্চ পর্যন্ত হেঁটে আসার প্রস্তাব দিল সে। ওরা রাজি হতে একজন চাকরকে ডেকে লণ্ঠন আনাল।

কপটিক চার্চে ঢুকে প্রার্থনায় বসল নিমা আর রুবি, রানা মিউরালের ছবি তুলল পোলারয়েড ক্যামেরায়। ফেরার পথে কোন কথা হলো না।

'রানা! রানা! উঠুন, প্লীজ!' ধাক্কা দিয়ে রানার ঘুম ভাঙাল নিমা। উঠে বসে টর্চ জ্বালল ও, দেখল ঢোলা প্যান্ট আর ব্লাউজের বদলে সালোয়ার-কামিজ পরেছে নিমা, তাড়াহুড়োয় ওড়না নিয়ে আসতে ভুলে গেছে।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা, তবে নিমা জবাব দেয়ার আগেই উস্তাভের কর্কশ গর্জন আর খিস্তি শুনতে পেল, রাতের নিস্তব্ধতাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে তার তাঁবু থেকে ভেসে আসছে। আরও একটা রোমহর্ষক শব্দ পেল রানা, শক্ত মুঠো দিয়ে মাংস ও হাড়ে আঘাত করলেই শুধু এ ধরনের আওয়াজ হতে পারে।

'মেয়েটাকে মারছে,' রাগে কেঁপে গেল নিমার গলা। 'যেভাবে পারেন থামান আপনি।'

প্রতিটি আঘাতের পর ব্যথায় চিৎকার করছে রুবি, তারপর ফোঁপাচ্ছে। ইতস্তত করছে রানা। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ায় শুধু একজন বোকা নাক গলায়, এবং সাধারণত পুরস্কার হিসেবে তার কপালে জোটে অকস্মাৎ ঐকমত্যে পৌঁছুনো স্বামী-স্ত্রীর কঠোর নিন্দা।

'কিছু একটা করুন, রানা! প্লীজ!'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কট থেকে নামল রানা। শুধু শর্টস পরে রয়েছে ও। জুতো খোঁজার ঝামেলায় গেল না, বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে। নিমা ওর পিছু পিছু আসছে, ওর পা-ও খালি।

ওদের তাঁবুর ভেতর লণ্ঠন জ্বলছে এখনও, ক্যানভাসের দেয়ালে বড় আকৃতির ছায়া নড়াচড়া করছে। রানা দেখল উস্তাভ তার স্ত্রীর চুল ধরে হিড়হিড় করে মেঝের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, গর্জন করছে রুশ ভাষায়।

'উস্তাভ!' মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে তিনবার চিৎকার করতে হলো রানাকে। রুবিকে ছেড়ে দিয়ে তাঁবুর ফ্ল্যাপ তুলল উস্তাভ। শুধু আন্ডারপ্যান্ট পরে আছে সে। শরীরে কিলবিল করছে পেশী, তবে বুকটা চ্যাপ্টা ও লোহার মত শক্ত মনে হলো, কোঁকড়ানো সোনালি চুলে ঢাকা। তার পিছনে মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে রুবি, উল্টোদিকে মুখ ঘুরিয়ে ফোঁপাচ্ছে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ মেয়েটা, তার শরীরের সমতল অংশগুলো সাপের চামড়ার মত মসৃণ।

'রাত দুপুরে এ-সব কি?' জিজ্ঞেস করল রানা, অনেক কষ্টে রাগ চেপে

রাখছে। শান্ত সরল একটা মেয়ের এই অপমান সহ্য করার মত নয়।

'কালো বেশ্যাটাকে ভদ্রতা শেখাচ্ছি,' খেঁকিয়ে উঠল উস্তাভ। 'আপনার কোন ব্যাপার নয়, মিস্টার। তবে আপনিও যদি ঝাল মাংসের খানিকটা ভাগ চান, সেটা আলাদা কথা।' হেসে উঠল সে, আওয়াজটা শুনে গা ঘিন ঘিন করে উঠল রানার।

'আপনি সুস্থ, শেফতা রুবি? আমাদের সাহায্য দরকার থাকলে বলুন।' কথাগুলো বলার সময় উস্তাভের দিকে তাকিয়ে আছে রানা, নগ্ন শরীরটার দিকে তাকিয়ে রুবিকে আরও অপমান করতে ইচ্ছুক নয়।

কোন রকমে উঠে বসল রুবি, ভাঁজ করা হাঁটু তুলল বুকের সামনে, নগ্নতা ঢাকার জন্যে সে-দুটোকে হাত দিয়ে আলিঙ্গন করল। 'আমি ভাল আছি, স্যার রানা। ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার চেয়ে আপনারা চলে যান, প্লীজ।' তার নাক থেকে গড়ানো রক্ত ঠোঁট ভিজিয়ে দিচ্ছে, লাল হয়ে উঠছে সাদা দাঁতগুলো।

'আমার স্ত্রী তোমাকে নিজের চরকায় তেল দিতে বলছে, ইউ ব্ল্যাক বাস্টার্ড! ভাগো, যাও! তা না হলে এমন শিক্ষা দেব···।' টলতে টলতে এগিয়ে এল উস্তাভ, ঘুসি তুলল রানার বুক লক্ষ্য করে।

সাবলীল অনায়াস ভঙ্গিতে সরে গেল রানা, উস্তাভকে ঠেলে দিল যেদিকে তার এগোবার ঝোঁক। ভারসাম্য হারিয়ে তাঁবুর সামনে খোলা জায়গায় আছাড় খেলো সে, পড়ার সময় একটা ক্যাম্প চেয়ারকেও সঙ্গে নিল।

'প্লীজ, এ-সব করবেন না!' এখনও কোঁপাচ্ছে রুবি। 'ও রেগে গেলে মানুষ থাকে না। আপনার সঙ্গে যদি পেরে না ওঠে, দেখবেন কারও না কারও ক্ষতি করবে।'

'নিমা, রুবিকে আপনার তাঁবুতে নিয়ে যান,' নরম সুরে নির্দেশ দিল রানা। ছুটে তাঁবুতে ঢুকল নিমা, কট থেকে চাদর তুলে এনে জড়িয়ে দিল রুবির গায়ে, তারপর তাকে দাঁড় করাল।

রুবিকে নিয়ে নিজের তাঁবুর দিকে এগোচ্ছে নিমা, এই সময় উঠে দাঁড়াল উস্তাভ। হুঙ্কার ছাড়ল সে, উল্টে পড়া ক্যাম্প চেয়ার হাতে নিল। মাটিতে আছাড় মেরে চেয়ারের একটা পা ভাঙল সে, সেটা নিয়ে এগিয়ে এল রানার দিকে। 'খেলতে চাও, তাই না, কালা কুত্তা? এসো তাহলে, হয়ে যাক!' ধেয়ে এল রানার দিকে, নিনজা ব্যাটনের মত হাতের কাঠ ঘোরাল। বাতাসে শিস কেটে রানার মাথার দিকে ছুটে এল পায়াটা।

ঝট করে মাথা নিচু করল রানা, লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় পায়াটা এরপর ওর বুক বরাবর নামিয়ে আনল উস্তাভ। লাগলে পাঁজরের হাড় গুঁড়িয়ে যেত, তবে শেষ মুহূর্তে মোচড় খেয়ে সরে গেল রানা।

একটা বৃত্ত ধরে ঘুরছে ওরা, তারপর আবার হামলা করল উস্তাভ। ভদকা খাওয়ায় তার রিফ্লেক্স ভোঁতা হয়ে গেছে, তা না হলে এরকম শক্ত ও অভিজ্ঞ প্রতিপক্ষের সঙ্গে লাগতে যাবার আগে দ্বিতীয়বার চিন্তা করত রানা। উস্তাভের পায়াটা আরেকবার বাতাসে শিস কেটে ছুটে এল ওর মাথার দিকে, এবারও ঝট করে নিচু হয়ে আঘাতটা এড়াল ও। তারপর সিধে হলো, কষে একটা ঘুসি মারল উস্তাভের তলপেটে। হুসস করে বাতাস বেরিয়ে এল, ফুসফুস খালি হয়ে গেল

উস্তাভের। হাত থেকে ছিটকে পড়ল পায়া, কুঁজো হলো শরীরটা, তারপর পড়ে গেল মাটিতে। হেঁটে এসে তার সামনে দাঁড়াল রানা। 'দুটো ব্যাপারে তোমাকে প্রথম ও শেষবার সাবধান করে দিচ্ছি, ভ্লাদিমির উস্তাভ। কালো বলে কাউকে গাল দেবে না। আর মেয়েদের গায়ে হাত দেয়া চলবে না।'

পাঁচ

পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে পরম বন্ধুর মত রানাকে অভ্যর্থনা জানাল উস্তাভ। 'গুড মর্নিং, স্যার রানা! কাল রাতে খুব মজা করলাম আমরা, কি বলেন? মনে পড়লে এখনও আমার হাসি পাচ্ছে। সাম গুড জোকস! এই যে, নারী জাগরণের প্রতীক, তোমার নতুন বয়ফ্রেন্ডকে নাস্তা খেতে দাও! কাল রাতে ওরকম খেলাধুলোর পর ওঁর খুব খিদে পেয়েছে।'

রুবি নির্লিপ্ত ও বিষণ্ন, চাকরদের নাস্তা পরিবেশন তদারক করছে। একটা চোখ ফুলে প্রায় বন্ধ হয়ে আছে, নিচের ঠোঁট কাটা। রানার দিকে সে একবারও তাকাচ্ছে না।

'আমরা আগে রওনা হব,' কফি খাবার সময় ব্যাখ্যা করল উস্তাভ। ক্যাম্প তুলে বড় ট্রাকে চড়ে পিছু নেবে চাকররা। ভাগ্য ভাল হলে আজ রাতে খাদের কিনারায় ক্যাম্প ফেলতে পারব। নামতে শুরু করব কাল।'

ট্রাকে ওঠার সময় উস্তাভের কান বাঁচিয়ে দু'একটা কথা বলল রুবি। 'ধন্যবাদ, মিস্টার রানা। তবে কাজটা আপনি ভাল করেননি। আপনি ওকে চেনেন না। আপনাকে এখন থেকে সাবধান থাকতে হবে। ও ভোলে না, ক্ষমাও করে না।'

ডেবরা মারিয়াম গ্রাম থেকে একটা শাখা পথ ধরে এগোল ওরা, ডানডেরা নদীর পাশ দিয়ে এগিয়েছে। রাতে বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তার অবস্থা খুবই করুণ, ট্রাক ঠেলার জন্যে বারবার কাদায় নামতে হলো রানাকে। বড় ট্রাকটা এক সময় ধরে ফেলল ওদেরকে। উস্তাভ সারাক্ষণ গজগজ করছে। 'আমার কথা শুনলে এই জোগাড়ির মধ্যে পড়তে হত না। রাস্তা নেই, শিকারও নেই, তবু যাব!'

বিকেলে লাঞ্চ খাবার জন্যে নদীর ধারে থামল ওরা। হাত-পা থেকে কাদা ধোয়ার জন্যে পানিতে নামল রানা, পিছু নিয়ে নিমাও নেমে এল। নদীর পানি হলুদ হয়ে আছে, বৃষ্টি হওয়ায় ভরাট হয়ে গেছে। 'ডোরা কাটা ডিক-ডিকের গল্প উস্তাভ বিশ্বাস করেছে বলে মনে হয় না,' রানাকে সাবধান করে দিল নিমা। 'রুবি বলছেন, আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ আছে তার।' বুক আর বাহু ধোয়ার সময় রানার দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকল ও। তারপর নিজেই লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

'লাগেজ হাতড়াতে পারে,' বলল রানা। 'আপনার লাগেজে কোন কাগজ-পত্র

বা নোট নেই তো?'

'শুধু স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফ আছে, আর নোটবুকে যা আছে তার সবই শর্টহ্যান্ড–উস্তাভ বুঝবে না।'

'রুবির সঙ্গে কথা বলার সময় সাবধান।'

'তিনি খুব সরল। কারও ক্ষতি করবেন না।'

'উস্তাভ তাঁর স্বামী, ভুলে যাবেন না। অনুভূতি যা-ই বলুক, দু'জনের কাউকেই বিশ্বাস করার দরকার নেই।' শার্টটা ধুয়ে নিল রানা, ভিজেই পরল। 'চলুন।'

ট্রাকের কাছে ফিরে ওরা দেখল, সাউথ আফ্রিকান হোয়াইট ওয়াইনের বোতল খুলছে উস্তাভ। রুবি ওদেরকে ঠাণ্ডা চিকেন রোস্ট আর হাতে তৈরি রুটি পরিবেশন করল। খাওয়া শেষ হতে রানার পাশে ঘাসের ওপর শুয়ে দাড়িঅলা এক শকুনের দূর নীলিমায় ভেসে যাওয়া দেখল নিমা। যাবার সময় হতে নিমার হাত ধরে দাঁড় করাল রানা। শারীরিক সংস্পর্শে দুর্লভ একটা মুহূর্ত, রানার আঙুলগুলো প্রয়োজনের চেয়ে এক কি দু'সেকেন্ড দেরি করে ছাড়ল নিমা।

রাস্তার অবস্থা ভাল হওয়া তো দূরের কথা, আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। অতি কষ্টে একটা চড়াই পেরিয়ে এসে উতরাই ধরে নামতে শুরু করল ট্রাক। অর্ধেক দূরত্ব নামার পর চুলের কাঁটার মত বাঁক পড়ল। বাঁকটা ঘুরতেই দেখা গেল বিশাল একটা ট্রাক, প্রায় ট্র্যাক জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুনেছে বটে এই পথে প্রচুর ভারী যানবাহন চলাচল করে, তবে এই প্রথম একটাকে দেখল ওরা। খুব সাবধানে ও কৌশলে ট্রাক আর উঁচু পাড়ের মধ্যবর্তী সরু ফাঁক গলে সামনে বাড়ল উস্তাভ।

পিছনের সীটে বসেছে নিমা, জানালা দিয়ে প্রকাণ্ড ডিজেল ট্রাকটা দেখতে পেল। সবুজের ওপর লাল রঙে লেখা হয়েছে কোম্পানীর নাম, লোগোটাও একই রঙের। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো ওর। মনে হলো, এই লোগো কিছুদিন আগে দেখেছে। অথচ মনে করতে পারছে না ঠিক কবে বা কোথায়।

বাকি পথ চুপচাপ গম্ভীর হয়ে থাকল নিমা। বারবার শুধু মনে হচ্ছে ডানাওয়ালা ঘোড়ার লোগো আগেও কোথাও দেখেছে। লাল লোগোর ওপর কোম্পানীর নাম লেখা–প্রক্সি এক্সপ্লোরেশন।

দিনের শেষ ট্র্যাকের পাশে একটা সাইনপোস্ট দেখল ওরা। পোস্টের পায়াগুলো কংক্রিটে গাঁথা, লেখাগুলো প্রফেশনাল কারও হাতের কাজ। বোর্ডের মাথায় একটা তীরচিহ্ন আঁকা, নির্দেশ করছে বুলডোজার দিয়ে সমান করা নতুন একটা রাস্তা, বাঁক ঘুরে ডান দিকে চলে গেছে। তার নিচের লেখাগুলো পড়ল নিমা–

প্রক্সি এক্সপ্লোরেশন
বেস ক্যাম্প–ওয়ান কিলোমিটার
প্রাইভেট রোড
নো এন্ট্রি টু আনঅথোরাইজড ট্রাফিক

লাল ঘোড়া পিছনের পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে আছে, ডানা দুটো দু'দিকে মেলা।

ঝট করে মনে পড়ে গেল নিমার! 'একই ট্রাক!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেও,

মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিল। আতঙ্কের একটা ধাক্কা খেয়েছে বুকে। এই ট্রাকটাই ইয়র্কে ওর মায়ের ল্যান্ড রোভারকে ব্রিজ থেকে ঠেলে নিচে ফেলে দিয়েছিল। অসম্ভব, একই কোম্পানীর ট্রাক ইথিওপিয়ার দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় চলে আসাটা কাকতালীয় কোন ঘটনা হতে পারে না!

আরও কয়েক মাইল এগিয়ে খাদের খাড়া কিনারায় এসে থামল ওরা। নিচে নেমে রানার হাত ধরে টান দিল নিমা। 'কথা আছে,' ফিসফিস করল ও। নদীর ধারে চলে এল দু'জন।

পা ঝুলিয়ে একটা পাথরের ওপর পাশাপাশি বসল ওরা। পাশের ফুলে ওঠা নদী আভাস দিচ্ছে ওদের সামনে কি অপেক্ষা করছে। ঠাণ্ডা পাহাড়ী জলরাশি অসংখ্য পাথরের মাঝখান দিয়ে দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে। ওদের নিচে পাহাড়-প্রাচীর পাথরের খাড়া দেয়াল, প্রায় এক হাজার ফুট গভীর। ওরা এত ওপরে রয়েছে যে সন্ধের আলো-ছায়া আর জলপ্রপাত থেকে ছড়িয়ে পড়া জলকণার ভেতর নিচের অন্ধকারও রহস্যময় লাগছে। নিচে তাকাতেই মাথাটা ঘুরে উঠল নিমার, নিজের অজান্তেই রানাকে আঁকড়ে ধরল। ধরার পর বুঝতে পারল কি করছে, তাড়াতাড়ি আবার ছেড়ে দিল। 'রানা, আপনার মনে আছে, ইয়র্কে একটা ট্রাক মামির ল্যান্ড রোভারকে ব্রিজ থেকে ফেলে দিয়েছিল?'

'কেন মনে থাকবে না!' নিমার দিকে তাকাল রানা। 'আপনাকে আপসেট লাগছে। কি ব্যাপার?'

'ট্রাকটার গায়ে কোম্পানীর নাম আর লোগো ছিল। নামটা আমি পড়তে পারিনি, তবে লোগোটা লক্ষ করেছিলাম। আজ বিকেলে ঠিক ওই একই ধরনের একটা ট্রাককে আমরা পাশ কাটিয়ে এসেছি। লোগো লাল একটা ঘোড়া। কোম্পানীর নাম প্রক্সি এক্সপ্লোরেশন।'

'আপনার ভুল হয়নি?'

'না!'

'একই কোম্পানীর ট্রাক ইয়র্কশায়ার আর গোজামে? মেনে নেয়া যায়?'

'কোম্পানী পুলিসের কাছে রিপোর্ট করে যে তাদের ট্রাক চুরি গেছে। এটা হয়তো তাদের সাজানো ব্যাপার, চুরি যাবার ঘটনা ঘটেনি, মিছিমিছি রিপোর্ট করেছে।'

'অসম্ভব নয়।'

'হাসলান চাচাকে খুন করার পরও আমার ওপর দু'বার হামলা করেছে ওরা,' বলল নিমা। 'বোঝাই যায়, বড় ধরনের আয়োজন করার ক্ষমতা রাখে তারা। মিশর আর ইংল্যান্ডে যারা আয়োজন করতে পারে, তাদের পক্ষে ইথিওপিয়ায়ও সেটা করা সম্ভব। আমাদের সমস্ত কাগজ-পত্র ও নোট তাদের দখলে রয়েছে, সে-সব দেখে তারা জেনেছে অ্যাবে নদীই তাদের গন্তব্য।'

হঠাৎ পাথর থেকে নেমে পড়ল রানা। 'আসুন।'

'কোথায়?' নিমা হতভম্ব।

'প্রক্সি বেস ক্যাম্পে। চলুন সাইট ফোরম্যানের সঙ্গে কথা বলি।'

ওদেরকে টয়োটায় উঠতে দেখে বাধা দেয়ার জন্যে ছুটে এল উস্তাভ। 'আমার

অনুমতি না নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?'

'চারদিকটা দেখতে,' বলে ক্লাচ ছেড়ে দিল রানা। 'এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব।'

'কি বলে···না! আমার ট্রাক!' ধরার জন্যে ছুটছে উস্তাভ, কিন্তু টয়োটার গতি বেড়ে যাওয়ায় পিছিয়ে পড়ল সে।

'বিল করবেন।' রিয়ার-ভিউ মিররে তাকিয়ে হাসল রানা।

সাইনপোস্ট দেখে বাঁক ঘুরল ওরা, সাইড ট্র্যাক ধরে একটা রিজ পেরুল। চূড়ায় উঠে ব্রেক করল ও, সামনের দৃশ্যটার ওপর চোখ বুলাচ্ছে।

দশ একরের মত জায়গা পরিষ্কার ও সমতল করা হয়েছে। জায়গাটা কাঁটাতারের উঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা। ভেতরে ঢোকার একটা মাত্র গেট। সবুজ ও লাল রঙ করা তিনটে প্রকাণ্ড ডিজেল ট্রাক বেড়ার ভেতর পার্ক করা রয়েছে। ছোট আরও কয়েকটা গাড়ি দেখা যাচ্ছে, আর রয়েছে একটা লম্বা মোবাইল ড্রিলিং রিগ। উঠানের আরেক অংশ দখল করে রেখেছে প্রসপেক্টিং ইকুইপমেন্ট। একদিকে স্তূপ করা হয়েছে ড্রিলিং রড আর ইস্পাতের কোর বক্স, স্পেয়ার পার্টস ভর্তি কাঠের বাক্স, ডিজেল ভর্তি চুয়াল্লিশ গ্যালনের কয়েকটা ড্রাম। এত সব জিনিস, অথচ তারপরও উঠানে প্রচুর জায়গা পড়ে আছে, এর কারণ প্রতিটি জিনিস সামরিক শৃঙ্খলা বজায় রেখে গুছিয়ে রাখা হয়েছে। গেটের ঠিক ভেতরে দশ-বারোটা ঘর, করোগেটেড শিট দিয়ে তৈরি। 'বড় একটা আউটফিট,' বলল রানা। 'নিজেদের কাজ বোঝে ওরা। চলুন দেখা যাক চার্জে কে আছে।'

গেটে দু'জন গার্ড, ইথিওপিয়ান আর্মির ক্যামোফ্লেজ ইউনিফর্ম পরা। অচেনা ল্যান্ড ক্রুজার দেখে বিস্মিত হয়েছে তারা। রানা হর্ন বাজাতে একজন এগিয়ে এল, সন্দেহে কুঁচকে আছে ভুরু, হাতে বাগিয়ে ধরা এ/কে ফরটিসেভেন রাইফেল।

'এখানকার ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে চাই,' আরবীতে বলল রানা, বলার সুরে কর্কশ কর্তৃত্ব থাকল, সেন্ট্রিদের অনিশ্চিয়তা ও অস্বস্তির মধ্যে ফেলাটাই উদ্দেশ্য।

অপেক্ষা করতে বলে সঙ্গীর কাছে ফিরে পরামর্শ করল সেন্ট্রি, তারপর টু-ওয়ে রেডিওর হ্যান্ডসেট তুলে মাইক্রোফোনে কথা বলল। কথা বলার পর পাঁচ মিনিট পেরিয়েছে, কাছাকাছি একটা ঘরের দরজা খুলে একজন শ্বেতাঙ্গ বেরিয়ে এল।

তার পরনে খাকি কভারঅল, মাথায় নরম বুশ ক্যাপ। চোখ দুটো আয়না লাগানো সানগ্লাসে ঢাকা। শক্ত লেদারের মত গায়ের চামড়া, আকারে প্রকাণ্ড না হলেও শক্ত-সমর্থ, আস্তিন গুটানো হাতে পেশী ফুলে আছে। গার্ডের সঙ্গে দু'একটা কথা বলে টয়োটার দিকে এগিয়ে এল সে।

'কি চাই? কেন আসা হয়েছে?' কথার সুরে টেক্সাসের বাচনভঙ্গি স্পষ্ট, না ধরানো চুরুটটা দু'সারি দাঁতের মাঝখানে আটকে রেখেছে।

'আমি মাসুদ রানা।' ট্রাক থেকে নেমে এগিয়ে এল ও, হাত বাড়াল। 'হাউ ডু ইউ ডু?'

আমেরিকান লোকটা ইতস্তত করল, তারপর এমন ভঙ্গিতে হাতটা ধরল তাকে যেন একটা ইলেকট্রিক ঈল মোচড়াতে দেয়া হয়েছে। 'রাফেল,' বলল সে। 'জ্যাক রাফেল। আমিই এখানকার ফোরম্যান।' লোকটার হাতের সব ক'টা শিরা ফুলে আছে, শুকনো কয়েকটা ক্ষতচিহ্নও লক্ষ করল রানা। নখের ভেতর গ্রিজ, কালো হয়ে আছে।

'বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। দেখুন না, হঠাৎ ট্রাকটা বেঁকে বসেছে। ভাবলাম এখানে যদি কোন মেকানিক পাই, দেখাব।' হাসল রানা, তবে বিনিময়ে লোকটা কোন রকম উৎসাহ দেখাল না।

'উটকো ঝামেলায় জড়ানো কোম্পানীর পলিসি নয়।' মাথা নাড়ল লোকটা।

'টাকা লাগলে দিতে রাজি আছি···।'

'একবার তো বললাম, না!' দাঁত থেকে চুরুট নামিয়ে মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করছে রাফেল।

'আপনাদের কোম্পানী–প্রক্সি। বলতে পারেন হেড অফিস কোথায়? ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নাম কি?'

'আমি খুব ব্যস্ত মানুষ। আপনি আমার সময় নষ্ট করছেন।' ঘুরে দাঁড়াতে গেল রাফেল।

'শিকার করতে এসেছি, কয়েক হপ্তা এদিকে গুলি ছুঁড়ব। আমি চাই না ভুল করে আপনার কর্মচারীদের কারও গায়ে লাগুক। একটা ধারণা দিতে পারেন, কোনদিকে আপনারা কাজ করবেন?'

'এখানে আমি একটা প্রসপেক্টিং আউটফিট চালাচ্ছি, মিস্টার। গতিবিধি সম্পর্কে খবর ফাঁস করতে পারি না। যান!' ঘুরে সোজা নিজের অফিস-ঘরে চলে গেল রাফেল।

'ছাদে স্যাটেলাইট ডিস্ক,' মন্তব্য করল রানা। 'ভাবছি এই মুহূর্তে কার সঙ্গে কথা বলছে রাফেল।'

'টেক্সাসে কারও সঙ্গে?' জিজ্ঞেস করল নিমা।

'নট নেসেসারিলি,' বলল রানা। 'প্রক্সি নামকরা মাল্টিন্যাশনাল। রাফেল টেক্সান, তারমানে এই নয় যে তার বসও তাই হবে।' ইউ টার্ন নিল টয়োটা। 'প্রক্সির কুৎসিত কেউ যদি এই ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িত থাকে, আমার নামটা তার চেনা চেনা লাগবে। আমরা আমাদের হাজিরা নোটিশ দিয়েছি, দেখা যাক কি জবাব পাওয়া যায়।'

ডানডেরা নদী ও জলপ্রপাতের কাছে ফিরে এসে ওরা দেখল ইতিমধ্যে ক্যাম্প ফেলা হয়েছে, ওদের জন্যে চা বানাতে বসে গেছে শেফ। সন্ধের মধ্যে পুরো আধ বোতল ভদকা শেষ না করা পর্যন্ত মুখ হাঁড়ি করে থাকল উস্তাভ। তারপর সে জানাল, 'ঘোড়া আর গাধার বাচ্চা এখানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করার কথা। এখানকার মানুষগুলোও তাই, খচ্চর: সময়ের কোন মূল্য দেয় না। ওরা না পৌঁছুলে খাদে আমরা নামতে পারব না।'

রানা খেয়াল করল, স্থানীয় লোকজনকে 'কালা কুত্তা' বলা থেকে বিরত

থাকছে উত্তাভ।

সকালে নাস্তা খাবার পরও যখন খচ্চরগুলো পৌঁছল না, নিজের রাইফেলটা হাতে নিল রানা। ওর কাছ থেকে সেটা চেয়ে নিয়ে পরীক্ষা করল উত্তাভ। 'মনে হচ্ছে পুরানো একটা রাইফেল?' জিজ্ঞেস করল সে।

'উনিশশো ছাব্বিশ সালে তৈরি।'

'তখনকার লোকজন জানত কিভাবে রাইফেল বানাতে হয়?' প্রশংসা করল উত্তাভ। 'শর্ট মাউজার ওবানডর্ফ ডাবল স্ক্যারব্রিজ অ্যাকশন, বিউটিফুল। তবে নতুন করে ব্যারেল লাগানো হয়েছে, ঠিক বলিনি?'

'অরিজিন্যাল ব্যারেল কেটে ফেলে দিয়েছি,' বলল রানা। 'নতুনটা লাগানোয় এখন আমি একশো কদম দূর থেকে একটা মশার ডানা উড়িয়ে দিতে পারি।'

'ক্যালিবার সেভেন ইনটু ফিফটিসেভেন, ঠিক?'

'টুসেভেনটিফাইভ রিগবি,' তার ভুলটা ধরিয়ে দিল রানা।

'একই কার্টিজ, আপনারা কায়দা করে অন্য নাম দিয়েছেন।' হাসছে উত্তাভ। 'একশো পঞ্চাশ গ্রেন বুলেট প্রতি সেকেন্ডে দু'হাজার আটশো ফুট গতি পাবে। সত্যি খুব ভাল রাইফেল, সেরাগুলোর মধ্যে একটা।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'আপনার প্রশংসার আমি মূল্য দিই।'

'কালা মানুষদের রসবোধ!'

টার্গেট প্র্যাকটিস করার জন্যে ক্যাম্প ত্যাগ করল রানা, ওর সঙ্গে নিমাও এল। নদীর তীরে এসে দুটো ক্যানভাস ব্যাগে সাদা বালি ভরল ওরা। একটা পাথরের ওপর ব্যাগ দুটো রাখা হলো, রাইফেলের রেস্ট হিসেবে কাজ করবে। ব্যাক-স্টপ হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে খোলা হিলসাইড। দুশো গজ এগোল রানা, ওখানে একটা কার্ডবোর্ড কার্টুন সেট করল, তার ওপর টেপ দিয়ে আটকাল একটা বিসলে-টাইপ টার্গেট। পাথরটার পিছনে ফিরে এল আবার, এখানে নিমা আর রাইফেলটা অপেক্ষা করছে।

গুলির প্রথম আওয়াজটাই ঘাবড়ে দিল নিমাকে। রাইফেলটা দেখতে এত নিরীহ, তা থেকে এরকম বিকট আওয়াজ বেরুতে পারে, ভাবা যায় না। মনে হলো নিমার কানে যেন ভোঁ বাজছে। টার্গেটের তিন ইঞ্চি ডানে আর দু'ইঞ্চি নিচে লেগেছে বুলেট। টেলিস্কোপ সাইট অ্যাডজাস্ট করল রানা। পরবর্তী শট বুলসআইয়ের মাত্র এক ইঞ্চি ওপরে লাগল।

'আপনি নিরীহ প্রাণীগুলোকে এই ভয়ঙ্কর অস্ত্র দিয়ে মারবেন?' নিমার কথায় প্রতিবাদ ও আপত্তির সুর। 'এ কিন্তু উচিত নয়।'

'কেন, উচিত নয় কেন? ঈশ্বর তো ওগুলো আমাদেরকে দান করেছেন। আপনি তো বিশ্বাসী। উদ্ধৃতি শোনান আমাকে—অ্যান্ডস টেন, ভার্সেস টুয়েলভ অ্যান্ড থারটিন।'

'দুঃখিত,' মাথা নাড়ল নিমা। 'আপনি শোনান।'

'শুনুন—"...অল ম্যানার অব ফোরফুটেড বীস্টস অব দি আর্থ, অ্যান্ড ওয়াইল্ড বীস্ট, অ্যান্ড ক্রীপিং থিংস, অ্যান্ড ফাউলস অব দি এয়ার",' অনুরোধ রক্ষা করছে রানা। '"অ্যান্ড দেয়ার কেম আ ভয়েস টু হিম, রাইজ, পিটার; কিল,

অ্যান্ড ঈট"।'

'আপনার উকিল হওয়া উচিত ছিল।' কৃত্রিম হতাশায় গুঙিয়ে মত উঠল নিমা।

আধ ঘন্টা পর কেসে ভরা রাইফেল নিয়ে ক্যাম্পে ফিরছে ওরা, কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'মেহমান!' বলে চোখে বিনকিউলার তুলল। 'বাহ্, নোটিশে তাহলে কাজ হয়েছে! ওখানে প্রক্সির একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে, নিমা। চলুন দেখা যাক কি ঘটছে।'

ক্যাম্পের আরও কাছাকাছি এসে ওরা দেখল দশ কি বারোজন ইউনিফর্ম পরা সৈনিক লাল-সবুজ প্রক্সি ট্রাকের পাশে জড়ো হয়েছে, সবাই ভারী অস্ত্রে সজ্জিত। ডাইনিং তাঁবুর ফ্ল্যাপ তোলা, ভেতরে ক্যাম্প চেয়ার পেতে বসে রয়েছে জ্যাক রাফেল, একজন ইথিওপিয়ান আর্মি অফিসার ও উস্তাভ। গভীর আলোচনায় মগ্ন।

রানা ভেতরে ঢুকতেই চশমা পরা ইথিওপিয়ান আর্মি অফিসারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল উস্তাভ। 'ইনি কর্নেল জুলিয়াস ঘুমা, সাউদার্ন গোজাম এলাকার মিলিটারি কমান্ডার।'

'হাউ ডু ইউ ডু?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কর্নেল কঠিন সুরে বলল, 'আপনার পাসপোর্ট আর ফায়ার আর্মসের লাইসেন্স দেখান।' তার চেহারা থমথম করছে। পাশে বসা জ্যাক রাফেলের চোখে নগ্ন উল্লাস, নিভে যাওয়া চুরুট চিবাচ্ছে।

নিজের তাঁবু থেকে কাগজ-পত্র নিয়ে এল রানা। টেবিলের ওপর সেগুলো মেলে ধরে বলল, 'আমি জানি, ব্রিটিশ ফরেন সেক্রেটারির দেয়া আমার পরিচয়-পত্রটাও দেখতে চাইবেন আপনি। আর এটা হলো আদ্দিস আবাবা থেকে দেয়া ব্রিটিশ অ্যামব্যাসাডরের প্রশংসা-পত্র। আর এই যে, এটা দেখছেন, লন্ডনে ইথিওপিয়ার অ্যামব্যাসাডর ভদ্রলোক দিয়েছেন। আরেকটা, এটাই শেষ, দিয়েছেন আপনাদের প্রতিরক্ষামন্ত্রী, জেনারেল সাইয়ি আব্রাহা।'

অলঙ্কৃত অফিশিয়াল লেটারহেড আর সরকারী সীল-ছাপ্পড়ের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল কর্নেল ঘুমা। সোনালি ফ্রেমের চশমার ভেতর তার চোখ দুটোয় প্রায় বিহ্বল দৃষ্টি। 'স্যার!' লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল সে, কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে স্যালুট করল। 'আপনি আগে বলেননি কেন? জেনারেল আব্রাহার বন্ধু আপনি? জানতাম না, আমি জানতাম না! কেউ আমাকে বলেনি। বিরক্ত করার জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত, স্যার!'

আবার স্যালুট করল সে, বিব্রত বোধ করায় আনাড়ি ও আড়ষ্ট লাগছে তাকে। 'আমি শুধু আপনাকে বলতে এসেছিলাম যে প্রক্সি কোম্পানী এলাকায় ড্রিলিং ও ব্লাস্টিং অপারেশন চালাচ্ছে। বিপদ ঘটতে পারে। প্লীজ, সাবধান থাকবেন। তাছাড়া, এলাকায় অসংখ্য ডাকাত আর গুফতা আছে, সেদিক থেকেও সাবধান থাকতে হবে আপনাকে।' উত্তেজনায় হাঁপিয়ে গেছে সে, দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। 'বুঝতেই পারছেন, প্রক্সি কোম্পানীর এমপ্লয়ীদের জন্যে এসকর্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি এখানে আমরা। যে-কোন রকম বিপদে আমাকে শুধু একটা খবর দিলেই হবে, আপনার সাহায্যে হাজির হয়ে যাব আমরা।'

'ধন্যবাদ, কর্নেল।'

'আপনাকে আর বিরক্ত করব না, স্যার।' তৃতীয়বার স্যালুট করে প্রক্সি ট্রাকের দিকে পিছু হটছে কর্নেল, টেক্সান ফোরম্যানকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে। জ্যাক রাফেল এ পর্যন্ত একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি, কোনরকম বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়েই চলে যাচ্ছে সে। ট্রাক চলতে শুরু করার পর ক্যাব জানালা থেকে চতুর্থ ও শেষ স্যালুটটা করল কর্নেল ঘুমা।

স্যালুটের উত্তরে অলসভঙ্গিতে একবার হাত নাড়ল রানা, নিমাকে বলল, 'সব মিলিয়ে বোঝা গেল, মি. প্রক্সি চান না এদিকে আমরা থাকি। সন্দেহ করছি শিগগির আবার তিনি সার্ভিস দিতে আসবেন।'

ডাইনিং টেবিলের কাছে ফিরে এসে উস্তাভকে রানা বলল, 'এখন শুধু আপনার খচ্চরগুলো এলেই হয়।'

'গ্রামে লোক পাঠিয়েছি। এসে পড়বে।'

খচ্চরগুলো পৌঁছুল পরদিন সকালে। ছ'টা শক্ত-সমর্থ জানোয়ার, প্রতিটির সঙ্গে খাকি শর্টস আর সাদা হাফশার্ট পরা একজন করে চালক। সকাল দশটার মধ্যে ওগুলোর পিঠে মাল-পত্র চাপিয়ে খাদে নামার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলল ওরা। পথের শেষ মাথায় থামল উস্তাভ, গলা লম্বা করে ঢালের দিকে তাকাল। তার মত লোককেও অন্তত এই একবার খাদের সীমাহীন পতন ও দুরধিগম্য বিভীষিকা সন্ত্রস্ত ও নার্ভাস করে তুলল।

'আপনারা ভিন্ন এক জগতের ভিন্ন এক সময়ের ভেতর ঢুকতে যাচ্ছেন,' প্রায় দার্শনিক ভঙ্গিতে বলল সে। 'ওরা বলে, ট্রেইলটা দু'হাজার বছরের পুরানো, যীশুর বয়েসী। ডেবরা মারিয়াম চার্চের কালো প্রিস্ট গল্প শোনায়, যীশু ক্রুশবিদ্ধ হবার পর ইসরায়েল থেকে পালাবার সময় ভার্জিন মেরী এই পথ ধরেই গিয়েছিলেন।' মাথা নাড়ল সে। 'তবে কথা হলো, এখানকার লোকেরা সত্যি-মিথ্যে সবই বিশ্বাস করে।' ট্রেইলে পা ফেলল সে।

পাহাড়-প্রাচীরকে জড়িয়ে আছে ওটা, নেমে গেছে এমন তির্যক ভঙ্গিতে, আর পাথরের ধাপগুলো পরস্পরের কাছ থেকে এত দূরে, যে প্রতিটি পদক্ষেপে হাঁটু ও পেটের শিরা পেশী ও চামড়ায় প্রবল চাপ পড়ে, ঝাঁকি খায় শিরদাঁড়া। ট্রেইলের পতন আরও বেশি খাড়া ও কর্কশ যেখানে, পাথর ধরে ঝুলে পড়তে হলো ওদেরকে, কিংবা ক্রল করে এগোতে হলো।

দেখে মনে হলো অসম্ভব ব্যাপার, ভারী বোঝা নিয়ে খচ্চরগুলো ওদেরকে অনুসরণ করতে পারবে না। ওগুলো যে কিরকম সাহসী, না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। পাথরের এক ধাপ থেকে আরেক ধাপে লাফ দিল, পড়ার পর সামনের দুই পা ভাঁজ হয়ে গেল, পেশী শক্ত করে তৈরি হলো পরবর্তী ধাপে লাফ দেয়ার জন্যে। ট্রেইলটা এত সরু যে পেটমোটা বোঝা একদিকের পাথরের পাঁচিলে ঘষা খাচ্ছে, অপরদিকের সীমাহীন অধোগতি ফাঁক লোভীর মত হাঁ করে আছে।

ট্রেইল যখন বেঁকে গেছে, খচ্চরগুলো লাফ দিয়ে বাঁক নিতে পারছে না বা একবারের চেষ্টায় এগোতে পারছে না। পিছিয়ে এসে ট্রেইলটা স্পর্শ দিয়ে অনুভব

করতে হচ্ছে, পাঁচিলে গা ঘষে থেমে থেমে প্রতি বার একটু একটু করে এগোচ্ছে, ঘন ঘন দেখে নিচ্ছে খাদের কিনারা, আতঙ্কে ঘুরে গিয়ে বেরিয়ে আসছে চোখের সাদা অংশ। কর্কশ হুঙ্কার ছেড়ে, ওগুলোর গায়ে চাবুক মারছে চালকরা।

কোথাও কোথাও ট্রেইলটা পাহাড়ের ভেতর ঢুকে পড়েছে। কয়েকবার ভেতরে ঢোকা অসম্ভব মনে হলো, সরু প্রবেশমুখের দু'পাশে সুচের মত ধারাল হয়ে আছে পাথর। কোথাও আবার মুখটা এতই সরু যে বোঝা সহ খচ্চর ভেতরে ঢুকতে পারবে না। অগত্যা পিঠ থেকে সব নামাতে হলো, খানিক দূর এগিয়ে তুলতে হবে আবার।

'দেখুন!' অবাক বিস্ময়ে চিৎকার দিল নিমা, হাত তুলে ফাঁকা দিকটা দেখাল। খাদের গভীরতা থেকে বিশাল ডানা মেলে উঠে এল কালো একটা শকুন, ভেসে গেল প্রায় ওদের দুই হাত দূর দিয়ে, লালচে নগ্ন মাথা ঘুরিয়ে কালো চোখে তাকাল ওদের দিকে।

পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে জড়িয়ে থাকা ট্র্যাক ধরে সারাদিন এগোল ওরা, বিকেল শেষ হয়ে আসছে অথচ এখনও অর্ধেক দূরত্বও পেরোয়নি। আরও একবার পুরোপুরি উল্টোদিকে ঘুরে গেল ট্রেইল, সামনে থেকে ভেসে এল জলপ্রপাতের গর্জন। প্রকাণ্ড একটা ঝুল-পাথরের দিকে এগোচ্ছে ওরা, আওয়াজটা সেই সঙ্গে বাড়ছে। কোণ ঘুরে ওটাকে পেরিয়ে আসতেই বিপুল জলরাশির পতন পুরোপুরি দৃষ্টিসীমার ভেতর চলে এল।

প্রবল বর্ষণে ঝড়ের মত গতি পেয়ে গেছে বাতাস, মনে হলো ওদেরকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে; পাহাড়-প্রাচীরের গর্তের কিনারা আঁকড়ে ধরে কোন রকমে ঝুলে থাকতে হলো। ওদের চারদিকে রাশি রাশি জলকণা বিস্ফোরণের মত ছড়িয়ে পড়ছে, ভিজিয়ে দিচ্ছে উঁচু করা মুখ, কিন্তু ইথিওপিয়ান গাইড থামার সুযোগ না দিয়ে সোজা এগিয়ে নিয়ে চলল। এক সময় মনে হলো বর্ষণের তোড়ে উপত্যকায় ভেসে যাবে ওরা, এখনও কয়েকশো ফুট নিচে সেটা।

তারপর, যেন মন্ত্রবলে, ভাগ হয়ে গেল বিপুল জলরাশি, স্বচ্ছ নিবিড় পতনশীল পর্দার পিছনে পা ফেলে ঢুকে পড়ল শ্যাওলা ঢাকা ও ভেজা চকচকে পাথরের গভীর ফোকরে–হাজার বছর ধরে পানির তোড়ে পাহাড়-প্রাচীর ক্ষয়ে যাওয়ায় তৈরি হয়েছে। গাঢ় ছায়াময় এই জায়গায় আলো আসছে শুধু জলপ্রপাত ভেদ করে, তার রঙ সবুজাভ, ফলে গা ছমছমে রহস্যময় একটা আবহ তৈরি হয়েছে, ওরা যেন সাগরের তলায় একটা গুহার ভেতর রয়েছে।

'আজ রাতে এখানে আমরা ঘুমাব,' জানাল উস্তাদ, ওদের বিস্ময় উপভোগ করছে সে। গুহার পিছনে জ্বালানি কাঠের বান্ডিলগুলো ইঙ্গিতে দেখাল, পাশেই পাথরের তৈরি ফায়ারপ্লেস, ওপরের দেয়াল ধোঁয়া লেগে কালো হয়ে আছে। 'খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে মঠ সন্ন্যাসীদের জন্যে খাবার নিয়ে যায় গ্রামবাসীরা, এই জায়গা তারা কয়েকশো বছর ধরে ব্যবহার করছে।'

গুহার আরও ভেতরে চলে আসায় জলপ্রপাতের শব্দ ক্রমশ ভোঁতা হয়ে এল, পায়ের নিচে এখন শুকনো পাথর। চাকররা আগুন জ্বালার পর রোমান্টিক যদি না-ও হয়, আরামদায়ক আশ্রয় হয়ে উঠল জায়গাটা। এক কোণে স্লীপিং ব্যাগের

fb.com/groups/BoiLoversPolapain

ভাঁজ খুলল রানা, স্বভাবতই ওর পাশে নিমাও। দু'জনেই খুব ক্লান্ত, স্লীপিং ব্যাগের ভেতর লম্বা হয়ে পেশীতে ঢিল দেয়ার চেষ্টা করল, গুহার ছাদে লাল-গোলাপি প্রতিফলন দেখছে।

'ভাবুন একবার!' ফিসফিস করল নিমা। 'কাল আমরা স্বয়ং টাইটার পায়ের ছাপে পা ফেলব।'

'ভার্জিন মেরীর কথা না হয় বাদই দিলাম।' হাসল রানা।

'আপনি অসহ্যরকম বিশ্বনিন্দুক,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল নিমা। 'আমার আরও ধারণা, আপনার নাক ডাকে।' তর্কযুদ্ধ জমল না, একটু পরই ঘুমিয়ে পড়ল ও।

ভোর হবার আগেই নড়াচড়া শুরু করল খচ্চর চালকরা। পায়ের সামনেটা দেখা যায়, এরকম আলো ফুটতেই আবার ওরা রওনা হলো। পাহাড়-প্রাচীরের ওপরের অংশে সকালের প্রথম রোদ লাগল যখন, তখনও ওরা উপত্যকার মেঝে থেকে এত উঁচুতে রয়েছে যে নিচের গোটা এলাকার ওপর চোখ বুলানো সম্ভব হলো। নিমাকে কাছে টেনে নিল রানা, বাকি ক্যারাভানকে থাকতে দিল ওদের সামনে। বসার একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে প্যাঁচানো স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফ খুলল ও। নিচের দৃশ্য থেকে প্রধান প্রধান চূড়া আর বৈশিষ্ট্যগুলোকে চিহ্নিত করল ওরা, ফলে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া গেল কোথায় ওরা রয়েছে। 'এখান থেকে অ্যাবে নদী আমরা দেখতে পাব না,' বলল রানা। 'সেটা এখনও উপ-খাদের গভীরে লুকিয়ে আছে। দেখতে পাব সম্ভবত সরাসরি ওটার ওপরে পৌঁছুবার পর।'

'যেখানে আছি বলে হিসাব করলাম তাতে যদি ভুল না হয়, একজোড়া হাঁসুলিবাঁক ঘোরার পরই নদীটা দেখতে পাবার কথা—সম্ভবত ওই খাড়া পাঁচিলটার ওদিকেই বাঁক দুটো পাওয়া যাবে।'

'বোধহয়,' সায় দিল রানা। 'আর ডানডেরা নদী অ্যাবের সঙ্গে মিলিত হয়েছে ওদিকের ওই পাঁচিলগুলোর নিচে।' বুড়ো আঙুলের গিট ব্যবহার করল আনুমানিক দূরত্ব মাপার জন্যে। 'এখান থেকে প্রায় পনেরো মাইল।'

'দেখে মনে হচ্ছে হাজার বছরের মধ্যে কয়েকবারই গতিপথ বদল করেছে ডানডেরা। আমি অন্তত দুটো নালার আভাস পাচ্ছি, দেখতে প্রাচীন রিভার বেডের মত।' হাত তুলে দেখাল নিমা। 'ওখানে, আর ওদিকে। এখন অবশ্য জঙ্গলে ঢাকা পড়ে গেছে।' নিচে আরেকবার চোখ বুলিয়ে দম আটকাল ও। 'কি বিশাল এলাকা! আর কি জটিল! এই দুর্গম পাথরের জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা সমাধির [illegible] কিভাবে খুঁজে পাব আমরা?'

'[illegible] কোন সমাধির কথা বলা হচ্ছে?' পিছন থেকে সাগ্রহে জানতে চাইল উস্তাভ। [illegible] ট্রেইল ধরে পিছিয়ে এসেছে সে। তার পায়ের আওয়াজ ওরা শুনতে পায়নি। 'কি, চুপ হয়ে গেলেন কেন? কার সমাধি খুঁজছেন আপনারা?'

'কার আবার,' [illegible] রানার ঠোঁটে হাসি লেগে থাকল, 'সেন্ট ফ্রুমেনটিয়াসের সমাধি।'

'মঠটা না সেন্টের নামে উৎসর্গিত?' ফটোগ্রাফ পেঁচিয়ে রাখার সময় উস্তাভের দিকে ফিরে নিমাও হাসল।

'হ্যাঁ।' হতাশ দেখাল উস্তাভকে, যেন আরও ইন্টারেস্টিং কিছু শুনবে বলে আশা করেছিল। 'হ্যাঁ, সেন্ট ক্রমেনটিয়াস। তবে ওরা আপনাদেরকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না। সন্ন্যাসীরা ছাড়া ভেতরে ঢোকার অনুমতি নেই কারও।' ক্যাপ নামিয়ে মাথা চুলকাল সে, তার চুল তারের মত, নখের ঘষায় প্রায় ধাতব শব্দ উঠছে। 'এ হপ্তায় তিমকাত উৎসব হবে। আনন্দ-উত্তেজনার বন্যা বয়ে যাবে ওখানে। বাইরে থেকে দেখে মজা পেতে হবে, ভেতরে ঢুকতে পারবেন না।'

চোখ কুঁচকে সূর্যের দিকে তাকাল সে। 'চলুন যাওয়া যাক। দেখে মনে হচ্ছে কাছে, কিন্তু অ্যাবেতে পৌঁছুতে আরও দু'দিন লেগে যাবে আমাদের। নিচে আরও কঠিন পথ, এমন কি ডিক-ডিক শিকারীর জন্যেও।' নিজের কৌতুকে হেসে উঠে ঘুরে দাঁড়াল সে, ট্রেইল ধরে এগোল।

পাহাড়-প্রাচীরের যতই নিচে নামছে ওরা ট্রেইল ততই মসৃণ হয়ে উঠছে, ধাপগুলো আগের চেয়ে অগভীর, পরস্পরের সঙ্গে দূরত্বও বাড়ছে। সহজে এগোনো যাচ্ছে, তাই গতিও বেড়ে গেল। তবে বাতাসের মান ও স্বাদ বদলে গেছে। পাহাড়ী ঠাণ্ডা বাতাস উধাও হয়েছে, তার বদলে স্থান দখল করেছে শক্তিহীন নিস্তেজ বাতাস, তাতে সীমা না মানা জঙ্গলের স্বাদ ও গন্ধ লেগে আছে।

'গরম!' বলে উলেন শালটা গা থেকে খুলে ফেলল নিমা।

'দশ ডিগ্রী বেশি,' আন্দাজ করল রানা। পুরানো আর্মি জার্সিটা মাথা গলিয়ে খুলে আনল, এলোমেলো হয়ে থাকল এক রাশ কালো চুল। 'নিচে আরও গরম লাগবে। অ্যাবেতে পৌঁছুবার আগে আরও তিন হাজার ফুট নামতে হবে।'

এরপর বেশ খানিকদূর ডানডেরা নদী ঘেঁষে এগিয়েছে ট্রেইল। মাঝে মধ্যে দেখা গেল নদীটা থেকে কয়েক শো ফুট ওপরে রয়েছে ওরা, আবার খানিক পরই নেমে আসতে হলো কোমর সমান পানিতে, তীব্র স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যাবার ভয়ে খচ্চরের পিঠে চাপানো বোঝা আঁকড়ে ধরে আছে।

তারপর ডানডেরা নদীর খাদ এত গভীর আর খাড়া হয়ে উঠল যে অনুসরণ করা সম্ভব নয়, পাহাড়-প্রাচীর সটান দাঁড়িয়ে আছে পানির ওপর। কাজেই নদী ছেড়ে আঁকাবাঁকা ট্র্যাক ধরল ওরা, ভাঙাচোরা পাহাড় আর লাল পাথুরে ব্লাফের মাঝখান দিয়ে এগিয়েছে।

ভাটির দিকে এক কি দু'মাইল এগোবার পর আবার ওরা অন্য এক মেজাজের ডানডোরার সঙ্গে মিলিত হলো, নদী এখানে ঘন ও নিবিড় বন ভূমির ভেতর দিয়ে কলকল শব্দে ছুটে চলেছে। লতানো গাছের ডগা পানি ছুঁয়ে আছে, ওদের মাথায় গাছের শ্যাওলা লেগে গেল। ওদেরকে দেখে ডালে ডালে খুব লাফালাফি আর চেঁচামেচি করছে কয়েক ঝাঁক বাঁদর। একবার নিচের ঝোপ ভেঙেচুরে ছুটল বড় আকৃতির একটা জানোয়ার। ঝট করে উস্তাভের দিকে তাকাল রানা।

মাথা নাড়ল রুশ পাইড, হাসছে। 'না, ডিক-ডিক নয়। কুডু।'

সারাটা দিন আঁকাবাঁকা ট্রেইল ধরে এগোল ওরা, শেষ বিকেলে ক্যাম্প ফেলল নদীর খানিকটা ওপরে, ফাঁকা একটা জায়গায়। এখানে আগেও অনেকবার ক্যাম্প ফেলা হয়েছে, লক্ষণ দেখে বোঝা গেল। ট্রেইল যেন এখানে দুই সময়শাসিত পর্যায়ে বিভক্ত—জলপ্রপাতের মাথা থেকে মঠে নামতে ট্যুরিস্টদের

পুরো তিন দিন লাগে, সবাই তারা এই একই জায়গায় ক্যাম্প ফেলে।

'দুঃখিত, এখানে কোন শাওয়ার নেই,' মক্কেলদের জানাল উস্তাভ। 'হাত-মুখ ধুতে চাইলে উজানের দিকে প্রথম বাঁক ঘুরলে নিরাপদ একটা পুল আছে।'

নিমার চোখে আবেদন, 'রানা, ঘামে একদম ভিজে গেছি। এমন কোথাও পাহারা দেবেন, ডাকলে যাতে শুনতে পান?'

বাঁকটার ঠিক নিচেই শ্যাওলা ঢাকা তীরে শুয়ে থাকল রানা; কাছাকাছি, তবে দৃষ্টিসীমার বাইরে থেকে ভেসে আসা নিমার পানি ছিটানো আর মৃদু হাসির শব্দ শুনছে। একবার মাথা ঘোরাবার পর উপলব্ধি করল স্রোত নিশ্চয়ই নিমাকে ভাটির দিকে টেনে নিয়ে এসেছে, কারণ গাছপালার ফাঁকে এক পলকের জন্যে নগ্ন পিঠ দেখা গেল, তারপর নিতম্বের ভাঁজ-মাখনের মত, ভেজা ও চকচকে। অপরাধবোধ জাগায় তাড়াতাড়ি চোখ ফেরাল রানা।

খানিক পর ভাটির দিক থেকে তীর ধরে এগিয়ে আসতে দেখা গেল নিমাকে, কোমল সুরে গুন গুন করছে, চুলের পানি মুছছে তোয়ালে দিয়ে। 'আপনার পালা, রানা। চান আমি পাহারায় থাকি?'

'আমি এখন বড় হয়েছি।' মাথা নাড়ল রানা, তবে নিমা পাশ কাটানোর সময় তার চোখে রক্তিম লজ্জা আর সেই সঙ্গে কৌতুকের ক্ষীণ ঝিলিক দেখতে পেল। হঠাৎ রানা ভাবল, নিমা কি জানে স্রোতের টানে কতটা ভাটির দিকে চলে এসেছিল সে, তার কতটুকু দেখে ফেলেছে ও? চিন্তাটা রোমাঞ্চিত করে তুলল ওকে।

গোসল করার জন্যে উজানে চলে এল রানা। কাপড় খোলার সময় উপলব্ধি করল নিমা ওকে কতটা উত্তেজিত করে তুলেছে। 'ঠাণ্ডা পানি উপকারে আসবে,' বিড়বিড় করল ও, তারপর ডাইভ দিল নদীতে।

সন্ধ্যার পরপরই খাওয়াদাওয়া শেষ করে ক্যাম্পফায়ারের সামনে বসে আছে ওরা, হঠাৎ মুখ তুলে কান পাতল রানা। 'কিসের একটা আওয়াজ হচ্ছে না?'

'ঠিক ধরেছেন,' হেসে উঠে বলল রুবি। 'আপনি গান শুনতে পাচ্ছেন। আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে মঠের পুরোহিতরা আসছেন।'

ঠিক তখনই আগুনের লাল শিখা দেখতে পেল ওরা, আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ ধরে উঠে আসছে মশালমিছিল, গাছ-পালার ভেতর দিয়ে ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে আসায় মিটমিট করছে আলোগুলো খচ্চর চালক আর চাকরবাকররা ভিড় করে সামনে বাড়ল, ছন্দোবদ্ধ গানের সঙ্গে তালি দিচ্ছে, স্বাগত জানাচ্ছে সম্মানীয় মঠ প্রতিনিধিদের।

ভারি ও গভীর পুরুষকণ্ঠ ক্রমশ চড়ছে, তারপর আবার ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে অস্পষ্ট ফিসফিসানি, তবে বাতাসে মিলিয়ে যাবার আগেই আবার চড়ছে, এভাবে বারবার। গানের কথাগুলো বোঝা গেল না, তবে সম্মিলিত কণ্ঠের প্রলম্বিত সুর হৃদয়কে দোলা দিয়ে যায়, আপনা থেকে ভক্তির একটা ভাব চলে আসে মনে। রানার শরীর শিরশির করে উঠল, হিম রোমাঞ্চ নেমে এল শিরদাঁড়া বেয়ে।

তারপর দেখা গেল পুরোহিতদের সাদা আলখেল্লা, মশালের আলোয়

দেওয়ালি পোকার মত লাগছে, উঠে আসছে ট্রেইল ধরে। ক্যাম্পের সামনে খোলা জায়গায় সাধুদের দেখামাত্র ক্যাম্প সার্ভেন্টরা জমিনে হাঁটু গাড়ল। সামনের সারিতে রয়েছে অধস্তন তরুণ উপাসকরা, খালি পায়ে ও খালি মাথায়। তাদের পিছু নিয়ে এলেন সন্ন্যাসীরা, পরনে দীর্ঘ আলখেল্লা ও লম্বা পাগড়ী। কয়েক সারিতে এলেন তাঁরা, তবে দু'পাশে সরে গিয়ে পিছনটা ফাঁক করে দিলেন। সন্ন্যাসীরা আসলে এই মুহূর্তে মর্যাদাপূর্ণ প্রহরীর ভূমিকা পালন করছেন, তাঁদের ঠিক পিছনেই রয়েছেন নকশাদার আলখেল্লা ও অলঙ্কার পরিহিত যাজক বা পুরোহিতরা।

তাঁদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে ভারী কপটিক ক্রস, বসানো হয়েছে রূপোয় মোড়া একটা দণ্ডের মাথায়। পুরহিতদের সারিটাও দু'পাশে সরে গেল, আবেগমথিত সুরে এখনও তাঁরা গানের মাধ্যমে ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করছেন, সরে গিয়ে চাঁদোয়া ঢাকা পালকিটাকে সামনে এগোবার পথ করে দিলেন। চারজন তরুণ উপাসক বয়ে নিয়ে এল সেটা, নামিয়ে রাখল ক্যাম্পের ঠিক মাঝখানে। মশাল ও ক্যাম্প লণ্ঠনের আলোয় লাল আর হলুদ সিল্ক পর্দা ঝলমল করছে।

'মোহন্তকে অভ্যর্থনা জানাতে সামনে এগোতে হবে,' ফিসফিস করল উস্তাভ। 'তাঁর নাম ওলি জারকাস।' পালকির কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা, নাটকীয় ভঙ্গিতে পর্দা সরিয়ে দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি মাটিতে পা রাখলেন।

নিমা ও রুবি সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে জমিনে হাঁটু গাড়ল, হাতজোড় করল বুকে। তবে রানা ও উস্তাভ নড়ল না। রানা বেশ আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে মোহন্ত বা প্রধান পুরোহিতের দিকে।

ওলি জারকাস কঙ্কাল বললেই হয় তাঁর আলখেল্লা ঢোলা হলেও তেমন লম্বা নয়, হাঁটুর নিচে পা পাটখড়ির মত সরু ও কালো, মোচড় খাওয়া পেশী ফুলে আছে, হাড়ের ওপর ফুটে আছে আঁকাবাঁকা শিরা। আলখেল্লাটা সবুজ ও সোনালি, তার ওপর সোনার তৈরি সুতো দিয়ে নকশা করা হয়েছে, চকচক করছে আগুনের আভায়। মাথায় লম্বা হ্যাট, চূড়াটা সমতল, গায়ে এমব্রয়ডারি করা নক্ষত্র ও ক্রস চিহ্ন।

মোহন্তের মুখ গাছের শুকনো শিকড়ের সমষ্টি বলে মনে হবে, অসংখ্য ভাঁজ আর বলিরেখা কালের ছাপ ফেলেছে। কুঞ্চিত ও ফাটা ঠোঁটের ভেতর এখনও কয়েকটা দাঁত অবশিষ্ট আছে, প্রত্যেকটি ভাঙাচোরা ও হলুদ। রূপালি-সাদা দাড়ি, চোয়ালে যেন সাগর তীরের ফেনা জমে আছে। একটা চোখ ট্রপিকাল অপথ্যালমিয়ায় আক্রান্ত, অস্বচ্ছ নীল, সম্ভবত কিছুই দেখতে পান না; তবে অপর চোখ শিকারী চিতার মতই তীক্ষ্ণ ও চকচকে।

চড়া, কাঁপা কাঁপা গলায় কথা বললেন তিনি। 'আশীর্বাদ দিই, বাছাদের মঙ্গল হোক!' কনুই দিয়ে রানাকে গুঁতো মারল উস্তাভ, দু'জনেই ওরা সামান্য মাথা নত করল। প্রধান পুরোহিত সুর করে গান করছেন বা মন্ত্র আওড়াচ্ছেন, তিনি থামলেই কোরাস ধরছে সমবেত পুরোহিতরা।

আশীর্বাদ পর্ব শেষ হতে একে একে চারদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বাতাসে ক্রসচিহ্ন

আঁকলেন মোহন্ত, এ সময় চারজন কিশোর চারটে রূপোর ধূপদানি ঘোরাতে শুরু করল দ্রুতবেগে, সবগুলো থেকে ধূপ-ধুনার ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

এরপর মেয়ে দুজন মোহন্তের সামনে এসে হাঁটু গাড়ল। ওদের দিকে ঝুঁকলেন তিনি, রূপোর ক্রস দিয়ে হালকাভাবে প্রত্যেকের গাল স্পর্শ করলেন, সুর করে আওড়ালেন বিশেষ আশীর্বাদ।

ফিসফিস করল উত্তাভ, 'লোকে বলে এঁর বয়েস একশো দশ বা তারও বেশি।'

সাদা আলখেল্লা পরা দু'জন তরুণ উপাসক আফ্রিকান কালো আবলুস কাঠের তৈরি একটা টুল বয়ে নিয়ে এল, ডিজাইনটা এত সুন্দর যে লোভী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা। ধারণা করল, সম্ভবত কয়েক শতাব্দী ধরে মঠপ্রধানরা ওটা ব্যবহার করছেন। উপাসক দু'জন ওলি জারকাসের কনুই ধরল, ধীরে ধীরে যত্নের সঙ্গে বসিয়ে দিল তাঁকে টুলের ওপর। এরপর পুরোহিতবৃন্দ ও সাধু-সন্ন্যাসীরা ঘিরে বসল তাঁকে, তাদের কালো মুখ তাঁর দিকে উঁচু হয়ে আছে।

তাঁর পায়ের কাছে বসে আছে রুবি, স্বামীর কথা ইথিওপিয়ার অফিশিয়াল ভাষা অ্যামহ্যারিক-এ অনুবাদ করছে। 'আপনাকে আবার অভ্যর্থনা জানাবার সুযোগ পেয়ে নিজেকে আমি ধন্য মনে করছি, হোলি ফাদার।'

বৃদ্ধ প্রধান পুরোহিত মাথা ঝাঁকালেন। উত্তাভ আবার বলল, 'আমি বিশিষ্ট এক ভদ্রলোককে সেন্ট ফ্রুমেনটিয়াস ভিজিট করাবার জন্যে নিয়ে এসেছি। উনি আপনাকে সন্তুষ্ট করবেন।'

'এ কি!' প্রতিবাদ করল রানা, কিন্তু দেখা গেল সাধু-সন্ন্যাসী আর পুরোহিতবৃন্দ প্রত্যাশায় চকচকে চোখ নিয়ে ওর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। অগত্যা বাধ্য হয়ে ফিসফিস করে প্রশ্ন করতে হলো, 'এখন কি করতে হবে আমাকে?'

'বুঝতে পারছেন না, এতটা দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে কেন এসেছেন উনি?' শয়তানি হাসি ফুটল উত্তাভের ঠোঁটে, সে-ও ফিসফিস করছে। 'উপহার চান! টাকা!'

'মারিয়া থেরেসা ডলার?' জানতে চাইল রানা, ইথিওপিয়ার এই মুদ্রা কয়েক শতাব্দী ধরে চলছে।

'তা না হলেও ক্ষতি নেই। সময় বদলেছে, ওলি জারকাসকে এখন মার্কিন ডলার বা ব্রিটিশ পাউন্ড দিয়েও সন্তুষ্ট করা যায়।'

'কত?'

'আপনি বিশিষ্ট ভদ্রলোক। তাঁর উপত্যকায় শিকার করবেন। কমপক্ষে পাঁচ শো ডলার।'

ব্যাগ আছে খচ্চরের পিঠে, উঠে গিয়ে সেখান থেকে টাকা নিয়ে আসতে হলো রানাকে। ইতিমধ্যে হাত পেতেছেন পুরোহিতপ্রধান, তাতে নোটগুলো ধরিয়ে দিল ও।

হাসলেন মোহন্ত, ভাঙা ও হলুদ দাঁত বেরিয়ে পড়ল। তারপর তিনি কথা বললেন। অনুবাদ করল রুবি, 'সেন্ট ফ্রুমেনটিয়াস ও তিমকাত উৎসবে স্বাগতম।

অ্যাবের তীরে আপনার শিকার অভিযান সফল হোক।'

সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য খসে পড়ল। নড়েচড়ে বসল সবাই, হাসাহাসি শুরু করল। মোহন্ত উস্তাভের দিকে তাকালেন, দৃষ্টিতে প্রত্যাশা। তাঁর কথা ভাষান্তর করল রুবি, 'প্রধান পুরোহিত বলছেন, এতটা পথ আসতে তাঁর গলা শুকিয়ে গেছে।'

'বুড়ো শয়তান ব্র্যান্ডি খেতে চাইছেন!' হাসছে উস্তাভ, হাঁক ছেড়ে ক্যাম্পবাটলারকে ডাকল। একটু পরই ব্র্যান্ডির একটা বোতল মোহন্তের সামনে ক্যাম্প টেবিলে রাখা হলো, তার পাশেই থাকল উস্তাভের ভদকা। পরস্পরের স্বাস্থ্যপান করল তারা। ব্র্যান্ডিতে কিছু মেশালেন না মোহন্ত, ঢোক গেলার পর সুস্থ চোখটা থেকে পানি বেরিয়ে এল। বোতলটা অর্ধেক খালি করার পর খসখসে গলায় একটা প্রশ্ন করলেন, নিমার দিকে তাকিয়ে।

রুবি বলল, 'আল নিমা, উনি আপনাকে জিজ্ঞেস করছেন, ও আমার কন্যা, কে তুমি, কোত্থেকে এলে? মানবজাতির ত্রাণকর্তা যীশুর পথে কে তোমাকে নিয়ে এল?'

'আমি একজন মিশরীয়, প্রাচীন ধর্মে বিশ্বাসী,' জবাব দিল নিমা।

মাথা ঝাঁকাল মোহন্ত, পুরোহিতরাও সবাই প্রশংসাসূচক হাসি দিল। 'খ্রিস্টধর্মে সবাই আমরা ভাই-বোন, মিশরীয় ও ইথিওপিয়ানরা,' মোহন্ত ওকে বললেন। 'এমন কি কপটিক শব্দটাও গ্রীক ভাষায়–মিশরীয়। ষোলো শো বছরেরও বেশি দিন ধরে কায়রোর প্রধান গির্জার পুরোহিত ইথিওপিয়ার বিশপকে নিয়োগ দান করেছেন। উনিশ শো উনষাট সালে সম্রাট হাইলে সেলাসি নিয়মটা বাতিল করেন। তবু আমরা সবাই যীশুর সত্যিকার পথ অনুসরণ করব। আপনাকে স্বাগতম, প্রিয় কন্যা।'

ব্র্যান্ডির বোতল দ্রুত খালি হয়ে গেল। ইঙ্গিতে সেটা উস্তাভকে দেখালেন মোহন্ত। উস্তাভ ইংরেজিতে বলল, 'শালার ব্যাটা এত জায়গা পাচ্ছে কোথায় যে শুধু ঢেলেই চলেছে?'

তার এই কথাও অনুবাদ করতে যাচ্ছিল রুবি, হঠাৎ খেয়াল হতে মাথাটা নিচু করে নিল সে। তারপর রানার দিকে মুখ তুলে বলল, 'মোহন্ত জানতে চাইছেন, উপত্যকায় কি শিকার করতে চাইছেন আপনি?'

নিজেকে শক্ত করল রানা, তারপর জবাব দিল সাবধানে। অবিশ্বাসে দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলল না। নিস্তব্ধতা ভাঙলেন প্রধান যাজক, খলখল করে হেসে উঠলেন তিনি। দেখাদেখি বাকি সবাইও হাসতে শুরু করল। 'ডিক-ডিক? আপনি ডিক-ডিক শিকার করতে এসেছেন? কিন্তু তাহলে মাংস পাবেন কোত্থেকে?'

পাহাড় চূড়ায় দাঁড়ানো ডোরাকাটা ডিক-ডিকের একটা ফটো নিয়ে এসে তাঁর সামনে শ্যাম্প টেবিলের ওপর রাখল রানা। 'এটা সাধারণ কোন ডিক-ডিক নয়। এটা একটা পবিত্র ডিক-ডিক।' ইঙ্গিতে রুবিকে অনুবাদ করতে বলল ও। 'গল্পটা বলছি আমি।'

ভাল একটা গল্প শোনার আশায় চুপ হয়ে গেল সবাই, এমন কি মোহন্তের

হাতের গ্লাসও মাঝপথে থেমে গেছে। ওটা তিনি দ্বিতীয় বোতল থেকে ভরেছেন।

'জন দ্য ব্যাপ্টিস্ট খাদ্যের অভাবে মরুভূমিতে মারা যাচ্ছেন,' শুরু করল রানা। 'ত্রিশটা দিন ও ত্রিশটা রাত পেরিয়ে গেছে, এককণা খাবারও জোটেনি তাঁর।' সেইন্টের নাম শুনে বুকে ক্রসচিহ্ন আঁকল কয়েকজন পুরোহিত। 'শেষে প্রভু তাঁর ভৃত্যের প্রতি সদয় হলেন, ছোট একটা হরিণ আটকে দিলেন অ্যাকেইশা গাছের ডালে ও কাঁটায়। তারপর সেইন্টকে তিনি বললেন, "তোমার জন্যে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছি, কাজেই তুমি মরবে না। এই মাংস নিয়ে খাও তুমি"। জন দ্য ব্যাপ্টিস্ট যখন ছোট্ট প্রাণীটিকে স্পর্শ করলেন, ওটার পিঠে তাঁর আঙুলের ছাপ পড়ে গেল চিরকালের জন্যে।'

সবাই চুপ। এতই প্রভাবিত হয়েছে যে চোখের পাতা ফেলতেও ভুলে গেছে।

ফটোটা আরেকবার প্রধান পুরোহিতকে দেখাল রানা। 'দেখুন, সেইন্টের আঙুলের ছাপ আছে।'

ফটোটা সশ্রদ্ধভঙ্গিতে হাতে নিলেন ওলি জারকাস, ভাল চোখটার সামনে তুললেন। বেশ কিছুক্ষণ দেখার পর বিস্মিত গলায় বললেন, 'কথাটা সত্যি! সেইন্টের আঙুলের ছাপ পরিষ্কারই চেনা যায়!' ফটোটা তিনি পুরোহিতদের দেখার জন্যে দিলেন। প্রত্যেকে দেখলেন, এবং প্রধান পুরোহিতের মন্তব্য পুনরাবৃত্তি করলেন।

'আপনারা কেউ এই প্রাণীটিকে দেখেছেন কখনও?' উত্তরে এক এক করে সবাই মাথা নাড়লেন। পুরোহিতদের দেখা শেষ, এখন সেটা তরুণ উপাসকরা দেখছে।

হঠাৎ তাদের একজন তড়াক করে সিধে হলো, ফটো হাতে লাফাচ্ছে আর উত্তেজনায় চিৎকার করছে। 'আমি দেখেছি, দেখেছি আমি! যীশুর কিরে, পবিত্র এই প্রাণী দেখা দিয়েছে আমাকে!' খুবই কম বয়েস তার, কিশোরই বলতে হবে।

বাকি সবাই নিন্দা করছে তার, কেউ বিশ্বাস করতে রাজি নয়।

'মাথামোটা ছেলে, মাঝে মধ্যেই শয়তান ভর করে,' ম্লান সুরে বললেন ওলি জারকাস, দুঃখে কাতর দেখাল তাঁকে। 'ওর কথায় গুরুত্ব দেবেন না। বেচারা বাটি!'

ইতিমধ্যে বাটির হাত থেকে ফটোটা কেড়ে নেয়া হয়েছে। উপাসকদের হাতে হাতে ঘুরছে সেটা, আর ফিরে পাবার জন্যে ছুটোছুটি করছে সে। সবাই তার সঙ্গে কৌতুক করছে। কিন্তু বাটি সাংঘাতিক উত্তেজিত, তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। বাধা দেবার জন্যে এগোল রানা, দুর্বলচিত্তের এক কিশোরকে নিয়ে এই খেলাটা নিষ্ঠুর মনে হলো ওর। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে কিশোরের মনে কি ঘটল কে জানে, সটান পড়ে গেল সে জমিনের ওপর, যেন কেউ তার মাথায় মুগুরের বাড়ি মেরেছে। পিঠটা কাঁকড়ার মত বাঁকা হয়ে গেল, হাত-পা মোচড় ও ঝাঁকি খাচ্ছে, চোখের মণি উল্টে গিয়ে অদৃশ্য হলো খুলির ভেতর, শুধু সাদা অংশটুকু দেখা যাচ্ছে, ঠোঁটের কোণ বেয়ে গড়িয়ে নামছে সাদা ফেনা।

তার কাছাকাছি রানা পৌঁছুবার আগেই চারজন উপাসক চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে গেল তাকে। রাতের অন্ধকারে তাদের হাসির শব্দ মিলিয়ে গেল। বাকি

সবার আচরণ দেখে মনে হলো অস্বাভাবিক কিছু ঘটেনি। ওলি জারকাস ইঙ্গিতে একজন তরুণকে আবার গ্লাসটা ভরে দিতে বললেন।

ছয়

পরদিন সকালে আবার যখন রওনা হলো ওরা, ট্রেইলটা বেশ কিছুদূর নদীর পাড় ঘেঁষে থাকল। মাইলখানেক পর স্রোতের গতি খুব বেড়ে গেল, তারপর উঁচু ও লাল পাহাড়-প্রাচীরের মধ্যবর্তী সরু ফাঁকের ভেতর ঢুকে পড়ল, সেখান থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ছে–অর্থাৎ এখানে আরেকটা জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়েছে।

বহুল ব্যবহৃত ট্রেইল ছেড়ে জলপ্রপাতের কিনারায় এসে দাঁড়াল রানা। দুশো ফুট গভীরে পাথরের একটা ফাটলে তাকাল ও, আক্রোশে সংকুচিত ভয়াল প্রবাহকে কোন রকমে গলে বেরিয়ে যেতে দেয়ার মত চওড়া। ফাঁকটার ওপারে একটা পাথর ছুঁড়ে দিতে পারে রানা। নিচের ওই গহ্বরে কোন পথ বা পা ফেলার জায়গা নেই। ফিরে এসে ক্যারাভ্যানের সঙ্গে যোগ দিল ও, ঘুরপথ ধরে নদীর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ওরা, ঢুকে পড়েছে আরেকটা গভীর জঙ্গলে ঢাকা উপত্যকায়।

'এটা বোধহয় এক সময় ডানডেরা নদীর কোর্স ছিল, ফাটলটার ভেতর নতুন পথ তৈরির আগে।' পথের দু'পাশে উঁচু জমিনের দিকে হাত তুলল নিমা, তারপর ইঙ্গিতে ট্রেইলের ওপর ছড়িয়ে থাকা মসৃণ বোল্ডারগুলো দেখাল।

'নদীর গতি পথ বারবার বদলে যাওয়ায় গোটা এলাকায় ক্ষয় আর কাটাছেঁড়ার প্রচুর নমুনা দেখতে পাবেন। নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে পারেন, লাইমস্টোনের পাঁচিলগুলোয় গুহা আর ঝর্ণা গিজগিজ করছে।'

ট্রেইল এখন দ্রুত নীল নদের দিকে নামছে, শেষ কয়েক মাইলে প্রায় পনেরোশো ফুট নিচে চলে এসেছে ওরা। উপত্যকার সাইডগুলো গাছপালায় ঢাকা, বহু জায়গায় দেখা গেল লাইমস্টোনের গা থেকে খুদে ঝর্ণার পানি অলসভঙ্গিতে পুরানো নদীর তলায় পড়ছে।

নিচে নামার সঙ্গে সঙ্গে গরমও বাড়ছে। আজ খাকি শার্ট পরেছে নিমা, ঘামে ওর শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানটা ভিজে গেছে।

এক জায়গায় দেখা গেল ঘন জঙ্গলে মোড়া পাহাড়ের অনেক উঁচু থেকে স্বচ্ছ পানি নেমে আসছে, স্রোতটা চওড়া হয়ে রীতিমত ছোট একটা নদী হয়ে উঠেছে। তারপর উপত্যকার একটা কোণ ঘুরল ওরা, দেখতে পেল ওদের সঙ্গে এখানে স্রোতটাও মিলিত হয়েছে ডানডেরা নদীর মূল প্রবাহে। খাদের পিছন দিকে তাকিয়ে পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে একটা অকৃত্রিম সরু খিলান দেখতে পেল ওরা, ফাটলের ভেতর দিয়ে ওই খিলান হয়ে বেরিয়ে এসেছে নদী। ফাটল ও খিলানের চারধারে পাথরের রঙ অদ্ভুত লালচে-গোলাপী, পালিশ করা মসৃণ, ভাঁজের ওপর

ভাঁজ খেয়ে আছে, ফলে রঙ ও আকৃতিতে মানুষের জোড়া ঠোঁটের মত দেখতে হয়েছে।

'যেন কোন দৈত্যের মুখ থেকে নর্দমা বেরিয়েছে,' ফিসফিস করল নিমা, তাকিয়ে আছে খিলান, ফাটল আর অদ্ভুতদর্শন পাথরের দিকে। 'ভাবছি টাইটা আর প্রিন্স মেমননের নেতৃত্বে প্রাচীন মিশরীয়রা এখানে যদি এসে থাকে, কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তাদের। প্রকৃতির এই অদ্ভুত খেয়াল নিশ্চয়ই তাদেরকে খুব নাড়া দিয়েছিল।'

'তাদের রক্ত আপনার শিরাতেও বইছে,' বলল রানা। 'অবশ্যই তারাও আপনার মত মুগ্ধ হয়েছিল।'

রানার হাত ধরল নিমা। 'আপনি আমাকে ভরসা দিন, রানা। বলুন এখানে আমার উপস্থিতি স্বপ্নের ভেতর ঘটছে না। বলুন আমরা যা খুঁজতে এসেছি তা অবশ্যই পাব। আমাকে নিশ্চয়তা দিন, হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে হাসলান চাচার আত্মাকে শান্তি দিতে পারব আমরা।'

রানার দিকে মুখ তুলে রেখেছে নিমা, উদ্ভাসিত মুখে চকচক করছে শিশির কণার মত ঘাম। ওকে আলিঙ্গন করার প্রবল একটা ঝোঁক চাপল, ইচ্ছে হলো ভেজা ও ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁট জোড়ায় চুমো খায়। তার বদলে ঘুরে দাঁড়াল রানা, ট্রেইল ধরে নেমে যাচ্ছে।

নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই রানার, নিমার দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছে না। খানিক পর পিছনে শব্দ হলো, পিছু নিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে নিমা। নিঃশব্দে নিচে নামছে ওরা, অন্যমনস্ক থাকায় ওদের সামনে অকস্মাৎ উন্মোচিত প্রাকৃতিক বিস্ময়ের জন্যে প্রস্তুত ছিল না রানা।

ওরা দাঁড়িয়ে আছে উপ-খাদের অনেক ওপরে, একটা কার্নিসে। ওদের নিচে লাল পাথর ভর্তি বিশাল এক কড়াই, পাঁচশো ফুট গভীর। কিংবদন্তীর অ্যাবের মূল প্রবাহ সবুজ খরস্রোত, লাফ দিয়ে পড়ছে ছায়াময় অতল গহ্বরে। সেটা এত গভীর যে সূর্যের আলো নাগাল পায় না। ওদের পাশ থেকে ডানডেরা নদীর বিক্ষিপ্ত পানিও একই ভঙ্গিতে লাফ দিয়েছে, পানির পতনটা বকের সাদা পালকের মত লাগছে দেখতে, খাদের ভেতরকার বাতাসে মোচড় খাচ্ছে ও ফুলছে। অতল গহ্বরে মিলিত হচ্ছে দুই প্রবাহ, বিপুল জলরাশি টগবগ করে ফুটছে, বিশাল ঢেউগুলো চুরমার হয়ে ফেনা তৈরি করছে, অবশেষে নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজে পেয়ে সেদিকে ছুটে চলেছে অনিয়ন্ত্রিত প্রচণ্ড শক্তিতে।

'বোট নিয়ে আপনি ওখানে গিয়েছিলেন?' রানার দিকে হতবিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নিমা।

'কম বয়েসে কত রকম বোকামি করে মানুষ,' ক্ষীণ বিষণ্ণ হাসি রানার ঠোঁটে, পুরানো স্মৃতি মনে পড়ে যাওয়ায় হাতের রোম দাঁড়িয়ে গেল।

কিছুক্ষণ কেউ কথা বলল না। এক সময় মৃদু গলায় নিমা বলল, 'উজানের দিকে আসার সময় টাইটা আর মেমনন কি ধরনের বাধার সামনে পড়েছিল, সে তো দেখতেই পাচ্ছি।' নিজের চারদিকে তাকাল ও। তারপর খাদের নিচের অংশটা দেখাল, পশ্চিম দিকটা। 'ওদের পক্ষে অবশ্যই উপ-খাদ ধরে আসা সম্ভব

ছিল না। পাহাড়-প্রাচীরের চূড়াগুলো যে রেখা তৈরি করেছে, নিশ্চয়ই সেই রেখা ধরে আসে তারা–সরাসরি এখান পর্যন্ত, যেখানে এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি।' চিন্তাটা ওর গলায় উত্তেজনার ভাব এনে দিল।

'জোর করে কিছুই বলা যায় না। তারা হয়তো নদীর ওপারে পৌঁছেছিল।'

রানা ঠাট্টা করে বললেও, নিমার চেহারা ঝুলে পড়ল। 'এটা তো ভাবিনি। হ্যাঁ, তা সম্ভব বৈকি। রানা, এপারে যদি কোন সূত্র না পাই, ওপারে আমরা পৌঁছুব কিভাবে?'

'যখনকার সমস্যা তখন দেখা যাবে।'

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ওরা। যে কাজ নিয়ে এখানে আসা হয়েছে তার ব্যাপকতা ও বিশালত্ব কল্পনা করছে দু'জনেই, উপলব্ধি করছে অনিশ্চয়তার মাত্রা। খানিক পর নিমাই আবার নিস্তব্ধতা ভাঙল, 'রানা, মঠটা কোথায়? আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

'সরাসরি আমাদের পায়ের নিচে যে, দেখবেন কিভাবে।'

'ওখানে আমরা ক্যাম্প ফেলব?'

'সন্দেহ আছে। চলুন দেখি উস্তাভকে ধরি, দেখি সে কি ভাবছে।'

কড়াইয়ের কিনারা ধরে ট্রেইল অনুসরণ করল ওরা, খচ্চরগুলোকে ধরে ফেলল যেখানে দু'ভাগ হয়ে গেছে ট্র্যাক। একটা পথ নদীর উল্টোদিক ধরে জঙ্গল ঢাকা নিচু জমিনে নেমে গেছে, অপরটা আগের মতই কিনারার পাথরে ঝুলে আছে। ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল উস্তাভ, হাত তুলে নিচু জমিনে নেমে যাওয়া ট্র্যাকটা দেখাল সে। 'ওদিকে জঙ্গলের ভেতর ভাল একটা ক্যাম্পসাইট আছে। শেষবার শিকার করতে এসে ওখানে ছিলাম আমরা।'

জঙ্গলে ঢুকে ফাঁকা একটা জায়গা পাওয়া গেল। কয়েকটা বুনো ডুমুর গাছ থাকায় ছায়ার অভাব নেই। এক কোণের ছোট্ট একটা ঝর্ণায় রয়েছে নির্মল পানি। বোঝা হালকা করার জন্যে তাঁবুগুলো খাদে বয়ে আনেনি উস্তাভ। খচ্চরের পিঠ থেকে মাল-পত্র নামানো শেষ হতেই নিজের লোকদের তিনটে ছোট কুঁড়েঘর বানাবার হুকুম দিল সে। ঝর্ণার কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে একটা ল্যাট্রিনও তৈরি করা হবে।

এ-সব কাজ যখন চলছে, নিমা আর রুবিকে ডেকে নিল রানা, তিনজন রওনা হয়ে গেল মঠ দেখার জন্যে। দুই ট্র্যাকের মুখে এসে দাঁড়াল ওরা, তারপর রুবির নেতৃত্বে পাহাড়-প্রাচীরের কিনারা ঘেঁষা ট্রেইল ধরে এগোল। খানিক পরই চওড়া এক প্রস্থ পাথুরে সিঁড়ি পাওয়া গেল, পাহাড়-প্রাচীরের মুখ বেয়ে নিচে নেমে গেছে।

সাদা আলখেল্লা পরা একদল সন্ন্যাসী ধাপ বেয়ে উঠে আসছিল, অল্প কিছুক্ষণ থেমে তাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করল রুবি। তারা ওদেরকে পাশ কাটিয়ে উঠে যেতে সে বলল, 'তিমকাত উৎসবের আগের রাতটাকে কাটেরা বলা হয়। কাল উৎসব তো, আজ তাই সবাই খুব ব্যস্ত। তিমকাত খুব বড় ধর্মীয় উৎসব।'

'কিন্তু মিশরের চার্চ ক্যালেন্ডারে তো এ-ধরনের কোন উৎসবের উল্লেখ নেই,' বলল নিমা।

'এটা আসলে ইথিওপিয়ান ইপিফানি, যীশুর ব্যাপ্টিজম উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়,' ব্যাখ্যা করল রুবি। 'উৎসব চলার সময় নদীতে গিয়ে কিছু ধর্মীয় আচার অনুশীলন করা হবে, সমস্ত পাপ ধুয়ে-মুছে পবিত্রকরণের পর ব্যাপ্টিজমে দীক্ষা দেয়া হবে তরুণ উপাসকদের, ঠিক যেভাবে ব্যাপ্টিস্টের হাতে দীক্ষা নিয়েছিলেন স্বয়ং যীশু।'

খাড়া পাহাড়-প্রাচীরের অবয়ব বেয়ে নেমে গেছে সিঁড়ির ধাপ, আবার ওরা সেটা ধরে নামতে শুরু করল। শত শত বছর ধরে নগ্ন পা ফেলায় প্রতিটি ধাপ মসৃণ ডিশ-এ পরিণত হয়েছে। ওদের কয়েকশো ফুট নিচে নীল নদ হিসহিস আওয়াজ তুলে টগবগ করে ফুটছে, চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে বিপুল জলকণা।

হঠাৎ করেই চওড়া একটা টেরেসে বেরিয়ে এল ওরা, কঠিন পাথর কেটে মানুষই এটা তৈরি করেছে। মাথার ওপর লাল পাথর ঝুলে আছে, তোরণশোভিত উদ্যানের ওপর ছাদ হিসেবে কাজ করছে; খিলান আকৃতির পাথরের তোরণগুলো প্রাচীন মিস্ত্রীরা ছাদের অবলম্বন হিসেবে তৈরি করেছিল। ঢাকা ও লম্বা টেরেসের ভেতরদিকের দেয়ালে অসংখ্য প্রবেশপথ, সামনের গোলকধাঁধায় হারিয়ে গেছে। যুগ যুগ ধরে পাহাড়-প্রাচীরের গা কেটে অসংখ্য হল, সেল, চেম্বার, চার্চ ইত্যাদি তৈরি করা হয়েছে। নির্জনতা প্রিয় সন্ন্যাসীরা এখানে বসবাস করছেন হাজার বছরেরও বেশি দিন ধরে।

টেরেসের দৈর্ঘ্য জুড়ে দলে দলে ভাগ হয়ে বসে আছেন সন্ন্যাসীরা। একদিকে কিছু সন্ন্যাসী যাজকের ধর্মশাস্ত্র পাঠ শুনছেন। বাগানের ভেতর দিয়ে যাবার সময় আরেক দল সন্ন্যাসীকে দেখা গেল, সুর করে ধর্মীয় সঙ্গীত গাইছেন, অ্যামহ্যারিক ভাষায় লেখা। নানা গন্ধে ভারী হয়ে আছে বাতাস। জ্বালানি কাঠ আর ধূপের ধোঁয়া তো আছেই, আরও আছে ঘাম, গরম নিঃশ্বাস, শোক, অসুস্থতার গন্ধ। সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বসে রয়েছে তীর্থে আসা সাধারণ মানুষ। দীর্ঘ দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে তারা, অনেককেই অসুস্থ আত্মীয়স্বজনকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে। সেইন্টের কাছে অনেক কিছু চাওয়ার আছে তাদের। কেউ তার ভোগান্তির অবসান চায়, কেউ ফিরে পেতে চায় সুস্থতা, আবার কেউ এসেছে পাপের শাস্তি মউকুফ করার আবেদন নিয়ে।

মায়ের কোলে অনেক অন্ধ ছেলেকে দেখা গেল। হাড় থেকে মাংস খসে পড়ছে এমন কুষ্ঠরোগীর সংখ্যাও কম নয়। তাদের আহাজারি ও গোঙানির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে সন্ন্যাসীদের সুর করে গাওয়া প্রার্থনা সঙ্গীত, আরও মিশছে প্রকাণ্ড কড়াইয়ের নিচ থেকে ভেসে আসা নীলনদের ফোঁসফোঁসানি।

এক সময় ওরা সেন্ট ফ্রুমেনটিয়াস ক্যাথেড্রালের প্রবেশমুখে এসে পৌঁছুল। মাছের হাঁ করা মুখের মত গোল একটা ফাঁক, তবে দরজার চারদিকের গায়ে চওড়া বর্ডারের ওপর আঁকা হয়েছে নক্ষত্র, ক্রসচিহ্ন ও সেইন্টদের মাথা।

প্রবেশপথে সবুজ ভেলভেটের আলখেল্লা পরা একজন যাজক পাহারায় দাঁড়িয়ে আছেন। রুবি তাঁর সঙ্গে কথা বলার পর ভেতরে ঢোকার অনুমতি দিলেন তিনি। চওড়া হলেও, দরজাটা নিচু, ঢোকার সময় মাথা নিচু করতে হলো রানাকে। ভেতরে ঢোকার পর মাথা উঁচু করে চারদিকে তাকিয়েই স্তম্ভিত হয়ে

গেল।

বিশাল গুহার ভেতর ছাদ এত ওপরে যে অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। পাথুরে দেয়াল মিউরাল-এ ঢাকা, ডানা বিশিষ্ট পরী আর দেব-দেবীদের ছবি আঁকা হয়েছে, মোমবাতি আর ল্যাম্পের কাঁপা কাঁপা আলো পড়ায় যেন মনে হলো নড়াচড়া করছে। ছবিগুলো আংশিক ঢাকা পড়েছে পাঁচিলের ওপর কারুকাজ করা লম্বা ব্যানার বা পর্দা ঝুলে থাকায়, কিনারার ঝালর জট পাকিয়ে গেছে, ছিঁড়েও গেছে কোথাও কোথাও। এরকম একটা ব্যানারে সেইন্ট মাইকেলকে দেখা যাচ্ছে, সাদা একটা ঘোড়া ছোটাচ্ছেন তিনি। আরেকটায় দেখা গেল ক্রস-এর পাদদেশে হাঁটু গেড়ে রয়েছেন ভার্জিন, তাঁর ওপরে যীশুর ম্লান শরীর থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে, পাঁজরে গাঁথা রোমান বর্শা।

চার্চের এটা বাইরের অংশ। দূর প্রান্তের দেয়ালে মিড্‌ল্ চেম্বারে ঢোকার দরজা। দরজা আসলে একজোড়া, খোলাই রয়েছে। পাথরের মেঝে ধরে হেঁটে এল ওরা তিনজন, হাঁটু গেড়ে প্রার্থনারত তীর্থযাত্রীদের পাশ কাটিয়ে। সবাই তারা হয় গান গাইছে, নয়তো কান্নাকাটি করছে। অনেককেই দেখা গেল যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। ধূপ-ধুনোর নীলচে ধোঁয়ায় অস্পষ্ট হয়ে আছে জায়গাটা।

তিনটে ধাপ পেরিয়ে ভেতরের দরজাগুলোর সামনে পৌঁছুতে হয়, কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন আলখেল্লা পরা দু'জন দীর্ঘদেহী যাজক, মাথায় লম্বা হ্যাট, হ্যাটের মাথা সমতল। তাঁদের একজন রাগের সঙ্গে কি যেন বললেন রুবিকে।

'ওঁরা এমন কি মিডল চেম্বারেও ঢুকতে দেবেন না,' জানাল রুবি। 'ওই চেম্বারের সামনে মাকডাস–হোলি অব হোলিস।'

উঁকি দিয়ে প্রহরী যাজকদের পিছনে তাকাল ওরা, মিডল চেম্বারের ভেতর দিয়ে প্রবেশনিষিদ্ধ পবিত্র স্থানটার দরজাই শুধু দেখা গেল। 'মাকডাসে শুধু ভারপ্রাপ্ত পুরোহিতরা ঢুকতে পারেন, কারণ ওখানে ট্যাবট আছে, আর আছে সেইন্টের সমাধিতে ঢোকার দরজা।'

তারা ভরা আকাশের নিচে বসে রাতের খাবার খেলো ওরা। বাতাসে এখনও দম আটকানো গরম। নাগালের ঠিক বাইরে মেঘের মত ঝুলে আছে ঝাঁক ঝাঁক মশা। কাপড়ের বাইরে চামড়ায় রিপেলেন্ট মেখেছে ওরা, তা না হলে রক্ষা ছিল না।

'এবার বলুন, বিশিষ্ট ভদ্রলোক। যেখানে আসতে চেয়েছিলেন সেখানে আপনাকে আমি পৌঁছে দিয়েছি। অত দূর থেকে যে প্রাণীর সন্ধানে এলেন, বলুন সেটা কোথায় খুঁজবেন।'

'ভোরে ট্র্যাকারদের ভাটির দিকে পাঠাবেন,' জবাব দিল রানা। 'সব ডিক-ডিকের পায়ের ছাপ একই রকম বলে আমার ধারণা। ছাপ চোখে পড়লে কাছাকাছি লুকিয়ে থাকতে হবে। ডিক-ডিক নিজেদের এলাকা ছেড়ে কোথাও যায় না। অপেক্ষা করলে দেখতে পাবে। আর দেখতে পেলে আমাকে খবর দেবে।'

'ঠিক আছে, ট্র্যাকারদের পাঠালাম। কিন্তু আপনি কি করবেন? মেয়েদের নিয়ে ক্যাম্পে থাকবেন?' তির্যক দৃষ্টি হেনে হাসল উস্তাভ। 'মেয়েরা আপনার সেবা-যত্ন করলে আমার কোন আপত্তি নেই।'

চেহারায় অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়াল রুবি, রান্নাবান্নার তদারক করার কথা বলে কিচেনের দিকে চলে গেল। উত্তাভের ইঙ্গিতটা গায়ে মাখল না রানা, বলল, 'ডানডেরার পাশে ঝোপের ভেতর কাজ করব আমরা। ওদিকে ডিক-ডিক থাকতে পারে। আপনার লোকদের নদীর ওদিকে যেতে নিষেধ করে দেবেন। আমি চাই না শিকারের সময় কেউ ডিসটার্ব করুক।'

পরদিন ভোরের আলো ভাল করে ফোটার আগেই ক্যাম্প ত্যাগ করল ওরা, সঙ্গে রাইফেল ও হালকা খাবার নিয়েছে। ডানডেরার পাশে এসে ঝোপের ভেতর দিয়ে হাঁটছে রানা, পিছনে নিমা। কয়েক পা এগিয়ে একবার করে থামল, কান পেতে শুনছে। ডালে ডালে প্রচুর পাখি, ঝোপের ভেতর খুদে প্রাণীদের সংখ্যাও কম নয়। 'ইথিওপিয়ানরা শিকারে খুব একটা অভ্যস্ত নয়,' বলল রানা। 'আর খাদের ভেতর সন্ন্যাসীরাও বোধহয় ওয়াইল্ডলাইফকে বিরক্ত করে না।' হাত তুলে হরিণের পায়ের ছাপ দেখাল। 'এগুলো বুশবাকের ছাপ। ট্রফি হিসেবে সাংঘাতিক লোভনীয়।'

'আপনি কি সত্যি সত্যি ডোরাকাটা ডিক-ডিক পাবেন বলে আশা করেন?'

'পেলে এমনি পাব, খুঁজতে যাব না।'

উঁচু গাছের ডালে একটা সানবার্ডকে বসে থাকতে দেখল ওরা, পালকগুলো পান্না বসানো টায়রার মত ঝলমল করছে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনটা দেখে নিল রানা, তারপর পড়ে থাকা একটা গাছের গুঁড়িতে বসে নিমাকেও বসতে ইঙ্গিত করল। 'ডিক-ডিক খোঁজার অজুহাতে সবার চোখের আড়ালে এভাবেই পালিয়ে আসতে হবে। এখন বলুন, আসলে ঠিক কি খুঁজব আমরা।'

'একটা সমাধির অবশিষ্ট, কিংবা কোন গোরস্থানের ধ্বংসাবশেষ, যেখানে ফারাও মামোসের সমাধি তৈরি করার সময় শ্রমিকরা বসবাস করত।'

'ইঁট বা পাথরের যে-কোন কাজ,' সায় দিল রানা। 'বিশেষ করে স্তম্ভ বা মনুমেন্ট।'

'টাইটার স্টোন পেস্টামেন্ট।' মাথা ঝাঁকাল নিমা। 'গায়ে হায়ারাগ্লিফিকস খোদাই করা থাকবে। হয়তো রোদ-বৃষ্টিতে ম্লান হয়ে গেছে, খসে পড়েছে, কিংবা ঢাকা পড়েছে ঝোপের ভেতর—আমি জানি না।'

'এখানে আমরা বসে আছি কেন? চলুন মাছ ধরি।'

বেলা এগারোটার দিকে নদীর তীরে একটা ডিক-ডিকের ছাপ দেখল রানা। বড় একটা গাছের বেরিয়ে থাকা শিকড়ের তলায় লুকাল ওরা, নড়াচড়া না করে চুপচাপ বসে থাকল। কিছুক্ষণ পর খুদে প্রাণীগুলোর একটাকে দু'এক মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেল। ওদের সামনে দিয়ে চলে গেল সেটা, গাছের গুঁড়ির মত শুঁড়টা নাড়ছে, মানবশিশুর টলমল করা পায়ের মত খুর ফেলছে জমিনে, নিচু একটা ডাল থেকে পাতা ছিঁড়ল, ব্যস্তভাবে চিবাল। তবে গায়ের ইউনিফর্মটা ধূসর, কোন রকম দাগ নেই।

ওটা অদৃশ্য হতে উঠে দাঁড়াল রানা। 'কমন ভ্যারাইটি,' বিড়বিড় করল। 'চলুন অন্যদিকে যাই।'

দুপুরের খানিক পর এমন একটা জায়গায় পৌঁছুল ওরা, পাহাড়-প্রাচীরের রঙ

যেখানে গোলাপী-লালচে মাংসের মত। এরকম একজোড়া প্রাচীরের মাঝখান দিয়ে গহ্বরের ভেতর বেরিয়ে এসেছে নদী। জায়গাটা যতদূর সম্ভব পরীক্ষা করল ওরা, তারপর বাধা পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। পাথর এখানে সোজা নেমে এসেছে পানিতে, পানির কিনারায় এমন একটা গর্ত নেই যে পা রাখা যায়।

ভাটির দিকে ফিরে এল ওরা, আদ্যিকালের একটা ঝুলন্ত ব্রিজ ধরে নদী পেরুল। শুকনো লতানো গাছ আর শণ দিয়ে ব্রিজটা সম্ভবত সন্ন্যাসীরাই বানিয়েছেন। এপারে এসেও আরেকবার গহ্বরের ভেতর দিয়ে এগোবার চেষ্টা করল ওরা। লালচে-গোলাপী পাঁচিল পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে, সেটাকে এড়িয়ে এগোতে চেষ্টা করায় দেখা গেল স্রোত এত জোরাল যে রানাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। বাধ্য হয়ে ফিরে আসতে হলো ওকে।

'আমরা যখন এগোতে পারছি না, ধরে নিতে হবে টাইটাও পারেনি।'

ঝুলন্ত ব্রিজের কাছে ফিরে এসে একটা ছায়া খুঁজে নিল ওরা, ওখানে বসে লাঞ্চ খেলো। গরমে সেদ্ধ হবার অবস্থা। নদীর পানিতে রুমাল ভিজিয়ে মুখ মুছল নিমা। চিৎ হয়ে শুয়ে লালচে-গোলাপী প্রাচীর দেখছে রানা, চোখে আঁটা বিনকিউলার। মসৃণ চকচকে সারফেসে কোন ফাটল আছে কিনা খুঁজছে। চোখ থেকে বিনকিউলার না নামিয়েই কথা বলছে ও। 'রিভার গড পড়ে জানা যায়, গ্রেট লায়ন অভ ইজিপ্ট অর্থাৎ টানুস আর ফারাও-এর লাশ অদলবদল করার জন্যে লোকজনের সাহায্য নিতে হয়েছিল টাইটাকে।' বিনকিউলার সরিয়ে নিমার দিকে তাকাল। 'ব্যাপারটা আমার কাছে বিস্ময়কর লেগেছে। কারণ ওই যুগে মানুষ এ-ধরনের কাজ করতে ভয় পেত। ভাবছি, স্ক্রোলের অনুবাদে কোন ভুল হয়নি তো? টাইটা কি সত্যি লাশ বদলাবদলি করেছিল?'

হেসে উঠে রানার দিকে কাত হলো নিমা। 'লেখক উইলবার কিথ এখানে কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন গল্পের এই অংশটুকু তিনি একটা মাত্র বাক্যের ওপর ভিত্তি করে লিখেছেন। বাক্যটি হলো, "টু মি হি ওয়াজ মোর আ কিং দ্যান এভার ফারাও হ্যাড বীন"।' আবার চিৎ হলো নিমা। 'সেজন্যেই বইটার এত সমালোচনা করি। আমি যতটুকু জানি বা বিশ্বাস করি, টানুস তাঁর নিজের সমাধিতে আছেন, তেমনি ফারাও-ও আছেন নিজের সমাধিতে।'

শেষ বিকেলের দিকে ক্যাম্পে ফিরল ওরা। কিচেন থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাল রুবি। হাঁপাচ্ছে সে। 'কখন ফিরবেন তার অপেক্ষায় ছিলাম। ওলি জারকাস তিমকাতে উৎসবে দাওয়াত দিয়েছেন আমাদের। আল নিমা তাঁর প্রধান অতিথি। গরম পানি রাখা আছে, এখুনি গোসল করে তৈরি হয়ে নিন। তা না হলে মঠে পৌঁছুতে দেরি হয়ে যাবে।'

ব্যাংকুইট হলে ওদেরকে নিয়ে যাবার জন্যে প্রধান পুরোহিত একদল তরুণ উপাসককে পথ প্রদর্শক হিসেবে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তারা এল গোধূলি পার করে, প্রত্যেকের হাতে একটা করে জ্বলন্ত মশাল। তাদের মধ্যে বাটিও আছে, প্রথমে চিনতে পারল নিমা। তার দিকে তাকিয়ে হাসি দিতে লজ্জায় জড়সড় ভঙ্গিতে এগিয়ে এল সে, নদীর ধার থেকে কুড়িয়ে আনা বুনো ফুলের একটা গোছা বাড়িয়ে

ধরল নিমার দিকে। প্রস্তুত ছিল না নিমা, কিছু না ভেবেই আরবীতে ধন্যবাদ দিল তাকে।

নিমাকে অবাক করে দিয়ে বাটিও পাল্টা ধন্যবাদ জানাল ওই আরবীতেই। নিমার প্রশ্ন শুনে বাটি বলল, 'আমার মা লোহিত সাগরের ওদিক থেকে এসেছে। আরবী আমার মায়ের ভাষা।'

মঠের উদ্দেশে ওরা যখন রওনা হলো, ভক্ত কুকুরছানার মত নিমার পিছু নিল বাটি।

পাহাড়-প্রাচীরের মাথা থেকে আরেকবার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল ওরা, বেরিয়ে এল জ্বলন্ত মশাল ঘেরা টেরেসে। গাছপালায় ছাওয়া সরু উদ্যান-পথ লোকজনে ঠাসা, ভিড় সরিয়ে ওদের জন্যে পথ তৈরি করল তরুণ উপাসকরা। তীর্থযাত্রীরা কি ভাবল কে জানে, অ্যামহ্যারিক ভাষায় স্বাগত জানাল ওদেরকে, হাত লম্বা করে ছুঁয়ে দিচ্ছে।

নিচু প্রবেশপথ পেরিয়ে ক্যাথেড্রালের বাইরের অংশে পৌঁছুল ওরা। আজও মনে হলো মশাল আর ল্যাম্পের অনিশ্চিত আলোয় দেয়ালচিত্রের চরিত্রগুলো নাচছে। মেঝেতে নল খাগড়া দিয়ে তৈরি কার্পেট ফেলা হয়েছে, পায়ের ওপর পা তুলে তাতে বসে আছেন সন্ন্যাসীরা, মনে হলো সবাই তাঁরা এখানে উপস্থিত। গলা চড়িয়ে তারাও ওদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। বসা সন্ন্যাসীদের প্রত্যেকের পাশে একটা করে বোতল, তাতে মধু মিশিয়ে তৈরি করা স্থানীয় মদ তেজ। হাসিখুশি সন্ন্যাসীদের চকচকে চেহারা দেখে বোঝা যায়, এরইমধ্যে ভাল সার্ভিস দিয়েছে বোতলগুলো।

রানার দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করল রুবি, 'ইচ্ছে না থাকলেও এই তেজ বা মদ খেতে হবে আপনাকে। না খেলে উৎসব ও পুরোহিতদের অপমান করা হবে। তবে আমি চেখে দেখব, তারপর আপনি খাবেন। রঙ, স্বাদ ও শক্তি বদলে যায়। বড় গামলা বা পিপে থেকে পরিবেশন করা হচ্ছে, একেকটার ধরন একেকরকম।' নিজের বোতল থেকে সরাসরি পান করল সে। 'এটা ভালই। বেশি না খেলে আপনার কোন অসুবিধে হবে না।'

ওদের চারপাশে বসা সন্ন্যাসীরা পান করার জন্যে সাধাসাধি করছে, বাধ্য হয়েই নিজের বোতলটা ধরতে হলো রানাকে। হালকা ও মিষ্টি একটা স্বাদ পেল ও, মধুর পরিমাণ খুব বেশি বলেই হয়তো মদ বলে মনে হলো না। 'ভালই তো!'

'কিন্তু সাবধান,' বলল রুবি। 'তেজের পর নিশ্চয়ই ওরা আপনাকে কাটিকালো সাধবে। কাটিকালা চোলাই করা কড়া মদ, খেলে নিজেকে সামলাতে পারবেন না, ওটা আপনার ঘাড় থেকে মুণ্ডুটা আলাদা করে ফেলবে।'

সন্ন্যাসীরা এবার নিমার যত্ন-আত্তির দিকে মন দিয়েছেন। ও যে কপটিক ক্রিশ্চান, এটা তাঁদেরকে প্রভাবিত করেছে। সন্দেহ নেই, ওর রূপ-যৌবনও পবিত্র ও সংযমী চিরকুমারদের চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটিয়েছে কিছুটা।

নিমার কানে কানে রানা বলল, 'বোতলটা ঠোঁটে তুলে ভান করুন খাচ্ছেন। তা না হলে ওঁরা আপনাকে শান্তিতে থাকতে দেবেন না।'

নিমা বোতলটা মুখের সামনে তুলতেই উল্লাসে ফেটে পড়লেন সন্ন্যাসীরা।

বোতল নামিয়ে রানাকে নিমা বলল, 'স্বাদটা তো দারুণ। মদ কোথায়, এ তো মধু।'

'মদ না খাবার প্রতিজ্ঞা ভেঙে ফেললেন?' হেসে উঠে জিজ্ঞেস করল রানা।

'মাত্র এক ফোঁটা,' স্বীকার করল নিমা। 'তাছাড়া, কে বলল আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম খাব না?'

অতিথিদের সামনে গরম পানি ভর্তি একটা করে পাত্র রাখা হলো, হাত ধোয়ার জন্যে। ভোজন পর্ব শুরু হতে যাচ্ছে। হঠাৎ ড্রামের শব্দ শোনা গেল, তারপর ভেসে এল নানা ধরনের ইন্সট্রুমেন্টের আওয়াজ। মিডল চেম্বারের খোলা দরজা ভরাট করে তুলল মিউজিশিয়ানদের একটা ব্যান্ড। চেম্বারের একদিকের দেয়াল ঘেঁষে আসন গ্রহণ করল তারা।

অবশেষে প্রাচীন প্রধান পুরোহিত ওলি জারকাস ধাপের মাথায় উদয় হলেন। রক্তলাল সাটিনের লম্বা আলখেল্লা পরে আছেন, দুই কাঁধে সোনালি সুতো দিয়ে এমব্রয়ডারির কাজ করা। মাথায় পরেছেন প্রকাণ্ড এক মুকুট। সোনার মত চকচক করলেও রানা জানে ওটা আসলে পালিশ করা পিতল, আর বহুরঙা পাথরগুলো কাঁচ।

হাতের দণ্ড উঁচু করলেন প্রধান যাজক, সেটার মাথায় রুপোর কাজ করা ক্রস। সমস্ত কোলাহল থেমে গিয়ে বিশাল গুহার ভেতর অটুট নিস্তব্ধতা নেমে এল।

দীর্ঘ সময় নিয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করলেন ওলি জারকাস। প্রার্থনা শেষ হতে দু'জন তরুণ উপাসক ধাপের নিচে নামতে সাহায্য করল তাঁকে। বয়ঃবৃদ্ধ পুরোহিতরা হৃৎপিণ্ড আকৃতির একটা বৃত্ত রচনা করে বসেছেন, সেই বৃত্তের মাথায় তিনি তাঁর প্রাচীন টুলে বসলেন। এরপর টেরেস থেকে মিছিল নিয়ে ভেতরে ঢুকল তরুণ উপাসকরা, প্রত্যেকের মাথায় নল খাগড়ার তৈরি ঝুড়ি, আকারে গরুর গাড়ির চাকার মত। অতিথিদের প্রতিটি বৃত্তের সামনে একটা করে নামিয়ে রাখা হলো।

প্রধান যাজকের সঙ্কেত পেয়ে সব ক'টা ঝুড়ির ঢাকনি একযোগে খোলা হলো। আনন্দে হৈ-চৈ করে উঠলেন সন্ন্যাসীরা। প্রতিটি ঝুড়িতে একটা করে পিতলের গামলা রয়েছে, তাতে হাতে বেলা গোল ময়দার রুটি, গভীর গামলার কিনারা পর্যন্ত ভরাট হয়ে আছে। আরও একদল উপাসক ঢুকল, ভারী পিতলের গামলা বয়ে আনতে বারোটা বাজছে তাদের, টলমল করছে পা। মরিচ আর এলাচের গন্ধে ভারী হয়ে উঠল বাতাস। এই গামলাগুলো থেকে ধোঁয়া উঠছে, ভেতরে রান্না করা খাসীর মাংস।

পুরোহিত আর সন্ন্যাসীরা রুটি ও মাংসের ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, দেখে মনে হলো হিংস্র কোন প্রাণী শত্রু নিধনে মেতে উঠেছে। আহার পর্ব মাত্র শুরু হয়েছে, উপাসকরা পরিবেশন করল ড্রাম ভর্তি তেজ। খাবে কি, হাঁ করে তাকিয়ে আছে রানা। পুরোহিত ও সন্ন্যাসীরা মুখ খোলার পর তা আর বন্ধ করছে না, এক হাতে যতটুকু ধরে ভেতরে ভরছে মাংস আর রুটি, না চিবিয়ে ঢক ঢক করে তেজ ঢেলে নামিয়ে দিচ্ছে গলা দিয়ে, এভাবে বিরতিহীন চালিয়ে যাচ্ছে।

মাংসের গামলা খালি হয়ে আসায় রানা ভাবল এবার বোধহয় নোংরা দৃশ্যটা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। কিন্তু না, তরুণ উপাসকরা এরপর নিয়ে এল আস্ত মুরগীর রোস্ট।

রানার নির্দেশে কিছুই না খেয়ে নিমা ভান করছিল প্রচুর খাচ্ছে, হঠাৎ ম্লান গলায় বলল, 'আমার অসুস্থ লাগছে।'

'চোখ বন্ধ করে ইংল্যান্ডের কথা ভাবুন,' পরামর্শ দিল রানা। 'এই উৎসবের আপনিই স্টার। ওরা আপনাকে পালাতে দেবে না।'

তারপর শুরু হলো চিৎকার, 'কাটিকালা! কাটিকালা!' পুরোহিত বা সন্ন্যাসী, কেউ থামছেন না। উপাসকরা ছুটে বেরিয়ে গেল টেরেসে, খানিক পর ফিরে এল ডজন ডজন বোতল আর চায়ের কাপ নিয়ে। স্থানীয় লোকজনকে কালা কুত্তা বলে গাল দিলেও, খাওয়াদাওয়া শুরু হবার পর দেখা গেল খাদ্যগ্রহণের প্রতিযোগিতায় পুরোহিত আর সন্ন্যাসীদের সঙ্গে জোর পাল্লা দিচ্ছে উস্তাভ। শুধু তাই নয়, প্রতিযোগিতায় সে-ই জিতছে বলে মনে হলো। ওরা দেখল তরুণ উপাসকরা তার পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিচ্ছে। কাটিকালা আসার পর দেখা গেল, চোখের পলক না ফেলে বোতলের পর বোতল খালি করে ফেলছে উস্তাভ।

তারপর এক সময় প্রধান পুরোহিতের চোখে রানা আর নিমার ফাঁকিবাজি ধরা পড়ে গেল। তেজ আর কাটিকালা খেয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন তিনি, দাঁড়াবার পর টলছেন, এলোমেলো পা ফেলে এগিয়ে আসছেন সরাসরি নিমার দিকে, হাতে মাংস ভরা বিশাল এক রুটি, টকটকে লাল ঝোল ঝরছে তা থেকে।

তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ভয়ে কুঁকড়ে গেল নিমা। উপস্থিত সবাই তাকিয়ে আছে ওর দিকে। রানার বাহু খামচে ধরল নিমা। 'না! প্লীজ, না। বাঁচান আমাকে, রানা। আমি আপনার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকব, প্লীজ...'

'প্রধান অতিথি হবার মাসুল দিতে হবে না?' হাসল রানা।

নাটকীয় আবহ তৈরি হলো হঠাৎ করে ব্যান্ড পার্টির সদস্যরা একযোগে বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শুরু করায়। পবিত্র উপহার হাতে নিয়ে নিমার সামনে হাজির হলেন মোহন্ত। উপস্থিত পুরোহিত আর সন্ন্যাসীরা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছেন। নিয়তির অমোঘ বিধান কি করে এড়ায় নিমা, অগত্যা চোখ বুজে হাঁ করতে হলো ওকে।

উৎসাহদায়ক গর্জন, করতালি ও বাদ্যযন্ত্রের সম্মিলিত ঐকতানের মধ্যে প্রাণপণে চিবিয়ে যাচ্ছে নিমা। ওর মুখ গোলাপি হয়ে উঠল, চোখ বেয়ে দর দর করে পানি ঝরছে। এক পর্যায়ে রানার মনে হলো পরাজয় মেনে নিয়ে সবটুকু উগরে দেবে ও। তবে না, ধীরে ধীরে, সাহসের সঙ্গে, প্রতিবার একটু একটু করে, গিলে ফেলল মুখের খাবার। তারপর নেতিয়ে পড়ল। দর্শকরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল, তাদের উল্লাসধ্বনিতে কান পাতা দায়। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ওর সামনে নিচু হলেন মোহন্ত, হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে ঝুঁকলেন, আলিঙ্গন করলেন ওকে। তারপর আলিঙ্গন ঢিলে না করেই নিমার পাশে নিজের জন্যে জায়গা করে নিলেন তিনি। খেয়াল নেই, মাথার মুকুট পাশে গড়াচ্ছে।

'মনে হচ্ছে আপনি ওঁর হৃদয় জয় করেছেন,' শুকনো গলায় বলল রানা।

'আমার ভয় করছে, দৌড়ে না পালালে যে-কোন মুহূর্তে উনি আপনার কোলে চড়ে বসতে পারেন।'

দ্রুত প্রতিক্রিয়া হলো নিমার। খপ করে কাটিকালার একটা বোতল তুলে নিয়ে মোহন্তের ঠোঁটে ঠেকাল। 'পান করুন!' চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন ওলি জারকাস, তবে ওর হাত থেকে পান করার জন্যে ওকে তাঁর ছেড়ে দিতে হলো। বোতল থেকে সরাসরি খানিকটা কাটিকালা পান করে ইঙ্গিত করলেন ওলি জারকাস, অর্থাৎ তিনি নিমার হাত থেকে রুটি মাংস খেতে চাইছেন।

নিমা ইতস্তত করছে দেখে রানা বলল, 'বুড়োকে খুশি রাখতে পারলে ভবিষ্যতে কিছু সুবিধে পাওয়া যেতে পারে।'

রুটি আর মাংস হাতে নিয়ে তাঁকে খাওয়াতে যাবে নিমা, হঠাৎ এমন চমকে উঠল যে হাতের রুটির-মাংস ওলি জারকাসের কোলের ওপর পড়ে গেল। থরথর করে কাঁপাছে নিমা, যেন প্রচণ্ড জ্বরে ভুগছে। চোখ দুটো বিস্ফারিত, তাকিয়ে আছে পাশে পড়ে থাকা মুকুটটার দিকে।

'কি হলো?' দ্রুত জানতে চাইল রানা, তবে গলাটা চড়তে দেয়নি। হাত বাড়িয়ে নিমার বাহু ধরে ফেলল। উপস্থিত কেউই ওর চমকে ওঠা লক্ষ করেনি। অপর হাতে বোতল ছেড়ে দিয়ে নিমাও রানার বাহু খামচে ধরল, ওর আঙুলের শক্তি অনুভব করে বিস্মিত হলো রানা। শার্ট ভেদ করে ওর নখ চামড়া ছিঁড়ে ফেলছে। 'মুকুটটা দেখুন!' ফিসফিস করল নিমা, হাঁপাতে শুরু করেছে। 'পাথরটা। নীল পাথরটা!'

কাচ ও স্ফটিকের পাথরগুলো সস্তাদরের, তবে ওগুলোর সঙ্গে মুকুটে অল্পদামী কিছু পাথরও আছে। একটা পাথর নীল, আকারে সিলভার ডলারের মত, আসলে নীল সেরামিকের তৈরি সীল, পুরোপুরি গোল, তাপ দিয়ে কঠিন করা হয়েছে। চাকতির মাঝখানে একা মিশরীয় রথ খোদাই করা–ঘোড়া টানা রথ, সামরিক শকট। রথের ওপর খোদাই করা হয়েছে ডানা ভাঙা বাজপাখি। চাকতির বৃত্তাকার কিনারা জুড়ে হায়ারাগ্লিফিক্স-এ লেখা হয়েছে দুটো বাক্য, পড়তে মাত্র কয়েক মুহূর্ত লাগল রানার–

'আমি দশ হাজার রথের নেতৃত্ব দিই।
আমি টাইটা, রাজকীয় আন্তাবলের পরিচালক।'

চোখ ইশারায় বার্তা বিনিময় হলো, কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করা চলবে না। ব্যাপারটা নিয়ে এখুনি আলোচনা করা দরকার, কিন্তু এখান থেকে পালাবে কিভাবে! এই সময় ওদেরকে সাহায্য করল উস্তাভ, হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল মাতালটা, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়েও পড়ল। টলতে টলতে এগিয়ে এল রুবি, সে-ও মাতাল হতে চলেছে, রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'স্যার, এখন আমি কি করব?'

কথা না বলে দাঁড়াল রানা, এগিয়ে এসে উস্তাভকে কাঁধে তুলে নিল। পালাবার এই সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। 'সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ!' বলল ও, যদিও পুরোহিত বা সন্ন্যাসীদের মধ্যে সাড়া দেয়ার মত কাউকে পাওয়া গেল না। টেরেসে বেরিয়ে এল রানা, ওর পিছু নিয়ে মেয়ে দুজনও। কোথাও না থেমে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে ওরা।

'আমার ধারণা ছিল না স্যার রানার শরীরে এত শক্তি।' হাঁপাচ্ছে রুবি, কারণ ধাপগুলো খুব উঁচু আর সিঁড়িটাও খুব লম্বা।

'আমারও তো ধারণা ছিল না,' বলল নিমা, নিজেও বলতে পারবে না কথার সুরে কি কারণে গর্ব প্রকাশ পেল। ছেলেমানুষি কোরো না, নিজেকে চোখ রাঙাল, তোমার কেউ হয় না ও!

কুঁড়েঘরে ঢুকে উত্তাভকে তার বিছানায় ছুঁড়ে দিল রানা, হাপরের মত হাঁপাচ্ছে, ঘামছে দরদর করে। তার কাছে রুবিকে রেখে নিমাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ও।

'আপনি দেখেছেন...?' উত্তেজিত গলায় শুরু করল নিমা, তবে ঠোঁটে আঙুল রেখে ওকে চুপ করিয়ে দিল রানা। নিমার ঘরে চলে এল ওরা। 'দেখেছেন আপনি?' আবার জানতে চাইল নিমা। 'পড়তে পেরেছেন?'

'আমি দশ হাজার রথের নেতৃত্ব দিই,' বলল রানা।

'আমি টাইটা, রাজকীয় আস্তাবলের পরিচালক,' বাকিটুকু পূরণ করল নিমা। 'সে এখানে এসেছিল! ওহ্ রানা! টাইটা এখানে এসেছিল! এই প্রমাণটাই খুঁজছিলাম আমরা। এখন আমরা জানি অযথা সময় নষ্ট করছি না!' নিজের বিছানায় ধপ করে বসে পড়ল। 'আপনার কি ধারণা, প্রধান পুরোহিত সীলটা পরীক্ষা করতে দেবেন?'

মাথা নাড়ল রানা। 'মনে হয় না। মুকুটটা মঠের মূল্যবান ধর্মীয় সম্পদ। আপনাকে তাঁর খুব ভাল লাগলেও, দেখতে দেবেন বলে মনে হয় না। তবে, বেশি আগ্রহ দেখানো চলবে না। ওটার তাৎপর্য সম্পর্কে ওলি জারকাসের কোন ধারণা নেই। তাছাড়া, আমরা চাই না উত্তাভ কিছু টের পাক।'

'ঠিক বলছেন।' সরে গিয়ে বিছানায় নিজের পাশে জায়গা করল নিমা। 'বসুন এখানে।'

বসল রানা।

নিমা জানতে চাইল, 'বলুন, সীলটা কোত্থেকে এল? কে পেয়েছিল? কবে, কোথায়?'

'ধীরে, সুন্দরী, ধীরে। একের ভেতর চারটে প্রশ্ন, কোনটারই উত্তর আমার জানা নেই।'

'কল্পনা করুন!' তাগাদা দিল নিমা। 'আঁচ করুন। আইডিয়া দিন।'

'বেশ,' রাজি হলো রানা। 'সীলটা তৈরি করা হয়েছে হুঙকঙে। ওখানে ছোট একটা কারখানা আছে, হাজারে হাজারে তৈরি করা হয়। মিশরে বেড়াতে গিয়ে ওলি জারকাস একটা কিনে এনেছেন।'

রানার বাহুতে চিমটি কাটল নিমা, জোরে। 'সিরিয়াস হোন!' চোখ রাঙিয়ে নির্দেশ দিল।

'আমার চেয়ে ভাল আইডিয়া থাকলে শোনান,' বাহুটা অপর হাতে ডলছে রানা।

'বেশ, আমিই বলি। ফারাও-এর সমাধি নির্মাণের কাজ চলছে, এ-সময় সীলটা এখানে খাদের ভেতর পড়ে যায় টাইটার হাত থেকে। তিন হাজার বছর

পর বুড়ো এক সন্ন্যাসী, মঠে যারা প্রথম বসবাস করতে আসে তাদের একজন, এটা কুড়িয়ে পান। না, হায়ারাগ্লিফিক্স পড়তে পারেননি। সীলটা তিনি তখনকার প্রধান পুরোহিতের কাছে নিয়ে যান, প্রধান পুরোহিত ওটাকে সেন্ট ফ্রুমেনটিয়াস-এর একটা অলঙ্কার বলে ঘোষণা করেন, এবং সেট করেন মুকুটে।'

'আইডিয়াটা মন্দ নয়,' বলল রানা।

'আপনি কোন ফুটো দেখতে পাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল নিমা, উত্তরে মাথা নাড়ল রানা। 'তাহলে আপনি স্বীকার করছেন যে টাইটা সত্যিসত্যি এখানে ছিল, এবং তাতে প্রমাণ হয় আমাদের থিওরি মিথ্যে নয়?'

'প্রমাণ খুব কঠিন শব্দ। আসুন বলি, সব মিলিয়ে ওদিকটাই নির্দেশ করছে।'

বিছানার ওপর শরীরটা মুচড়ে পুরোপুরি রানার দিকে ফিরল নিমা। 'ওহ্, রানা, উত্তেজনায় কাঁপছি আমি! যীশুর কিরে, আজ রাতে আমি এক মিনিটও ঘুমাতে পারব না। এই, আমরা আবার সার্চ শুরু করব কখন?'

নিমার চোখ জোড়া উত্তেজনায় চকচক করছে, রক্তিম মুখে গোলাপী আভা। ফাঁক হয়ে আছে ঠোঁট দুটো, ভেতরে লালচে জিভের ডগা দেখতে পাচ্ছে রানা। এবার নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না ও। ধীরে ধীরে নিমার দিকে ঝুঁকল, ইচ্ছে করেই, এড়িয়ে যেতে চাইলে যাতে সুযোগ পায় নিমা।

'না,' বলার এক সেকেন্ড পর নিজেকে সরিয়ে দিল নিমা, যেন ইচ্ছের বিরুদ্ধে। 'প্লীজ, না। আমি···আমি এ-সব পছন্দ করি না।'

সিধে হয়ে বসল রানা, নিমার একটা হাত তুলে নিয়ে নিজের তালুর ওপর রাখল। তারপর ওর হাতে ঠোঁট ছোঁয়াল, মাত্র একবার। 'কাল সকালে দেখা হবে,' বলে হাতটা ছেড়ে দিল ও, দাঁড়িয়ে পড়ল। 'খুব ভোরে, কেমন? তৈরি থাকবেন।' মাথা নিচু করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ও।

সাত

পরদিন ভোরে কাপড় পরার সময় পাশের ঘরে নিমার নড়াচড়ার আওয়াজ পেল রানা। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মৃদু শিস দিতে বেরিয়ে এল নিমা, তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিল, রওনা হবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে আছে।

'মির এখনও জাগেনি,' ওদেরকে নাস্তা পরিবেশনের সময় জানাল রুবি।

'অবাক কাণ্ডই বলব আমি।' নিজের প্লেটে তাকিয়ে আছে রানা। কাল রাতের ঘটনা মনে থাকায় ওর মত নিমাও আড়ষ্ট হয়ে আছে। তবে রাইফেল আর প্যাক কাঁধে ঝুলিয়ে উপত্যকা ধরে রওনা হতে স্বাভাবিক হয়ে উঠল ওরা, চোখে-মুখে উত্তেজনা ও প্রত্যাশা ফুটে উঠল।

ঘন্টাখানেক হলো হাঁটছে, এই সময় ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা, তারপর নিমার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে সাবধান করে দিল, 'পিছনে কেউ

লেগেছে।'

কব্জি চেপে ধরে স্যান্ডস্টোনের বড় একটা বোল্ডারের আড়ালে নিমাকে টেনে নিয়ে এল রানা। আড়ালে পৌঁছে শুয়ে পড়ল ওরা। লাফ দেয়ার ভঙ্গি নিল রানা, ডাইভ দিয়ে পড়ল নোংরা জোব্বা পরা রোগা-পাতলা একটা মূর্তির ওপর। উপত্যকা ধরে ওদের পিছু পিছু উঠে এসেছে সে। চিৎকার দিয়ে জমিনে হাঁটু গাড়ল মূর্তিটা, ভয়ে ফোঁপাতে শুরু করল।

রানা তাকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে দাঁড় করাল। 'বাটি! পিছু নিয়েছ কেন? কে পাঠিয়েছে তোমাকে?' আরবীতে জানতে চাইল ও।

চোখ ঘুরিয়ে নিমার দিকে তাকাল বাটি। 'না, মাফ চাই! দয়া করুন, মারবেন না! আমি কোন ক্ষতি করতে চাইনি।'

'ছেড়ে দিন ওকে, রানা। তা না হলে আবার খিচুনি শুরু হবে।'

রানা ছেড়ে দিতেই ছুটে এসে নিমার পিছনে লুকাল বাটি, ভয়ে ওর একটা হাত আঁকড়ে ধরল, উঁকি দিয়ে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'মারব না, সত্যি কথা বললে মারব না,' তাকে অভয় দিল রানা। 'কিন্তু সত্যি কথা না বললে গায়ের চামড়া তুলে নিয়ে গাছে ঝোলাব। কে তোমাকে পাঠিয়েছে?'

'আমি নিজে থেকে এসেছি। কেউ আমাকে পাঠায়নি,' কাঁপতে কাঁপতে বলল বাটি। 'ওই জায়গাটা দেখাব আপনাদের, যেখানে পবিত্র ডিক-ডিক আমাকে দেখা দিয়েছিল। ওটার চামড়ায় ব্যাপ্টিস্টের আঙুলের ছাপ ছিল।'

হেসে ফেলল রানাও। 'ও সত্যি কথা বলছে কিনা সন্দেহ আছে আমার। আমি যতটুকু বুঝি, ডোরাকাটা ডিক-ডিকের আজ আর কোন অস্তিত্ব নেই।' বাটির দিকে তাকাল ও। 'যদি বুঝি যে মিথ্যে বলছ, সত্যি সত্যি তোমাকে গাছে ঝোলানো হবে, মনে থাকে যেন।'

'আমি মিথ্যে কথা বলছি না,' বলে ফোঁপাতে শুরু করল কিশোর ছেলেটা।

নাক গলাল নিমা। 'কেন শুধু শুধু ভয় দেখাচ্ছেন ওকে! ও আমাদের কোন ক্ষতি করবে না।' বাটির মাথায় আদর করে হাত বুলাল।

'ঠিক আছে, তোমাকে একটা সুযোগ দেয়া হলো,' বলল রানা। 'নিয়ে চলো আমাদের, দেখি কোথায় দেখেছিলে পবিত্র ডিক-ডিক।'

আবার রওনা হলো ওরা। বাটি হাঁটছে না, বলা চলে নিমার পাশে নাচছে, হাতটাও সে ছাড়তে রাজি নয়। একশো গজও পেরোয়নি, চেহারা থেকে ভয়-ডর সব উধাও হয়ে গেল, আহ্লাদে আটখানা অবস্থা। চোখে-মুখে লাজুক ভাব নিয়ে খিকখিক করে হাসছে।

এক ঘণ্টা ওদেরকে পথ দেখাল বাটি, ডানডেরা নদী থেকে দূরে সরিয়ে আনল। উপত্যকার অনেক ওপর, উঁচু জমিনে উঠে আসার পর লাইমস্টোনের রিজ দেখতে পেল ওরা, হুকের মত কাঁটা নিয়ে ঘন ঝোপগুলো গোটা এলাকাটাকে দুর্গম করে রেখেছে। ঝোপগুলো পরস্পরের সঙ্গে জোড়া লাগানো, দেখে মনে হচ্ছে এগোবার কোন পথ নেই। তবে আঁকাবাঁকা একটা সরু পথ ঠিকই খুঁজে বের করল বাটি, এত কম চওড়া যে দু'পাশের কাঁটাঝোপ এড়াতে ধীর পায়ে সাবধানে

হাঁটতে হচ্ছে। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল বাটি, নিমার কব্জিতে টান দিয়ে ওকেও নিজের পাশে দাঁড় করাল। হাত দিয়ে নিচের দিকটা দেখাল সে, প্রায় নিজের পায়ের আঙুলগুলো।

'নদী!' বলল বাটি, গলায় উল্লাস। তার পাশে এসে দাঁড়াল রানা, অবাক হয়ে শিস দিল মৃদু। বিশাল এক বৃত্ত তৈরি করে বাটি ওদেরকে পশ্চিমে নিয়ে এসেছে, তারপর ফিরিয়ে এনেছে ডানডেরা নদীর এমন একটা পয়েন্টে যেখানে প্রবাহটা এখনও বয়ে চলেছে গভীর নালার তলায়।

এই মুহূর্তে সেই গহ্বরের একেবারে কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। একবার তাকিয়েই রানা লক্ষ করল, পাথুরে নালার মাথার দিকটা একশো ফুটের কম চওড়া হলেও, রিম-এর নিচে গহ্বরটা প্রসারিত হয়েছে। বহু নিচের পানির সারফেস থেকে উঠে আসা পাথরের পাঁচিল মাটির তৈরি তেজ বোতলের মত ক্রমশ ফুলে উঠেছে। আবার ওটা সরু হয়েছে মাথার কাছাকাছি যেখানে ওরা দাঁড়িয়ে। 'ওখানে দেখেছি,' গহ্বরের অপরদিকটা দেখাল বাটি। ওখানে কাঁটাঝোপের ভেতর থেকে একটা ঝর্ণা বেরিয়ে এসেছে। ধনুকের মত বাঁকা পাথুরে পাঁচিলে ঝুলে আছে সবুজ শ্যাওলার জাল, তা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি ঝরে পড়ছে দুশো ফুট নিচের নদীতে।

'ওপারে যদি দেখে থাকো, আমাদেরকে এপারে আনলে কেন?'

চেহারা দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবে বাটি। 'এদিকে আসাটা সহজ। ওপারের জঙ্গলে কোন পথ নেই। ঝোপের কাঁটা লাগবে মেমসাহেবকে।'

বাটির কাঁধে হাত রেখে চাপ দিল নিমা। গহ্বরের ঠোঁটে ঝুলে থাকা একটা গাছের ছায়ায় বসে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত হলো। ইতিমধ্যে দুপুর পেরিয়ে গেছে, গরমে ভাজা ভাজা হয়ে যাচ্ছে শরীর। নিমাকে রানা ইংরেজিতে বলল, 'মুকুটে টাইটার সেরামিক সম্পর্কে বাটি কিছু জানলেও জানতে পারে, আপনি ওকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।'

প্রথমে অন্য প্রসঙ্গে আলাপ জুড়ল নিমা, মাঝে মধ্যে বাটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কি, প্রধান পুরোহিতের মুকুটে নীল পাথরটা?'

'সেইন্টের পাথর ওটা, সেন্টফ্রুমেনটিয়াসের প্রধান প্রিস্ট বলেন, যীশুর মতই পুরানো ওটা।'

'কোত্থেকে এল ওটা, জানো তুমি?'

মাথা নাড়ল বাটি। 'বোধহয় আকাশ থেকে পড়েছে। তারপর হয়তো সেন্ট ফ্রুমেনটিয়াস মারা যাবার সময় প্রধান প্রিস্টকে দিয়ে যান। কিংবা তাঁর কফিনে ছিল, কবরে ঢোকানোর আগে বের করে নেয়া হয়।'

'হ্যাঁ, হয়তো। বাটি, তুমি সেন্ট ফ্রুমেনটিয়াসের কবর দেখেছ?'

ভয়ে ভয়ে চারদিকে চোখ বুলাল বাটি, যেন কোন অপরাধ করে ফেলেছে। 'শুধু অধিকারী প্রিস্টদের মাকডাসে ঢোকার অনুমতি আছে,' মাথা নিচু করে বিড়বিড় করল সে।

'তুমি দেখেছ,' নরম সুরে অভিযোগ করল নিমা, হাত বুলিয়ে দিচ্ছে মাথায়।

বাটির সন্ত্রস্ত ভাব লক্ষ করে উৎসাহ বোধ করছে ও। 'আমাকে বলতে পারো, আমি কাউকে বলব না।'

'মাত্র একবার,' স্বীকার করল বাটি। 'আমার বয়সী কয়েকটা ছেলে টাবট পাথরটা ছোঁয়ার জন্যে জোর করে পাঠায় আমাকে। না গেলে ওরা আমাকে মারধর করত। প্রিস্টের সহকারী সব ছেলেকেই পাঠায় ওরা।' ঘটনাটার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় তার চেহারা শুকিয়ে গেল। 'সাংঘাতিক ভয় পেয়েছিলাম। কেউ ছিল না, আমি একা। তখন মাঝরাত, প্রিস্টরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। চারদিক অন্ধকার। মাকডাসে তো সেইন্টের আত্মা ঘুরে বেড়ায়, তাই না? ওরা আমাকে বলে দিয়েছিল, আমি যদি অযোগ্য বা অপবিত্র হই তাহলে সেইন্ট আমার মাথায় বাজ ফেলবেন।'

'সেইন্টের কবর পর্যন্ত গেলে তুমি?' জিজ্ঞেস করল নিমা। 'সমাধির ভেতরে ঢুকলে?'

মাথা নাড়ল বাটি। 'ঢোকার মুখে বার আছে। সেইন্টের জন্মদিনে শুধু প্রধান প্রিস্ট ওখানে ঢুকতে পারেন।'

'তুমি তাহলে বারের ভেতর দিয়ে তাকালে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু ভেতরটা অন্ধকার। সেইন্টের কফিন অবশ্য দেখা যাচ্ছিল। কাঠের কফিন, গায়ে পেইন্টিং আছে—সেইন্টের মুখ।'

'তিনি কি কালো?'

'না, ফর্সা। লাল দাড়ি আছে। পেইন্টিংটা খুব পুরানো। ঝাপসা হয়ে গেছে। কফিনের কাঠ পচে গেছে, গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ছে।'

'সমাধির মেঝেতে শোয়ানো কফিনটা?'

'না। পাথরের একটা শেলফে খাড়া করা।'

'আর কিছু মনে করতে পারো তুমি?' বাটি মাথা নাড়তে নিমা অন্য প্রশ্ন করল তাকে, 'কফিনটা কি মাকডাসের পিছনের দেয়ালে?'

'হ্যাঁ। বেদি আর টাবট পাথরের পিছনে।'

'বেদিটা কি দিয়ে তৈরি? পাথর দিয়ে?'

'কাঠের বেদি। মোমবাতি আছে, বড় একটা ক্রস আছে, কয়েকটা মুকুটও আছে। আর আছে পানপাত্র।'

'বেদির গায়ে কি ছবি আঁকা আছে?'

'না, খোদাই করা ছবি আছে। মুখগুলো কেমন যেন, কাপড়চোপড়ও অন্য রকম। ঘোড়া আছে।'

'টাবট সম্পর্কে বলুন,' রানাকে জিজ্ঞেস করল নিমা। 'আমাদের চার্চে টাবট স্টোন বলে কিছু নেই।'

'আমাকে জিজ্ঞেস করে লাভ কি। বাটি কিছু বলতে পারে কিনা দেখুন।'

নিমার প্রশ্ন শুনে টাবট সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলতে পারল না বাটি, শুধু জানাল, 'ওটা কাপড়ে মোড়া। সবাই বলে, শুধু সেইন্টের জন্মদিনে প্রধান প্রিস্ট ওটা খোলেন।'

রানা ও নিমা দৃষ্টি বিনিময় করল, তারপর রানা বলল, 'চিন্তা করে বের করুন

আমরা কিভাবে দেখতে পারি।'

'সেইন্টের জন্মদিনের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে, আপনাকে হতে হবে ভারপ্রাপ্ত প্রিস্ট…' হঠাৎ সচকিত দেখাল নিমাকে, ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'আপনি কি…না, তা আপনি ভাবতে পারেন না।'

'আরে না, তা কি আমি ভাবতে পারি!'

'মাকডাসে আপনি ধরা পড়লে ওরা আপনাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবে।'

'উত্তরটা হলো, ধরা না পড়া।'

'আপনি গেলে আমিও যাব। কিভাবে ম্যানেজ করবেন?'

'ধীরে।' রানার ঠোঁটে অলস হাসি। 'মাত্র দশ সেকেন্ড হলো আইডিয়াটা মাথায় এসেছে। প্ল্যান করার জন্যে অন্তত দশটা মিনিট সময় দিন।'

দু'জনেই ওরা গহ্বরের ওপারে চুপচাপ তাকিয়ে থাকল। নিস্তব্ধতা ভাঙল নিমা, 'কাপড়ে মোড়া একটা বস্তু। টাইটার স্টোন টেস্টামেন্ট?'

'জোরে বলবেন না, শয়তান শুনছে।'

হঠাৎ চিৎকার দিল সেটি। 'ওই দেখুন! ওদিকে তাকান!' নিমার হাত ধরে ঝাঁকাল সে। 'বলেছি না…' অপর হাতে নদীর ওপারটা দেখাচ্ছে। 'কাঁটাঝোপের কিনারায়! দেখতে পাচ্ছেন না?'

'কি? কি দেখব?'

'ডোরাকাটা ডিক-ডিক। জন দ্য ব্যাপ্টিস্টের ডিক-ডিক। গায়ে পবিত্র ছাপ…'

ওপারের ঝোপের গায়ে নরম, খয়েরি একটা অস্পষ্ট প্রলেপ দেখতে পেল নিমা। 'কি জানি। এত দূর থেকে…'

প্যাক হাতড়ে বিনকিউলার বের করল রানা। কিছুক্ষণ দেখার পর হেসে উঠল। 'মাই গড! দেখিয়াও না হয় প্রত্যয়! এ তো সত্যি সত্যি ডোরাকাটা ডিক-ডিক!' বিনকিউলারটা নিমার হাতে ধরিয়ে দিল।

আগের দিন সাধারণ যে ডিক-ডিকটা ওরা দেখেছিল, আকারে এটা তার অর্ধেক হবে। গায়ের রঙও ধূসর নয়, উজ্জ্বল লালচে খয়েরি। তবে প্রথমেই চোখে লাগে কাঁধে ও পিছনদিকের গাঢ় চকলেট রঙের ডোরাগুলো—পাঁচটা দাগ, পরস্পরের সঙ্গে সমান দূরত্বে, দেখে সত্যিসত্যি মনে হবে পাঁচ আঙুলের ছাপ।

ডিক-ডিকের অর্ধেক গায়ে ছায়া পড়েছে, বাতাস শোঁকার সময় নাক কোঁচকাচ্ছে। মাথা উঁচু করে আছে, সন্দিহান ও সতর্ক।

রাইফেলটা হাতে নিল রানা, বোল্ট টেনে চেম্বারে একটা রাউন্ড ঢোকাল। নিমা জানতে চাইল, 'গুলি করবেন নাকি?'

'এখুনি না। ছোট টার্গেট, তিনশো গজ দূরে। মাথা নাড়ল রানা। 'আরও কাছে আসার অপেক্ষায় থাকব।'

কথা না বলে চোখে আবার বিনকিউলার তুলল নিমা। পালিয়ে যা, পালিয়ে যা, মনে মনে বলছে। কিন্তু পালিয়ে না গিয়ে গহ্বরের দিকে এগিয়ে আসছে ডিক-ডিক।

'দুশো গজ,' বিড়বিড় করল রানা, শুয়ে পড়েছে ও, টেলিস্কোপ সাইটে চোখ। এই সময় হঠাৎ উত্তেজনায় টান টান হলো খুদে হরিণ, ফেলে আসা পথ ধরে

ছুটল, অদৃশ্য হয়ে গেল কাঁটাঝোপের ভেতর।

'ভয় পেল কেন?' বলার পর মুখের ভাব বদলে গেল রানার। বাতাসে কিসের যেন একটা গুঞ্জন, প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে। 'হেলিকপ্টার!' নিমার হাত থেকে বিনকিউলার নিয়ে আকাশের দিকে তাক করল। আকাশে মেঘ নেই, একটু পরই যান্ত্রিক ফড়িংটাকে দেখা গেল। কাঠামোটা চিনতে পারল রানা। 'বেল জেট রেঞ্জার। এদিকেই আসছে। আসুন, লুকিয়ে পড়ি।'

কাঁটাঝোপের ভেতর গা ঢাকা দিল ওরা। হেলিকপ্টারটাকে এখনও বিনকিউলারে ধরে রেখেছে রানা। 'সম্ভবত ইথিওপিয়ান এয়ার ফোর্স, অ্যান্টি গুফতা টহলে বেরিয়েছে। না, দেখে তো সামরিক বলে মনে হচ্ছে না। সবুজ আর লাল ফিউজিলাজ, লাল ঘোড়া। লাল ঘোড়া তো প্রক্সি এক্সপ্লোরেশনের লোগো।'

কাছাকাছি চলে আসায় নিমা এখন খালি চোখেই লোগোটা দেখতে পাচ্ছে। ওদের সামনে আধ মাইল দূরে রয়েছে কপ্টার, উড়ে যাচ্ছে নীল নদের দিকে।

'জ্যাক রাফেল ভাল একটা বাহন পেয়েছে,' বলল রানা। 'যখন খুশি আমাদের ওপর নজর রাখতে পারবে।'

কপ্টারটা উপ-খাদের কুঞ্জ পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, সম্ভবত মঠের দিকে যাচ্ছে।

'বসের নির্দেশে ওরা সম্ভবত আমাদের ক্যাম্প খুঁজছে,' আন্দাজ করল রানা। 'চলুন, ফিরি। না, সবুর!' এঞ্জিনের আওয়াজ আবার বাড়তে শুরু করেছে। ঝোপ-ঝাড়ের ফাঁকে আবার কপ্টারটাকে দেখা গেল, ওদের মাথার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। 'নদীটাকে অনুসরণ করছে ওরা,' বলল রানা। 'কিছু খুঁজছে বলে মনে হয়।'

'আমাদের?'

এই সময় ওদেরকে চমকে দিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে ছুটল বাটি। 'বাঁচাও!' তারস্বরে চিৎকার করছে। 'কে কোথায় আছ বাঁচাও আমাকে! শয়তান তাড়া করেছে! যীশু তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে বাঁচাও!' ফাঁকা জায়গায় বেরিয়েও থামছে না, ছুটছে এখনও।

পাইলট তাকে দেখে ফেলেছে, কপ্টার ঘুরে গেছে ওদের দিকে। খুব নিচু দিয়ে এল ওটা, গহ্বরের ঠোঁটের কাছে স্থির হলো শূন্যে। ফরওয়ার্ড কেবিনের উইন্ডস্ক্রীনের ভেতর দুটো মাথা দেখতে পাচ্ছে ওরা। আরও নিচে নামছে পাইলট। নদীর ওপর ঝুলে থাকল। ঝোপের ভেতর কুঁকড়ে আছে ওরা, রানাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরেছে নিমা। কানে ভারী রেডিও এয়ারফোন আর গাঢ় চশমা থাকলেও জ্যাক রাফেলকে চিনতে পারল ওরা। পাইলট কালো। দু'জনেই গলা লম্বা করে নিচে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। ধরা পড়ে যাওয়ায় এখন আর লুকিয়ে থাকার কোন মানে হয় না। হাত-পা ছড়িয়ে পিছনের গাছে হেলান দিল রানা, হ্যাটটা মাথার পিছনে ঠেলে দিয়ে হাত নাড়ল রাফেলের উদ্দেশে।

কোরম্যান সাড়া দিল না। রানার দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে দেশলাই জ্বালল, ঠোঁটে ঝোলা আধ পোড়া চুরুটে ধরাল আগুনটা; কাঠিটা ফেলে দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল রানার দিকে, তারপর কি যেন বলল পাইলটকে। ওপরে উঠল

'কপ্টার, বাঁক ঘুরে উত্তর দিকে চলে গেল।

'শুধু আমাদেরকে নয়, আমাদের ক্যাম্পটাও দেখে গেল ওরা,' বলল নিমা।

'চলুন, ফিরি,' বলল রানা। 'কাল আবার আসা যাবে।'

'ওদেরকে আমার ভয়ই লাগছে,' বলল নিমা, তবে রানা চুপ করে আছে দেখে প্রসঙ্গ বদলে জানতে চাইল, 'বাটির আবার খিচুনি শুরু হয়নি তো?'

পথের ধারেই পাওয়া গেল তাকে। কাঁপছে সে এখনও, কাঁদছে, তবে খিচুনি ওঠেনি। নিমা গায়ে-মাথায় হাত বুলাতে শান্ত হলো সে। ওদের পিছন পিছন অনেক দূর এল, তারপর কখন এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেল মঠের দিকে।

সন্ধের আগে আরেকবার মঠ দেখতে এল ওরা। পাথুরে ক্যাথেড্রালের প্রবেশমুখে থামল, তারপর আউটার চেম্বারে ঢুকে তরুণ উপাসকদের ভিড়ে মিশে গেল। খোলা দরজা দিয়ে মিড্‌ল চেম্বারের ভেতর তাকিয়ে ফিসফিস করল নিমা, 'বাটির কথা থেকে বোঝা যায়, ডিউটিতে থাকা প্রিস্ট কখন ঘুমিয়ে পড়বে তার অপেক্ষায় থাকে শিক্ষানবিস তরুণরা।'

দেখা গেল পুরোহিতরা বিনা বাধায় ভেতরে আসা-যাওয়া করছেন, কারও অনুমতির জন্যে কোথাও থামছেন না। তবে দরজায় পাহারায় দাঁড়ানো পুরোহিতদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের সময় নাম ধরে সম্বোধন করছেন সবাই। পরস্পরকে সবাই তাঁরা চেনেন। রানা বলল, 'সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ নিয়ে ভেতরে ঢুকলাম, তারপর ধরা পড়ে গেলাম। পবিত্র এলাকায় অনুপ্রবেশের সাজাটা যেন কি?'

'নীলনদের বুভুক্ষু কুমীরের খোরাক বানানো হয় না তো?' হেসে উঠল নিমা। 'তবে আমাকে না নিয়ে ওখানে আপনি ঢুকছেন না।'

এ নিয়ে এখুনি তর্ক করতে রাজি নয় রানা। খোলা দরজা দিয়ে যতটুকু পারা যায় দেখে নিতে চাইছে ও। আউটার চেম্বারের চেয়ে মিড্‌ল চেম্বারটা আকারে ছোট বলে মনে হলো। ভেতরে ছায়ার ভেতর দেয়ালচিত্র দেখা যাচ্ছে। মুখোমুখি দেয়ালে আরেকটা দরজা। বাটির বর্ণনা অনুসারে ওটা মাকডাসে ঢোকার পথ। ফাঁকটা বন্ধ করা হয়েছে গ্রিলের গেট বসিয়ে। গেটের ফ্রেমটা গাঢ় রঙের কাঠ দিয়ে তৈরি, তবে বারগুলো লোহার।

দরজার দু'পাশে পাথুরে সিলিং থেকে মেঝে পর্যন্ত এমব্রয়ডারি করা পর্দা ঝুলছে, তাতে সেইন্ট ফ্রুমেনটিয়াসের জীবন কাহিনী থেকে নেয়া দৃশ্য ফুটে উঠেছে। একটা দৃশ্যে নতমস্তকে সমবেত শিষ্যদের ধর্মীয় বাণী শোনাচ্ছেন তিনি, এক হাতে বাইবেল, অপর হাতটা আশীর্বাদ করার ভঙ্গিতে ওপরে তোলা। আরেকটা পর্দায় ফুটে উঠেছে একজন সম্রাটকে ব্যাপ্টিজমে দীক্ষিত করার দৃশ্য। ওলি জারকাসের মতই মাথায় উঁচু আর সোনালি মুকুট পরে আছেন সম্রাট, সেন্টের মাথার চারপাশে একটা বলয়। সম্রাটের মুখ কালো, তবে সেইন্টের মুখ সাদা।

'ইতিহাস কি এখানে বিশুদ্ধ?' বিড়বিড় করে নিজেকেই প্রশ্নটা করল রানা।

'কি ভেবে হাসছেন আপনি?' জানতে চাইল নিমা। 'ভেতরে ঢোকার কোন উপায় পেয়ে গেছেন?'

fb.com/groups/BoiLoversPolapain

'না, ভাবছি ডিনারের কথা। চলুন, ফিরি।'

ডিনারে বসে দেখা গেল উস্তাভ ঢক ঢক করে শুধু মদই খাচ্ছে। সারাদিন কে কি করল বা দেখল আলোচনা হচ্ছে। ডোরাকাটা ডিক-ডিক প্রসঙ্গটা তুলতে যাচ্ছিল নিমা, চোখ ইশারায় নিষেধ করল রানা, নিচু গলায় বলল, 'জানলে কাল ওরা আমাদের সঙ্গে যেতে চাইবে।'

'মিস্টার রানা, স্যার, মা জননী কি আপনাকে ভদ্রতা বলে কিছু শেখাননি? সবাই না বুঝলে, সে ভাষায় কথা বলতে নেই। নিন, খানিকটা ভদকা খান।'

'আমার ভাগটুকুও আপনি খেয়ে ফেলুন,' বলল রানা।

ডিনারের সময় প্রায় কোন কথাই বলছে না রুবি। করুণ আর বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাকে। নিমা লক্ষ করল, স্বামীর দিকে ভুলেও সে তাকাচ্ছে না। ডিনার শেষ হতে রানা আর নিমা উঠে পড়ল, আগুনের ধারে স্ত্রীকে বসিয়ে রাখল উস্তাভ।

নিজেদের কুঁড়ের দিকে যাবার সময় রানা বলল, 'যেভাবে গিলছে উস্তাভ, আজ রাতেও না বউকে ধরে পেটায়।'

'আজ সারাদিন রুবির ওপর অত্যাচার করেছে লোকটা,' বলল নিমা। 'আমাকে রুবি বললেন, আদ্দিস আবাবায় ফিরেই স্বামীকে ছেড়ে দেবেন।'

'এরকম একটা জানোয়ারের সঙ্গে বিয়ে হলো কি করে? দেখতে তো খুবই সুন্দর, ভাল একজনকে বেছে নিতে পারলেন না?'

'সব মেয়ে সমান নয়,' জবাব দিল নিমা। 'কিছু মেয়ে জানোয়ার দেখলে আকৃষ্ট হয়। বিপদের মধ্যে রোমাঞ্চ থাকে, সেটাই বোধহয় কারণ। সে যাই হোক, রুবি জানতে চাইছেন কাল আমাদের সঙ্গে বেরুতে পারবেন কিনা। স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন বেচারি।'

'অন্তত ওঁকে রেহাই দেয়ার জন্যে সঙ্গে নেয়া দরকার,' রাজি হলো রানা।

পরদিন ভোর হবার আগেই রওনা হলো ওরা। রিগবি হাতে রানা সামনে থাকল, পিছনে মেয়ে দুজন কথা বলতে বলতে আসছে। ডোরা-কাটা ডিক-ডিক সম্পর্কে জানানো হলো রুবিকে, ওদের প্ল্যানটাও ব্যাখ্যা করা হলো। আগের দিন বাটি যে পথ ধরে নিয়ে গিয়েছিল, সেই পথটাই অনুসরণ করছে ওরা।

সূর্য বেশ অনেকটা ওপরে উঠে আসার পর ফাটলটার ঠোঁটে, কাঁটা-ঝোপের নিচে পৌঁছুল ওরা। ওত পেতে বসে থাকা ছাড়া আজ কোন কাজ নেই ওদের। খানিক পর নিমা জিজ্ঞেস করল, 'বেচারি ডিক-ডিককে যদি গুলি করতে পারেন, ওপার থেকে সেটাকে আনবেন কিভাবে?'

'ক্যাম্প ছাড়ার আগেই ব্যবস্থা করেছি,' বলল রানা। 'হেড ট্র্যাকারের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। গুলির শব্দ হলে রশি নিয়ে হাজির হবে সে, ওপারে পৌঁছুতে সাহায্য করবে আমাকে।'

ওদের নিচে ফাটলটার দিকে তাকাল রুবি। 'এর ওপর দিয়ে ওপারে যেতে কোনদিনই রাজি হব না আমি।'

রুবি আর নিমা রানার কাছাকাছি শুয়ে পড়ল, নিচু গলায় গল্প করছে। হাতে রিগবি নিয়ে অপেক্ষা করছে রানা, কাঁটা গাছে হেলান দিয়ে। দুপুর পেরিয়ে গেল, ডিক-ডিকের দেখা নেই।

গরমে সেদ্ধ হচ্ছে মেয়েরা। অনেক আগেই মুখ বন্ধ হয়ে গেছে তাদের। ঝিমুনি এসে যাচ্ছে।

আরও প্রায় আধঘন্টা পর কি একটা শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল রানার। ওর পিছনের কাঁটাঝোপ থেকে আওয়াজটা এসেছে বলে মনে হলো। খুবই অস্পষ্ট, তবে পরিচিত। এমন একটা শব্দ, এক নিমেষে পুরোপুরি সজাগ করে তুলেছে ওকে, পালস রেট বাড়িয়ে দিয়েছে, ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত নেমে এল শিরদাঁড়া বেয়ে। একে-ফরটিসেভেনের সেফটি ক্যাচ সামনে ঠেলে 'ফায়ার'পজিশনে আনা হয়েছে।

এক ঝটকায় কোল থেকে রাইফেল তুলে নিয়ে দু'বার গড়ান দিল রানা, শরীর মুচড়ে পাশে শুয়ে থাকা মেয়ে দুটোকে আড়াল দেয়ার চেষ্টা। একই সঙ্গে রিগবিটা কাঁধে তুলে ফেলেছে, তাক করেছে পিছনের ঝোপ।

'মাথা তুলবেন না,' হিসহিস করল রানা। 'নিচে রাখুন মাথা!' ট্রিগারে আঙুল, পাল্টা গুলি করার জন্যে প্রস্তুত। টার্গেট দেখতে পেয়েই ব্যারেল ঘোরাল সেদিকে।

বিশ কদম দূরে এক লোক গুঁড়ি মেরে বসে আছে, হাতের অ্যাসল্ট রাইফেল সরাসরি রানার মুখে তাক করা। চকচকে কালো লোকটা, ছেঁড়া-ফাড়া ক্যামোফ্লেজ ফেটিগ-পরে আছে, মাথার নরম ক্যাপটাও তাই। ওয়েবিং বেল্টে একটা বুশনাইফ, গ্রেনেড, পানির বোতল ও গেরিলাযোদ্ধার অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস রয়েছে। প্রফেশনাল শুকতা, চিন্তা করছে রানা, ঝুঁকি নেয়া যায় না। একই সঙ্গে উপলব্ধি করল, ইচ্ছে থাকলে এতক্ষণে মেরে ফেলতে পারত ওকে।

রিগবি তাক করল রানা অ্যাসল্ট রাইফেল মাজলের এক ইঞ্চি ওপরে, ওটার পিছনে গেরিলার রক্তলাল ডান চোখে।

অচল বা চালমাত অবস্থা; চোখ সরু করে জানান দিল লোকটা। তারপর আরবীতে নির্দেশ দিল, 'জাওয়াদ, মেয়ে দুটোকে কাভার দাও। লোকটা নড়লে গুলি করবে ওদের।'

খসখস আওয়াজ শুনে একপাশে তাকাল রানা। ঝোপের আড়াল থেকে আরেকজন গেরিলা বেরিয়ে এল। একই ড্রেস, তবে কোমরের কাছে ধরে আছে রাশিয়ান আরপিডি লাইট মেশিন গান। সাবধানে এগিয়ে এসে পয়েন্ট-ব্লাঙ্ক রেঞ্জ থেকে মেয়েদের ওপর মেশিন গান তাক করল সে।

ওদের চারপাশের ঝোপ থেকে আরও আওয়াজ আসছে। দু'জন নয়, গেরিলাদের গোটা একটা গ্রুপ, বুঝতে পারল রানা। জানে, মাত্র একটা গুলি করার সুযোগ পাবে ও। ফলাফল যা-ই হোক, নিমা আর রুবি ততক্ষণে লাশে পরিণত হবে।

মাজলটা ধীরে ধীরে নিচু করল রানা। তারপর মাটিতে রাইফেল নামিয়ে মাথার ওপর হাত তুলল। 'ওরা যা বলে শুনুন।'

সিধে হলো গেরিলা লীডার, নিজের লোকদের সঙ্গে দ্রুত কথা বলছে। 'ওর রাইফেল আর প্যাক নিয়ে নাও।'

'আমরা বিদেশী নাগরিক,' বলল রানা। 'সাধারণ ট্যুরিস্ট। যোদ্ধা বা সরকারী লোক নই।'

'কথা নয়, একদম চুপ!' কঠিন সুরে খেঁকিয়ে উঠল লীডার। আড়াল থেকে

গেরিলারা বেরিয়ে আসছে। সব মিলিয়ে পাঁচজনকে দেখতে পাচ্ছে রানা, তবে অনেকেই হয়তো সামনে বেরোয়নি। নড়াচড়ার ধরনই বলে দেয় প্রফেশনাল, গুলির পথে বাধা হচ্ছে না, সুযোগ দিচ্ছে না পালানোর। ঝটপট সার্চ করা হলো ওদেরকে, তারপর ধমক দিয়ে পথে এনে তোলা হলো।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?' জানতে চাইল রানা।

'কোন প্রশ্ন নয়!' ওর শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে একে-ফরটিসেভেনের বাঁট দিয়ে আঘাত করল একজন গেরিলা। পড়েই যাচ্ছিল, কোনরকমে তাল সামলাল।

প্রচণ্ড গরমের মধ্যে হাঁটতে বাধ্য করা হচ্ছে ওদেরকে। সূর্যের অবস্থান লক্ষ করছে রানা, সুযোগ পেলেই দেখে নিচ্ছে পাহাড়-প্রাচীরের চূড়াগুলো। পশ্চিম দিকে যাচ্ছে ওরা, নীলনদের কোর্স ধরে সুদান সীমান্তের দিকে। শেষ বিকেলের দিকে আন্দাজ করল দশ মাইল পেরিয়েছে। ইতিমধ্যে উপত্যকার একটা পাশে পৌঁছেছে ওরা, ডালটা ঘন জঙ্গলে ঢাকা। আরও মাইলখানেক এগোবার পর গেরিলাদের ক্যাম্পটা দেখা গেল। কয়েকটা মাত্র একচালা, সেন্ট্রিরা লাইট মেশিন গান নিয়ে সতর্ক হয়ে আছে।

ক্যাম্পের মাঝখানে একটা একচালার সামনে দাঁড় করানো হলো ওদেরকে। ভেতরে নিচু ক্যাম্প টেবিলের ওপর ঝুঁকে ম্যাপ দেখছে তিনজন অফিসার। অফিসারদের মধ্যে কমান্ডারকে আলাদাভাবে চেনা গেল। গেরিলা গ্রুপের লীডার তার কাছে গিয়ে উত্তেজিত ভঙ্গিতে কিছু বলল, ইঙ্গিতে বন্দীদের দেখাল।

সিধে হলো কমান্ডার, বেরিয়ে এল রোদে। লোকটা বেশি লম্বা নয়, তবে চেহারায় এত বেশি গাম্ভীর্য ও কর্তৃত্ব যে সেটা প্রথমে চোখে পড়ে না। কাঁধ দুটো চওড়া, কাঠামোটা চৌকো ও নিরেট। মুখে কোঁকড়ানো কালো দাড়ি, অল্প দু'একটা সাদা। চেহারায় মার্জিত একটা ভাব স্পষ্ট, সুদর্শনও বলতে হবে। চোখ দুটো চঞ্চল ও বুদ্ধিদীপ্ত, দৃষ্টি নিক্ষেপে ক্ষিপ্রতা লক্ষ করার মত। 'আমার লোক বলছে তুমি নাকি আরবী জানো,' রানাকে বলল সে।

'তোমার চেয়ে ভাল জানি, অ্যালান শাফি,' জবাব দিল রানা। 'তা, এই তোমার শেষ পরিণতি? একদল ডাকাতের সর্দার? কিডন্যাপারদের লীডার?'

এক সেকেন্ড হতভম্ব হয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল অ্যালান শাফি। 'রানা? ওহ্ গড! তোমাকে আমি চিনতে পারিনি? তোমাকে?' হাসছে সে। দুই হাত মেলে দিল, ভাঁজে আটকে বুকে টেনে নিল রানাকে। 'রানা! রানা!' দু'গালে দু'বার চুমো খেলো, তারপর বাহু সমান দূরে ঠেলে দিয়ে মেয়ে দুটোর দিকে তাকাল। 'এই ব্যাটা আমার প্রাণ বাঁচিয়ে ছিল,' ব্যাখ্যা দেয়ার সুরে বলল ওদেরকে। দু'জনেই ওরা হাঁ করে তাকিয়ে আছে। এদিকে গেরিলা দল ততক্ষণে হাওয়া।

'লজ্জা দিচ্ছ, শাফি।'

রানাকে আবার চুমো খেলো শাফি। 'তাও একবার নয়, দু'বার।'

'না, একবারই,' প্রতিবাদ করল রানা। 'দ্বিতীয়বার ভুলে। ওদের গুলিতে তোমাকে মরতে দেয়া উচিত ছিল আমার।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল গেরিলা কমান্ডার শাফি। 'প্রায় পাঁচ-ছয় বছর আগের

কথা, তাই না? তুমি কি এখনও সেনাবাহিনীতে আছ? এতদিনে নিশ্চয়ই জেনারেল হয়ে গেছ!'

'থাকলে হতাম, কিন্তু থাকিনি।'

মেয়ে দুটোর মধ্যে কে জানে কেন রুবিকে মনে ধরেছে শাফির, অন্তত ঘন ঘন তার দিকেই তাকাচ্ছে সে। 'তোমাকে আমি চিনি। কয়েক বছর আগে আদ্দিসে দেখেছি। তখন কিশোরী ছিলে। তোমার বাবা মালডু সিমেন, অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। মেনজিসটু তাঁকে খুন করে।'

'আমিও আপনাকে চিনি,' বলল রুবি। 'আমাদের অনেকেরই বিশ্বাস, মেনজিসটুর বদলে আপনারই ইথিওপিয়ার প্রেসিডেন্ট হওয়া উচিত ছিল।' সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল সে।

'সিধে হয়ে, মাথা উঁচু করে দাঁড়াও। কারও সামনে মাথা নিচু করো না।' রানার দিকে তাকাল কমান্ডার শাফি। 'আমার লোকেরা একটু বেশি উৎসাহী, খারাপ ব্যবহার করায় দুঃখিত। তবে আমরা খবর পেয়েছি যে মঠে কিছু লোকজন এসেছে, প্রশ্ন করছে নানা রকম। এসো, রানা, ভেতরে এসো।'

ক্যাম্প ফায়ার থেকে কেটলিতে কফি বানিয়ে আনা হলো, মগে ভরে ধরিয়ে দেয়া হলো হাতে। পুরানো দিনের কথা স্মরণ করল রানা ও শাফি। আফগানিস্তানে জঙ্গী মৌলবাদ বিরোধী গেরিলা ট্রেনিং ক্যাম্পে ট্রেনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে রানা, সেখানে সেকিউলারিজমে বিশ্বাসী ইথিওপিয়ান মুক্তি আন্দোলনে জড়িত অ্যালান শাফিও ট্রেনিং নিতে এসেছিল। পরে শাফির অনুরোধ ফেলতে না পেরে ইথিওপিয়ায়ও যেতে হয়েছিল রানাকে, পরোক্ষভাবে হলেও অল্প কিছুদিনের জন্যে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল মেনজিসটুর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধে।

তারপর শাফি জানতে চাইল, 'এখানে, আফ্রিকায় তুমি কি করছ, রানা?'

'এসেছি অ্যাবে গিরিখাদে,' রানার জবাব। 'ডিক-ডিক শিকার করব।'

'কি বললে? ডিক-ডিক?' শাফির চোখে অবিশ্বাস। তারপর গলা ছেড়ে হেসে উঠল। 'তুমি? ডিক-ডিক শিকার করবে? তুমি? নাহ্, বিশ্বাস করলাম না। তোমার অন্য কোন মতলব আছে।' পরমুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল সে। 'কিন্তু তুমি তো কখনও মিথ্যে বলো না!'

'একেবারে বলি না তাই বা বলি কি করে!' অসহায় একটা ভাব করল রানা। 'প্রশ্ন হলো, প্রয়োজনে তোমার সাহায্য পাব কিনা।'

'চাইলেই পাবে। দু'দু'বার জান বাঁচিয়েছ।'

'একবার,' শুধরে দিল রানা।

'এমন কি একবারও যথেষ্ট।'

অনুরোধ ফেলতে না পারায় রাতটুকু গেরিলাদের অতিথি হতে রাজি হলো রানা। কাল সকালে সেন্ট ফ্রুমেনটিয়াস মঠে ওদেরকে পৌঁছে দেবে শাফি। তিমকাত উৎসবে যোগ দেয়ার জন্যে গেরিলাদের নিয়ে তারও সেখানে যাবার কথা। প্রধান পুরোহিত ওলি জারকাস তার বন্ধু। রানা আন্দাজ করল, মঠটা আসলে শাফির ডীপ কাভার বেস। সম্ভবত সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে প্রতিপক্ষ বাহিনীর ত পরতা

সম্পর্কে তথ্যও পায় সে।

একটা একচালার অর্ধেকটা চট দিয়ে ঘিরে ছেড়ে দেয়া হলো রানা আর নিমাকে, বিছানা তৈরি হলো শুকনো ঘাস বিছিয়ে। মশা তাড়াবার জন্যে ধূপ জ্বালা হলো। নিমা আর রানা কাছাকাছি শুয়েছে, নিমার শরীর চাদরে ঢাকা। ঘরের খোলা, বাইরে ক্যাম্পফায়ারের সামনে বসে থাকতে দেখা গেল শাফি আর রুবিকে।

সেদিকে তাকিয়ে নিচু গলায় নিমা বলল, 'আরবের কোন মেয়ে পরপুরুষের সঙ্গে গভীর রাত পর্যন্ত একা বসে থাকবে না বিশেষ করে সে যদি বিবাহিতা হয়।'

'পরস্পরকে চেনে ওরা,' বলল রানা। 'তাছাড়া, আমার কেন যেন মনে হয়েছে, এক সময় দু'জন দু'জনকে পছন্দ করত। ভালবাসা তো দূরের কথা, স্বামীর কাছ থেকে সামান্য ভদ্র আচরণটুকুও বেচারি পায়নি। এখন শাফি যদি সহানুভূতি জানায়, আগ্রহ দেখায়, রুবির ওখানে বসে থাকাটা অন্যায় হয় কি করে?'

'আমি কি বলেছি অন্যায় হচ্ছে?' হাসল নিমা। 'শুধু ভাবছি, আপনার বন্ধু শাফি কি অসহায় মেয়েটাকে মুক্তির পথ দেখাতে পারবে?'

পরদিন ভোর হবার আগেই রওনা হয়ে গেল গেরিলারা। মার্চ শুরু হলো পুরোপুরি সামরিক শৃঙ্খলা বজায় রেখে, মূল দলের সামনে ও দু'পাশে থাকল স্কাউটরা। রানাকে শাফি জানাল, গিরিপথের এদিকে খুব কমই আসে আর্মি, তবু তারা সারাক্ষণ সতর্ক থাকে।

চলার পথে রুবির উচ্ছ্বাস আর আবেগ হলো দেখার মত। তার মুগ্ধ দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যেও শাফির ওপর থেকে নড়ছে না। নিমার কানে কানে বলল, 'পারলে একমাত্র উনিই আমাদের দেশটাকে এক করতে পারবেন, হাজার বছরেও যে কাজ কেউ পারেনি। ওকে দেখে আমি যেন আমার কৈশোর ফিরে পেয়েছি। আনন্দ আর আশা জাগছে বুকে।'

মঠের কাছাকাছি পৌঁছুতে সারাটা সকাল লেগে গেল। ডানড্রেরা নদীকে দেখামাত্র গেরিলাদের নিয়ে গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়ল শাফি, মঠে পাঠানো হলো মাত্র চারজন স্কাউটকে। এক ঘণ্টা পর মাথায় বড় আকারের বান্ডিল নিয়ে একদল তরুণ উপাসক এল মঠ থেকে। শাফিকে সমীহের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানাল তারা, বান্ডিলগুলো রেখে আবার নেমে গেল সরু পথ ধরে গিরিখাদে

বান্ডিল থেকে বেরুল শিক্ষানবিস সন্ন্যাসীদের উপযোগী ঢোলা আলখেল্লা। গেরিলাদের মধ্যে শুধু যারা ক্রিশ্চান, তারা পরবে ক্যামোফ্লেজ ফেটিগ খুলে সবাই তা পরছে দেখে ভুরু কুঁচকে শাফির দিকে তাকাল রানা। বুঝতে পেরে হাসল শাফি, বলল, 'মাঝে মধ্যে মুসলমানদের মসজিদেও আমাদেরকে আশ্রয় নিতে হয়, তখন আমরা সবাই নিজেদেরকে মুসলমান বলি। এখানেও তাই, সবাই আমরা ক্রিশ্চান।'

কথা না বলে হেসে ফেলল রানা। দেখা গেল আলখেল্লার ভেতর শুধু

সাইডআর্মস ভরল গেরিলারা। বাকি সব অস্ত্র ও গোলা-বারুদ পাহাড়-প্রাচীরের গুহায় রেখে যাওয়া হচ্ছে, পাহারায় থাকবে কয়েকজন সেন্ট্রি।

সন্ন্যাসী সেজে রওনা হয়ে গেল গেরিলারা, মঠ আর মাত্র কয়েক মাইল দূরে। পথ থেকেই বিদায় নিল রানা, মেয়ে দুজনকে নিয়ে ফিরে এল ক্যাম্পে।

রাগে ও হতাশায় ফাঁকা জায়গাটায় পায়চারি করছিল উস্তাভ। 'তুমি একটা খারাপ মেয়েমানুষ!' রুবিকে দেখেই মারমুখো হয়ে ছুটে এল সে। 'সারারাত দেহদান করে এলে!'

'কাল সন্ধ্যায় আমরা পথ হারিয়ে ফেলি,' বলল রানা, গেরিলাদের নিরাপত্তার স্বার্থে উস্তাভকে বলার জন্যে এই মিথ্যে গল্পটা ওকে শিখিয়ে দিয়েছে শাফি। 'আজ সকালে একদল সন্ন্যাসী আমাদের দেখতে পেয়ে ফিরিয়ে আনে।'

'হারিয়ে তো যাবেনই, মিস্টার!' খেঁকিয়ে উঠল উস্তাভ। 'গাইড হিসেবে আমাকে ভাড়া করেছেন, অথচ আমাকে সঙ্গে নেয়ার কথা উঠলে আপনার অ্যালার্জি হয়! খারাপ মেয়েমানুষ, তোমার সঙ্গে আমার পরে বোঝাপড়া হবে। যাও, কি খাওয়া হবে দেখো।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাছতলায় দুপুরের খাবার পরিবেশন করল রুবি। ওরা খাচ্ছে, নিমার হাতে টোকা দিয়ে রানা বলল, 'আপনার সেই ভক্ত হাজির!'

চুপিচুপি কখন এসেছে, কেউ দেখেনি বাটিকে। একটা কুঁড়ের পাশে গুঁড়ি মেরে বসে আছে। নিমা তার দিকে তাকাতেই আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেল মুখ, বোকার সলজ্জ হাসি হাসছে।

'আপনার সঙ্গে বিকেলে আমি বেরুচ্ছি না,' উস্তাভের কান বাঁচিয়ে রানাকে বলল নিমা। 'আশঙ্কা করছি রুবির ওপর আবার আজ অত্যাচার হবে। আপনি বাটিকে নিয়ে যান।'

রওনা হবার সময় নিমার খোঁজে চারদিকে তাকাল বাটি, কিন্তু নিমা তার কুঁড়ে থেকে বেরুল না। অগত্যা, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, রানার পিছু নিল সে। 'তুমি আমাকে নদীর ওপারে নিয়ে যাবে,' বলল রানা। 'যেখানে পবিত্র প্রাণীটা থাকে।'

উত্তেজনার নতুন খোরাক পেয়ে রানার সামনে চলে এল বাটি, ফুর্তিতে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে।

ঝুলন্ত ব্রিজ পেরিয়ে এসে আঁকাবাঁকা সরু পথ ধরে এক ঘণ্টা এগোল ওরা। ক্ষয়ের কারণে এবড়োখেবড়ো হয়ে থাকা পাথরের মাঝখানে হারিয়ে গেছে পথটা, চেনাই মুশকিল। কোনও দিকে খেয়াল নেই, লাফিয়ে একের পর এক কাঁটাঝোপের ভেতর ঢুকে পড়ছে বাটি। এই পাথুরে জমিন আর কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়ে আরও প্রায় দু'ঘণ্টা এগোল ওরা। এ-পথে নিমাকে কেন আনতে চায়নি বাটি, হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে রানা। নগ্ন হাত দুটো কাঁটায় চিরে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, ট্রাউজারের পায়া ছিঁড়ে গেছে অন্তত দশ জায়গায়। তবে পথটা চিনে রাখছে ও, পরে খুঁজে নিতে পারবে।

অবশেষে আরেকটা রিজের মাথায় চড়ে থামল বাটি, হাত তুলে ওপারটা দেখাল। ওদের নিচে ফাঁক বা গহ্বরের পাঁচিল দেখতে পেল রানা। সেই ফাঁকা জায়গাটাও চোখে পড়ল, ডোরাকাটা খুদে ডিক-ডিক যেখানে বেরিয়ে আসে।

ড্রানডেরা নদীর ওপারে কাঁটাগাছটাও চিনতে পারল, ওটার আড়ালে বসে থাকার সময় শাফির গেরিলারা বন্দী করেছিল ওদের।

বাটিকে বোতল থেকে পানি খেতে দিল রানা, তারপর নিজে খেলো। ঢাল বেয়ে নামার আগে রিগবি রাইফেলটা চেক করল, লেন্স থেকে ধুলো মুছল। চেম্বারে এক রাউন্ড গুলি ভরে সেট করল সেফটি-ক্যাচ। 'আমার পিছনে থাকবে,' নির্দেশ দিল ছেলেটাকে।

ঢাল বেয়ে নামছে রানা, কয়েক কদম পরপর সামনের ও দু'পাশের কাঁটা ঝোপ পরীক্ষা করার জন্যে থামছে। এভাবে ঝর্ণাটার মাথায় পৌঁছে গেল ওরা: এদিকের জমিন নরম ও ভেজা ভেজা। পশু-পাখিরা এখানে পানি খেয়েছে। কুডু আর বুশবাক-এর পায়ের ছাপ চিনতে পারল রানা। তবে ওগুলোর মাঝখানে খুদে হৃৎপিণ্ড আকৃতির ছাপও আছে।

ঝোপ লক্ষ্য করে নিঃশব্দ পায়ে এগোল রানা। ভেতরে ঢুকতেই বিষ্ঠার একটা স্তূপ দেখতে পেল, ডিক-ডিক তার নিজস্ব এলাকার সীমানা চিহ্নিত করনের জন্যে বাউন্ডারি পোস্ট হিসেবে ব্যবহার করে। খুদে বুলেট আকৃতির বিষ্ঠা, ডিক-ডিক এদিকে এলেই স্তূপটা আকারে আরেকটু বড় হয়।

শিকারের খোঁজে মগ্ন হয়ে পড়ল রানা, মনোযোগের মাত্রা দেখলে মনে হবে মানুষখেকো সিংহের পিছু নিয়েছে। প্রতিবার কয়েক ইঞ্চি এগোচ্ছে, পা ফেলার আগে দেখে নিচ্ছে সামনে শুকনো পাতা বা ডাল আছে কিনা, চোখের চঞ্চল দৃষ্টি দ্রুত বেগে আশপাশের ঝোপের ভেতর ঘোরাফেরা করছে।

একটা কান সামান্য একটু নাড়তে ধরা পড়ে গেল ডিক-ডিক। শরীরের অর্ধেকে ছায়া পড়েছে, গায়ের লালচে রঙ পিছনের শুকনো ডালের সঙ্গে মিশে এক হয়ে আছে, এমন স্থির যেন মেহগনি খোদাই করে বানানো একটা মূর্তি। ওই একবার শুধু কান নড়ে ওঠায় ধরা পড়ল অস্তিত্ব। তারপর অবশ্য নাকটাও একটু কোঁচকাল, যেন অস্বস্তিবোধ করছে। সম্ভবত বিপদ সম্পর্কে সচেতন, তবে জানে না কোনদিক থেকে আসবে।

ধীরে ধীরে রাইফেলটা কাঁধে তুলল রানা। লেন্সের ভেতর দিয়ে দুই শিং-এর মাঝখানের প্রতিটি রোম দেখতে পাচ্ছে। গলা আর মাথার মাঝখানে ক্রস হেয়ার সেট করল, চামড়াটার ক্ষতি করতে চায় না।

'ওই তো, ওই তো!' রানার কনুইয়ের কাছ থেকে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল বাটি! 'সেন্ট জন ব্যাপ্টিস্টকে অভিনন্দন, পবিত্র প্রাণী দেখা দিয়েছে!'

বাদামী ধোঁয়ার মত চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল ডিক-ডিক, লেন্স থেকে চোখ সরাবার পর রানা শুধু ঝোপের দু'একটা ডাল সামান্য নড়তে দেখল। কাঁধ থেকে রাইফেলটা ধীরে ধীরে নামিয়ে বাটির দিকে তাকাল ও। 'এটা কি করলে তুমি?'

ধমক খেয়ে মাথা নিচু করল বাটি।

এরপর একাই এগোল রানা, কিন্তু ঘণ্টাখানেক পর হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরে এল। ক্যাম্পে পৌঁছুতে সন্ধে হয়ে গেল ওদের। ক্যাম্পফায়ারের কাছে থামতে ছুটে এল নিমা। 'কি ঘটল? ডিক-ডিককে দেখা গেছে?'

'আপনার ভক্তকে জিজ্ঞেস করুন। ওই ভাগিয়ে দিয়েছে।'

বাটির গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে আদর শুরু করল নিমা। 'তোমাকে নিয়ে সত্যি আমি গর্বিত, বাটি।' শুনে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করল ছেলেটা, কুকুরছানার মত লাফাতে লাফাতে মঠের পথ ধরল।

রানার জন্যে কফি নিয়ে এল নিমা, আগুনের সামনে ওর পাশে বসল। বার দুয়েক তাকিয়েই কিছু একটা সন্দেহ হলো রানার, জিজ্ঞেস করল, 'কিছু একটা হয়েছে। কি?'

আগুনের ওদিকে বসে রয়েছে উস্তাভ, চট করে তাকে একবার দেখে নিল নিমা, তারপর রানার আরও কাছে সরে এসে গলা খাদে নামাল, 'শাফির সঙ্গে দেখা করার জন্যে রুবিকে নিয়ে মঠে গিয়েছিলাম। রুবি অনুরোধ করাতেই যেতে হয়েছিল। কি বলছি বুঝতে পারছেন তো? রুবি একা গেলে উস্তাভ সন্দেহ করবে, তাই।'

'বুঝব না কেন।'

'ওদের দু'জনকে নিরিবিলিতে কথা বলার সুযোগ করে দিই,' বলল নিমা। 'তবে তার আগে ওদের সঙ্গে তিমকাত উৎসব সম্পর্কে আলাপ হয় আমার। উৎসবের পঞ্চম দিনে প্রধান পুরোহিত টাবট নিয়ে অ্যাবেতে নামেন। শাফি আমাকে বললেন, পাহাড়-প্রাচীরের গা বেয়ে পানির কিনারা পর্যন্ত নামার একটা পথ আছে।'

'হ্যাঁ, জানি আমরা।'

'যেটা আপনি জানেন না—নদীতে নামার মিছিলে সবাই থাকে। সবাই মানে, সব্বাই। প্রধান প্রিস্ট, সব ক'জন পুরোহিত, শিক্ষানবিস উপাসকরা, প্রতিটি সত্যিকার বিশ্বাসী, এমন কি শাফি আর তার লোকজনও। শুধু যে নদীতে নামে তাই নয়, রাতটা ওরা ওখানে কাটায়ও। সারাটা দিন ও রাত মঠ একদম খালি পড়ে থাকে।'

হাসি ফুটল রানার মুখে। 'ইন্টারেস্টিং তো!'

'ভুলবেন না, আমিও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি,' হিসহিস করে বলল নিমা।

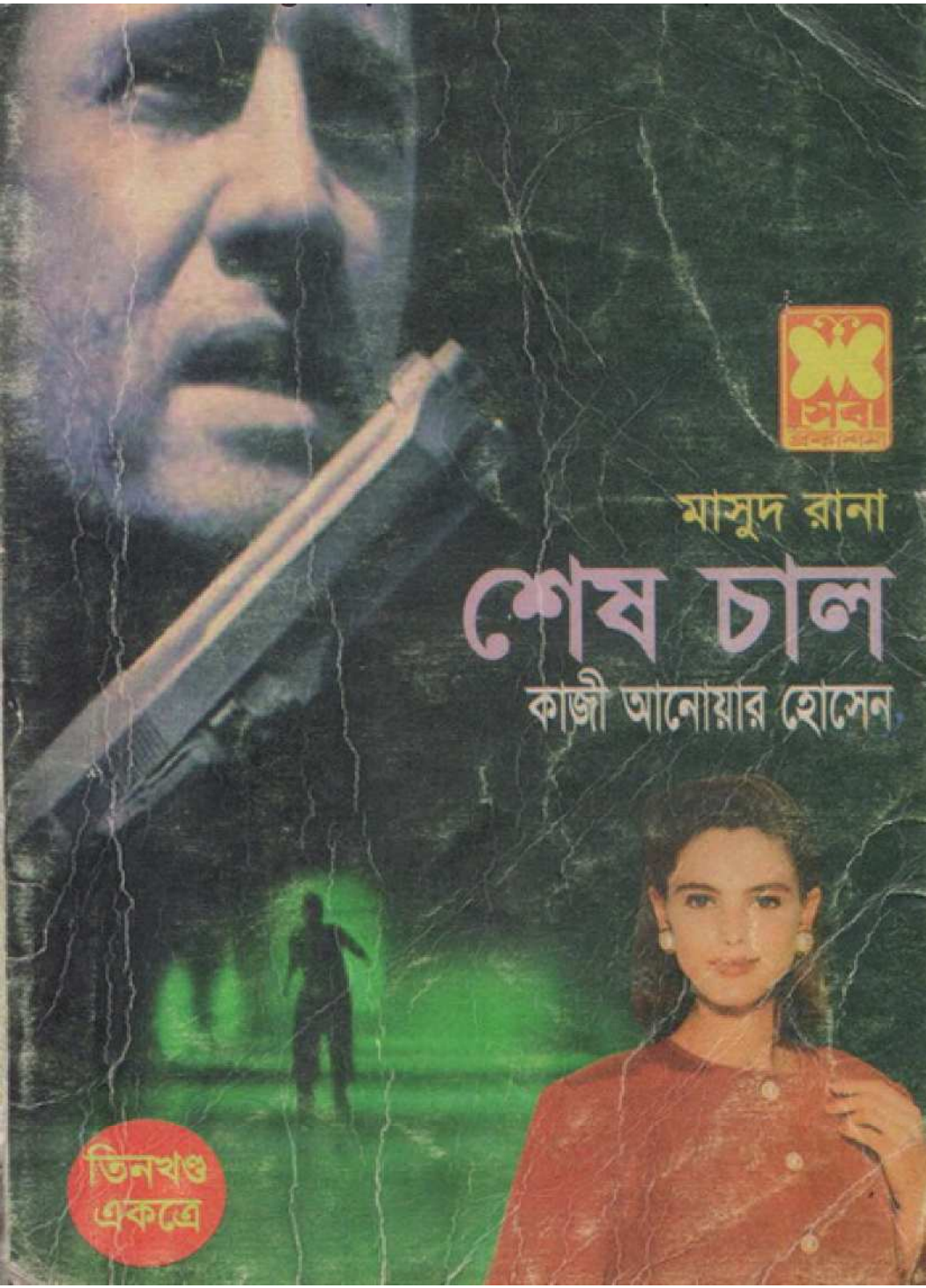
সেবা প্রকাশনী
মাসুদ রানা
শেষ চাল
কাজী আনোয়ার হোসেন
তিনখণ্ড একত্রে

মাসুদ রানা
(তিনখণ্ড একত্রে)

শেষ চাল

কাজী আনোয়ার হোসেন

সুন্দরী মরুকন্যা নিমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে মাসুদ রানা কি চার হাজার বছর আগেকার এক ফারাও সম্রাটের বিত্তবৈভব উদ্ধার করতে আফ্রিকা যাবে? বিপদটা কী ধরনের জানার পরও?

প্রায় চার হাজার বছর আগে ক্রীতদাস টাইটা যা করেছিল, মাসুদ রানাও তাই করতে চাইছে–গিরিখাদের ভিতর ডানভেরা নদীতে একটা বাঁধ দেবে। নদীর তলায়, পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে একটা ফাটল আছে; সেই ফাটলের ভিতর কোথাও থাকলেও থাকতে পারে ফারাও মামোসের সমস্ত ও গুপ্তধন।

সমস্ত বিপদ পায়ে দলে ওরা যখন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত, সরকারি সৈন্য নিয়ে হামলা করে বসলেন কর্নেল ঘুমা, জার্মান ধনকুবের হেস ডুগার্ড ফারাও মামোসের সমস্ত গুপ্তধন রানার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চান। একই সঙ্গে শুরু হলো তুমুল মরশুমি বর্ষণ, সমাধির ভিতর চিরকালের জন্য আটকা পড়তে হলো ওদেরকে। বেইমানীর আভাস পেয়ে রানা, প্রশ্ন উঠল, শেষ হাসিটা কে হাসবে? কে দেবে শেষ চাল?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

শেষ চাল-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮

এক

ঘন কাঁটাঝোপের গাঢ় ছায়া থেকে খুদে হরিণটা বেরিয়ে আসতেই সকালের নরম রোদ লেগে রোমগুলো মসৃণ সিল্কের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সরু ফাঁকা জায়গাটা ধরে দ্বিধাহীন হেঁটে আসছে।

রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল রেখে তৈরি রানা। রিগবিতে মেটাল জ্যাকেট বুলেট ভরেছে, লাগলে ক্ষতটা চওড়া হবে না, বেরুবার সময় বড় গর্ত তৈরি করবে না।

ফাঁকা জায়গাটার পাশের কয়েকটা ঝোপের দিকে এগোল ভোরাকাটা ডিক-ডিক। নিচু একটা ঝোপে চড়ে ওপরের কচি পাতা ছিঁড়ছে দাঁত দিয়ে। নিস্তব্ধ সকালে বিকট আওয়াজ করল রাইফেল। ঝোপ থেকে শূন্যে লাফ দিল খুদে হরিণ, মাটিতে পড়ার আগেই ছোটার ভঙ্গিতে দ্রুতগতিতে পা ছুঁড়ছে। সলিড বুলেট এত জোরে আঘাত করেনি যে ছিটকে পড়ে যাবে ডিক-ডিক। হৃৎপিণ্ডে বুলেট নিয়ে ছুটল ওটা। মারা গেছে এরইমধ্যে, ছুটছে রিফ্লেক্সের বশে, রক্তস্রোতে অবশিষ্ট অক্সিজেনের জোরে।

'সর্বনাশ! না, ওদিকে না!' লাফ দিল রানা। খুদে প্রাণীটি সোজা খাদের কিনারা লক্ষ্য করে ছুটছে। অন্ধের মত শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল, পতনের সময় ডিগবাজি খেলো, অদৃশ্য হয়ে গেল ওদের দৃষ্টিপথ থেকে, নেমে যাচ্ছে প্রায় দুশো ফুট গভীর ডানডেরা নদীর গহ্বরে। ছুটে এসে কিনারায় দাঁড়াল রানা, পিছু নিয়ে এল নিমাও।

হাত দিয়ে নিমাই দেখাল, 'ওই যে, ওই যে, দেখতে পাচ্ছি!'

ডিক-ডিক সরাসরি ওদের নিচে পড়ে রয়েছে। করুণ চোখে তাকিয়ে থাকল রানা। তবে এক সেকেন্ড পরই ওর চেহারায় জেদ ফুটে উঠল। 'মারতে যখন পেরেছি, তুলে আনতেও পারব। চলুন, আপাতত আমরা ক্যাম্পে ফিরে যাই।'

বিকেলে আবার ফিরে এল ওরা, সঙ্গে উস্তাভ, দু'জন ট্র্যাকার ও দু'জন স্কিনার। সঙ্গে করে ওরা নাইলনের চারটে কয়েল নিয়ে এল। প্রথমেই খাদের কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে ডিক-ডিককে দেখে নিল রানা, ভয় হচ্ছিল স্রোতের সঙ্গে ভেসে গেল কিনা। তারপর কয়েলের রশি ফাঁকা জায়গাটায় লম্বা করে ফেলে সাজাবার কাজে সাহায্য করল ট্র্যাকারদের। দুটো কয়েলের রশি জোড়া লাগিয়ে গিঁটটা খুব ভালভাবে পরীক্ষা করল রানা। খাদের নিচে রশি ফেলা হলো, প্রান্তটা পানির সারফেস ছুঁতে তুলে আনা হলো আবার। 'একশো আশি ফুট,' মাপ শেষ করে বলল ও। 'ত্রিশ ফ্যাদম।' উস্তাভের দিকে তাকাল। 'রশি বেয়ে এতটা ওপরে ওঠা সম্ভব নয়, আপনারা আমাকে টেনে তুলবেন।'

মোটা একটা কাঁটাগাছে বাঁধা হয়েছে রশিটা। পরনে শুধু শার্ট আর খাকি

শর্টস, খাদের ঠোঁটে দাঁড়িয়ে পিছন দিকে হেলান দিল রানা, রশিটা কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলে আছে, লেজের অংশটুকু ফিরিয়ে আনা হয়েছে দু'পায়ের মাঝখানে। পিছন ফিরে গহ্বরে লাফ দিল, পতন নিয়ন্ত্রণ করছে কাঁধের ওপর দিয়ে রশি ছেড়ে, ব্রেক করার প্রয়োজন হলে উরুতে পেঁচিয়ে নিচ্ছে। পেণ্ডুলামের মত দোল খাচ্ছে রানা, দু'পায়ের সাহায্যে পাথুরে পাঁচিল থেকে দূরে রাখছে নিজেকে। দ্রুত নেমে এল নিচে, পা দুটো ডুবে গেল তীব্র স্রোতে, রশির মাথায় লাটিমের মত ঘুরছে শরীরটা। যে পাথরটার ওপর পড়ে আছে ডিক-ডিক, সেটার কাছ থেকে কয়েক ফুট দূরে রয়েছে ও, কাজেই পানিতে নামতে বাধ্য হলো। রশির শেষ প্রান্ত দাঁত দিয়ে ধরে থাকল, দূরত্বটুকু পেরিয়ে এল সাঁতরে।

খুদে পাথুরে দ্বীপটায় উঠে এসে খানিক দম নিল রানা। তারপর ডিক-ডিকের চার পা এক করে বাঁধল। পিছিয়ে এসে মুখ তুলে তাকাল ওপরে। গহ্বরের মাথা থেকে উঁকি দিয়ে ওকে দেখছে উস্তাভ। 'টানুন!' চিৎকার করল রানা, রশিটা তিনবার ঝাঁকাল। টান টান হলো নাইলন, ঝাঁকি খেয়ে দ্বীপটা থেকে শূন্যে উঠে পড়ল ডিক-ডিক, গহ্বরের পাঁচিল ঘেঁষে দ্রুত উঠে যাচ্ছে ওপরে। তিন ভাগের দুই ভাগ উঠে গেছে, এই সময় কোথাও আটকাল রশিটা, তবে একটু পর নিজেই মুক্ত হলো, সাপের মত এঁকেবেঁকে খাদের কিনারায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

বেশ খানিক পর নিচে নেমে এল রশিটা, বুদ্ধি করে বড় তরমুজ আকৃতির একটা পাথর বেঁধে দিয়েছে উস্তাভ। খাদের কিনারা থেকে নিচে তাকিয়ে রশির নামাটা দেখছে সে, ইঙ্গিতে নির্দেশ দিচ্ছে নিজের লোকজনকে। রশিটা ধরে একটা লুপ তৈরি করল রানা, বগলের তলায় ঢুকিয়ে নিল সেটা, মুখ তুলে ইঙ্গিত দিল উস্তাভকে। টান টান হলো রশি, পাথরের ওপর থেকে শূন্যে উঠে পড়ল ওর পা। ঝাঁকি খেতে খেতে উঠে যাচ্ছে ওপরে। খাদের কিনারা থেকে পঞ্চাশ ফুট নিচে পৌঁচেছে, হঠাৎ স্থির হয়ে গেল রশি। পাথরের গায়ে অসহায়ভাবে ঝুলছে ও। 'কি ঘটেছে?' উস্তাভকে জিজ্ঞেস করল।

'শালার রশি কোথাও আটকে গেছে,' পাল্টা চিৎকার করল উস্তাভ। 'কোথায় আটকেছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন?'

রানার দৃষ্টি রশি অনুসরণ করল। সরু ও লম্বা একটা ফাটলে ঢুকেছে রশিটা, সম্ভবত ডিক-ডিককে তোলার সময়ও এটাতেই আটকে ছিল। তবে ডিক-ডিকের তুলনায় রানার ওজন বহুগুণ বেশি, ফলে ফাটলের ভেতর রশিটা অনেক বেশি সেঁধিয়ে গেছে। শূন্যে ঝুলে রয়েছে ও, প্রায় একশো ফুট নিচে নদী আর পাথরের দ্বীপ। 'দোল খান, ঝাঁকি দিন,' ওপর থেকে চিৎকার করল উস্তাভ।

সে চেষ্টাই করছে রানা। গহ্বরের গায়ে পায়ের ধাক্কা দিয়ে রশিটাকে যতটা সম্ভব নাড়াচাড়া করছে, পাক খেয়ে মোচড়াচ্ছে। এক সময় ঘাম ছুটে গেল, বগলের তলায় রশির ঘষা লাগায় জ্বালা করছে চামড়া। 'লাভ হচ্ছে না,' উস্তাভকে জানাল। 'টেনেই তুলতে হবে। জোর লাগান, যতটা পারা যায়।'

কয়েক সেকেন্ড পর ফাটলটার ওপরের রশি লোহার মত শক্ত ও টান টান হলো, পাঁচজন লোক যত জোরে পারা যায় টানছে। ফাটলের নিচের রশি এক চুল নড়ছে না। বন্ধু আটুনি একেই বলে, বের করে আনা সম্ভব নয়। নিচে তাকিয়ে

চিন্তা করছে রানা। একটা মানুষের পতনের গতি ঘণ্টায় একশো পঞ্চাশ মাইল। এই গতিতে পানিতে নামা আর নিরেট কংক্রিটে নামা একই কথা।

আবার ওপরে তাকাল রানা। লোকগুলো এখনও সর্বশক্তি দিয়ে রশি টানছে। ঠিক সেই মুহূর্তে ফাটলটার ধারাল কিনারা রশির একটা রোঁয়া কেটে দিল, রশির গা থেকে লম্বা সবুজ পোকার মত আলগা হয়ে আসছে। আঁতকে উঠে চিৎকার দিল রানা, 'থামুন, টানবেন না!' কিন্তু উস্তাভকে দেখা যাচ্ছে না, ট্র্যাকারদের সঙ্গে হাত লাগিয়ে নিজেও রশি টানছে সে।

দ্বিতীয় রোঁয়াটাও ছিড়ে গেল। এখন মাত্র একটা রোঁয়ায় ঝুলছে রানা। ওটাও যে-কোন মুহূর্তে ছিড়ে যাবে, বুঝতে পারল ও। 'রুশ কুত্তা, কি বলছি শুনতে পাচ্ছিস–থাম, শালা! টানবি না! থাম!' কিন্তু ওর গলা উস্তাভের কানে পৌঁছায়নি। শ্যাম্পেনের ছিপি খোলার মত পপ্ করে একটা শব্দ হলো, রশির তৃতীয় ও শেষ রোঁয়াটা ছিড়ে গেল।

খসে পড়ছে রানা। পাথুরে দ্বীপটার কথা ভাবছে। ওটার ওপর পড়বে নাকি? শরীরের একটা হাড়ও তাহলে আস্ত থাকবে না। আর যদি পানিতে পড়ে, নির্ঘাত পাঁজর আর শিরদাঁড়া ভেঙে যাবে।

পানিতে পা দিয়ে পড়ল রানা, তার আগে বুক ভরে বাতাস নিয়ে ফেলেছে। আঘাতটা প্রচণ্ড, শরীরের প্রতিটি হাড় যেন পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি খেলো। দাঁতে দাঁতে বাড়ি খেলো, বন্ধ চোখের ভেতর ছড়িয়ে পড়ল উজ্জ্বল আলো। নদী ওকে ঢেকে ফেলেছে। তলিয়ে গেল গভীরে। গতিটা এখনও এত বেশি, তলায় পৌঁছে যে ধাক্কাটা খেলো, মনে হলো পা ও কোমর ভেঙে শরীরের বাকি অংশ থেকে আলাদা হয়ে গেছে।

তলায় বাড়ি খেয়ে ওপরে উঠছে রানা, উপলব্ধি করল পা ও কোমর অটুটই আছে। ইতিমধ্যে ফুসফুস খালি হয়ে গেছে, বাতাসের অভাবে ছটফট করছে ও। পানির ওপর মাথা তুলল কাশতে কাশতে।

প্রবল স্রোতের মধ্যে গা এলিয়ে দিল রানা, মাথা ঝাঁকিয়ে চোখ থেকে পানি সরাল। গহ্বরের পাঁচিল দুটো দ্রুতবেগে পিছিয়ে যাচ্ছে, আন্দাজ করল দশ নট গতিতে ভেসে যাচ্ছে ও। এই গতিতে কোন পাথরে বাড়ি খেলে হাড়গোড় না ভাঙার কোন কারণ নেই। কথাটা যখন ভাবছে, আরেকটা পাথুরে দ্বীপ পাশ কাটাল ওকে, হাত বাড়ালে ছুঁতে পারত। চিৎ হলো রানা, পা দুটো মেলে দিল সামনে। পাথর দেখলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবে।

মনে মনে একটা হিসাব পাবার চেষ্টা করছে রানা, গহ্বরের সরু ও লালচে পাথরের খিলান হয়ে নিচে লাফ দিয়েছে নদী, সেই জায়গা থেকে ঠিক কতটা দূরে রয়েছে ও। তিন কি চার মাইল তো হবেই, আন্দাজ করল। আর নদী ওখানে প্রায় এক হাজার ফুট লাফ দিয়েছে। সামনে নদীর তলায় ঢাল ও উতরাইও না থেকে পারে না, ফলে তীব্র জলাবর্ত আর আলোড়নের মধ্যে পড়তে হবে ওকে একটু পরেই।

ওপরে তাকাল রানা। দু'দিকের পাঁচিল পরস্পরের দিকে কাত হয়ে পড়েছে, ফলে কোথাও কোথাও সরাসরি ওর মাথার ওপর প্রায় এক হয়ে গেছে। শুধু এক

ফালি সরু নীল আকাশ দেখা যায়, গহ্বরের ভেতরটা প্রায়-অন্ধকার আর স্যাঁতসেঁতে। ভাগ্য ভাল যে এটা বর্ষার মরশুম নয়। ওর মাথা থেকে পনেরো কি বিশ ফুট ওপরে পাথরের গায়ে গতবারের বন্যা তার চিহ্ন রেখে গেছে।

কিছুক্ষণ পর ক্যানিয়নে নদীর কলকল ছলছল ছাড়াও নতুন একটা আওয়াজ শুনতে পেল রানা। ভোঁতা, গুরুগম্ভীর একটা শব্দ, যতই এগোচ্ছে ততই বাড়ছে। গহ্বরের পাঁচিল পরস্পরের দিকে সরে এসেছে, সেই সঙ্গে নদীর স্রোতও এখন সংকীর্ণ একটা পথ দিয়ে ছুটছে, ফলে স্বভাবতই গতিও অনেক বেড়ে গেল। পানির আওয়াজ দ্রুত বজ্রপাত বা কামান দাগার বৈশিষ্ট্য অর্জন করছে, সমস্ত শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ক্যানিয়নের ভেতর। উপুড় হলো রানা, সবটুকু শক্তি কাজে লাগিয়ে স্রোতের ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে কাছাকাছি পাথুরে পাঁচিলে পৌঁছুল। কিন্তু লাভ হলো না, হাত দিয়ে ধরা যায় এমন কিছু নেই, পাথরের গা পিচ্ছিল ও মসৃণ করে রেখেছে নদী। স্রোতের দুর্বার টানে ভেসে চলেছে রানা, তাকিয়ে দেখল চারপাশের পানি নিরেট কাঁচের মত সমতল ও মসৃণ। নদী যেন জানে সামনে কি অপেক্ষা করছে, এ তারই প্রস্তুতি।

পাঁচিলের কাছ থেকে সরে এল রানা, আবার ভাটির দিকে পা করল। অকস্মাৎ ওর নিচে বাতাস ভরা একটা জগৎ উন্মোচিত হলো, শরীরটা নিক্ষিপ্ত হলো শূন্যে। ওর চারপাশের বাতাস সাদা ফেনাময় পানিতে ভরে উঠল। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে, বিপুল জলরাশির অবিরাম পতন ঝরা একটা পাতার মত কোথায় কে জানে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওকে।

পতনটা মনে হলো অনন্ত কাল ধরে চলছে। তারপর এক সময় আরেকবার পানিতে পড়ল রানা, ডুবে গেল সারফেস থেকে অনেক গভীরে। ওঠার সময় পানির সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হলো, বাতাসে চোখ খোলার পর দেখল জলপ্রপাতের নিচে একটা ঘূর্ণির গভীর গর্তের ভেতর রয়েছে ও। ঘূর্ণির ভেতর পানি ঘুরছে, এটা একটা গতি; আরেকটা গতি স্রোতের টানে ঘূর্ণির ছুটে চলা।

ঘুরপাক খাচ্ছে রানা। ওপরে তাকাবার সুযোগ হলে এই প্রথম জলপ্রপাতের সাদা পানি দেখতে পেল, মেলে দেয়া বিশাল চাদরের মত লাগল দেখতে। আর সামনে তাকাতে দেখতে পেল সরু একটা নির্গমন পথ, বেসিন থেকে ওই পথ দিয়েই উন্মত্ত নদী ভাটির দিকে ছুটে চলেছে স্রোতের টানে যতই সামনে এগোচ্ছে, ঘূর্ণিটার গভীরতা ততই কমে আসছে। আপাতত নিরাপদ মনে হলো নিজেকে ওর। ঘূর্ণি নিস্তেজ হয়ে আসায় বেসিনের কিনারায় সরে এল, পাঁচিলের ফাটলে বেড়ে ওঠা ঝোপের ডাল ধরে বিশ্রাম নিচ্ছে।

পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করল রানা। পাঁচিল বেয়ে পাহাড়ের মাথায় ওঠার কোন উপায় নেই। বাঁচার চেষ্টা করতে হবে নদীর গতিপথ ধরে ভাটির দিকে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে। পাহাড়ী নদীর তলায় চড়াই-উৎরাই থাকাটা স্বাভাবিক, ফলে স্রোতের গতি বেড়ে যেতে পারে, কোথাও হয়তো পানিতে তুমুল আলোড়ন উঠবে। আরও জলপ্রপাত থাকাও বিচিত্র নয়।

পাহাড় বেয়ে ওঠার কি কোন উপায়ই নেই? পাঁচিল ধরে আরেকবার রানার দৃষ্টি ওপরে উঠে গেল। অনেক ওপরে একটা পাথর ঝুলে আছে, দেখতে

ক্যাথেড্রাল-এর উঁচু ছাদের মত। পাঁচিলের গায়ে চোখ বুলাচ্ছে, কিছু একটা ধরা পড়ল চোখে। ছকে বাঁধা ও সাজানো মনে হলো, প্রাকৃতিক হতে পারে না।

দু'সারি গাঢ় দাগ, পাথুরে পাঁচিল ধরে পানির সারফেস থেকে ওপর দিকে উঠে গেছে, একেবারে সেই দুশো ফুট ওপরের কিনারা পর্যন্ত। ঝোপের ডালপালা ছেড়ে দিয়ে সাবধানে ও ধীরগতিতে পানি কেটে এগোল রানা, পৌঁছুল যেখানে দাগগুলো পানির নাগাল পেয়েছে। কাছে এসে বুঝতে পারল, এগুলো দাগ নয়, পাথর কেটে তৈরি করা প্রতিটি চার বর্গ ইঞ্চি কুলুঙ্গি বা ফোকর। সারি দুটোর মাঝখানে বারো ফুটের মত ব্যবধান, তবে প্রতি সারির কুলুঙ্গি অপর সারির কুলুঙ্গির সঙ্গে একই সরল রেখার ওপর তৈরি একটার ভেতর হাত গলাল রানা, কনুই পর্যন্ত ঢোকানো যায়। ওয়াটার মার্কের নিচের ফোকরগুলো ক্ষয়ে গেছে, ফলে হাতের ছোঁয়ায় মসৃণ লাগল কিনারাগুলো। তবে পাঁচিলের ওপর দিকে, ওয়াটার মার্ক ছাড়িয়ে, আকৃতিগুলো স্পষ্ট, পুরোপুরি চৌকো আর ধারাল।

একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন ভিড় করল মাথায়। কতদিনের পুরানো ওগুলো? পাথর কাটার জন্যে এখানে কাউকে নামতে হয়েছে, কিভাবে নামল? এত কষ্ট করে এগুলো তৈরি করার কারণই বা কি? নিচে এখানে কি আছে?

তারপর হঠাৎ রানার চোখে আরও একটা জিনিস ধরা পড়ল। পাথরে বৃত্তাকার একটা খাঁজ, দুই সারি কুলুঙ্গির ঠিক মাঝখানে, বরফ বা বন্যার পর থেকে যাওয়া জলচিহ্নের অনেকটা ওপরে। নিচে থেকে সম্পূর্ণ গোল দেখাচ্ছে, প্রাকৃতিক নয় এমন আরও একটা আকৃতি।

সাঁতার দিয়ে বারকয়েক জায়গা বদল করল রানা, বিভিন্ন কোণ থেকে জিনিসটাকে দেখছে। পাথর খোদাই করে তৈরি বলে মনে হলো, তবে আলো খুব কম থাকায় মানুষের হাতের কাজ কিনা নিশ্চিত হতে পারল না। ডিজাইনটার মধ্যে ছবি বা সংকেত যদি থাকেও, এখান থেকে দেখার উপায় নেই। কুলুঙ্গিতে পা রাখে খানিকটা ওঠার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু পারল না। একটার সঙ্গে আরেকটার দূরত্ব এত বেশি যে একটায় পা রাখার পর হাত দিয়ে দ্বিতীয়টার নাগাল পাওয়া কঠিন চেষ্টা করতে গিয়ে প্রতিবার নদীতে পড়ে গেল ও।

নদীর পানি বরফের মত ঠাণ্ডা, রানার দাঁত পরস্পরের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে। তীব্র স্রোতের টানে সরু নির্গমন পথের দিকে এগোচ্ছে, ওই পথ ধরে জননী নীলনদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে সমস্ত ব্যাকুলতা নিয়ে ছুটে চলেছে ডানডেরা।

নদীর তলা এখানে সাংঘাতিক ঢালু, পানির গতি ক্রমশ বাড়ছে। একের পর এক তীব্র আলোড়নের মধ্যে পড়ল রানা, নদী যেন এখানে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নিচে নেমেছে। তারপর এক সময় খানিকটা শান্ত হলো পানি, চিৎ সাঁতার দিচ্ছে রানা বিশ্রাম নেয়ার এই সুযোগ ছাড়া যায় না, তাকিয়ে আছে ওপরে।

ওপরে আলো খুব কম, কারণ মাথার ওপর পাথরের পাঁচিল প্রায় এক হয়ে মিশে আছে। বাতাসে ভ্যাপসা গন্ধ, ডানা ঝাপটাচ্ছে অসংখ্য বাদুড়। তবে চারদিকটা ভাল করে দেখার সুযোগ পাওয়া গেল না, সামনে থেকে আবার নদীর গর্জন ভেসে আসছে। ঢাল বেয়ে নিচের দিকে ছুটে চলেছে ডানডেরা, খড়কুটোর

মত ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রানাকে। খানিক পর দিশেহারা করে তুলল ওকে, কত দূর বয়ে নিয়ে এল হিসাব নেই, হিসাব নেই সব মিলিয়ে মোট ক'টা জলপ্রপাত পার হলো।

অকস্মাৎ উজ্জ্বল আলোয় ভেসে গেল চারদিক। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসায় মনে হলো কেউ যেন সরাসরি ওর চোখে সার্চলাইট তাক করেছে। রোদ লাগায় চোখ কোঁচকাল রানা, তারপর পিছন দিকে তাকিয়ে দেখল ফেকাসে লাল পাথরের খিলানের নিচ দিয়ে ভেসে এসেছে ও। পাহাড়ের এই অংশটুকু ওর চেনা, নিমার সঙ্গে দেখে গেছে। ওর সামনে রয়েছে রশি দিয়ে তৈরি ঝুলন্ত ব্রিজ। ক্লান্ত শরীরটা কোন রকমে ছোট্ট সৈকতের সাদা বালির ওপর এনে তুলল রানা। বালির ওপর শুয়ে মাথার ওপর ব্রিজটার দিকে তাকাল। ক্রল করে এগোবে, সে শক্তিও অবশিষ্ট নেই। বমি করল রানা, শরীরের অর্ধেকটা এখনও নদীতে।

কাঁধে ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভাঙল রানার। 'সুন্দরী মেম সাহেব আপনার নাম ধরে ছুটোছুটি করছেন আর কাঁদছেন! জাগুন, সাহেব, উঠুন!'

চোখ মেলে তাকাল রানা, বাটিকে দেখে বালির ওপর উঠে বসল। একই সঙ্গে কেউ হাসতে ও কাঁদতে পারে, বাটিকে না দেখলে বিশ্বাস করত না ও। বেঁচে আছে মনে পড়ে যাওয়ায় স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করল, দ্রুত পরীক্ষা করে দেখে নিল হাড়গোড় সব ঠিক আছে কিনা। সন্তুষ্ট হয়ে চোখ তুলল, দেখল পাহাড়ের ঠোঁটের কাছে মোটাসোটা আর লাল দেখাচ্ছে সূর্যটাকে। তারমানে সময়টা শেষ বিকেল।

উঁচু পাড় বেয়ে ওঠার পর সরু পথ পাওয়া গেল, ঝুলন্ত ব্রিজ পেরিয়ে নদীর ওপারে পৌঁছুল ওরা। ছুটে আসছিল নিমা, উল্লাসে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে জড়িয়ে ধরল রানাকে। 'বেঁচে আছেন! আপনি বেঁচে আছেন!' হাসছে বটে, তবে চোখে জল।

'আমাকে চেনেন না? দশ ফুট লম্বা, বুলেটপ্রুফ। তবে সত্যি কথা বলতে কি, বেঁচে আছি শুধু আপনার এই আলিঙ্গনের লোভে।'

তাড়াতাড়ি রানাকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল নিমা। 'অন্য কোন অর্থ করবেন না আবার!'

নিমার কাছ থেকে জানা গেল, ভাটির দিকে রানার লাশ খুঁজছে উত্তাভ আর তার ট্র্যাকাররা। আর রানার ডিক-ডিকটাকে ক্যাম্পে নিয়ে গেছে স্কিনাররা। 'ছাল ছাড়াবার সময় ওখানে আমার থাকা দরকার!' বলল রানা, বাটির কাঁধে হাত রেখে ছুটল। 'দেখা যাক সময়মত পৌঁছুতে পারি কিনা!'

সন্ধ্যার অন্ধকারে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ক্যাম্পে পৌঁছুল ওরা। দু'জন স্কিনার, খালিদ আর মোস্তফা, খেতে বসেছে। ওদের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নিল রানা, তারপর গোসল সেরে কাপড়চোপড় পাল্টাল, ক্যানভাস রোল থেকে ছুরি বের করে চলে এল স্কিনিং শেডে। ইতিমধ্যে ওখানে একটা গ্যাস লণ্ঠন জ্বালা হয়েছে। স্কিনাররা দাঁড়িয়ে থাকল, রানা নিজেই ডিক-ডিকের ছাল ছাড়াচ্ছে।

'ভাবছি বাঁচলেন কিভাবে!' দরজায় উদয় হলো উত্তাভ। রানা জবাব দিল না,

একমনে কাজ করছে। 'এই আপনার ডোরাকাটা ডিক-ডিক? ইঁদুর বললেই হয় তবু রানা তাকাচ্ছে না। 'ইঁদুর শিকার শেষ হলো, এবার আমরা তাহলে আদ্দি আবাবায় ফিরে যেতে পারি, কি বলেন?' জানতে চাইল সে।

রানা তাকে মনে করিয়ে দিল, এটা ওর সাফারি, আর চুক্তি করা হয়েছে তি হত্তার জন্যে। ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ ছেড়ে দরজার সামনে থেকে সরে গে উস্তাভ।

কাজটা প্রায় শেষ করে এনেছে রানা, দরজায় আরেকজনকে দেখা গেল পরে আছে পুরোহিতদের ঢোলা আলখেল্লা, মাথায় পাগড়ী, কথা বলার আগে তাকে রানা চিনতে পারল না। 'মঠে ওরা বলাবলি করছে, তুমি নাকি মরে গে দোস্ত। যদিও বিশ্বাস করিনি, তবু নিশ্চিত হতে এলাম,' বলে হাসল কমান্ডা শাফি।

মুখ তুলে হাসল রানা। 'ভেতরে এসো।'

ভেতরে ঢুকে রানার পাশে বেঞ্চের ওপর বসে পড়ল শাফি। 'ভ্লাদিমি উস্তাভকে কতদিন থেকে চেনো তুমি?'

'প্লেন থেকে নামার পর,' জবাব দিল রানা। 'এক বন্ধু ওর নাম সুপারি করে।'

'তোমার বন্ধু ভুল করেছে,' বলল শাফি। 'তোমাকে আমার সাবধান ক উচিত, দোস্ত।' কেন সাবধান করা উচিত ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করল সে। বছ দশেক আগে মেনজিসটুর গুণ্ডাপাণ্ডারা তাকে বন্দী করে আদ্দিসের কাছাকাছি কা মার্ক্স কারাগারে রেখেছিল। ওখানে ইন্টারোগেটরদের একজন ছিল উস্তাভ। তখ কেজিবি-তে ছিল সে। কথা আদায় করার জন্যে বন্দী বা বন্দিনীর পায়ুপথে প্রেশার হোস ঢুকিয়ে ট্যাপ ছেড়ে দিত। বন্দীরা ফুলতে থাকত, যতক্ষণ না তাদে নাড়ীভুঁড়ি বিস্ফোরিত হয়। শাফি পালিয়ে আসায় সে-যাত্রা উস্তাভের হাত থেকে বেঁচে যায়। মেনজিসটু ক্ষমতা হারাবার পর কেজিবি থেকে অবসর নেয় উস্তাভ সাফারি গাইড হিসেবে কাজ শুরু করে।

প্রসঙ্গ বদলে শাফি জানাল, দিনকাল খুব অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। কি নোটিশে এই এলাকা ছাড়তে হতে পারে তাকে। আদ্দিসে এক ভদ্রলোক আছেন নাম কর্নেল মুসা মনসুর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে কাজ করেন, তাঁকে রানা মেসে দিলে শাফি পেয়ে যাবে। কোডনেম ফিশি বললে শাফিকে চিনবেন তিনি।

বিদায়ের সময় আগের প্রসঙ্গে আবার ফিরে এল শাফি। 'তোমাকে জানি রাখি, উস্তাভকে আমার খুন করতে হতে পারে।'

পরদিন সকালে ব্যথায় আড়ষ্ট শরীর নিয়ে স্কিনিং শেডে চলে এল রানা। ছাড়া চামড়াটা পরীক্ষা করল, নতুন করে লবণ মাখাল, তারপর খালিদ আর মোস্তফা নির্দেশ দিল ডিক-ডিকের খুলি পিপড়ের ঢিবিতে পুঁতে ফেলতে হবে, পিপড়েগুলো যাতে অবশিষ্ট মাংস খেয়ে ওটাকে পরিচ্ছন্ন করে তোলে।

ওখান থেকে ডাইনিং কুঁড়েতে চলে এল রানা, ব্রেকফাস্ট সেরে নিমাকে নি বেরুল মাছ ধরতে। ঝুলন্ত ব্রিজের কাছাকাছি ছিপ ফেলল ওরা। ব্রিজের ওপ

ফেকাসে লাল পাথরের খিলানটার দিকে হাত তুলে নিমাকে বলল, 'আপনাকে আসলে উত্তাভের সামনে থেকে সরিয়ে আনার জন্যে মাছ ধরতে চেয়েছি। কাল ওদিকে কি দেখে এসেছি শুনুন।'

রানার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল নিমা। ও থামতে জানতে চাইল, 'ফোকরগুলো কি হতে পারে বলে আপনার ধারণা?'

'কি হতে পারে বুঝতে পারছি না। তবে বহু বছরের পুরানো ওগুলো।'

'রাজমিস্ত্রীদের জন্যে মাচা বা ভারা তৈরি করতে হলে এ-ধরনের ফোকর দরকার হতে পারে,' বলল নিমা।

'আপনার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়!' ব্যঙ্গ নয়, রানার চোখে প্রশংসা।

'দু'একটা আইডিয়া আপনিও দিন।'

'ধর্মীয় কোন প্রতীক? কোন সংকেত?' নিমার চেহারায় সন্দেহ দেখতে পেয়ে আবার বলল রানা, 'মানলাম, গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে না।'

একটা ঘাস ছিঁড়ে ডগাটা দাঁত দিয়ে কামড়াল নিমা। 'ধরুন ফোকরগুলো কাটা হয় মাচা তৈরির জন্যে। নদীর পাশে পাহাড়ের গায়ে, মাচা কেন দরকার হবে?'

'মাছ ধরার জন্যে।'

'কিন্তু এই নদীতে মাছ খুব বেশি নেই,' বলল নিমা। 'আর কিছু দেখেছেন?'

'দু'সারি কুলুঙ্গির মাঝখানে গোল একটা আকৃতি। পাথর খোদাই করে তৈরি।'

শিরদাঁড়া খাড়া করল নিমা। 'লিপি, নাকি নকশা?'

মাথা নাড়ল রানা। 'আলো কম, অত উঁচুতে পরিষ্কার কিছু দেখা যায় না,' বলল ও। 'কাল তিমকাত উৎসব, মাগডাস-এ ঢোকার একমাত্র সুযোগ। কাজটা শেষ করার পর খাদে নেমে আরেকবার দেখতে হবে ওগুলো।'

'এবার আপনার সঙ্গে আমিও থাকব,' বলল নিমা।

ওদের জন্য দু'জন তরুণ উপাসককে এসকর্ট হিসেবে পাঠিয়েছেন বিশপ, ভিড় সরিয়ে পথ তৈরি করবে তারা। কিন্তু দেখা গেল সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছুবার আগেই এসকর্ট দু'জন সচল জনারণ্যে হারিয়ে গেল। 'কাছাকাছি থাকুন,' বলে নিমার একটা বাহু খামচে ধরল রানা, কাঁধ দিয়ে ভিড় তো নয় যেন পাহাড় ঠেলছে।

দীর্ঘ সংগ্রামের পর অবশেষে টেরেস দাঁড়িয়ে থাকা অনেকগুলো পাথুরে স্তম্ভের একটার গায়ে পিঠ ঠেকাতে পারল ওরা। এখান থেকে ক্যাথেড্রালে ঢোকার পথটা পরিষ্কারই দেখা যায়। নিমা যথেষ্ট লম্বা নয়, সামনে জনসমুদ্র থাকায় প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, তাই ওকে সিঁড়ির নিচের ছোট একটা স্তম্ভের মাথায় তুলে দিল রানা। অবলম্বন হিসেবে রানার একটা কাঁধ আঁকড়ে ধরল নিমা, কারণ ওর পিছনেই গভীর খাদ, নিচে বয়ে চলেছে নীলনদ।

উপাসকরা একঘেয়ে সুরে ভক্তিগীত গাইছে। মিউজিশিয়ানদের বারোটা গ্রুপ ড্রাম সহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে। প্রতিটি ব্যান্ডকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে ভক্তরা, তাদের পরনে বিচিত্র বাহারি আলখেল্লা, মাথার ওপর বহুরঙা ছাতা।

প্রচণ্ড গরম আর উৎকট দুর্গন্ধের মতই জনারণ্যে ছড়িয়ে পড়েছে বিপু উত্তেজনা আর প্রত্যাশা। গান ও বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে উন্মাদনা ক্রমশ বাড়ে হাজার হাজার উপাসক, ভক্ত, পূজারি, যেন একটিমাত্র জ্যান্ত প্রাণীতে পরিণত হ বিশেষ একটা ছন্দে দোল খাচ্ছে।

হঠাৎ করে ক্যাথড্রালের ভেতর থেকে পিতলের অনেকগুলো ঘণ্টা একযো বাজতে শুরু করল, পরমুহূর্তে সেই কান ঝালাপালা করা আওয়াজের সঙ্গে যো দিল কয়েক শো হর্ন আর ট্রামপিট বা ভেরী। সিঁড়ির মাথায় গোত্রপ্রধানদে দেহরক্ষীরাও বসে থাকল না, অটোমেটিক রাইফেল থেকে ফাঁকা গুলিবর্ষণ শু করল বিরতিহীন। মহিলারা শুরু করল উলুধ্বনি, সে আওয়াজ যেমন রোমহর্ষ তেমনি রক্ত পানি করা। ধর্মীয় উন্মাদনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল পুরুষদের চেহারা মেঝেতে হাঁটু গাড়ল তারা, আকুল আবেদন জানাবার ভঙ্গিতে মাথার ওপর দু'হা তুলে ঈশ্বরের কৃপা ভিক্ষা চাইছে। মহিলারা তাদের শিশুসন্তানকে মাথার ওপ তুলে ধরল, কৃষ্ণবর্ণ গাল বেয়ে অনর্গল নেমে আসছে চোখের পানি।

আন্ডারগ্রাউন্ড চার্চ থেকে গেট হয়ে বেরিয়ে এল পুরোহিত আর সন্ন্যাসীদে একটা বিশাল মিছিল। প্রথমে এল সাদা আলখেল্লা পরা ভক্তরা, তাদের পিছু নি এল তরুণ উপাসকদের দল, আজ নদীর কিনারায় তারা ব্যাপ্টাইজড্ হবে বাটিকে চিনতে পারল নিমা, আশপাশের কিশোরদের চেয়ে যথেষ্ট লম্বা সে চোখাচোখি হতে লজ্জা পেয়ে হাসল।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। কড়াই আকৃতির জায়গাটা ছায়ার ভেত অস্পষ্ট দেখাচ্ছে, মাথার ওপর ঝুলে আছে দু'একটা রূপালি তারা নিয়ে রক্তব শামিয়ানার মত সরু আকাশ।

পথের মাথায় পিতলের একটা পাত্রে কয়লা জ্বলছে, পুরোহিতরা সেটাকে প কাটাবার সময় হাতের মশাল গুঁজে দিচ্ছে ভেতরে, অমনি দপ করে জ্বলে উঠে মশালের মাথা।

তরল লাভা স্রোতের মত মশাল মিছিল কুণ্ডলী ছাড়াতে শুরু করল পাহাড় প্রাচীরের গা থেকে, প্রিস্টরা সুর করে গান করছেন, ড্রামের গুরুগম্ভীর আওয়া পাহাড়ে লেগে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ব্যাপ্টিজম প্রার্থীদের পিছু নিয়েছে ভারপ্রাপ্ত প্রিস্টরা, তাঁদের আলখেল্লায় পিতলের তৈরি রূপালি ক্রস সাঁটা, মাথা জড়ানো সিল্ক পট্টি, অনেকেই ব্যানার বহন করছেন। তাঁদের পিছনে দু'জ প্রিস্টকে দেখা গেল, ট্যাবট বহন করছেন। প্রিস্ট দু'জন অস্বাভাবিক লম্বা, মাথা রত্নখচিত পাগড়ী, পরনে বহুরঙা আলখেল্লা। আর্ক অভ ট্যাবারন্যাকল বা চন্দ্রাতা আবৃত আসন লাল কাপড়ে মোড়া, সেটা জমিনে লুটিয়ে পড়েছে। কাপড়ে মোড়া কারণ অপবিত্র বা পাপীরা যাতে চামড়ায় চোখে ওটাকে সরাসরি দেখার সুযোগ পায়।

মিছিলের শেষ দিকে যোগ দিলেন ওলি জারকাস। আজ তিনি নীল পাথ লাগানো মুকুটটা পরেননি। পরেছেন ইপিফানি ক্রাউন। চকচকে ধাতু-খণ্ড আ বহুমূল্য পাথর দিয়ে সাজানো। মুকুটটা এত ভারী, প্রধান পুরোহিতের প্রাচীন ঘা ওটার ভারে নুয়ে পড়েছে। দু'জন তরুণ ভক্ত তাঁর কনুই ধরে গাইড করছে

অনিশ্চিত পা ফেলে সিঁড়ি বেয়ে নামছেন তিনি। এই সিঁড়িপথই নীল নদীর দিকে নেমে গেছে।

মিছিল এগোচ্ছে, সেই সঙ্গে সিঁড়ির মাথায় বসে থাকা লোকজন সিধে হলো নিচে নামার জন্যে। টেরেস খালি হয়ে আসছে দেখে নিমাকে স্তম্ভের ওপর থেকে নামিয়ে মিছিলে যোগ দিল রানা, জায়গাটা একেবারে ফাঁকা হয়ে যাবার আগেই চার্চের ভেতর ঢুকে পড়তে হবে ওদেরকে। জনস্রোত সামনে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, তারই মধ্যে একপাশে সরে আসছে ওরা, উদ্দেশ্য চার্চের প্রবেশমুখে পৌঁছুনো সামনে উস্তাভ আর রুবিকে দেখতে পেল ওরা, তবে তারা ওদেরকে দেখতে পায়নি।

চার্চের আউটার চেম্বারে ঢোকার গেটে এসে মাথা নিচু করল রানা, ভেতরে ঢুকে আবছা অন্ধকারে কাউকে দেখতে পেল না। ভেতরের গেটগুলোয় কোন প্রহরী নেই দেখে সাইড ওয়াল ঘেঁষে এগোল ও, এক হাতে নিমার কব্জি ধরে আছে, অপর হাতে ব্যাগটা। সামনেই ঝুলছে মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত লম্বা পর্দা ভারী পর্দা তুলে ভেতরে গা ঢাকা দিল ওরা।

পর্দার কাঁপন তখনও পুরোপুরি থামেনি, সবেমাত্র দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছে ওরা, কয়েক জোড়া পায়ের আওয়াজ ভেসে এল কানে। পর্দা সামান্য ফাঁক করে বাইরে তাকাল রানা। সাদা আলখেল্লা পরা চারজন প্রিস্ট চার্চের ভেতর দিক থেকে এগিয়ে আসছেন, আউটার চেম্বার পার হয়ে গেটের সামনে থামলেন, বাইরে বেরিয়ে গিয়ে বন্ধ করে দিলেন মেইন গেট।

'আজ রাতে আর ওই গেট খোলা হবে না,' ফিসফিস করল রানা। 'ভেতরে আটকা পড়েছি আমরা।'

'কেউ আমাদেরকে বিরক্ত করবে না,' জবাব দিল নিমা। 'চলুন, এখুনি কাজ শুরু করি।'

পা টিপে টিপে পর্দার আড়াল থেকে বেরুল ওরা, আউটার চেম্বার পার হয়ে একটা দরজার দিকে এগোল নিমাকে নিয়ে মিডল চেম্বারে পা রাখল রানা।

প্রথম চেম্বারের তুলনায় আকারে ছোট আর নিচু এটা। দেয়ালচিত্রগুলোয় সম্ভবত নিয়মিত রঙের প্রলেপ লাগানো হয়। মেঝে খালি, শুধু বাঁশ দিয়ে পিরামিড আকৃতির একটা কাঠামো তৈরি করা হয়েছে, তাতে দাঁড়িয়ে আছে পিতলের তৈরি সমাধি, সাতটি প্রদীপে তেলের ওপর ভাসছে সলতে। আলোর অন্য কোন উৎস চোখে পড়ল না। সিলিং আর চেম্বারের কুলুঙ্গিগুলোয় অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে।

মেঝে পেরিয়ে আরেকটা দরজার দিকে এগোল রানা, মাকডাসে ঢুকতে হলে এই তালামারা দরজা পেরুতে হবে ওদেরকে। টর্চ বের করে দরজাটা পরীক্ষা করল ও। দুটো কবাটেই সেইন্ট ফ্রুমেনটিয়াসের প্রতিকৃতি খোদাই করা রয়েছে, মাথার চারধারে আলোর একটা বৃত্ত, ডান হাত আশীর্বাদ করার ভঙ্গিতে ওপরে তোলা।

তালাটা কয়েকশো বছরের পুরানো, ব্যাগ থেকে যন্ত্রপাতি বের করে খুলতে বিশ সেকেন্ডের বেশি লাগল না। তালা খোলার পর একটা কবাটে কাঁধ ঠেকিয়ে চাপ দিল রানা। কব্জায় তেল দেয়া হয় না, ক্যাঁচক্যাঁচ করে প্রতিবাদ জানাল।

ভেতরে ঢোকার জন্যে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ফাঁক হলো কবাট, ভেতরে ঢোকার পর সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিল।

মাকডাসের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বোবা বিস্ময়ে চারদিকে তাকাল ওরা। হোলি অব হোলিজ খুব ছোট একটা চেম্বার, এত ছোট হবে বলে ওরা ধারণা করেনি। দশ-বারো কদম ফেললে এক মাথা থেকে আরেক মাথায় পৌঁছুনো যায়। গম্বুজ আকৃতির ছাদ এত নিচু, পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে হাত উঁচু করলে ছোঁয়া যাবে।

মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত সারি সারি শেলফ, ভক্তদের দেয়া উপহারসামগ্রী সাজানো রয়েছে–ট্রিনিটি ও ভার্জিন আইকন, বাইজেনটাইন স্টাইলে গড়া, অলংকৃত রূপোয় মোড়া। সেইন্ট আর সম্রাটদের খুদে স্ট্যাচুও আছে। আর আছে পালিশ করা মেটাল দিয়ে তৈরি পাত্র, গহনার বাক্স, মেডেল, মালা, শাখা-প্রশাখা সহ মোমদানি–প্রতিটিতে মোমবাতি জ্বলছে।

মেঝের মাঝখানে সিডারউডের অলটার, প্যানেলে বিশ্ব সৃষ্টির ছবি খোদাই করা–স্বর্গ থেকে আদমের পতন থেকে শুরু করে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত সবই দেখানো হয়েছে। সিল্কে মোড়া অলটার, ক্রসটা রূপোর তৈরি। প্রধান পুরোহিতের মুকুট মোমবাতির আলোয় চকচক করছে, টাইটার নীল সেরামিক সীল মুকুটটার ঠিক কপালের মাঝখানে।

নিঃশব্দে এগিয়ে এসে অলটারের সামনে হাঁটু গাড়ল নিমা। প্রার্থনায় বসে মাথা নত করল ও। অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকল রানা, মোটেও বিরক্ত হচ্ছে না।

নিমার প্রার্থনা শেষ হতে ওর পাশে চলে এল রানা। 'ট্যাবট স্টোন!' ইঙ্গিতে অলটারের সামনেটা দেখাল। একসঙ্গে সেদিকে এগোল ওরা। মাকডাসের পিছনে কাপড় মোড়া একটা কাঠামো দেখা যাচ্ছে। রূপো আর সোনার তৈরি সুতোয় এমব্রয়ডারি করায় কাপড়টা ভারী বলে মনে হলো। কাঠামোটা মানুষের মতই লম্বা ওটাকে ঘিরে ঘুরছে দু'জন, ছুঁতে ভয় পাচ্ছে–যদি প্রত্যাশা পূরণ না হয়! উত্তেজনা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে উপাসনালয়ের পিছন দিকের দেয়ালে তাকাল রানা, ওদিকে বার লাগানো একটা গেট রয়েছে। 'সেইন্ট ফ্রুমেনটিয়াসের সমাধি!' বলে গ্রিলের দিকে এগোল ওর পাশে চলে এল নিমা। কাঠের গায়ে চৌকো ফোকর, সেগুলোর একটা দিয়ে ভেতরে তাকাল। ভেতরটা অন্ধকার। ফোকরের ভেতর টর্চ ঢুকিয়ে বোতামে চাপ দিল রানা।

টর্চের আলোয় রঙধনুর সব ক'টা রঙ ওদের চোখ যেন ধাঁধিয়ে দিল। আলোটা চোখে সয়ে আসতে চেঁচিয়ে উঠল নিমা, 'ওহ, সুইট হেভেন!' এমন কাঁপুনি শুরু হলো, যেন প্রবল জ্বরে ভুগছে ও। মুখ থেকে সমস্ত রক্ত নেমে যাওয়ায় ফেকাসে হয়ে গেল চেহারা।

সেলের মত দেখতে সমাধি কক্ষের পিছনের দেয়ালে, একটা পাথুরে শেলফের ওপর, সেট করা হয়েছে কফিনটা। কফিনের গায়ে একটা মানুষের প্রতিকৃতি আঁকা, ভেতরে শুয়ে থাকা মানুষটার আদলে। ছবিটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে, অনেক জায়গাতেই রঙ নেই, তাসত্ত্বেও মানুষটার ম্লান চেহারা, লালচে দাড়ি ইত্যাদি আলাদাভাবে চেনা যায়।

নিমার বিস্ময় বোধ করার এটাই একমাত্র কারণ নয়। কফিন শেলফটার ওপরে এবং দু'পাশে তাকিয়ে আছে ও। ওখানে যেন বিভিন্ন রঙের দাঙ্গা বেধে গেছে, দেয়ালের প্রতিটি ইঞ্চিতে সূক্ষ্ম ও দৃষ্টিনন্দন পেইন্টিং সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নেয়। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এতকাল পরও পেইন্টিংগুলো অক্ষত ও অম্লান রয়েছে কিভাবে।

ওগুলোর ওপর টর্চের আলো ঘোরাল রানা, যেন পড়ে যাবার ভয়ে রানার একটা বাহু আকড়ে ধরে থাকল নিমা। ওর আঙুল রানার মাংসে সেঁধিয়ে যাচ্ছে, অথচ রানা কোন ব্যথা অনুভব করছে না।

বড় বড় যুদ্ধের দৃশ্য দেখানো হয়েছে, নীলনদের পানিতে যুদ্ধজাহাজগুলো পরস্পরের মুখোমুখি। আছে শিকারের দৃশ্য, সিন্ধুঘোটক আর বিশাল সব হাতিকে ধাওয়া করছে শিকারীরা, লম্বা গজদন্ত রোদ লেগে চকচক করছে। কোথাও রক্তপিপাসু পদাতিক বাহিনী উন্মত্ত আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ছে প্রতিপক্ষ বাহিনীর ওপর। শত শত রথ নিয়ে বীর যোদ্ধারা ছুটে চলেছে রণক্ষেত্র অভিমুখে, গিরিখাদের তলায় ধুলো উড়ছে, ঘোড়সওয়ারদের অস্পষ্টভাবে দেখা যায়।

প্রতিটি দেয়ালচিত্রের নিচের দিকে দীর্ঘদেহী এক যোদ্ধার মূর্তি দেখা যাচ্ছে। একটা দৃশ্যে সে তার ধনুক পুরোপুরি টেনে ধরেছে, আরেকটায় ব্রোঞ্জের তৈরি তলোয়ার ঘোরাচ্ছে। শত্রুরা মাথা নোয়াচ্ছে তার সামনে, সে তাদেরকে পায়ের নিচে পিষছে, কিংবা অনেকগুলো মাথা একহাতে ধরে অট্টহাসি হাসছে।

টর্চের আলো সেন্ট্রাল প্যানেলের ওপর স্থির করল রানা। কফিনের ওপর দেয়ালটা কাভার করছে এই প্যানেল। এখানে দেবতুল্য সেই মূর্তি রথের ওপর সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে, তার এক হাতে ধনুক, অপর হাতে বল্লম। মাথায় পাগড়ী বা হেলমেট নেই, চুলগুলো তার পিছনে পতাকার মত উড়ছে–সিংহের সোনালি কেশর যেন। চেহারায় আভিজাত্য ও গর্ব, দৃষ্টিতে অদম্য স্পর্ধা।

তার নিচে ক্লাসিকাল ঈজিপশিয়ান হায়ারোগ্লিফিক্সে লেখা কয়েকটা লাইন। গলা খাদে নামিয়ে অনুবাদ করল নিমা,

> গ্রেট লায়ন অভ ঈজিপ্ট
> বেস্ট অভ ওয়ান হানড্রেড থাউজেন্ড
> হোল্ডার অব দা গোল্ড অব ভ্যালার
> ফারাও'স সোল কম্প্যানিয়ন
> ওয়ারিয়র অভ অল দা গডস
> মে ইউ লিভ ফর এভার!

প্রবল আবেগে কাঁপিয়ে উঠল নিমা, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'এই শিল্পীকে আমি চিনি। তাঁর শিল্পকর্ম নিয়ে পাঁচ বছর গবেষণা করেছি। আমি যীশুর কসম খেয়ে বলতে পারি, এই দেয়ালচিত্র চার হাজার বছর আগে ক্রীতদাস টাইটার আঁকা। আর এই সমাধির ডিজাইনও তারই করা।' হাত তুলে কফিন রাখা শেলফের খানিক ওপরে পাথরে খোদাই করা নামটা দেখাল। 'না, এটা কোন ক্রিশ্চান সেইন্টের কফিন নয়। কয়েক শো বছর আগে কোন একজন প্রাচীন প্রিস্ট হঠাৎ এটা দেখতে পান, নিজ ধর্মের নামে দখল করে নেন।'

কাঁপা কাঁপা নিঃশ্বাস ফেলল ও। 'ওদিকে তাকান! ওটা ট্যানাস-এর সীল-লর্ড হারেব, সমগ্র মিশরীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডার, রানী লসট্রিস-এর প্রেমিক, প্রিন্স মেমনন-এর ন্যাচারাল ফাদার, যিনি পরে ফারাও টামোস হয়েছিলেন।'

অনেকক্ষণ পর নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা, 'সবই তাহলে সত্যি। সপ্তম স্ক্রোলের সমস্ত রহস্যই দেখা যাচ্ছে এখানে। এখন শুধু চাবিটা পেলেই হয়।'

'হ্যাঁ, চাবি-টাইটার স্টোন টেস্টামেন্ট!' ধীরে ধীরে ঘুরল নিমা, চেহারায় শ্রদ্ধা আর ভয় ফুটে রয়েছে, এগোচ্ছে ট্যাবলেট স্টোনটার দিকে। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ও। 'রানা, আমার ভয় করছে। যা ভেবেছি ওটা হয়তো তা নয়। প্লীজ, আপনি দেখুন!'

লম্বা কাঠামোটার সামনে এসে দাঁড়াল রানা, কাপড়টা সরিয়ে নিল। ফেকাসে লাল একটা গ্র্যানিট পিলার দেখতে পাচ্ছে ওরা, গায়ে বহুরঙা চিত্রবিচিত্র দৃশ্য খোদাই করা। পিলারটা প্রায় ছ'ফুট লম্বা, গোড়ার দিকে এক বর্গফুটের মত হবে। ক্রমশ সরু হয়ে যাওয়ায় চ্যাপ্টা বা সমতল চূড়ার কাছে আধ বর্গমিটার দাঁড়িয়েছে। গ্র্যানিট প্রথমে পালিশ করা হয়েছে, খোদাই করা হয়েছে পরে। এগিয়ে এসে ঠাণ্ডা পাথরটা ছুঁলো নিমা, হায়ারোগ্লিফিক্সের ওপর হাত বুলাচ্ছে। 'আমাদেরকে লেখা টাইটার চিঠি,' ফিসফিস করল ও। খোদাই করা লিপির ভিড় থেকে একটা প্রতীকচিহ্ন খুঁজে নিল-ডানাভাঙা একটা বাজপাখি। ওটা স্পর্শ করার সময় আঙুলগুলো কাঁপতে শুরু করল। 'লেখা হয়েছে প্রায় চার হাজার বছর আগে। প্রতীক্ষায় আছে, এত বছর পর আমরা পড়ব, অর্থ উদ্ধার করব। দেখুন কিভাবে সে সই করেছে।' গ্র্যানিট পিলারটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে নিমা, পালা করে চারটে দিকেই পরীক্ষা করছে, হেসে উঠে মাথা ঝাঁকাচ্ছে, কখনও বা ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়ছে, তারপর আবার হাসছে, যেন একটা প্রেমপত্র পড়ছে ও।

'পড়ে শোনান আমাকে,' বলল রানা। 'ক্যারেক্টারগুলো বুঝতে পারি, তবে সেন্স বা মিনিং সহজে ধরতে পারি না। আপনি ব্যাখ্যা করুন।'

'নিখাদ টাইটা!' হেসে উঠল নিমা, উত্তেজনায় লালচে হয়ে উঠেছে চেহারা। 'বরাবরের মত অস্পস্ট ভাষায়, ধাঁধার সাহায্যে মেসেজ দিয়েছে এখানেও। এ সম্ভবত তার নিজস্ব কোন কোড।' একটা হায়ারোগ্লিফিক্স লাইনে আঙুল রাখল, অনুবাদ করার সময় লাইনটা অনুসরণ করছে আঙুল দিয়ে। 'প্রকাণ্ড ডানা মেলে শকুনরা উঠল সূর্যকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে। ডেকে উঠে লেজের দিকে ঘুরে গেল শিয়ালরা। নদী বয়ে চলল জমিনের দিকে। পবিত্র স্থানের অমর্যাদাকারীরা সাবধান! সমস্ত দেবতার অভিশাপ নেমে আসবে তোমাদের ওপর!'

'অর্থহীন প্রলাপ নয় তো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, অর্থহীন নয়! টাইটা কখনও অর্থহীন কথা বলে না। নিজেকে সে দুর্লভ প্রতিভা বলে দাবি করে, কাজেই আমরা ধরে নিতে পারি একটু হয়তো ছিটগ্রস্ত। তাকে বুঝতে হলে তার চিন্তাধারা বুঝতে হবে। সে আমাদের জন্যে কিছু ধাঁধা রেখে গেছে, অর্থ বের করতে কিছুটা সময় তো লাগবেই। সেজন্যেই আমরা ক্যামেরা নিয়ে এসেছি। ছবি তোলার পর ওই পাথর থেকে ছাপ নেব আমরা। পরে যাতে স্টাডি করা যায়।'

ব্যাগ খুলে ক্যামেরা বের করল রানা। 'প্রথমে দুই রোল কালার ফটো তুলি, তারপর পোলারয়েড ব্যবহার করব–কালার ফটোগুলো ডেভলপ করতে সময় লাগবে, তার আগেই যাতে কাজ শুরু করতে পারি।' একে একে পিলারটার চারদিকেরই ফটো তুলল ও। ছবি তোলা শেষ হতে গ্রিল গেটের সামনে এসে তালাটা পরীক্ষা করল। 'এই তালাটা একটু জটিল, খুলতে হলে তালার ক্ষতি হতে পারে। তারমানে পুরোহিতরা জানবেন এখানে কেউ ঢুকছিল।'

'তাহলে ভেতরে ঢোকার দরকার নেই,' বলল নিমা। 'গ্রিলের এদিক থেকেই ছবি তুলুন।'

গ্রিলের ফাঁক দিয়ে ভেতরে ক্যামেরা ঢোকাল রানা, বেশ কয়েকটা ফটো তুলল। 'এবার পোলারয়েড।' ক্যামেরা বদল করে আরেক দফা ছবি তোলা হলো। রানা প্রতিটি প্লেট এক্সপোজ করার পর নিমাকে দিল ডেভেলপমেন্ট চেক করার জন্যে

প্রায় দু'ঘণ্টা পরিশ্রম করার পর ফটো তোলার পর্ব শেষ হলো। ক্যামেরা রেখে দিয়ে আর্ট পেপারের একটা রোল বের করল রানা। পিলারের গায়ে সাঁটা হলো কাগজটা, তারপর টেপ দিয়ে আটকানো হলো। দু'জন দু'দিক থেকে কাজ শুরু করল–রানা ওপর থেকে, নিমা নিচ থেকে। দু'জনের হাতে একটা করে কালো আর্ট ক্রেয়ন, খোদাই করা প্রতিটি হরফ ওই পেন্সিল দিয়ে ঘষে ফাঁকা কাগজে হুবহু তুলে নিল ওরা। 'টাইটা এখন যেখানেই থাকুক, আমি জানি আমাদের কাজ দেখে খিকখিক করে হাসছে সে,' বলল নিমা। 'ভাবছে, যতই চালাক হও তোমরা, আমার হেঁয়ালি ধরতে পারা এত সহজ কাজ নয়!'

ডিজাইনের আউটলাইন কাগজে তোলা পরিশ্রমসাপেক্ষ ও একঘেয়ে কাজ, তবু সময় যে কিভাবে বয়ে গেল দু'জনের কেউই টের পেল না। কাজ শেষ হতে নিমা জানতে চাইল, 'ক'টা বাজে বলুন তো?'

'ভোর চারটে। আসুন, জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেলি।'

'আর একটা কাজ বাকি আছে,' বলে আর্ট পেপারের একটা কোণ ছিঁড়ে অলটার বা বেদির দিকে এগোল নিমা, ওখানে প্রধান পুরোহিতের মুকুটটা পড়ে রয়েছে। মুকুটটার মাঝখানে নীল সেরামিক সীলটার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল ও, তারপর আর্ট পেপারে ডানা ভাঙা বাজপাখির একটা ছাপ নিল। ইতিমধ্যে পিলারটাকে কাপড়ে মুড়ে দিয়েছে রানা, নিজেদের জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিচ্ছে।

মিডল চেম্বারে ফিরে এসে তালাটা আবার লাগিয়ে দিল রানা। নিমা জিজ্ঞেস করল, 'মেইন দরজা দিয়ে বেরুব কিভাবে?'

খানিক চিন্তা করে রানা বলল, 'মিডল চেম্বার থেকে বেরুবার আরও রাস্তা থাকতে বাধ্য।' মেঝের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাল ও। 'পুরোহিতরা মেইন গেট খুব কমই ব্যবহার করেন। এখান থেকে ওঁদের কোয়ার্টারে যাবার কোন না কোন পথ নিশ্চয়ই আছে...' হঠাৎ থেমে হাত তুলে দেখাল নিমাকে। '...ওদিকে তাকান!' দেয়াল ঘেঁষে একটা মসৃণ লম্বা দাগ দেখা গেল মেঝেতে, শত শত বছর ধরে আসা-যাওয়া করায় মেঝে ওখানে ক্ষয়েও গেছে। 'পর্দার দিকে

তাকান, ওদিকে, হাত দিয়ে ধরার কেমন কালচে হয়ে গেছে।' দ্রুত এগিয়ে এসে পর্দাটা সরাতেই গোপন একটা দরজা দেখা গেল। 'যা ভেবেছি! পিছু নিন।'

পাথুরে একটা টানেল ধরে এগোল ওরা। ডান দিকে বাঁক নেয়ার পর সামনে ম্লান আলোর আভাস পাওয়া গেল। টর্চ নিভিয়ে ফেলল রানা।

বাসি খাবার আর ঘামের গন্ধ ঢুকল নাকে। সন্ন্যাসীদের একটা পাথুরে সেলকে পাশ কাটাল ওরা, দরজা নেই। টর্চের আলো ফেলতে দেখা গেল ভেতরটা ফাঁকা। কোন ফার্নিচার নেই, দেয়ালে শুধু একটা কাঠের ক্রস, তার নিচে চাকা লাগানো বিছানা। এরকম আরও দশ-বারোটা সেলকে পাশ কাটাল ওরা, একই রকম দেখতে। পরবর্তী বাঁক ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। মুখে সামান্য বাতাস লাগছে। কেউ কোথাও নেই দেখে আবার এগোল ওরা। কিছু দূর যাবার পর পিছন থেকে রানাকে আঁকড়ে ধরল নিমা।

'কি?' জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল রানা, নিমা ওর কাঁধে চাপ দেয়ায় চুপ করে গেল। তারপর শুনতে পেল আওয়াজটা। মানুষের গলা, গোলকধাঁধার ভেতর অস্পষ্টভাবে প্রতিধ্বনি তুলছে।

তারপরই ভেসে এল বুকের রক্ত হলকান একটা আর্তচিৎকার, যেন তীব্র ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে কেউ। সাবধানে এগোল ওরা, কারও চোখে ধরা পড়তে চায় না। তবে আওয়াজটা ক্রমশ বাড়ছে।

এতক্ষণে ওরা আলো দেখতে পাচ্ছে। প্যাসেজের একধারে একটা সেল থেকে বেরুচ্ছে আলোটা। আরও একটা রক্ত হিম করা আর্তচিৎকার শোনা গেল, এটা একটা নারীকণ্ঠ। চিৎকারটা প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে আসছে, প্যাসেজে দাঁড় করিয়ে রেখেছে ওদেরকে।

'কি ঘটছে বলুন তো?' নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফিসফিস করল নিমা।

জবাব না দিয়ে মাথা নাড়ল রানা, নিমার হাত ধরে আবার এগোল। আলোকিত সেলের দরজাটাকে পাশ কাটাতে হবে ওদের। উল্টোদিকের দেয়ালে পিঠ ঘষে একটু একটু করে এগোচ্ছে রানা। ওর পাশেই রয়েছে নিমা, ওর একটা বাহু ধরে আছে।

সেলের ভেতর তাকাল ওরা, নারীকণ্ঠের চিৎকারটা আবার শুনতে পেল। তবে এবার চিৎকারের সঙ্গে মিশে আছে একটা পুরুষকণ্ঠ।

দৃশ্যটা ওদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। চাকা লাগানো বিছানার ওপর সম্পূর্ণ নগ্ন ওরা, ঘামে চকচকে দুটো শরীর এক হয়ে আছে আরও অনেক কিছু দেখার ছিল, কিন্তু ঠেলে রানাকে সরিয়ে নিয়ে এল নিমা। 'থাক, দেখতে হবে না!' হিসহিস করে বলল ও।

প্যাসেজ থেকে ফাঁকা টেরেসে বেরিয়ে এল ওরা, থামল সিঁড়ির গোড়ায়, নীলনদের গন্ধ মেখে উঠে আসা তাজা বাতাসে ভরে নিল নিজেদের ফুসফুস। 'রুবি ওর কাছে চলে গেছে,' নরম সুরে ফিসফিস করল নিমা।

'অন্তত আজ রাতের জন্যে তো বটেই,' মন্তব্য করল রানা।

'না,' প্রতিবাদ করল নিমা। 'শুধু আজ রাতের জন্যে নয়, চিরকালের জন্যে। রুবি এখন শাফির মেয়েমানুষ।'

'কিন্তু স্বামী থাকতে অন্য পুরুষের কাছে যাওয়াটা কি ভাল? তোমার ধর্ম কি বলে?' কৌতুক করল রানা।

'উস্তাভ একটা মানুষ নাকি? ওটা তো একটা জানোয়ার, একটা পাষণ্ড,' জবাব দিল নিমা। 'আর ধর্মের কথা যদি বলেন, প্রচলিত ব্যাখ্যা আমি সব ক্ষেত্রে মানি না।'

দুই

রোদ ওঠার আগেই যে যার কুঁড়েতে পৌঁছুল ওরা।

বিকেলে রানার ঘুম ভাঙল উস্তাভের চেঁচামেচিতে। 'আমার বউ! আমার বউ! আপনি জানেন কোথায় গেছে আমার বউ? কোথাও তাকে পাওয়া যাচ্ছে না!'

হাত দিয়ে চোখ রগড়ে বিছানার ওপর উঠে বসল রানা। 'আপনার বউ কোথায় আছে তার আমি কি জানি!'

'শালী আমার কালা কুত্তাটার সঙ্গে পালিয়েছে!' হুংকার ছাড়ল উস্তাভ। 'আপনি সব জানেন! বলুন কোথায় গেছে ওরা, তা না হলে খুনোখুনি কাণ্ড ঘটে যাবে!'

'মুখ সামলে কথা বলুন,' সাবধান করে দিল রানা।

'বউ তো নয়, বেশ্যা! আলান শাফিকে ভাল খদ্দের ভেবে তার সঙ্গে পালিয়েছে! কিন্তু আমার নামও ভ্লাদিমির উস্তাভ! আমি ইন্টেলিজেন্স চীফ ছিলাম...' কি বলে ফেলছে বুঝতে পেরে থেমে গেল উস্তাভ। '...শাফির পেটে গুলি করব আমি, বেশ্যা মাগীটা তাকে মরতে দেখবে।' ছুটে রানার কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে গেল সে। গায়ে শার্ট চড়িয়ে তার পিছু নিল রানা।

নিজের কুঁড়েতে ফিরে একটা ব্যাগে কয়েকটা জিনিস ভরেছে উস্তাভ। এই মুহূর্তে হান্টিং রাইফেলে কার্ট্রিজ ঢোকাচ্ছে।

'গেছে যাকগে,' দরজা থেকে বলল রানা। 'ওদের পিছু নিলে আপনার বিপদ হতে পারে। শাফির সঙ্গে পঞ্চাশ জন গেরিলা আছে। আপনার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, বোঝা উচিত জোর করে কোন মেয়েকে ধরে রাখা যায় না।'

'কে ধরে রাখতে চায়? বেশ্যাটাকে আমি খুন করতে চাই!' চাবির গোছাটা রানার পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিল উস্তাভ। 'সাফারি শেষ হয়ে গেছে, মিস্টার। ল্যান্ড ক্রুজারের চাবি রইল, নিজের চেষ্টায় আদ্দিস আবাবায় ফিরে যাবেন। বড় ট্রাকটা আমার জন্যে রেখে যাবেন। আদ্দিসে পৌঁছে আমার ট্র্যাকারকে ল্যান্ড ক্রুজারের চাবি বুঝিয়ে দেবেন। সাফারি বাতিল করায় আপনি কিছু টাকা ফেরত পাবেন, সেটা পরে আমি পাঠিয়ে দেব।'

রানার কোন যুক্তিই মানল না, কাঁধে ব্যাগ আর হাতে রাইফেল নিয়ে ক্যাম্প ত্যাগ করল উস্তাভ। নিজের কুঁড়েতে ফিরে আসছে রানা, দেখল দরজা দিয়ে মাথা

বের করে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে নিমা। 'সবই শুনলাম,' বলল সে। 'রুবিকে পেলে সত্যি মেরে ফেলবে। আমাদের কি কিছুই করার নেই?'

'না, নেই। আমাদের কোন সাহায্য ওদের লাগবেও না। যান, আবার শুয়ে পড়ুন।'

'কাল রাতের পোলারয়েড ছবিগুলো দেখছিলাম। টাইটা আমাদেরকে অঢেল দান করে গেছে। আসুন না, দেখবেন।'

ভেতরে ঢুকে রানা দেখল পোলারয়েড আর আর্ট পেপারে তোলা ছাপগুলো ক্যাম্প টেবিলে বিছিয়ে রেখেছে নিমা।

'আপনি যখন নাক ডেকে ঘুমাচ্ছেন, আমি কিছু কিছু কাজ করেছি।' চারটে পোলারয়েড পাশাপাশি রাখল নিমা, ওগুলোর ওপর টেনে আনল বড় আকারের ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা ভাঁজ করা পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে জিনিসটা, প্রফেশনাল ল্যান্ড সার্ভেয়ার'স মডেল। ওটার নিচে ফটোগ্রাফের প্রতিটি সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে। 'টাইটা পাথরের প্রতিটি দিকের নাম রেখেছে–বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ আর শীত। এর মানে কি?'

'পৃষ্ঠা সংখ্যা?'

'ঠিক আমি যা ভেবেছি,' বলল নিমা। 'মিশরীয়রা বিশ্বাস করে বসন্ত হলো সমস্ত নতুন জীবনের সূচনা। প্যানেলগুলো কি নিয়মে পড়তে হবে সে-কথাই এখানে বলে দিচ্ছে টাইটা। এটা বসন্ত,' একটা ফটোগ্রাফ দেখাল ও।

'বুক অব দা ডেড থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে এখানে,' বলল নিমা। 'পড়ছি, "অনাদি অনন্ত ও অন্ধকার সমুদ্রের ওপর মৃদুমন্দ প্রথম বায়ু আমি। আমি প্রথম সূর্যোদয়। আলোর প্রথম আভাস। ভোরের বাতাসে উড়ছি সাদা একটা পালক। আমি রা। সমস্ত বস্তুর গুরু আমি। বেঁচে থাকব চিরকাল। আমার ক্ষয় বা বিনাশ নেই"।' গ্লাস থেকে চোখ তুলে রানার দিকে তাকাল নিমা। 'আপাতত এ-সব থাক, পরে ফিরে আসা যাবে। পরের অংশটুকু পড়া দরকার...তবে আপনি পড়লে ভাল হয়।' নিজের জায়গা রানাকে ছেড়ে দিল ও। 'পড়ার সময় আমার দিকে তাকাবেন না।'

ভুরু কুঁচকে রানা বলল, 'অনুবাদে আমি দক্ষ নই, অনেক বেশি সময় নেব। কেন, আপনার পড়তে অসুবিধে কি?'

'অসুবিধে আছে,' বলল নিমা, রানার দিকে তাকাচ্ছে না।

অগত্যা শুরু করল রানা। অনুবাদ খুব ধীরগতিতে এগোল, একটা কাগজে লেখার পর পড়ে শোনাল নিমাকে। পড়তে গিয়ে ওর নিজেরই কান যেন আগুন হয়ে গেল। 'দেবীর কন্যা তার মায়ের কাছে পৌঁছুনোর জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল। সিংহীর মত সগর্জনে মিলিত হবার জন্যে ছুটছে সে। পাহাড় থেকে লাফ দিল, দাঁতগুলো সাদা। সমস্ত বিশ্বের বেশ্যা সে। তার জননেন্দ্রিয় থেকে বিপুল স্রোত বেরিয়ে আসে। তার জননেন্দ্রিয় একদল কর্মীকে গ্রাস করেছে। তার শারীরিক ক্ষুধা পাথরমিস্ত্রী আর রাজমিস্ত্রীদের খেয়ে ফেলেছে। তার জননেন্দ্রিয় একটা অক্টোপাস, গিলে ফেলেছে একজন রাজাকে।'

নিমা আর রানা পরস্পরের দিকে তাকাতে পারছে না। তবে নিস্তব্ধতা ভাঙল

নিমাই, 'কি বুঝলেন?'

মাথা নাড়ল রানা।

'চলুন, আপনাকে একটা জিনিস দেখিয়ে আনি,' বলে হ্যাভারস্যাকে ফটোগ্রাফ আর আর্ট পেপার ভরে উঠে দাঁড়াল নিমা। 'আপনাকে বুট পরতে হবে। আমরা খানিক হাঁটতে বেরুব।'

এক ঘণ্টা পর ঝুলন্ত ব্রিজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল ওদেরকে, ডানডেরা নদীর তীব্র স্রোতের অনেক ওপরে এদিক ওদিক দোল খাচ্ছে ব্রিজটা। 'নীল নদের দেবী হলো হাপি। তাহলে এই নদী তার কন্যা নয়, মায়ের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ছুটে চলেছে, লাফ দিচ্ছে পাহাড় থেকে, গর্জন করছে সিংহীর মত, ফেনায় সাদা দেখাচ্ছে তার দাঁত?' জিজ্ঞেস করল নিমা।

নদীর দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল রানা, 'একদল কর্মীকে গ্রাস করেছে। পাথরমিস্ত্রী আর রাজমিস্ত্রীদের খেয়ে ফেলেছে।'

'ফারাও মামোস একজন গড বা কিং। নদী একজন গডকে গিলে ফেলেছে···পাথুরে খিলান সহ।' রানার মতই উত্তেজিত নিমা। 'খাদের ভেতর পাঁচিলে আপনি ওই কুলুঙ্গিগুলো দেখেছেন বলেই সম্পর্কটা ধরতে পেরেছি আমি। রানা, ওখানে আবার আমাদের যাওয়া দরকার। খোদাই করা ডিজাইনটা দেখতে হবে।'

'সেজন্যে প্রস্তুতি দরকার,' বলল রানা। 'রশি কাটতে হবে, একটা পুলি সিস্টেম দরকার হবে। খালিদ সহ সবার সাহায্যে লাগবে।'

'আপনি প্রস্তুতি নিন, সেই ফাঁকে পাথরটার অনুবাদ শেষ করি আমি···' হঠাৎ থেমে গিয়ে আকাশের দিকে তাকাল নিমা। 'শুনুন!'

কান পাতল রানা, নদীর কলকল ছলছল ছাপিয়ে জেগে উঠল রোটরের আওয়াজ। 'প্রক্সি দেখছি পিছু ছাড়েনি! আসুন!' নিমার হাত ধরে ছুটল ও, ব্রিজ থেকে নেমে সৈকতে চলে এল। ব্রিজের নিচে সাদা বালিতে বসে থাকল ওরা, বোল্ডারের আড়াল থাকায় আশা করছে হেলিকপ্টার থেকে ওদেরকে দেখা যাবে না।

লালচে পাহাড় প্রাচীরের ওদিকটায় চক্কর দিল জেট রেঞ্জার হেলিকপ্টার। ওদেরকে পাইলট দেখতে পায়নি, ঘুরে গিয়ে খাদের এদিক থেকে ওদিক টহল দিতে শুরু করল। তারপর হঠাৎ এঞ্জিনের আওয়াজ বদলে গেল, 'কপ্টারের গতি কমে আসছে। পাহাড়ে কোথাও নামছে,' ব্রিজের তলা থেকে ক্রল করে বেরুবার সময় বলল রানা। 'ওদের এই উঁকি-ঝুঁকি মারা আমার ভাল ঠেকছে না।'

'খুব একটা চিন্তার কিছু আছে বলে মনে করি না,' বলল নিমা। 'চাচা হাসলানের খুনীদের সঙ্গে প্রক্সির যদি কোন সম্পর্ক থাকে, তার ব্যবস্থা পরে এক সময় করা যাবে।' প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছেটা আগের মতই প্রবল নিমার, তবে হাতের জরুরী কাজগুলো প্রথমে সারতে চাইছে। 'ওদের চেয়ে এগিয়ে আছি আমরা, তাই না? মঠ বা শিলালিপির তাৎপর্য সম্পর্কে ওদের এখনও কোন ধারণা নেই।'

'চলুন ক্যাম্পে ফিরি,' বলল রানা। 'আমি চাই না খাদের কাছাকাছি ওরা

আমাদেরকে আবার ঘুরঘুর করতে দেখে ফেলে।'

গ্যানট্রি বা মোবাইল একটা ক্রেন তৈরি করল রানা. ওকে সাহায্য করল ট্র্যাকার আর স্কিনাররা। ব্লক আর ট্যাকল নেই. তার বদলে ব্যবহার করা হলো কাঠের পোল। পিং শীট তৈরির জন্যে কুকিং হাট থেকে কেটে আনল এক টুকরো ক্যানভাস, সেটার চার কোণে চারটে ফুটো করে রশি বাঁধা হলো। প্রস্তুতি শেষ করতে বিকেল হয়ে গেল, নিমা বাদে বাকি সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রানা।

গ্যানট্রি আর রশির কুণ্ডলী নিয়ে সেই স্পটে পৌঁছুল ওরা. পাহাড়ের কিনারা থেকে যেখানে নিচে লাফ দিয়েছিল ডিক-ডিক। ওখান থেকে রওনা হলো ভাটির দিকে, পাহাড়-প্রাচীরের কিনারা ধরে এগোচ্ছে। এদিকে ঝোপ খুব ঘন, ম্যাচিট দিয়ে কাটার জন্যে মাঝে মধ্যে থামতে হলো। জলপ্রপাতের আওয়াজ পথ দেখাল রানাকে। ভাটির দিকে যতই এগোল, ততই বাড়ছে শব্দটা। তারপর একসময় পানির গর্জনে পায়ের নিচে কাঁপতে শুরু করল পাথর। খানিক পর কিনারায় দাঁড়িয়ে নিচের দিকে ঝুঁকল রানা, জলোচ্ছ্বাসের সাদা ফেনা দেখে খালিদকে বলল, 'এই জায়গাই।' তারপর ব্যাখ্যা করল ঠিক কি চাইছে ও।

গ্যানট্রি ঠিক কোথায় সেট করা দরকার জানার জন্যে ক্যানভাস পিং সীটে বসল রানা, খালিদ বাহিনীকে বলল, 'কিনারা থেকে বিশ ফুট নিচে নামাও আমাকে।' ও জানে, বিশ ফুট নিচ থেকে শুরু হয়েছে ওভারহ্যাঙ বা ঝুল-পাথর। ওই পয়েন্ট পর্যন্ত নাইলন রশি পাথরে ঘষা খাবে না, তবে ফুলে থাকা পাহাড়-প্রাচীরের গা চারদিকে অনেকটাই দেখতে পাওয়া যাবে।

দেড়শো ফুট নিচে নদীর পাথুরে গহ্বর, পিছন ফিরে শূন্যে ঝুলছে রানা, পাথরের গায়ে দুই সারি কুলুঙ্গি প্রায় পরিষ্কারই দেখতে পাচ্ছে। তবে পাঁচিলের গায়ে খোদাই করা ডিজাইন ফুলে থাকা পাথরের আড়ালে থেকে গেল। খালিদকে সংকেত দিতে পিং সীট ওপরে তুলে নিল ওরা।

'গ্যানট্রি আরও নিচের দিকে সেট করতে হবে।' জিনিস-পত্র তুলে নিয়ে ঝোপ ভেঙে আবার এগোল ওরা, পাহাড়-প্রাচীরের কিনারা ধরে। 'দাঁড়াও!' হঠাৎ চিৎকার করল রানা। 'ঝোপগুলো এদিকে খাটো কেন?' পরীক্ষা করে দেখার পর ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো। পাহাড়-প্রাচীরের এদিকের কিনারা ক্ষয়ে গেছে, ফলে পাথুরে জমিন পিছনের চেয়ে অনেক বেশি ঢালু। রানা ধারণা করল; সম্ভবত এই জায়গা থেকে প্রাচীন মাচা নিচে নামানো হয়েছিল। 'আর সামনে এগোবার দরকার নেই। এখানেই গ্যানট্রি সেট করব আমরা।'

ঝোপ-ঝাড় কেটে জায়গাটা পরিষ্কার করতে হলো। গ্যানট্রি সেট করার পর হাতে আর সময় থাকল না, সন্ধে হয়ে আসছে। 'আজকের মত থাক। এখন চলো, কাল সকালে ফিরে আসব,' বলল রানা।

পরদিন সকালে আবার সেট করা গ্যানট্রির কাছে পৌঁছুল ওরা। ঢালু জমিন একটা প্লাটফর্মে এসে শেষ হয়েছে, নিরেট পাথুরে প্লাটফর্মের কিনারায় খাদের ঠোঁট। ঘুরে ফিরে দেখে নিমা মন্তব্য করল, 'নিশ্চয় করে বলা কঠিন, তবে বোধহয় আপনার ধারণাই ঠিক—মানুষের তৈরি হতে পারে।'

স্লিং সীটে বসে সংকেত দিল রানা, খালিদ বাহিনী ওকে খাদে নামাতে শুরু করল। ওর পরনে শর্টস আর টেনিস শু, গায়ে টি-শার্ট। স্লিং সীটে ঝুলছে রানা, খাদের খাড়া গা থেকে যথেষ্ট দূরে। নামার শুরুতেই দেখতে পেল, কুলুঙ্গি সারির সঙ্গে একই লাইনে রয়েছে ও। পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে তৈরি বৃত্তাকার ডিজাইনটা ওর সামনে অর্থাৎ একই লেভেলে চলে এল, তবে ওর কাছ থেকে পঞ্চাশ ফুট দূরে ওটা, তার ওপর শ্যাওলা পড়ে পাথরের রঙ বদলে গেছে, ফলে ঠিক বোঝা গেল না ডিজাইনটা কৃত্রিম কিনা। খালিদ বাহিনী রশি ছাড়ছে, ডিজাইনটাকে ওপরে রেখে নিচে নামছে স্লিং সীট।

পানির সারফেসে পৌঁছুল স্লিং সীট, নদীতে নেমে পড়ল রানা। এরপর নিমা নামবে।

ডিজাইনটার সঙ্গে একই লেভেলে পৌঁছে নিমা সংকেত দিল, স্থির হয়ে গেল স্লিং সীট। বুকে ঝুলে থাকা বিনকিউলারটা চোখে তুলল ও। মাত্র কয়েক সেকেন্ড, তারপরই বিনকিউলার ছেড়ে নিল, গলা চিরে বেরিয়ে এল তীক্ষ্ণ উল্লাসধ্বনি। একশো ফুট নিচ থেকে চিৎকারটা স্পষ্ট শুনতে পেল রানা। উত্তেজনায় পা ছুঁড়ছে নিমা, রানার উদ্দেশে হাত নাড়ছে।

হেসে উঠল রানা, হাতছানি দিয়ে ওকে নিচে নেমে আসতে বলল। সংকেত পেয়ে আবার রশি ছাড়তে শুরু করল খালিদ বাহিনী।

'কি দেখলেন? মানুষের তৈরি? লিপি? পড়তে পেরেছেন?' নিমা পানির কাছাকাছি নেমে আসতে রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল রানা।

'ইউ ওয়্যার রাইট, ইউ ওয়ান্ডারফুল ম্যান!' উল্লাসে অধীর নিমা। 'আপনার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ! টাইটা এখানেও তার সই রেখে গেছে, ডানা ভাঙা বাজপাখি!'

'মার্ভেলাস!'

'টাইটা যে এখানে এসেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেল, রানা। কুলুঙ্গিগুলো তৈরি করার জন্যে একটা মাচায় দাঁড়াতে হয়েছিল তাকে। আমাদের প্রথম অনুমানই ঠিক। আপনি যে ফোকরে হাত রেখেছেন, ওটা খাদে নামার জন্যে তার মইয়েরই একটা অংশ।'

'বুঝলাম, কিন্তু কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'এখানে নামার কি দরকার ছিল তার? খোঁড়াখুঁড়ি বা নির্মাণ কাজের কোন চিহ্নই তো দেখছি না।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করে নিমা জিজ্ঞেস করল, 'পানির নিচে ফোকরগুলো আছে কিনা দেখেছেন?'

'না। সারফেসের নিচে পাথর কাটা সম্ভব নাকি!'

'তবু দেখুন!'

ফোকরটা থেকে হাত না সরিয়েই পা ও শরীর পানির ভেতর ডোবাল রানা। পানির নিচে অদৃশ্য হলো মাথা, পা দিয়ে পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে ফোকর খুঁজছে। অকস্মাৎ ঝাঁকি খেয়ে পানির ওপর মাথা তুলল, চেহারা দেখে মনে হলো ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে। 'সত্যি আছে! পানির নিচে আরেকটা ফোকর আছে!'

'একটা? আমি তো বলি, অনেকগুলো!' তারপর বিনয়ে বিগলিত হবার ভান

করল নিমা। প্লীজ, একবার ডাইভ দিয়ে দেখুন না! লজেন্স খাওয়াব!'

বড় করে শ্বাস টেনে বাতাসে বুক ভরে নিল রানা, তারপর ডুব দিল পানিতে। সারফেসের নিচে প্রথম ফোকরটা হাত দিয়ে ছুঁলো, তারপর নেমে এল আরও নিচে। দ্বিতীয়টা পাওয়া গেল ছ'ফুট দূরে, বাকিগুলোর মতই। এভাবে যত নামছে রানা ততই একের পর এক ফোকর পাচ্ছে। চারটে ফোকর, তারমানে সারফেস থেকে চব্বিশ ফুট নেমে এসেছে ও। ভোঁ-ভোঁ করছে কান দুটো।

আরও নামছে রানা। পঞ্চম ফোকরকে পাশ কাটাল। ফুসফুসের বাতাসে চাপ বাড়ছে। চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে আছে, যদিও পানি এখানে গাঢ় আর ঘোলা। সরাসরি সামনে পাহাড়-প্রাচীরের গা-ই শুধু দেখতে পাচ্ছে। ছ'নম্বর ফোকরটা চোখে পড়তে ধরে ফেলল কিনারা। ইতস্তত করছে রানা।

সারফেস থেকে ছত্রিশ ফুট নেমেছে অথচ এখনও নদীর তলায় পৌঁছুতে পারেনি। সিদ্ধান্ত নিল, আরও ছ'ফুট নামবে, তারপর উঠে যাবে ওপরে। বাতাসের অভাবে ব্যথা শুরু হয়েছে বুকে।

নামছে, সাত নম্বর ফোকরটা চোখে পড়ল। ভাবল, আশ্চর্য, নদীর একেবারে তলা পর্যন্ত আছে এগুলো! কাজটা টাইটা করল কিভাবে! ওদের তো ডাইভিং ইকুইপমেন্ট ছিল না! শেষ ফোকরটা ধরে চিন্তা করছে রানা, আরও নিচে নামার ঝুঁকি নেবে কিনা। ফিজিকাল লিমিটের প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে, শরীরের পেশী কাঁপতে শুরু করেছে। ঠিক আছে, আর মাত্র একটা!

বিপদ সংকেত পেতে শুরু করেছে রানা। মাথার ভেতরটা হালকা লাগছে। পানির চাপে কুঁচকে যাচ্ছে, ভাঁজ খাচ্ছে চামড়া। এই সময় আঙুলে ঠেকল আট নম্বর ফোকর। আর নয়, এবার ওপরে উঠতেই হয়। হঠাৎ নদীর তলায় পা লাগল। পানিতে পা ছুঁড়ে ওপরে উঠতে চাইছিল, কিছু একটা ধরে ফেলল ওগুলোকে, সজোরে টেনে নিল পাথুরে পাঁচিলের দিকে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। 'অক্টোপাস! টাইটার অক্টোপাস। একজন রাজাকে গিলে ফেলেছে!' আতঙ্কে এই সব চিন্তা করছে রানা। পা ছুঁড়ে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। যেন কোন জলদানব টেনে রেখেছে পা দুটোকে। নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় লাগল, শরীরটা সেঁটে আছে পাঁচিলের গায়ে। তারপর ভাবল, অক্সিজেনের অভাবে হ্যালুসিনেশনের শিকার হয়ে পড়েছে ও। আসলে কি ঘটেছে আন্দাজ করতে পারল এতক্ষণে।

অক্টোপাস নয়, ওয়াটার প্রেশার। পাথরের গায়ে সরু একটা ফাটল আছে, আন্ডারওয়াটার টানেলের মুখ। শ্যাফটের ভেতর তীব্রবেগে পানি ঢুকছে, সেই স্রোতে আটকা পড়েছে ওর পা, তবে শরীরের ওপরের অংশে এখনও ওই স্রোতের কোন প্রভাব পড়েনি। রানা টের পাচ্ছে ফাটলটার নির্দিষ্ট একটা আকৃতি আছে, রাজমিস্ত্রীর তৈরি চৌকো লিনটেল-এর মত। এই লিনটেলই ওকে ভেতরে টেনে নিতে চাইছে। হাত দুটো ওপরের পাঁচিলে মেলে সমস্ত শক্তি দিয়ে টানটা থেকে পা দুটোকে মুক্ত করতে চাইছে রানা, কিন্তু আঙুলগুলো ধরার মত কিছু পাচ্ছে না, মসৃণ আর শ্যাওলায় মোড়া পিচ্ছিল পাথরে হড়কে যাচ্ছে হাত বাঁকা হয়ে উপড়ে আসছে নখগুলো।

তারপর হঠাৎ সিঙ্ক-হোলের ওপর শেষ ফোকরটার নাগাল পেয়ে গেল রানা। দু'হাতে ফোকরের কিনারা ধরে প্রাণপণে চেষ্টা করল পা দুটোকে ফাটল থেকে বের করে আনতে। রিজার্ভ শক্তিও ফুরিয়ে এসেছে, দুই হাতের পেশী কাঁপছে থরথর করে, মাংসের নিচে থেকে ফুলে উঠল ঘাড়ের রগগুলো, মনে হলো মাথাটা বিস্ফোরিত হবে। একেবারে লাভ হলো না তা নয়, সিঙ্ক-হোলের ভেতর শরীরের ঢুকে যাওয়াটা বন্ধ হয়েছে।

ফুসফুসের সব বাতাস খরচ হয়ে গেছে। বড়জোর আর একবার চেষ্টা করতে পারবে রানা। গাঢ় মেঘের মত আকৃতি দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে, নেতিয়ে পড়ে বিশ্রাম নেয়ার ইচ্ছেটা অদম্য হয়ে উঠল। কোত্থেকে এত শক্তি পেল বলতে পারবে না, পা দুটোকে টানছে তো টানছেই। মাথার ভেতরটা অন্ধকার ছিল, হঠাৎ বিভিন্ন রঙের বিস্ফোরণ ঘটল সেখানে, চোখ দুটোকে ধাঁধিয়ে দিল। তবু ঢিল দেয়নি রানা, টেনে যাচ্ছে। অনুভব করল পা দুটো বেরিয়ে আসছে সিঙ্ক-হোল থেকে, স্রোতের টান দুর্বল হয়ে পড়ছে। শক্তির উৎস জানা নেই, নিজেকে পুরোপুরি মুক্ত করার জন্যে আরও জোর খাটাল ও।

হঠাৎ করেই ছাড়া পেল রানা, সারফেসের দিকে উঠে আসছে। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে, আবার অন্ধকার হয়ে গেল মাথার ভেতরটা, কানে গর্জন করছে জলপ্রপাতের মত বিকট শব্দ। নিঃশেষ হয়ে গেছে ও। জানে-না কোথায় রয়েছে, সারফেসে পৌঁছুতে হলে আর কতটুকু উঠতে হবে। একবার মনে হলো উঠছে না, ডুবে যাচ্ছে। শেষ হয়ে গেছে ও।

পানির ওপর ওঠার পরও বুঝতে পারেনি যে উঠেছে। এত শক্তি নেই যে পানি থেকে মুখ তুলে শ্বাস নেবে। পানিতে মুখ দিয়ে যেন একটা লাশ ভাসছে। তারপর অনুভব করল মাথার চুল ধরে টান দিল নিমা, ঠাণ্ডা তাজা বাতাসের স্পর্শ পেল মুখে।

'রানা! শ্বাস নিন!' চিৎকার করছে নিমা। 'শ্বাস নিন, রানা, শ্বাস নিন!'

মুখ খুলে পানি ছাড়ল রানা, তারপর বিষম খেলো।

'আপনি বেঁচে আছেন! ওহ্, থ্যাঙ্ক গড! এত দেরি করছেন দেখে ভাবলাম আপনাকে বুঝি হারালাম!' কেঁদে ফেলল নিমা।

খাদ থেকে প্রথমে রানাকে তোলা হলো, তারপর নিমাকে। রানার নির্দেশে গ্যানট্রি খুলে ঝোপের ভেতর লুকিয়ে রাখা হলো, হেলিকপ্টার থেকে জ্যাক রাফেল যাতে দেখতে না পায়। কাঁটাঝোপের ছায়ায় শুয়ে এক ঘণ্টা বিশ্রাম নিল রানা, প্রতিটি মুহূর্ত ওর সেবায় ব্যস্ত থাকল নিমা। মাথার ব্যথাটা কোনমতে কমছে না, নিঃশ্বাস ফেলার সময় বুকেও ব্যথা অনুভব করছে ও। এক সময় ওকে ধরে দাঁড় করাল নিমা। ক্যাম্পে ফেরার সময় আড়ষ্ট একজন কুড়োর মত লাগল রানাকে, সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে ব্যথা। ক্যাম্পে ফিরে ওকে ওর কুঁড়েতে শুইয়ে দিল নিমা, শোয়ার টাঙাল, আগুনের মত গরম এক মগ চায়ের সঙ্গে দুটো অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট খাওয়াল।

আরও এক মগ চা চাইল রানা। সেটা খালি হতে নিমা জিজ্ঞেস করল, 'এখন

একটু ভাল লাগছে?'

'বোধহয় বাঁচব,' বলে হাসল রানা।

'মুখের রঙ ফিরে এসেছে,' বলল নিমা, চোখে-মুখে তৃপ্তির ছাপ। 'যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন না!'

'আপনার মনোযোগ কাড়ার আর কোন উপায় ছিল?'

'এখন যখন জানেন যে বাঁচবেন, বলে ফেলুন কি ঘটেছিল।'

সিঙ্ক-হোলটার বর্ণনা দিল রানা। ও থামতে নিমা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল, তারপর বলল, 'সারফেস থেকে পঞ্চাশ ফুট নিচে ফোকর তৈরি করেছে টাইটা?' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কিভাবে, রানা?'

'চার হাজার বছর আগে ওয়াটারলেভেল আরও হয়তো নিচে ছিল। হয়তো খরায় শুকিয়ে গিয়েছিল নদীর তলা।'

'কিন্তু তাহলে মাচা দরকার হবে কেন? তাছাড়া, শুকনো নদী খাদের অন্য যে-কোন জায়গার মতই, তাই না? না, দুর্গম বলেই এই স্পটটা বেছে নিয়েছিল টাইটা। অন্তত এটা অন্যতম কারণ।'

'আপনার সঙ্গে আমি একমত।'

'তাহলে সারফেসের নিচে ফোকরগুলো টাইটা তৈরি করল কিভাবে?' হাসল নিমা। 'জানি একই প্রশ্ন অযথা রিপিট করছি। ঠিক আছে, এ প্রসঙ্গ আপাতত থাক। এবার সিঙ্ক-হোলটার কথা বলুন। সাইজটা কি?'

মাথা নাড়ল রানা। 'অন্ধকারে মাপার সুযোগ হয়নি। দুই কি তিন ফুট হবে।'

'দু'সারি ফোকরের ঠিক মাঝখানে ফাটলটা?'

'না, একটু একপাশে। তবে নদীর একেবারে তলায়। চৌকো বলে মনে হয়েছে, তবে তা না-ও হতে পারে। জান বাঁচাতে ব্যস্ত ছিলাম, অতশত খেয়াল করিনি।'

'মানুষের তৈরি?' বিড়বিড় করল নিমা, দরজার দিকে এগোল। 'নোট আর ফটোগ্রাফগুলো নিয়ে আসি।'

ফিরে এসে বিছানার পাশে মেঝেতে সুখাসনে বসল নিমা, কাগজ-পত্র ছড়িয়ে রাখল নিজের সামনে। মশারি থেকে মাথা বের করে ওর দিকে তাকাল রানা।

'শিলালিপির বসন্ত পর্বের বাকি অংশটুকু ডিসাইফার করেছি আমি।' নোটবুকটা খুলে নিজের হাতের লেখাটুকু দেখাল নিমা। 'এগুলো প্রাথমিক নোট, এখানে সেখানে কিছু প্রশ্ন চিহ্ন আছে। কোথাও অনুবাদ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারিনি, কোথাও হয়তো টাইটা নতুন সংকেত ব্যবহার করেছে। এগুলো নিয়ে পরে মাথা ঘামাব। সবুজ কালিতে লেখা এগুলো উদ্ধৃতি, বুক অভ দ্য ডেড থেকে নেয়া। খানিকটা পড়ি। "বিশ্বকে আঁকা হয়েছে বৃত্তাকারে, সূর্য দেবতার চাকতি, রা। মানুষের জীবন একটা বৃত্ত, শুরু জরায়ুতে, শেষ সমাধিতে"। আরও পড়া যায়, পড়ছি না। হুবুদ কালিতে এই যে লেখাগুলো দেখছেন, এগুলো বুক অভ দা ডেড বা অন্য কোন উৎস থেকে এসেছে বলে মনে হয়নি আমার। এগুলো টাইটারই লেখা বলে আমার ধারণা। বিশেষ করে এই প্যারাগ্রাফটার ওপর আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। পড়ছি—"দেবীর কন্যা গর্ভবতী হলো। সে

গর্ভবতী হলো এমন একজনের দ্বারা যার কোন শুক্র নেই। সে তার যমজ বোনকেও নিজের ভেতর ধারণ করছে। তার নিজের জরায়ুতে চিরকালের জন্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে ভ্রূণটা। তার যমজ কোনদিনই জন্ম নেবে না। রা-র আলো কোনদিনই তার দেখা হবে না। চিরকাল অন্ধকারেই কাটাতে হবে তাকে। বোনের জরায়ুতে বোন, তার বর তাকে চিরকালীন বৈবাহিক সূত্রে বাঁধতে চাইল। জন্ম না হওয়া যমজ বোন হলো দেবতার কনে, যিনি কিনা একজন মানুষ। ওদের নিয়তি পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ওরা অনন্তকাল বাঁচবে। ওদের বিনাশ নেই"।'

নোট বুক থেকে মুখ তুলল নিমা। 'আমরা আগেই একমত হয়েছি, দেবীর কন্যা মানে হলো ডানডেরা নদী। গড বা দেবতা এক সময় মানুষ ছিলেন, তারমানে পরে তিনি ফারাও হন। দেবতা হিসেবে বরণ করে একমাত্র মামোসকেই মিশরের সিংহাসনে তোলা হয়। তার আগে তিনি একজন মানুষ ছিলেন।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'শুক্রহীন ব্যক্তি টাইটা নিজেই, বোঝা যায়। সে যে খোজা পুরুষ, এ-কথা বারবার বলেছে। তবে রহস্যময় যমজ বোন সম্পর্কে কি ভাবছেন আপনি?'

'নদীর যমজ স্বভাবতই একটা শাখা হবে, কিংবা স্রোতের আরেকটা ধারা, তাই না?'

'আপনি বলতে চাইছেন সিঙ্ক-হোল ডানডেরার যমজ বোন। খাদের তলায় ওটা কোনদিনই রা-র আলো দেখবে না। টাইটা, র শুক্র নেই, পিতৃত্ব দাবি করছে, তারমানে বলতে চাইছে সে-ই আসলে আর্কিটেক্ট।'

'ঠিক তাই। আর নদীর যমজ বোনের সঙ্গে ফারাও মামোসের বিয়ে দিয়েছে, যে বিয়ে অনন্তকাল স্থায়ী হবে। সব মিলিয়ে দেখার পর আমি উপসংহারে পৌঁচেছি, ওই সিঙ্ক-হোলের ভেতরটা দেখার সুযোগ না পেলে ফারাও মামোসের সমাধির লোকেশন কোনদিনই আমরা খুঁজে পাব না।'

'কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব বলে আপনার ধারণা?'

কাঁধ ঝাঁকাল নিমা। 'আমি এঞ্জিনিয়ার নই, রানা। কিভাবে কি করবেন, আপনার ওপর ছেড়ে দিলাম। আমি শুধু জানি, টাইটা ওই সিঙ্ক-হোলে কাজ করেছে। সে পারলে, চার হাজার বছর পর আজ আপনারও পারা উচিত।'

'কিন্তু টাইটার সঙ্গে কি আমার তুলনা চলে? টাইটা ছিল একটা প্রতিভা। আমি পণ্ডিত, এ-কথা বারবার বলছে সে। আর আমি? আমি তো সামান্য একজন...'

'আপনি যা-ই হোন, আমি জানি আমাকে আপনি হতাশ করবেন না!' মুচকি হেসে বলল নিমা।

তিন

উত্তাত আর রুবি ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাবার পর গোপনীয়তা বজায় রাখার আর

কোন প্রয়োজন থাকল না, এখন আর নিমার কুঁড়েতে চুপিচুপি ঢুকে ফিসফিস করে কথা বলতে হয় না রানাকে। যে কুঁড়েতে বসে খাওয়াদাওয়া সারত ওরা সেটাকে বানানো হলো ওদের নতুন হেডকোয়ার্টার। ক্যাম্প স্টাফকে দিয়ে বড় একটা টেবিল তৈরি করাল রানা, তাতে জড়ো করা হলো স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফ সহ অন্যান্য জিনিস-পত্র, ইতিমধ্যে ওরা যা সংগ্রহ করতে পেরেছে। কিচেন থেকে নিয়মিত চা যোগান দিয়ে গেল শেফ, কাগজ-পত্রের ওপর হুমড়ি খেয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিল ওরা।

একটা ব্যাপারে একমত হলো দু'জনেই, সিঙ্ক-হোলটা মানুষের অর্থাৎ টাইটার তৈরি কিনা বুঝতে হলে উপযুক্ত ইকুইপমেন্ট নিয়ে আবার নামতে হবে ওখানে। তারমানে স্কুবা দরকার হবে। নিমা জানাল, চাচা হাসলানের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে লোহিত সাগরে অ্যাকুয়ালাঙ্গ ব্যবহার করেছে সে, তবে তাকে এক্সপার্ট বলা যাবে না।

শুধু ইকুইপমেন্টই নয়, এক্সপার্টদের সাহায্যও দরকার হবে। অপারেশনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করার জন্যে এ-সব নিয়ে ওদেরকে এলাকায় আবার ফিরে আসতে হবে যথাসম্ভব দ্রুত, বর্ষা মরশুম শুরু হয়ে যাবার আগেই।

ঠিক হলো সিঙ্ক-হোলটা সম্পর্কে আরও খানিক পরিষ্কার ধারণা পাবার পর রওনা হবে ওরা, ফিরে এসে যাতে সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করা যায়।

সিঙ্ক-হোল প্রসঙ্গে নিজের ধারণার কথা বলল রানা, 'যা ঢোকে তা বেরিয়েও আসে, যেমন ওপরে কিছু উঠলে সেটা নেমে আসতেও বাধ্য। ফাটলটার ভেতর এত জোরে পানি ঢুকছে, নিশ্চয়ই কোথাও দিয়ে বেরুচ্ছেও সেই পানি, তাই না?'

'বলে যান।'

'একটা ব্যাপার পরিষ্কার। নদীর তলা থেকে ওই সিঙ্ক-হোলে ঢোকা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। পানির প্রেশার ওখানে ভয়ঙ্কর। তবে আমরা যদি আউটলেটটা খুঁজে পাই, সেদিক থেকে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'একটা সম্ভাবনা বটে।' চেহারা দেখে মনে হলো রানার বক্তব্য প্রভাবিত করেছে নিমাকে। একটা স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফ টেনে নিল ও। মঠটা চিহ্নিত করে ফটোগ্রাফের ওপর একটা বৃত্ত এঁকেছে রানা। গহ্বরের ভেতর নদীর কোর্সও চিহ্নিত করেছে, যদিও খাদটা এত সরু আর ঘন ঝোপে এমনভাবে ঢাকা যে ছোট স্কেলের ছবিতে স্পষ্ট দেখা যায় না, হাই-পাওয়ারড ম্যাগনিফাইং লেন্স ব্যবহার করা সত্ত্বেও। 'এই পয়েন্টে নদীটা গহ্বরে ঢুকছে,' আঙুল দিয়ে দেখাল নিমা। 'আর এটা হলো সাইড ভ্যালি, যেটা বেয়ে ট্রেইল ঘুরপথে এগিয়েছে। ঠিক আছে?'

'তা আছে,' বলল রানা, 'কিন্তু আপনি আসলে বলতে চাইছেন কি?'

'এখানে আসার পথে আমরা মন্তব্য করেছিলাম এই উপত্যকা সম্ভবত এক সময় ডানভেরা নদীর আদি কোর্স ছিল, পরে নদীটা গহ্বরের ভেতর আলাদা একটা তলা তৈরি করে নেয়।'

'হ্যাঁ, মনে আছে।'

'এই পয়েন্টের জমিন নীলনদের দিকে খুব বেশি ঢালু, তাই না? এবার বলুন, আপনার কি মনে আছে, শুকনো উপত্যকা বেয়ে নামার সময় আরেকটা ছোট

প্রবাহ দেখেছিলাম আমরা? মনে হয়েছিল প্রবাহটা উপত্যকার পুবদিকের কোথাও থেকে বেরিয়েছে?'

'কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি,' বলল রানা। 'আপনার ধারণা সিঙ্ক-হোল দিয়ে ঢুকে ওই পথে বেরিয়েছে স্রোতটা।' দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'সরেজমিনে তদন্ত করে দেখতে অসুবিধে কি?'

ক্যামেরা ব্যাগ আর হালকা ডে-প্যাক নেয়ার জন্যে নিজের কুঁড়েতে চলে গেল রানা, ফিরে এসে দেখল নিমা যাবার জন্যে তৈরি হয়েছে, তবে ইতিমধ্যে ওর একজন সঙ্গী জুটেছে।

পথে ওদের সামনে থাকল বাটি, এগোচ্ছে নাচতে নাচতে, সরু কাঠির মত পায়ের চারপাশে আলখেল্লার ঝুল ফুলে ফুলে উঠছে। নৃত্যের সঙ্গে গীতও গাইছে ছেলেটা। অ্যামহারিক ভাষায় তার তেমন দখল নেই, তবে যীশু আর সেইন্টদের নিয়ে যত গান আছে তার প্রায় সবই মুখস্থ। কয়েক মিনিট পরপর পিছন ফিরে তাকাচ্ছে সে, দেখে নিচ্ছে নিমা ঠিকমত আসছে কিনা। আগুনের মত গরম রোদের ভেতর উপত্যকার ঢাল বেয়ে ওঠা অত্যন্ত ক্লান্তিকর, ওরা দু'জন ঘেমে একেবারে নেয়ে উঠল। কিন্তু বাটিকে যেন পরিশ্রম বা রোদ স্পর্শই করছে না, আগের মতই হাসি-খুশি আর অক্লান্ত লাগছে তাকে।

ঝর্ণা বা প্রবাহটা উপত্যকার যেখানে বেরিয়েছে সেখানে পৌঁছে কয়েকটা অ্যাকেইশা গাছের ছায়ায় বসে পড়ল ওরা। বিশ্রাম নেয়ার সময় চোখে বিনকিউলার তুলে উপত্যকার পাশটা পরীক্ষা করছে রানা। 'ঘন ঝোপে কিছুই দেখা যাচ্ছে না,' খানিক পর মন্তব্য করল। 'দুঃখিত, পায়ে হেঁটেই উৎসের সন্ধান করতে হবে।'

আবার হাঁটা শুরু হলো। উপত্যকার পাশ বেয়ে উঠে যাচ্ছে, মাথার ওপর সূর্য। জলপ্রবাহের কিনারা ধরে হাঁটছে ওরা। কয়েক জায়গায় জমা হয়েছে ঝর্ণার পানি, সেখান থেকে খুদে জলপ্রপাত লাফ দিয়েছে নিচের দিকে। পাড়ে ঘন ঝোপ, শিকড় যেখানে পানির নাগাল পেয়েছে সেখানে ওগুলো তাজা আর গাঢ় সবুজ। পানির ওপর কালো আর হলুদ প্রজাপতি মেঘের মত উড়ছে। সবুজ শ্যাওলা মোড়া পাথরে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে সাদা-কালো একটা খঞ্জনা। ঢালের অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে ছোট একটা জলাশয়ের পাশে বিশ্রাম নিতে বসল ওরা। বিরক্ত করছে দেখে হাতের হ্যাট দিয়ে একটা ফড়িংকে বাড়ি মারল রানা, ছিটকে সেটা ঝর্ণার পানিতে পড়ল। দুর্বল ভঙ্গিতে পা ছুঁড়ছে ওটা, স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে নিচের দিকে, এই সময় পানির ভেতর থেকে গাঢ় একটা ছায়া মাথাচাড়া দিল। আলোড়ন উঠল পানিতে, আয়নার মত রূপালি পেট ঝিক করে উঠল, অদৃশ্য হয়ে গেল ফড়িংটা।

'মাছ! কম করেও দশ পাউন্ড! ইস, রডটা আনিনি!'

ঝর্ণার পাশে রানার কাছাকাছি বসে আছে বাটি। হঠাৎ একটা হাত তুলে লম্বা করল সে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রজাপতি উড়ে এসে বসল তার আঙুলে। হলুদ আর কালো ভেলভেটের মত ডানা বারবার মেলছে আর গুটাচ্ছে। রানা আর নিমা তাকিয়ে আছে অবাক চোখে, কারণ ওদের মনে হলো বাটি মনে মনে ডাক

দেয়াতেই তার আঙুলে এসে বসেছে ওটা। খিকখিক করে হেসে উঠে হাতটা নিমার দিকে সরিয়ে আনল বাটি। দেখাদেখি নিমাও ওর হাত তুলে লম্বা করল। এবং কি আশ্চর্য, প্রজাপতিটা উড়ে চলে এল ওর আঙুলে।

খিলখিল করে হেসে উঠল নিমা। 'ধন্যবাদ, বাটি, এত সুন্দর একটা উপহার দেয়ার জন্যে,' হাসি থামতে বলল ও। হালকা একটু ফুঁ দিয়ে প্রজাপতিটাকে উড়িয়ে দিল, রানার দিকে ফিরে ইংরেজিতে বলল, 'বুনো পশু-পাখিদের সঙ্গে ওর খুব ঘনিষ্ঠতা, লক্ষ করেছেন? ব্যাপারটা অদ্ভুত না?'

'সন্ন্যাসী আর পুরোহিতরা বিনা বাধায় ওকে ঘুরে বেড়াতে দেয়, পশু-পাখিরা সম্ভবত জেনে ফেলেছে ওর দ্বারা তাদের কোন ক্ষতি হবে না।'

যেন ওদের কথা বুঝতে পেরেই হেসে উঠে আবার হাতটা লম্বা করল বাটি। এবারও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রজাপতি এসে বসল তার আঙুলে।

'অদ্ভুত!' বলল নিমা। 'ছেলেটাকে সত্যি আমি ভালবাসি।'

'সিরিয়াসলি ভাবছি, কেন আমি বাটি হয়ে জন্মাইনি!' কৌতুক করল রানা।

খিলখিল করে হেসে উঠে নিমা বলল, 'বাটি হয়ে জন্মালেও আপনি খুশি হতেন না কারণ আমি জানি আপনি আমার ছোট ভাই হতে চান না।'

আরও পঞ্চাশ ফুট ওপরে ওঠার পর ঝর্ণার উৎসটা দেখতে পেল ওরা। লাল স্যান্ডস্টোনের নিচু একটা পাঁচিল দেখা গেল, পাঁচিলের গায়ে একটা গুহামুখ, সেটার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে ঝর্ণার পানি। গুহামুখে ঘন ঝোপ, ভেতরটা দেখা যায় না। হাঁটু গেড়ে ঝোপ সরাল রানা, নিচু ফাঁকের ভেতর তাকাতে চেষ্টা করল। 'তেমন কিছু দেখার নেই। ভেতরটা অন্ধকার,' বলল ও। 'তবে অনেক লম্বা গুহাটা।'

'ওটার তুলনায় আপনি অনেক বড় হয়ে যাচ্ছেন,' বলল নিমা। 'আমাকে ঢুকতে দিন।'

'ভেতরে কেউটে থাকতে পারে,' সাবধান করল রানা। 'প্রচুর ব্যাঙ দেখতে পাচ্ছি।'

জুতো খুলে ঝর্ণার পানিতে নেমে পড়ল নিমা, রানার কথা যেন শুনতে পায়নি। স্রোত ঠেলে এগোতে কষ্ট হচ্ছে ওর, তবে ডুবেছে মাত্র উরুর অর্ধেকটা। গুহাটা নিচু, ভেতরে ঢোকার সময় ঝুঁকে শরীরটাকে প্রায় অর্ধেক করে নিতে হলো। ভেতরে ঢোকার পর বলল, 'সামনের দিকে আরও নিচু হয়ে এসেছে ছাদ।'

'বি কেয়ারফুল, ডিয়ার গার্ল। কোন ঝুঁকি নেবেন না।'

'আমি আপনার ডিয়ার নই। আমি গার্লও নই।'

'তাহলে ইয়ং লেডি বলি?'

'না, কেন! আমার নাম নিমা।' কিছুক্ষণ আর কোন কথা হলো না। তারপর গুহার ভেতর থেকে নিমা বলল, 'আর এগোতে পারছি না। সরু হয়ে গুহাটা একটা শ্যাফটে নেমেছে বলে মনে হচ্ছে।'

'শ্যাফট?'

'মানে প্রায় চৌকো একটা গর্ত আর কি।'

'কৃত্রিম? মানুষের তৈরি?'

'বলা সম্ভব নয়। তীব্রবেগে পানি বেরুচ্ছে। পাথরে কোন টুলসের দাগ দেখছি না। খোঁড়াখুঁড়ির কোন চিহ্নও নেই। প্রচুর শ্যাওলা।'

'পানির তোড় না থাকলে ওই শ্যাফট গলে কোন মানুষ ঢুকতে পারবে?'

'বামুন হলে পারবে।'

'কিংবা কোন বাচ্চা ছেলে?'

'হ্যাঁ, বাচ্চা ছেলে হলে পারবে। কিন্তু ওখানে কে একটা বাচ্চাকে নামাবে?'

'টাইটার যুগে শিশুশ্রম ব্যবহার করা হত,' বলল রানা। 'টাইটাও হয়তো ব্যবহার করেছে।'

গুহা থেকে বেরিয়ে এসে পাড়ে উঠল নিমা। 'অসম্ভব নয়।'

'এদিক থেকে টানেলটা পরীক্ষা করার কোন উপায় নেই?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'অসম্ভব,' জোর দিয়ে বলল নিমা। 'পানির বেগ ওখানে প্রবল। শ্যাফটের ভেতর হাত [illegible]তে চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার শক্তিতে কুলোয়নি।'

ব্যাগ হাতড়ে কালো একটা অ্যানাডাইজড ইন্সট্রুমেন্ট বের করল রানা। 'অ্যানারয়েড ব্যারোমিটার। প্রত্যেক নেভিগেটরের কাছে একটা থাকা উচিত।' কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে দেখে রিডিং নোট করল ও।

'খুলে বলুন।'

'আমি জানতে চাই সিঙ্ক-হোলের মুখ যে লেভেলে রয়েছে, এই ঝর্ণা তার চেয়ে নিচে কিনা; তা যদি না হয়, সম্ভাবনার তালিকা থেকে এটাকে আমরা বাদ দিতে পারি।'

'এখন তাহলে আমরা সিঙ্ক-হোলের লেভেল মাপতে যাব?'

'বলেছি না, মেয়ের বুদ্ধি আছে!'

ঠোঁট টিপে রানাকে ভেঙচাল নিমা।

ওরা কোথায় যাচ্ছে জানার পর নতুন একটা পথ দেখাল বাটি, ঝর্ণার উৎস থেকে টাইটার পুলের ওপর পাহাড়-প্রাচীরের মাথায় পৌঁছুতে দু'ঘণ্টার বেশি লাগল না। বিশ্রাম নেয়ার সময় নিমা মন্তব্য করল, 'বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় তো, গেম ট্রেইলের সবগুলো ওর চেনা। পাইড হিসেবে দারুণ।'

'উত্তাভের চেয়ে ভাল,' বলল রানা। ব্যারোমিটার বের করে আরেকটা রিডিং নিল ও।

'চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আপনি খুব খুশি।'

'খুশি হবার সঙ্গত কারণ আছে,' বলল রানা। 'নদীর সারফেস থেকে খাদের এই পাটিলের মাথা একশো আশি ফুট। সারফেস থেকে সিঙ্ক-হোল আরও পঞ্চাশ ফুট। হিসাবে বলছে, রিজের উল্টোদিকে আপনার ঝর্ণার উৎস সিঙ্ক-হোলের চেয়ে একশো ফুটেরও বেশি নিচে।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ প্রচুর সম্ভাবনা আছে স্রোতটা এক ও অভিন্ন হবার। ইনফ্লো এখানে, টাইটার পুলের তলায়; আর আউটফ্লো গুহার ভেতর।'

'কিন্তু কাজটা করল কিভাবে টাইটা?' হতভম্ব দেখাল নিমাকে। 'কিভাবে নামল পুলের তলায়?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা: 'এ-সব কাজ করার নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি আছে। পানির তলায় বহুকাল আগে থেকে কাজ করছে মানুষ। পানির নিচে ব্রিজের পিলার তৈরি করে না? কিংবা বাঁধের ভিত? ভেবে দেখুন না, জলের প্রবাহ মাপার জন্যে টাইটা নীলনদের লেভেলের নিচে শ্যাফট তৈরি করেনি? সে তার হাইড্রোগ্রাফ-এর বর্ণনা দিয়েছে রিভার গড-এ, মনে পড়ে? প্রতিষ্ঠিত টেকনিক হলো একটা কফার ড্যাম তৈরি করা...' হঠাৎ থেমে গেল ও। 'আরে, একটা ড্যাম! টাইটা, বুড়ো ভাম, নদীতে বাঁধ দেয়নি তো?'

'কিন্তু তা কি সম্ভব?'

'আমি বিশ্বাস করতে শুরু করেছি, টাইটার পক্ষে সবই সম্ভব। তার হাতে লোকবল ছিল প্রচুর। আসওয়ানের কাছে নীলনদে সে যদি হাইড্রোগ্রাফ তৈরি করতে পারে, তারমানে ধরে নিতে হবে হাইড্রোডাইনামিক্স প্রিন্সিপল্ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ছিল তার। হ্যাঁ, অবশ্যই সম্ভব!'

'আমরা প্রমাণ করব কিভাবে?'

'ডানডেরা নদীকে বাঁধা বিশাল একটা কাজ। কিছু না কিছু প্রমাণ আজও রয়ে গেছে, থাকতে বাধ্য।'

'সেই বাঁধ টাইটা কোথায় তৈরি করতে পারে?' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে নিমা। 'আপনি হলে কোন জায়গাটা বেছে নিতেন?'

'একটা জায়গার কথা বলতে পারি আমি,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল রানা। 'ট্রেইল যেখানে নদীর কিনারা ছেড়ে ঘুরপথে উপত্যকা ধরে নেমেছে, আর নদীটা যেখানে গহ্বরে পড়েছে।' দু'জনেই ওরা একযোগে মাথা ঘুরিয়ে উজানের দিকে তাকাল।

'তাহলে আমরা অপেক্ষা করছি কেন?' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল নিমা। 'চলুন দেখে আসি!'

উত্তেজনাটা সংক্রামক, হাসির ফোয়ারা ছেড়ে নাচতে নাচতে কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়ে ট্রেইল ধরল বাটি, তারপর উপত্যকা বেয়ে উঠে এল ট্রেইল যেখানে নদীর পাশে ফিরে এসেছে। আবার যখন জলপ্রপাতের ওপরে এসে দাঁড়াল ওরা, সূর্য তখন অনেকটাই নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। ডানডেরা এখানে লাফ দিয়ে পড়েছে গহ্বরের মুখে, তারপর সর্বশেষ দৌড় শুরু করেছে নীলনদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে। 'টাইটা যদি এখানে বাঁধ দিয়ে থাকে—' খাদের মুখের দিকটায় হাত তুলল রানা, '—সাইড ভ্যালির দিকে নদীর দিক বদল সম্ভব।'

'আমারও মনে হচ্ছে সম্ভব!' হেসে উঠল নিমা। কিছু না বুঝে ওদের সঙ্গে বাটিও হাসছে।

হাত তুলে চোখে ছায়া ফেলল রানা, মুখ তুলে জলপ্রপাতের দু'দিকে ক্লাফ দুটোর দিকে তাকাল। ক্লাফ দুটো লাইমস্টোনের তোরণ বা গেট তৈরি করেছে, মাঝখানে গর্জন করছে নদী ঠোঁট থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ার সময়। 'ওদিকটায় উঠতে চাই আমি, এলাকার লেআউট বুঝতে হবে। আপনি উঠবেন?'

'বাধা দিয়ে দেখতে পারেন,' চ্যালেঞ্জ করল নিমা, ওঠার সময় সে-ই পথ দেখাল। কঠিন চড়াই, কোথাও কোথাও হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হলো। অনেক জায়গায় আলগা বা ঝুরঝুরে হয়ে আছে লাইমস্টোন, বিপদ ঘটার সমূহ আশঙ্কা। তোরণটার পুব শাখার চূড়ায় উঠতে ঘেমে গোসল হয়ে গেল ওরা। তবে এত কষ্টের পুরস্কারও জুটল। নিচের দুর্গম এলাকা পুরোপুরি উন্মোচিত হয়েছে ওদের সামনে।

সরাসরি উত্তরে লম্বা সরু শৈলশিরা ও মালভূমি খাড়া পাঁচিলের মত মাথাচাড়া দিয়ে আছে, যেন সচ্ছিদ্র দুর্গ-প্রাকার, অসংখ্য ভাঁজ আর খাঁজ বিশিষ্ট। আরও দূরে ও ওপর দিকে অস্পষ্ট পাহাড়শ্রেণী, চোক পর্বতমালার চূড়া, কাছাকাছি উজ্জ্বল নীল আফ্রিকান আকাশের গায়ে ম্লান নীল পাখির পালকের মত।

'প্রকৃতির বিধ্বস্ত রূপ,' নিজের চারপাশে তাকিয়ে ফিসফিস করল নিমা। 'টাইটা এই জায়গা কেন বেছে নিয়েছিল, বোঝা যায়। অনুপ্রবেশ এখানে প্রায় অসম্ভব।'

'ছবিটা এখন পরিষ্কার,' বলল রানা, হাত লম্বা করে নিচের উপত্যকাটা দেখাল। 'উপত্যকার বিভক্তিরেখা স্পষ্ট। জমিনের স্বাভাবিক পতনও দেখতে পাচ্ছি। ওদিকে, খাদের ওপার থেকে আমাদের নিচের পয়েন্ট পর্যন্ত সবচেয়ে সরু। সরু গলা বলতে পারি, নদী সংকুচিত হয়ে ওটা দিয়ে বেরিয়েছে—বাঁধ তৈরির জন্যে আদর্শ সাইট।' শরীরটা মুচড়ে বাম দিকটা দেখাল নিমাকে। 'নদীর পানি উপত্যকায় ছড়িয়ে দেয়া কঠিন কাজ ছিল না। গহ্বরের ভেতর নদী শুকিয়ে যাবার পর সে ওখানে কি করেছে আমরা জানি না। তারপর বাঁধের দেয়াল ভেঙে ফেলে সে, সেটা আরও সহজ কাজ ছিল। ভেঙে ফেলার পর নদী আবার তার স্বাভাবিক কোর্স ফিরে পায়।'

ওদের দু'জনের মুখভাব গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করছে বাটি, যে যখন কথা বলে তখন তার দিকে তাকায়। কিছুই বুঝছে না, তবু নিমার প্রতিটি হাবভাব ও আচরণ তার ওপর বিরাট প্রভাব ফেলছে। নিমা মাথা ঝাঁকালে সে-ও ঝাঁকায়। নিমা ভুরু কোঁচকালে সে-ও তাই করে। আর নিমা যখন হাসে, খিকখিক করে সে-ও হেসে ওঠে।

'নদীটা ছোট নয়,' বলল নিমা। 'নিশ্চয়ই মাটি দিয়ে বাঁধটা বানায়নি?'

মাথা নাড়ল রানা। 'মাটি দিয়ে এই নদীকে বশ মানানো সম্ভব নয়। রক প্যাব বা পাথরের ফলক দিয়ে সম্ভব। পরে বাঁধটা ভেঙে ফেললেও কিছু কিছু আলামত থাকার কথা।'

'তাহলে খোঁজ শুরু করতে হয়,' বলল নিমা। 'প্রথমে খাদের সরু গলায়। তারপর ভাটির দিকে এগোব।'

ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ওরা, নিমার জন্যে সহজ পথ অনুসরণ করছে বাটি। নিমার হাঁটার গতি কমলে বা বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থামলে হাতছানি দিচ্ছে সে। উপত্যকার গলায় বেরিয়ে এল ওরা, দাঁড়াল নদীর পাথুরে পাড়ে, নিজেদের চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে। 'বাঁধের পাঁচিল কত উঁচু ছিল?' জিজ্ঞেস করল নিমা।

'খুব বেশি উঁচু হওয়ার কথা নয়।' পাঁচিলের পাশ ধরে খানিকটা ওপরে উঠল

রানা, ওখানে উবু হয়ে বসে সামনে-পিছনে মাথা ঘোরাল, প্রথমে দেখে নিল উপত্যকার নিচের দিকের দৈর্ঘ্য, তারপর দেখল গহ্বরের মুখে পতনশীল জলপ্রপাতের ঠোঁট। তিনবার স্থান বদল করল রানা, প্রতিবার ঢালের আরেকটু ওপর উঠে গেল। যত উঠল ততই খাড়া হচ্ছে ঢাল। শেষে দেখা গেল ঢালের গায়ে অনেক কষ্টে ঝুলে আছে ও, তবে চেহারা দেখে মনে হলো সন্তুষ্ট। ওখান থেকেই চিৎকার করল নিমার উদ্দেশে, 'আমার ধারণা এই পর্যন্ত উঁচু ছিল বাঁধটা। ধরুন, পনেরো ফুট।'

নিমা এখনও নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে, ওখান থেকে এবার উল্টোদিকের পাড়ে তাকাল, পাড় থেকে খাড়া উঠে যাওয়া লাইমস্টোন প্রাচীরের দূরত্ব আন্দাজ করছে। 'এখান থেকে খুব বেশি হলে একশো ফুট,' গলা চড়িয়ে বলল।

'কঠিন কাজ, তবে অসম্ভব নয়,' বলল রানা।

'কাজের কোন চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল নিমা। 'বাঁধের পাঁচিল পাহাড়ের গায়ে ঠেকাতে হয়েছিল টাইটাকে।'

একই লেভেলে থেকে জায়গা বদল করল রানা। এক সময় সরাসরি জলপ্রপাতের ওপর চলে এল, তারপর আর সামনে এগোবার উপায় দেখছে না। নিচে, নিমা আর বাটির পাশে নেমে এসে বলল, 'প্রায় চার হাজার বছর আগের ঘটনা। কোন চিহ্ন না থাকাই স্বাভাবিক। রক ব্লক বা পাথরের ফলক পাওয়া যায় কিনা দেখতে হবে, বাঁধ ভেঙে ফেলার পর তীব্র স্রোতে ভেসে গেলেও কত দূর আর যাবে।'

উপত্যকা বেয়ে নামতে শুরু করল ওরা। খানিক দূর নামার পর একটা পাথরের খণ্ড দেখতে পেল নিমা, আশপাশের অন্যান্য পাথরের সঙ্গে যেন বেমানান। পুরানো আমলের কেবিন ট্রাংকের মত আকার। শ্যাওলা আর লতাপাতায় অর্ধেকটাই ঢাকা, তবে বেরিয়ে থাকা অংশে ডান দিকে মোচড় খাওয়া একটা কোণ স্পষ্ট। রানাকে ডেকে দেখাল ও।

প্যাবটার গায়ে হাত বুলাল রানা। 'সম্ভব। তবে নিশ্চিত হবার জন্যে বাটালির দাগ পেতে হবে, রাজমিস্ত্রী যেখানে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করেছিল। আপনি জানেন, প্রথমে পাথরের গায়ে বাটালি দিয়ে গর্ত করা হত, তারপর গজাল ঢুকিয়ে চাপ দেয়া হত, যতক্ষণ না ফেটে যায়।'

আরও আধ কিলোমিটার পর্যন্ত উপত্যকার মেঝে সার্চ করল ওরা। 'বন্যার সময়ও এত দূরে কোন ব্লক ভেসে আসবে না,' বলল রানা। 'চলুন, দেখি জলপ্রপাত হয়ে গহ্বরের মুখে কিছু পড়েছে কিনা।'

ডানডেরার পাড়ে ফিরে এল ওরা, ঢাল বেয়ে নামল জলপ্রপাত পর্যন্ত। উঁকি দিয়ে তাকাল রানা। 'ভাটির চেয়ে এদিকটার গভীরতা কম,' বলল রানা। 'আমার ধারণা একশো ফুটও হবে না।'

'ভাবছেন আপনি ওখানে নামতে পারবেন?' নিমার চোখে সন্দেহ। নিচ থেকে বিস্ফোরিত হয়ে উঠে আসছে বাষ্পকণা ঘন মেঘের মত, চোখ-মুখ ভিজিয়ে দিচ্ছে। পানির বিরতিহীন পতন বজ্রপাতের মত আওয়াজ করছে, কথা বলার সময় চিৎকার করছে ওরা।

'রশি, আর টেনে তোলার লোক থাকলে ভেবে দেখা যেত।' কিনারায় শক্ত হয়ে বসল রানা, চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে নিচের গামলার দিকে তাকাল। আলগা পাথরের ছোটবড় অনেক স্তূপ রয়েছে ওখানে–ছোট আকৃতির গোল পাথর, কয়েকটা বেশ বড়। কিছু পাথর কোণ বিশিষ্ট, কল্পনার সাহায্য নিলে কিছু পাথরকে চৌকো বলেও মনে হবে। তবে ওগুলোর সারফেস পানির তোড়ে মসৃণ হয়ে আছে, ভেজা ও চকচকে। বেশিরভাগই আংশিক জলমগ্ন, সচল জলকণায় ঢাকা।

'ওগুলো সে পেল কোত্থেকে?' হঠাৎ জানতে চাইল নিমা।

'কে কি পেল?' রানা বিস্মিত।

'আপনি বুঝতে পারছেন না? ভুল দিক থেকে শুরু করেছি। আমরা জানার চেষ্টা করছি ব্লকগুলোর কি গতি হয়েছে। তার বদলে আমাদের খোঁজ করা উচিত নয়, ব্লকগুলো টাইটা পেল কোত্থেকে?'

'তাই তো! শেষটা জানার চেষ্টা করছি আমরা, শুরুটা নয়। বাঁধের ভাঙা পাঁচিল নয়, আমাদের খোঁজা উচিত পাথরের খনি। কোয়ারি!'

'কোত্থেকে শুরু করা যায়?' নিমার ব্যাকুল প্রশ্ন।

নিমার প্রশ্ন বুঝতে পারুক বা না পারুক, খিক খিক করে হেসে উঠল বাটি। দু'জনেই ওরা একযোগে তার দিক তাকাল। তারপর হাতছানি দিয়ে বাটিকে ডাকল নিমা। পাশে বসিয়ে আরবীতে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করে বলল তাকে। শোনার পর চোখ বড় বড় করল বাটি, তারপর উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, 'জেসাস স্টোন! জেসাস স্টোন! আসুন আমার সঙ্গে, আপনাদের দেখাই!' দাঁড়াল নিমা, বাটি তাকে টেনে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে উপত্যকার ঢাল বেয়ে।

বাটি ছুটছে, তার সঙ্গে নিমাকেও ছুটতে হচ্ছে। আনন্দে অ্যামহারিক গীত গাইছে ছেলেটা। ওদের পিছু নিয়ে আস্তে-ধীরে হাঁটছে রানা। উপত্যকার আধ মাইল নিচে মিলিত হলো ওদের সঙ্গে।

এখানে রানা বাটিকে দেখল হাঁটু গেড়ে বসে পাথুরে পাঁচিলে কপাল ঠেকিয়ে রেখেছে। প্রার্থনা করছে সে, চোখ দুটো বন্ধ। তার পাশে নিমাও বসে আছে।

খানিক পর লাফ দিয়ে সিধে হলো বাটি, ধুলো উড়িয়ে নাচল কিছুক্ষণ। 'প্রার্থনা শেষ, এবার আমরা জেসাস স্টোনের কাছে যেতে পারি।' নিমার হাত ধরল আবার, পাথরের পাঁচিল ঘেঁষে এগোল। রানার সামনে থেকে ওরা দু'জন যেন চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল, যাকে বলে বাতাসে মিলিয়ে যাওয়া। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা।

'নিমা!' ডাকল ও। 'কোথায় আপনি? কি ব্যাপার?'

'এদিকে, রানা! এদিকে আসুন!'

সাবধানে পা ফেলে পাথরের পাঁচিলের সামনে চলে এল রানা। 'ওহ্, গড! এ তো আমি এক বছর চেষ্টা করলেও খুঁজে পেতাম না!'

পাহাড়-প্রাচীরের গা ভাঁজ খেয়ে, ভেতর দিকে ঢুকে গেছে, তৈরি করেছে গোপন একটা প্রবেশপথ। খাড়া দুই পাশ বেয়ে ওপরে উঠে গেল রানার দৃষ্টি, ফাঁকটায় ঢুকে পড়েছে। ত্রিশ কদম পেরুতে খোলা একটা অ্যামফিথিয়েটারে ঢুকল, কম করেও একশো গজ লম্বা হবে, আকাশের দিকটা উন্মুক্ত। দেয়ালগুলো

নিরেট পাথর, এক পলক তাকিয়েই রানা বুঝতে পারল উপত্যকার মেঝেতে নিমার পাওয়া পাথরটার মত স্ফটিকতুল্য শিলা বা অভ্র এগুলো।

লক্ষণ দেখে বোঝা গেল গামলা থেকে পাথর কেটে ফাঁকা করা হয়েছে জায়গাটা, সারি সারি স্তর কাটার দাগ পাঁচিলের মাথা পর্যন্ত লম্বা। কাটার পর সব ব্লক সরানো হয়নি, অ্যাম্পিথিয়েটারের মেঝেতে স্তূপ করা রয়েছে। আবিষ্কারটা হতভম্ব করে তুলেছে রানাকে, নড়তে বা কথা বলতে পারছে না। একেবারে নিখুঁত চারকোনা পাথরও পড়ে আছে মেঝেতে, প্রয়োজন না পড়ায় বের করা হয়নি। নিমাকে নিয়ে সেটার সামনে দাঁড়িয়েছে বাটি।

নিমার হাত ধরে ঝাঁকাচ্ছে বাটি। 'জেসাস স্টোন। জেসাস আমাকে পথ দেখিয়ে এখানে নিয়ে আসেন। প্রথম যেদিন এলাম, দেখি এই পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। লম্বা সাদা দাড়ি ছিল, চোখ দুটো মায়া ভরা, দয়ালু, কিন্তু বিষণ্ণ।' গান শুরু করে বুকে ক্রস চিহ্ন আঁকল সে, গানের তালে তালে দুলছে।

এগিয়ে এসে রানা দেখল পাথরটার ওপর শুকনো ফুল, মাটির পাত্র, তেজ ফ্লাস্ক ইত্যাদি পড়ে রয়েছে। তারমানে নিয়মিতই এখানে আসে বাটি, জেসাস স্টোন তার ব্যক্তিগত বেদি, যীশুকে খুশি করার জন্যে নৈবেদ্য দিয়ে যায়।

প্রাচীন বেদির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করছে নিমা, দেখাদেখি বাটিও। প্রার্থনা শেষ হতে রানার পাশে চলে এল নিমা, দু'জন ঘুরেফিরে দেখছে কোয়ারির মেঝেটা। এত নিচু গলায় কথা বলছে ওরা, জায়গাটা যেন পবিত্র কোন ধর্মীয় স্থান।

ঘুরেফিরে দেখার পর কোয়ারির প্রবেশমুখে থামল ওরা, ইতিমধ্যে সূর্য ডুবে গেছে, দ্রুত অন্ধকার হয়ে আসছে চারদিক। একটা সাইজ করা চৌকো পাথরের ওপর বসল ওরা, বাটি বসল ওদের পায়ের কাছে হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে, মুখ তুলে নিমার দিকে তাকিয়ে আছে।

'লেজ থাকলে নাড়ত,' বলে হাসল রানা। তারপর বাটির দিকে তাকাল। 'বাটি, তোমার ওপর আমরা খুব খুশি। তুমি খুব ভাল ছেলে!'

'ওর প্রশংসা পরে করলেও চলবে,' বলল নিমা। 'চলুন, ফিরে যাই।'

'ফেরাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না,' বলল রানা। 'আজ চাঁদ উঠবে না, অন্ধকারে পা ভাঙব।'

'এখানে ঘুমানোর প্ল্যান করছেন?' নিমা অবাক।

'অসুবিধে কি? বললেই আগুন জ্বালতে পারি। সঙ্গে সারভাইভাল রেশন আছে। আর আপনার সঙ্গে তো প্রহরী আছেই, কাজেই আপনার সম্ভ্রম হুমকির সম্মুখীন হবে না।'

'সত্যিই তো, অসুবিধে কি!'

আগুন জ্বালার জন্যে শুকনো ডালপালা সংগ্রহ করতে যাবে রানা, হঠাৎ স্থির হয়ে কান পাতল। শব্দটা নিমাও শুনতে পাচ্ছে। 'আবার সেই প্রক্সি হেলিকপ্টার,' বলল রানা। 'এই অসময়ে কি খুঁজছে ওরা?'

অ্যামফিথিয়েটারের মাথার ওপর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা, এক

হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়ে গেল কন্টারটা, লাল আর সবুজ নেভিগেশন্যাল আলো মিটমিট করতে দেখা গেল। মঠের দিকে যাচ্ছে ওটা।

চার

ঘুমটা কেন ভাঙল বুঝতে পারেনি রানা। কোথায় রয়েছে মনে পড়ল, দেখল কোয়ারির ভেতর ওর কাছাকাছি শুকনো ঘাসের ওপর শুয়ে রয়েছে নিমা। আকাশে চাঁদ নেই, তবে তারাগুলো যেন মাটির কাছাকাছি নেমে এসেছে, একেকটা পাকা আঙুরের মত বড়। আগুনটা নিভে এসেছে, ওধারে শুয়ে নাক ডাকছে বাটি। ব্লাডার খালি করার জন্যে উঠতে হলো রানাকে।

আগুনটাকে পাশ কাটিয়ে ফিরে আসছে, যে শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে সেটা আবার ভেসে এল দূর থেকে। অস্পষ্ট, পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলে আসছে, ফলে বোঝা যায় না উৎসটা ঠিক কোন দিকে। এই আওয়াজ আগেও অনেকবার শুনেছে ও। অটোমেটিক গানফায়ারের শব্দ, সম্ভবত একে-ফরটিসেভেন অ্যাসল্ট রাইফেল থেকে বেরুচ্ছে। বিরতিহীন নয়, প্রতিবার তিন রাউন্ড করে। প্রফেশনালের কাজ।

ভোরের দিকে নিমার ঘুম ভাঙাল রানা। অবশিষ্ট রেশন থেকে ব্রেকফাস্ট সেরে গোলাগুলির কথাটা জানাল ওকে। 'উস্তাভ হতে পারে?' জিজ্ঞেস করল নিমা। 'সে হয়তো শাফি আর রুবিকে ধরে ফেলেছে।'

'মনে হয় না। উস্তাভ কয়েকদিন আগে রওনা হয়েছে, তার গুলির আওয়াজ এত দূর পৌঁছুবে না।'

'তাহলে?'

'কি জানি। আমার ভাল ঠেকছে না, নিমা। কোয়ারিটা আরেকবার দেখে ক্যাম্পে ফিরে যাই চলুন।'

আলো জোরাল হতে কোয়ারির কয়েকটা ছবি তুলল রানা। কয়েকটা ব্লকের ছবি তোলার সময় ওগুলোর পাশে পোজ দিল নিমা, মেরিলিন মনরোর ভঙ্গিতে একটা হাত মাথার পিছনে রেখে।

উপত্যকার ঢাল বেয়ে ফেরার পথে সন্তুষ্ট দেখাল ওদেরকে, প্রাচীন কোয়ারি আবিষ্কার ওদের অভিযানকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। এরপর কিভাবে কি করা হবে, সে-আলোচনায় মগ্ন হয়ে পড়ল ওরা। গহ্বরের নিচের অংশ ফেকাসে লাল পাহাড়-প্রাচীরের কাছে যখন পৌঁছুল, বেলা তখন প্রায় এগারোটা। মঠ থেকে ট্রেইল ধরে উঠে আসা একদল সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হলো ওখানে।

ওঁদেরকে দূর থেকে দেখেই বোঝা গেল, অত্যন্ত খারাপ কিছু একটা ঘটেছে। করুণ রসে সিক্ত সন্ন্যাসীদের উলুধ্বনি শুনে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল রানার। শোক প্রকাশের জন্যে এই ধ্বনি দেয়া আফ্রিকান ঐতিহ্যের অংশ। ওরা দেখল

সন্ন্যাসীরা মুঠো মুঠো ধুলো নিয়ে নিজেদের মাথায় ঢালছেন।

নিমার নির্দেশে ব্যাপার কি জানার জন্যে সন্ন্যাসীদের দিকে ছুটল বাটি। বাটিকে দেখে কেঁদে ফেলল সন্ন্যাসীরা, চিৎকার করে দুঃখজনক কোন ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছে। একটু পরই ছুটে ফিরে এল বাটি। 'আপনাদের ক্যাম্পে লোকজন নেই। একদল শয়তান এসেছিল। চাকরবাকরদের অনেকেই নেই-খুন হয়ে গেছে।'

খপ করে নিমার কব্জি চেপে ধরল রানা। 'আসুন!' ছুটল ও, 'দেখি কি হয়েছে!'

শেষ এক মাইল ছুটে ক্যাম্পে পৌঁছুল ওরা, কিচেন শেডের সামনে কিছু একটাকে ঘিরে আরও একদল সন্ন্যাসীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল। ভিড় ঠেলে সামনে চলে এল রানা, পেটে শূন্য একটা অনুভূতি, আতংকে মুখের ঘাম ঠাণ্ডা লাগছে। ঝাঁকে ঝাঁকে ভন ভন করছে নীল মাছি, মাঝখানে পড়ে আছে রক্তে ভাসমান কুক সহ আরও তিনজন ক্যাম্প সার্জেন্টের লাশ। প্রথমে তাদের হাতগুলো পিছমোড়া করে বাঁধা হয়েছে, হাঁটু গাড়তে বাধ্য করা হয়েছে মাটিতে, তারপর খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে মাথার পিছনে।

নিমাকে এগিয়ে আসতে দেখে বাধা দিল রানা, 'তাকাবেন না!'

ওর কথায় কান না দিয়ে পাশে এসে দাঁড়াল নিমা। 'ওহ্, গড!' দু'হাতে মুখ ঢাকল।

এগিয়ে এসে লাশগুলো দেখল রানা। 'খালিদ, মোস্তফা আর জহিরকে দেখছি না। কোথায় ওরা? জহির, কোথায় তুমি?'

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল জহির। 'এখানে, স্যার!' গলাটা কেঁপে গেল তার, মুখ ঝুলে পড়েছে। তার শার্টের সামনে শুকনো রক্ত দেখা গেল।

'কি হয়েছে বলো!' জহিরকে ধরে সিধে করল রানা।

'ওরা ছিল শুফতা, ডাকাত, খুনী! ওরা ছিল হায়েনা, শিয়াল, সাপ! রাতের অন্ধকারে হঠাৎ আসে, এসেই গুলি ছোঁড়ে কুঁড়ে লক্ষ্য করে। কতজন ছিল বলতে পারব না, কেন এভাবে খুন করল তাও বলতে পারব না!' ফোঁপাতে লাগল জহির।

খানিক পর জানা গেল নিমার ঘর তছনছ করা হয়েছে। ক্যানভাস ফোল্ডারের প্রচুর ফটোগ্রাফ আর কাগজ-পত্র ছিল, খালি করে নিয়ে গেছে সব। ওদের হেডকোয়ার্টারও তছনছ করা হয়েছে স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফ আর ম্যাপ, পাথর ফলকের রাবিং, পোলারয়েড-কিছুই নেই।

নিজের কুঁড়ে থেকে ছুটে নিমার কুঁড়েতে চলে এল রানা। 'একই অবস্থা আমার ঘরেরও। সমস্ত কাগজ-পত্র নিয়ে গেছে, রাইফেলটাও। পাসপোর্ট আর ট্র্যাভেলার্স চেক ডে-প্যাকে ছিল বলে রক্ষা পেয়েছে!'

নিঃশব্দে কাঁদছে নিমা। 'আমাদের গবেষণার সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে গেছে ওরা, এমনকি পোলারয়েডগুলোও বাদ দেয়নি। ওহ্, রানা, মিশরে আমাদের মরুভূমির বাসাতে যা ঘটেছিল, এখানে আবার ঠিক তাই ঘটল। ওদের হাত থেকে এখানেও আমরা নিরাপদ নই। কাল রাতে আমরা ক্যাম্পে থাকলে কি ঘটত?' ছুটে

এসে রানার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। 'ওই রোদের মধ্যে আমরাও মরে পড়ে থাকতাম!'

ভারপ্রাপ্ত পুরোহিতদের সঙ্গে কথা হয়েছে রানার। ওঁদের ধারণা, আক্রমণটা ওকে আর নিমাকে খুন করার জন্যেই করা হয়। বলছেন, এখান থেকে এখুনি ওদের চলে যাওয়া উচিত, কারণ আবার হামলা হতে পারে।

খালিদ, মোস্তফা আর জহিরকে রওনা হবার প্রস্তুতি নিতে বলেছে রানা। খবর দিয়ে আশপাশের গ্রাম থেকে মসজিদের ইমাম সাহেব আর কয়েকজন মুসলমান গোত্রপ্রধানকে আনানো হবে, তারাই জানাজা পড়ে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করবেন লাশগুলোর। ভারপ্রাপ্ত পুরোহিতরা কথা দিয়েছেন, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি কর্তৃপক্ষকে ঘটনার কথা জানাবেন তাঁরা।

একঘণ্টার মধ্যে রওনা হবার জন্যে তৈরি হয়ে গেল ওরা। সমস্ত ক্যাম্পিং ইকুইপমেন্ট আর উস্তাদের ব্যক্তিগত জিনিস-পত্র প্রধান পুরোহিত ওলি জারকাসের দায়িত্বে রেখে যাওয়া হচ্ছে। খচ্চরগুলোর পিঠে হালকা বোঝা চাপানো হলো।

প্রধান পুরোহিত এসকর্ট হিসেবে একদল সন্ন্যাসীকে পাঠালেন, ওদেরকে পাহাড় চূড়া পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন। স্কিনিং শেডে ডোরাকাটা ডিক-ডিকের ছাল আর খুলিটা পেল রানা, গুটিয়ে একটা বান্ডিল বানাল, স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকে দিল একটা খচ্চরের বোঝার ওপর।

এসকর্ট পার্টির সঙ্গে বাটিও রয়েছে। সারাক্ষণ নিমার কাছাকাছি থাকল সে। ট্রেইল ধরে রওনা হলো ওরা, প্রথম এক মাইল ওদের সঙ্গে আসছেন সন্ন্যাসীদের বড় একটা মিছিল।

দুপুর পার হয়ে গেল টাইটার ড্যাম সাইটে পৌঁছুতে। নদীর পানিতে মাথা ধোয়ার জন্যে কয়েক মিনিট এখানে থামল ওরা। জলপ্রপাতের ওপর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকল, দু'জনের মনই বিষণ্ণ ও কাতর হয়ে আছে। 'কবে নাগাদ আবার ফিরব আমরা?' ফিসফিস করে জানতে চাইল নিমা।

'বর্ষা শুরু হতে আর দেরি নেই,' বলল রানা। 'হায়েনারাও গন্ধ পেয়ে কাছে চলে আসছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, নিমা।'

গহ্বরের ভেতর তাকিয়ে বিড়বিড় করল নিমা, 'এখনও তুমি জেতোনি, টাইটা। খেলায় আবার আমরা ফিরে আসব।'

সন্ধে হয়ে এলেও নদীর পাশে স্থায়ী ক্যাম্পসাইটে থামল না ওরা, অন্ধকারে পথ চলা অসম্ভব না হওয়া পর্যন্ত কয়েক মাইল এগোল। তাঁবু ফেলে আরাম করার কথা ভাবল না কেউ, সন্ন্যাসীদের দেয়া রুটি আর ছাগলের দুধ খেয়ে পাথুরে জমিনের ওপর বেডরোল খুলে শুয়ে পড়ল। ক্লান্ত শরীর, সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এসে গেল

পরদিন ভোরে সূর্য ওঠার আগে খচ্চরের পিঠে মাল-পত্র তোলা হলো, কড়া কফি খেয়ে ট্রেইল ধরল ওরা। সদ্য ওঠা সূর্য এসকার্পমেন্টের খাড়া পাঁচিল আলোকিত করে তোলায় এত কাছে মনে হলো যেন ছোঁয়া যাবে। নিমার পাশে চলে এসে রানা বলল, 'এভাবে হাঁটলে আশা করা যায় বিকেলের দিকে এসকার্পমেন্টের

গোড়ায় পৌঁছে যাব। জলপ্রপাতের-পিছনের গুহায় রাত কাটানো সম্ভব হতে পারে।'

'তারমানে কাল কোন এক সময় ট্রাকের কাছে পৌঁছুব,' বলল নিমা। 'রানা, অনেকক্ষণ ধরে একটা কথা ভাবছি আমি। ধরুন, আমাদের পোলারয়েড আর রাবিংগুলো প্রক্সির কারও হাতে পড়েছে, যে ওগুলোর অর্থ করতে পারবে। আমরা কতদূর এগিয়েছি এটা বোঝার পর তার প্রতিক্রিয়া কি হবে?'

'ও-সব কথা পরে ভাবা যাবে, নিমা,' জবাব দিল রানা 'সঙ্গে রিগবি রাইফেলটা পর্যন্ত নেই, কাজেই খুব অসহায় বোধ করছি। আগে প্রাণে বাঁচি, তারপর অন্য কিছু।'

খালিদ, খচ্চরচালক আর সন্ন্যাসীরাও তাই ভাবছে, কারণ দেখা গেল তাদের হাঁটার গতি মুহূর্তের জন্যেও মন্থর হচ্ছে না। দুপুরের দিকে অল্প সময়ের জন্যে থামার নির্দেশ দিল রানা, নিজেরা কফি খাবে, খচ্চরগুলোকে পানি খাওয়াবে খালিদ আগুন জ্বালছে, বিনকিউলার নিয়ে পাথুরে ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল রানা; খুব বেশি দূর ওঠেনি, ঘাড় ফেরাতে দেখতে পেল পিছু নিয়ে উঠে আসছে নিমাও। কাছে এসে বলল, 'দেখতে এলাম কি করছেন আপনি।'

'সামান্য রেকি। সামনে স্কাউট রাখা দরকার ছিল, এভাবে অন্ধের মত ট্রেইল ধরে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। যত দূর মনে পড়ে, ঠিক সামনেই পড়বে অত্যন্ত কঠিন পথ। আল্লাই জানে কিসের মধ্যে গিয়ে পড়ব।'

আরও ওপরে উঠল ওরা, তবে চূড়ায় ওঠা সম্ভব হলো না বিশাল এক পাহাড়-প্রাচীর পথরোধ করে দাঁড়িয়ে থাকায়। বাধাটার ঠিক নিচে ভাল একটা জায়গা বেছে নিয়ে উপত্যকার দুটো ঢালই বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে পরীক্ষা করল রানা। এই এলাকার কথা মনে আছে ওর। এসকার্পমেন্ট ওয়াল-এর গোড়ায় পৌঁছুতে যাচ্ছে ওরা, জমিন এদিকে অসম্ভব এবড়োখেবড়ো আর রুক্ষ-কঠিন, খোলা সমুদ্রের-ঢেউয়ের মত, অনুভবে ডাঙার অস্তিত্ব টের পেয়ে তীরে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ার আগে সাজ সাজ রব তুলে ফুলে-ফেঁপে ওঠা। ট্রেইল খুব কাছ থেকে অনুসরণ করেছে নদীটাকে। নদীর পাড় বলতে সরু আল, তার ওপর ঝুলে আছে পাহাড়-প্রাচীর—রোদ-বৃষ্টি-ঝড়-বরফ নির্যাতনের স্টীমরোলার চালিয়ে অদ্ভুত, ভীতিকর আকৃতি দিয়েছে, ডিজনির কার্টুনে দেখা দুষ্ট ডাইনীর সচ্ছিদ্র দুর্গ যেন। এক জায়গায় ট্রেইলের ওপর ঝুলে আছে লাল স্যান্ডস্টোনের বিশাল এক পাথুরে অবলম্বন, বাধ্য হয়ে ওটাকে ঘুরে এগোতে হয়েছে নদীকে, ওখানে ট্রেইল এত সরু হয়ে গেছে যে বোঝা সহ একটা খচ্চর যেতে চাইলে পাড় থেকে নদীতে পড়ে যাবার ভয় আছে।

চোখে লেন্স লাগিয়ে উপত্যকার তলাটা সাবধানে দেখে নিল রানা। বেমানান বা সন্দেহজনক কিছুই দেখতে পেল না, কাজেই মাথা তুলে নিজেদের ওপর দিকে পাহাড়-প্রাচীরে দৃষ্টি বুলাল।

এই সময় নিচের উপত্যকা থেকে খালিদের চিৎকার ভেসে এল। 'জলদি, স্যার! খচ্চরগুলো রওনা হবার জন্যে রেডি হয়েছে।'

হাত ঝাঁকিয়ে তাকে একটু অপেক্ষা করতে বলল রানা, তারপর আবার

বিনকিউলার তুলে সামনের জমিনের ওপর দৃষ্টি বুলাল। ঝিক করে চোখে লাগল উজ্জ্বল একটা আলো। ভুরু কুঁচকে পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে সমস্ত মনোযোগ এক করল রানা।

'কি ব্যাপার?' দ্রুত জিজ্ঞেস করল নিমা। 'কি দেখলেন?'

'নিশ্চিত নই। বোধহয় কিছু না,' চোখ থেকে বিনকিউলার না নামিয়ে জবাব দিল রানা। পালিশ করা কোন ধাতব বস্তুর সারফেসে, অন্য একজোড়া বিনকিউলারের লেন্সে, কিংবা একটা রাইফেলের ব্যারেলে রোদ লেগে থাকতে পারে।

'জলদি, স্যার! খচ্চরচালকরা অপেক্ষা করতে রাজি নয়!' আবার খালিদের চিৎকার ভেসে এল।

দাঁড়াল রানা। 'কিছু না, চলুন।' নিমার হাত ধরে নামতে সাহায্য করছে রানা। হঠাৎ ঢালের ওপর দিক থেকে ভেসে পাথর নড়াচড়ার আওয়াজ। নিমাকে ছেড়ে দিয়ে ঠোঁটে আঙুল রাখল ও। অপেক্ষা করছে ওরা, স্কাইলাইনের ওপর চোখ।

অকস্মাৎ বাঁকা একজোড়া শিং মাথাচাড়া দিল চূড়ার কিনারায়, ওগুলোর নিচে বুড়ো এক পুরুষ হরিণের মাথা। আড়ষ্ট হয়ে আছে কান দুটো, নিঃশ্বাস ফেলছে ঘন ঘন। পাহাড়-প্রাচীরের কিনারায় থামল ওটা, ঠিক ওরা যেখানে গুড়ি মেরে বসে আছে তার সরাসরি ওপরে, যদিও ওদেরকে দেখতে পায়নি এখনও। হরিণটা ঘাড় ফেরাল, ফেলে আসা পথের দিকে তাকিয়ে আছে। এদিকের চোখটা রোদ লাগায় ঝিক করে উঠল। দাঁড়ানোর সতর্ক ভঙ্গি, আড়ষ্ট কান আর পিছন ফিরে তাকানোই বলে দেয় কোন কারণে ভয় পেয়েছে।

তারপর হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল হরিণটার শরীরে। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল রিজের পিছনে, দূরে মিলিয়ে গেল ছুটে পালানোর শব্দ।

'কিছু একটা দেখে ভয় পেয়েছে ওটা,' ঢালের নিচে তাকিয়ে বলল রানা। খচ্চর আর সন্ন্যাসীদের কাফেলা এরইমধ্যে রওনা হয়ে গেছে, নদীর উঁচু পাড়ের ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে।

'আমাদের এখন তাহলে কি করা উচিত?' জানতে চাইল নিমা।

'সামনের পথ রেকি করা দরকার, কিন্তু সেজন্যে যে সময় দরকার তা নেই।' কাফেলা দ্রুত এগোচ্ছে, এখুনি ঢাল বেয়ে নিচে না নামলে পিছনে পড়ে থাকবে ওরা। বিপদের নিরেট কোন প্রমাণ এখনও পায়নি রানা, সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করাও চলে না। 'আসুন!' নিমার হাত ধরল ও, ছুটে নেমে আসছে ঢাল বেয়ে।

কাফেলার পিছনে চলে এল ওরা, রানা এখনও ওদের মাথার ওপর স্কাইলাইন গভীর মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করছে। পাহাড়-প্রাচীর কাত হয়ে ঝুলে আছে ওদের ওপর, ঢেকে ফেলেছে অর্ধেক আকাশ। ওদের বাম দিকে নদী নিজের শব্দ দিয়ে অন্য সব শব্দ মুছে ফেলছে।

পাহাড়-প্রাচীরের মাথা থেকে একটা পাতা ঝরে পড়তে দেখছে রানা। গরম বাতাসে শুকনো পাতাটা ডিগবাজি খেতে খেতে নেমে আসছে। এত ছোট, কোন বিপদসংকেত হতে পারে না, তবু অলস কৌতূহলবশত ওটার পতন লক্ষ্য করছে

ও। বাদামী পাতাটা অবশেষে ওর মুখ স্পর্শ করল। হাত তুলে ধরল রানা, দু'আঙুলের মাঝখানে নিয়ে ঘষা দিল, জানে গুঁড়িয়ে যাবে।

কিন্তু মসৃণ আর নরম লাগল জিনিসটা। হাত খুলল রানা, ভাল করে দেখল। পাতা নয়, ছেঁড়া এক টুকরো গ্রিজড পেপার। মাথার ভেতর সতর্ক-সংকেত বেজে উঠল। সেমটেক্স আর প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভের যুগে সামরিক কাজে ব্লাস্টিং জেলিগনাইট আজকাল খুব কমই ব্যবহার করা হয়, তবে মাইনিং ইন্ডাস্ট্রি আর মিনারেল এক্সপ্লোরেশনে এখনও জিনিসটার চাহিদা ব্যাপক। সাধারণত নাইট্রোজেলাটিন স্টিক বাদামী রঙের গ্রিজড পেপারে মোড়া থাকে, স্টিকের মাথায় ডিটোনেটর সেট করার আগে এক্সপ্লোসিভ এক্সপোজ করার সময় কাগজে মোড়কটার একটা প্রান্ত ছিঁড়ে ফেলা হয়।

রানার মাথার ভেতর ঝড় বইছে। ওরা এইপথে আসবে এটা জানার পর কেউ যদি পাহাড়-প্রাচীরে জেলিগনাইট বসিয়ে থাকে, তাহলে আলোর যে প্রতিফলন দেখা গেছে সেটা বিস্ফোরকগুলোর মাঝখানে পড়ে থাকা কপার ওয়ায়্যারিং-এর কয়েল থেকে সৃষ্টি হতে পারে। সেক্ষেত্রে অপারেটর লোকটা এই মুহূর্তে পিছনের পাহাড়ে কোথাও শুয়ে আছে। বুড়ো হরিণ সম্ভবত তাকে লুকিয়ে থাকতে দেখে ভয় পেয়েছিল।

'খালিদ!' রানার গলার শিরা ফুলে উঠল। 'থামাও ওদের! ফিরিয়ে আনো!' কাফেলার মাথায় পৌঁছুনোর জন্যে ছুটল ও, মন বলছে এরইমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ওদের পিছনে পাহাড়ে সত্যি যদি কেউ থাকে, রানার প্রতিটি নড়াচড়া পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে। কাফেলার মাথায় পৌঁছে খচ্চরগুলোকে সরু ট্রেইলে ঘোরানো, তারপর নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে আনা, সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। ছোটার গতি কমিয়ে আনল রানা, তবে এখনও চিৎকার করে ফিরে আসতে বলছে ওদেরকে, সেই সঙ্গে হাতছানি দিয়ে ডাকছে নিমাকে।

ছুটে আসছে নিমা, ধৈর্য হারিয়ে রানাও খানিকটা পিছিয়ে এল। 'কি ব্যাপার, রানা?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল নিমা।

'ট্র্যাক থেকে সরে যেতে হবে। পরে ব্যাখ্যা করব।' নিমার হাত ধরে ফেলে আসা পথ ধরে ছুটল রানা, আবার খালিদের নাম ধরে ডাকল।

পঞ্চাশ গজও কভার করতে পারেনি, পাহাড়-প্রাচীরের মুখ বিস্ফোরিত হলো। বাতাসের তীব্র আলোড়ন ধাক্কা মারল, হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবার অবস্থা হলো ওদের। কান ও মাথার ভেতর ব্যথা করে উঠল। তারপর বিস্ফোরণের মূল শক্তি ঝাঁকি দিয়ে গেল ওদেরকে—একটামাত্র বিস্ফোরণ নয়, একের পর এক অনেকগুলো, যেন মাথার ওপর বিরতিহীন বজ্রপাত হচ্ছে। দিশেহারা হয়ে উঠল ওরা, পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। নিমাকে আঁকড়ে ধরে পিছন দিকে তাকাল রানা, দেখল পাহাড়-প্রাচীরের চূড়ায় পর পর কয়েকটা বিস্ফোরণ ঘটল। লম্বা, নুড়ি আর পাথর আর ধুলোর ঝর্ণা একের পর এক উপচে উঠছে।

আতংকে দিশেহারা, তবু জেলিগনাইট সাজানোর দক্ষতা লক্ষ্য করে রানার মনে সমীহ জাগল। এ একজন মাস্টার বম্বারের কাজ। পাথরখণ্ডের ধস এক সময় থামল, এখন শুধু স্বচ্ছ নীল আকাশের গায়ে মিহি ধুলো দেখা যাচ্ছে। মুহূর্তের

জন্যে মনে হলো ধ্বংসযজ্ঞের সমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু তারপরই পাহাড়-প্রাচীরের কাঠামো বদলে যেতে শুরু করল।

প্রথমে ধীরে ধীরে পাথরের পাঁচিল বাইরের দিকে কাত হলো। পাহাড়ের গায়ে বিশাল ফাটল সৃষ্টি হতে দেখল রানা, যেন রাক্ষসের প্রকাণ্ড মুখ খুলে যাচ্ছে। পাথরের বিরাট পাত ধসে পড়ছে, পো মোশনে নেমে আসছে ওদের ওপর। ভেঙে পড়ার আওয়াজ শুনে মনে হলো একই সঙ্গে হুংকার ছাড়ছে আর গোঙাচ্ছে শত শত টন পাথর, গোটা পাহাড়-প্রাচীর অনেক নিচের নদীতে পড়ে যাচ্ছে।

দৃশ্যটা সম্মোহিত করে ফেলেছে রানাকে, মনে হলো বিস্ফোরণের ফলে ব্রেন অবশ হয়ে গেছে। চিন্তা শক্তি ফিরে পেতে কিংবা তৎপর হতে সময় লাগল, নিজের ওপর জোর খাটাতে হলো। ও দেখল, বেশিরভাগ বিস্ফোরণ ঘটেছে ট্রেইলের সামনের দিকে, কাফেলার মাথার কাছে। ওদিকে বাটি ছিল, খালিদের পাশে। এক্সপ্লোসিভ ট্র্যাপের ভেতরে ওরা দু'জনও ঢুকবে, এই আশায় পাহাড়-প্রাচীরের মাথায় অপেক্ষা করছিল বম্বার। কিন্তু নিমাকে নিয়ে রানা যখন উল্টোদিকে ছুটতে শুরু করল, বিস্ফোরণ ঘটাতে বাধ্য হয়েছে সে।

অসহায় দাঁড়িয়ে থেকে পতনশীল পাথরের বিশাল স্রোতটাকে নেমে আসতে দেখছে রানা ওর সামনে ট্রেইলের ওপর, গ্রাস করছে লোকজন আর খচ্চরগুলোকে, কিনারা থেকে বিরতিহীন জলপ্রপাতের মত লাফ দিয়ে পড়ছে নদীর তলায়। পাথর ধসের কান ফাটানো গর্জনের ভেতর থেকেও লোকজনের আর্তনাদ ভেসে আসছে।

ধ্বংসযজ্ঞ ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমশ, এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। ব্যাখ্যা করার সময় নেই, যে-কোন মুহূর্তে টন টন পাথরের নিচে ওরাও চাপা পড়ে যাবে। ঝট করে নিমাকে দু'হাতে ধরে বুকে তুলে নিল রানা, লাফ দিয়ে পাড় টপকে নদীর দিকে পড়ল পাড়ের ঢালে দু'জন একসঙ্গে পড়ল ওরা, বারবার গড়িয়ে নেমে এল ত্রিশ ফুট এখানে বড় একটা পাথর পড়ে আছে, আকারে একটা বাড়ির মত হবে। ওই পাথরে লেগে স্থির হলো শরীর দুটো।

ধীরে ধীরে সিধে হলো রানা, নিমার হাত ধরে দাঁড় করাল, তারপর ওকে নিয়ে চলে এল পাথরটার উল্টোদিকে। এদিকে, জমিন ঘেঁষে, ভেতর দিকে একটা ভাঁজ খেয়েছে পাথর, সেই ভাঁজের ভেতর ঢুকে পড়ল ওরা

যতটা সম্ভব পিছিয়ে এসে পাথুরে খোলের ভেতর শুয়ে থাকল দু'জন। ধ্বংসযজ্ঞ আরও বিস্তৃত হয়েছে, এতক্ষণে ওদের ওপর নামতে শুরু করল ধসটা। বিশাল রাবার বলের মত লাফ দিতে দিতে প্রকাণ্ড টুকরোগুলো ছুটে আসছে, প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে গতি, তারপর ওদের শেলটারের সামনের দিকটায় লেগে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। গড়িয়ে এসে একটা করে টুকরো ভাঙে, অমনি প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে কাঁপতে শুরু করে ওদের শেলটার ধাক্কা খেয়ে বিস্ফোরিত পাথরের ছোট টুকরোগুলো মিসাইলে পরিণত হলো, বাতাসে শিস কেটে নদীতে গিয়ে পড়ছে নদীতে বড় বড় ঢেউ জাগল, আছড়ে পড়ে ভাঙার সময় দুই তীরে ফেনা জমে উঠল।

ওদের শেলটারের ওপর ইতিমধ্যে কয়েকশো টন পাথর ধসে পড়েছে, তবে

এ সবে মাত্র শুরু। এক সময় মনে হলো পাহাড়ের অর্ধেকটাই নেমে আসছে ওদের ওপর। ধুলো এখন ঘন মেঘের মত, দু'হাত দূরের জিনিস দেখা যায় না শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, খকখক করে কাশছে দু'জনেই। বিশাল বাড়ির মত শেলটার পাথর ধসে চাপা পড়ে যাচ্ছে, বুঝতে পেরে নিমার ওপর উঠে এল রানা, নিজের শরীর দিয়ে ঢেকে ফেলল ওকে। ছোট্ট একটা পাথর টোকা দিল ওর মাথার পাশে তাতেই চোখে অন্ধকার দেখল রানা। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথাটা সহ্য করল ও, অনুভব করল কানের পিছন গরম একটা স্রোত, জ্যান্ত প্রাণীর মত চিবুকে নেমে আসছে ওটা।

তারপর ধীরে ধীরে মাটি ও পাথর ধস বন্ধ হলো। এখন আর ওদের শেলটার ঘন ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে না। মিহি ধুলো হালকা হয়ে যাচ্ছে। নিস্তেজ হয়ে পড়ছে পাথরের গর্জন।

সাবধানে চোখের পাতা থেকে ধুলো পরিষ্কার করল রানা। ওর নিচে নড়ে উঠল নিমা। হামাগুড়ি দিয়ে সরে এল রানা, নিমা যাতে বসতে পারে। বসার পর দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকল। সাদা ধুলো মুখোশ পরিয়ে রেখেছে ওদেরকে। মাথার চুলকে মনে হচ্ছে উইগ। 'আপনার মুখে রক্ত,' আতংকে কর্কশ শোনাল নিমার গলা।

'খুলির চামড়া সামান্য একটু কেটে গেছে,' বলল রানা। 'আপনার খবর কি?'

'আমার হাঁটু মচকেছে। সিরিয়াস বলে মনে হয় না, অল্প অল্প ব্যথা করছে।'

'তাহলে বলতে হবে অদ্ভুত ভাগ্য আমাদের,' বলল রানা। 'এই ঘটনায় কারুরই বাঁচার কথা ছিল না।'

নিমা হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে বেরুতে যাচ্ছে দেখে হাত ধরে বাধা দিল রানা 'না! গোটা ঢাল আলগা হয়ে আছে। পুরোপুরি স্থির হতে আরও সময় লাগবে তাছাড়া...'

'তাছাড়া কি?'

'ওদেরকে জানতে দেয়া চলবে না আমরা বেঁচে আছি,' বলল রানা 'জানলেই শেষ করার জন্যে ছুটে আসবে।'

রানার কথা শেষ হওয়া মাত্র 'কপ্টার এঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে এল কাছাকাছি কোথাও থেকে টেক-অফ করছে। নিমাকে ধরে আবার শুইয়ে দিল রানা, নিজেও ওর পাশে শুয়ে পড়ল।

মাথার ওপর এসে চক্কর দিচ্ছে 'কপ্টারটা। বোধহয় জীবিত কাউকে খুঁজছে ভাবল রানা। রোটরের আওয়াজ দূরে সরে যাচ্ছে, পাথরের ভাঁজ থেকে মাথা বের করে বাইরে উঁকি দিল রানা। আধ মাইল উজানের দিকে যান্ত্রিক ফড়িংটাকে দেখা গেল, প্রক্সির জেট রেঞ্জারই বটে। দূরে সরে যাচ্ছে, ফলে উইন্ডস্ক্রীনের ভেতর ককপিটটা পরিষ্কার দেখা গেল না। তবে ঠিক সেই সময় 'কপ্টারের গতি কমে এল, দিক বদলে উত্তর দিকে যাচ্ছে এখন, এবার প্যাসেঞ্জারদের দেখার একটা সুযোগ পাওয়া গেল। পাইলটের পাশেই বসে রয়েছে জ্যাক রাফেল, আর কর্নেল জুলিয়াস ঘুমা বসেছেন ঠিক ওদের পিছনে। সবাই ওরা তাকিয়ে আছে নিচের নদী ও উপত্যকায়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে রিজের আড়ালে হারিয়ে গেল 'কপ্টারটা

Rkarim

'আর কোন সন্দেহ নেই,' বলল রানা। 'প্রক্সির মালিক যে-ই হোক, আপনার চাচাকে খুন করা থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত খারাপ যা কিছু ঘটেছে তার জন্যে সে-ই দায়ী। রাফেল আর কর্নেল ঘুমা তাঁর বেতনভুক চাকর মাত্র।'

'কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব?' নিমা মানতে পারছে না। 'কর্নেল ঘুমা ইথিওপিয়ান আর্মির একজন অফিসার!'

'এটা আফ্রিকা, নিমা, সম্ভাব্য সব কিছু বিক্রি হয়,' বলল রানা। 'শুনুন, এ-সব নিয়ে পরে চিন্তা-ভাবনা করা যাবে। এখন আমাদের প্রথম কাজ এই খাদ থেকে বেরিয়ে সভ্য জগতে ফিরে যাওয়া।' হামাগুড়ি দিয়ে পাথরের ভাঁজ থেকে বাইরে বেরিয়ে এল ও, ধীরে ধীরে দাঁড়াল।

ঢাল বেয়ে ওপরে উঠে গেল রানার দৃষ্টি। ওদের ওপরে ট্রেইলটা পাথরধসে চাপা পড়ে গেছে। ওর পাশে বেরিয়ে এসে দাঁড়াতে চেষ্টা করল নিমা, গুঙিয়ে উঠে পড়ে যাবার উপক্রম করল, রানা ধরে না ফেললে যেতও পড়ে। 'হাঁটু!' শরীরের ধর ভাল অর্থাৎ ডান পায়ে চাপাল নিমা, সাহস করে হাসল। 'ঠিক হয়ে যাবে।'

'ট্রেইল ধরে যাওয়া সম্ভব নয়,' বলে নিমাকে নিয়ে নদীতে নেমে এল রানা, নামার সময় আবার পাথর ধস শুরু হয় কিনা ভেবে ভয়ে ভয়ে থাকল।

কোমর সমান পানিতে দাঁড়িয়ে রানার খুলির ক্ষতটা ধুয়ে দিল নিমা, রানার ডে-প্যাক হাতড়ে অ্যান্টিসেপটিক মলমের একটা টিউব বের করল। মলম লাগাবার পর রানার গলা থেকে ব্যানড্যানা খুলে ব্যান্ডেজও বেঁধে দিল। 'প্রথম কাজ বাটিকে খুঁজে বের করা,' রানাকে মনে করিয়ে দিল।

নদীর পাড় ঘেঁষে পানি কেটে এগোল ওরা। নদীর তলা আলগা পাথরে ভর্তি, খুব সাবধানে এগোতে হচ্ছে। প্যাকটা পানির ওপর তুলে রেখেছে রানা। আলগা পাথরের ভেতর দিয়ে ঢাল বেয়ে ওপরে ওঠা অত্যন্ত কঠিন মনে হলো। খানিক দূর ওঠার পরই দু'জন সন্ন্যাসীর থেতলানো লাশ দেখতে পেল ওরা, পাথরের নিচে অর্ধেক চাপা পড়ে আছে। একটা খচ্চরের শুধু একটা পা বেরিয়ে আছে বাইরে। পিঠের বোঝা খুলে গেছে, জিনিস-পত্র ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে। দেখতে পেয়ে, ডিক-ডিকের গুটানো ছালটা তুলে নিল রানা, আটকে রাখল ওর ব্যাগের সঙ্গে।

শেষবার যেখানে বাটি আর খালিদকে দেখা গেছে সেদিকে উঠছে ওরা। কিন্তু এক ঘণ্টা সার্চ করার পরও দু'জনের একজনকেও খুঁজে পাওয়া গেল না। ওদের ওপর ঢালটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে, ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে আছে ঝোপ আর গাছপালা। হাঁটুর জখম নিয়ে যতটা সম্ভব ওপরে উঠল নিমা, হাত দিয়ে মুখের সামনে চোঙ তৈরি করে ডাকছে, 'বাটি! বাটি! বাটি!' ওর চিৎকার উপত্যকার পাঁচিলে বাড়ি খেয়ে ফিরে আসছে।

রানা বলতে চাইল, ডেকে কোন লাভ নেই, সে বেঁচে থাকলে তো! কিন্তু বলল না।

ব্যথায় মুখ বিকৃত হয়ে আছে নিমার, তবু হাল ছাড়তে রাজি নয়। 'বাটি! সাড়া দাও, ভাই! বাটি, কোথায় তুমি?'

নিমা কেঁদে ফেলবে, এই ভয়ে ওর দিকে তাকাচ্ছে না রানা।

আর ঠিক তখন আরও ওপরের ঢাল থেকে অস্পষ্ট একটা কাতর শব্দ ভেসে

এল। গুঁড়িয়ে উঠে ঢাল আঁচড়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে নিমা। বাধা না দিয়ে পিছু নি রানা। খানিক দূর উঠেই কেঁদে ফেলল নিমা। প্যাক ফেলে ওর পাশে চলে এ রানা। ইতিমধ্যে ঢালের ওপর হাঁটু গেড়েছে নিমা।

পাথর ধসের নিচে চাপা পড়েছে বাটির শরীর। ছেঁড়া-ফাড়া মুখটা প্রায় চেনা যায় না, চামড়ার অর্ধেকটাই নেই। মাথাটা কোলে তুলে নিল নিমা, শার্টের আস্তি দিয়ে নাকের ফুটো থেকে ধুলো বের করছে, আরও যাতে ভাল ভাবে শ্বাস নিতে পারে। বাটির মুখের কোণ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে—আবার যখন কাতর আওয়াজ করল, গলগল করে বেরিয়ে এল। সেটা মুছতে গিয়ে সারা মুখে লেপ্টে দিল নিমা।

বাটির শরীরের নিচের অংশ পাথরে চাপা পড়েছে। পাথরে সরাতে চেষ্টা করল রানা, তবে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করল কাজটা সম্ভব নয়। বড় একটা খণ্ডের নিচে রয়েছে বাটি, আকারে সেটা বিলিয়ার্ড বোর্ডের দ্বিগুণ হবে। কত টন ওজন হবে পাথরটার আন্দাজ করা কঠিন, বিশ থেকে পঁচিশ টনের কম হবে না সন্দেহ নেই, শিরদাঁড়া আর পেলভিস চুরমার হয়ে গেছে। সাহায্য ছাড়া একজনের পক্ষে এই পাথর সরানোর প্রশ্নই ওঠে না। সম্ভব যদি হতও, পাথরটার নড়াচড়া চিড়ে-চ্যাপ্টা শরীরটাকে আরও শুধু কষ্টই দিত।

অদ্ভুত এক অভিমান নিয়ে রানার দিকে তাকাল নিমা। 'কিছু একটা করুন প্লীজ, কিছু একটা করুন!'

চোখ ভিজে এলেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখল রানা। নিঃশব্দে মাথা নাড়ল ও। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল নিমা, চোখের জল বৃষ্টির ফোঁটার মত পড়ছে বাটির কপালে।

'ও এভাবে মারা যাবে আর আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব?' রানার দিকে করুণ চোখে তাকাল নিমা। এই সময় চোখ মেলে ওর দিকে তাকাল বাটি।

ছাল ছাড়ানো রক্ত ভেজা মুখ, অথচ হাসছে বাটি। কুৎসিত বীভৎস চেহারা ওই হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। 'আম্মি!' ফিসফিস করল সে। 'আপনি আমার মা; মা ছাড়া এত আদর কে করে! আম্মি, তোমাকে আমি ভালবাসি!'

কথাগুলো আড়ষ্ট, শেষ হতেই শরীরে একটা খিঁচুনি উঠল। ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেল চেহারা, ককিয়ে উঠল একবার, তারপর স্থির হয়ে গেল। আড়ষ্ট ভাবটুকু দূর হলো কাঁধ থেকে, মাথাটা কাত হয়ে গেল একদিকে।

কাঁদছে নিমা, মাথাটা কোলে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল। তারপর ওর কাঁধ ছুঁয়ে রানা বলল, 'ও মারা গেছে, নিমা।'

মাথা ঝাঁকাল নিমা। 'জানি। শুধু আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে বেঁচে ছিল ও।'

বাটির মাথাটা নিমার কোল থেকে তুলল রানা, সরে এসে ধীরে ধীরে দাঁড়াল নিমা। বাটির মাথা নামিয়ে রেখে তার হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করে দিল রানা। তারপর আলগা পাথর দিয়ে ঢেকে দিল লাশটা। 'এবার আমাদের যেতে হয়, বাটি।'

বাটির কবরে একটা চুমো খেলো নিমা। তারপর রানার কাঁধে ভর দিয়ে নেমে এল নদীতে।

পানি কেটে উজানের দিকে রওনা হলো ওরা। পাথর ধস নদীর অর্ধেকটাই ভরাট করে ফেলেছে, ফলে অবশিষ্ট ফাঁক গলে পানি খুব দ্রুত ছুটে চলেছে। দুর্গত এলাকা ছাড়িয়ে এসে নদীর পাড়ে উঠল ওরা, তারপর খাড়া ঢাল বেয়ে পৌঁছুল ট্রেইলে। এখানে সামান্য বিশ্রাম নিল, তাকাল পিছন দিকে। পাথর ধসের নিচে লালচে-খয়েরি দেখাচ্ছে নদীর পানি। মঠের সন্ন্যাসীরা বিস্ফোরণের আওয়াজ যদি না-ও শুনে থাকে, ঘোলা পানি দেখে চিন্তায় পড়ে যাবে, কি ঘটেছে দেখার জন্যে এদিকে আসবে। লাশগুলো তুলে নিয়ে যাবে মর্যাদার সঙ্গে কবর দেয়ার জন্যে। চিন্তাটা খানিকটা হলেও সান্ত্বনা এনে দিল রানার মনে। নিমাকে নিয়ে আবার রওনা হলো ও। এই ট্রেইল ধরে দু'দিনের কঠিন পথ পাড়ি দিতে হবে ওদেরকে।

নিমা এখন খুব বেশি খোঁড়াচ্ছে। কিন্তু রানা সাহায্য করতে গেলে ঝাপটা দিয়ে সরিয়ে দিল ওর হাত। 'কিছু না, শুধু একটু আড়ষ্ট লাগছে।' হাঁটুটা পরীক্ষা করতেও দিল না, জেদ করে রানার সামনে থাকল।

রাতটা ওরা এসকার্পমেন্টের নিচে কাটাল। সামনেই খাড়া পাঁচিল বেয়ে উঠে গেছে পথটা। পথ থেকে নিমাকে বেশ খানিকটা সরিয়ে আনল রানা, থামল গাছপালায় ঢাকা একটা নালায়। ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর আগুন জ্বালল, জানে বাইরে থেকে দেখা যাবে না এবার হাঁটুটা রানাকে দেখতে দিল নিমা। চামড়া ওঠা জায়গাটা ফুলে আছে, ছুঁতে খুব গরমও লাগল। মাথা নাড়ল রানা। 'এই পা নিয়ে আপনার হাঁটা ঠিক হচ্ছে না।'

'আর কোন উপায় আছে?' জিজ্ঞেস করল নিমা। জবাব না দিয়ে বোতলের পানি দিয়ে নিজের ব্যানড্যানাটা ভেজাল ও, তারপর শক্ত করে বেঁধে দিল পায়ে। দুটো পেইনকিলার ট্যাবলেট খেতে দিল।

সারভাইভাল রেশন সামান্যই অবশিষ্ট আছে, আধপেটা খেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হলো। আগুনের ধারে বসে ফিসফাস করছে দু'জন। 'চূড়ায় ওঠার পর কি ঘটবে?' জানতে চাইল নিমা। 'যেখানে রেখে এসেছি সেখানে কি ট্রাকগুলো পাব? পাহারাদাররা আছে, নাকি কেটে পড়েছে? আর যদি প্রক্সির লোকজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়? তাহলে কি হবে?'

'আপনার কোন প্রশ্নের উত্তরই আমার জানা নেই,' স্বীকার করল রানা।

'আদ্দিস আবাবায় পৌঁছে এই ম্যাসাকারের ঘটনা পুলিসকে আমি জানাব,' বলল নিমা। 'আমি চাই জ্যাক রাফেল আর তার লোকজন উপযুক্ত শাস্তি পাক।'

'সেটা বোধহয় উচিত হবে না,' বলল রানা। 'কারণ আবার আমরা ইথিওপিয়ায় ফিরে আসতে চাই। এই ব্যাপারটা নিয়ে বেশি হৈ-চৈ করলে গোটা উপত্যকায় ট্রুপস আর পুলিস গিজগিজ করবে। টাইটার ধাঁধার সমাধান পাবার রাস্তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। মামোসের সমাধির কথাও ভুলে যেতে হবে।'

'ও, হ্যাঁ, এদিকটা আমি ভাবিনি।'

'তাছাড়া, অভিযোগ করে লাভ হবে কিনা ভেবে দেখুন। কর্নেল ঘুমা রাফেলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। প্রক্সি যদি একজন আর্মি কর্নেলকে পকেটে ভরতে পারে, পুলিস অফিসারদের পকেটে ভরা তো আরও সহজ। ওদের হাত কতটা লম্বা কে জানে। হয়তো দেখা যাবে আর্মি চীফকে কিনে রেখেছে। কিংবা

কেবিনেট মেম্বারদেরও।'

'এ-ও আমি ভাবিনি,' স্বীকার করল নিমা।

'শায়েস্তা করার আরও উপায় আছে, নিমা,' বলল রানা। 'অন্যায় দেখেও সহ্য করব, আমাকে আপনি সেরকম লোক ভাববেন না।'

'আপনি একা ওদেরকে কিভাবে শায়েস্তা করবেন?'

'সেটা এখুনি আমি বলতে পারছি না।' হঠাৎ হাসল রানা। 'তবে শুধু শায়েস্তা নয়, মধুর প্রতিশোধের কথাও ভাবছি আমি।'

'মধুর প্রতিশোধ? মানে?'

'ওদের নাকের ডগা থেকে ফারাও মামোসের সমস্ত গুপ্তধন সরিয়ে নেব আমরা।'

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙার পর বসতে গিয়ে গুঙিয়ে উঠল নিমা। ব্যান্ডেজ খুলে হাঁটুটা আবার দেখল রানা। ফোলাটা আরও বেড়েছে, আকারে প্রায় দ্বিগুণ দেখাচ্ছে হাঁটু। আবার ওটা বাঁধল ও, শেষ দুটো ট্যাবলেট খাইয়ে দিল। রানাকে ধরে দাঁড়াতে পারল নিমা, খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসকার্পমেন্টের নিচে এসে দাঁড়াল। পাহাড়-প্রাচীর বেয়ে উঠে যাওয়া পথটার দিকে দু'জনই ওরা তাকিয়ে থাকল। আসার পথে কি রকম কষ্ট হয়েছে মনে পড়ে যাচ্ছে। চূড়া থেকে নিচে নামতে পুরো একটা দিন লেগেছিল ওদের।

শুরু হলো ওঠা। প্রতি পদক্ষেপের পর আরও যেন খাড়া হয়ে উঠছে পথটা। নিমা কোন আওয়াজ করছে না, তবে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আছে চেহারা, দরদর করে ঘামছে। দুপুর হয়ে গেল, এখনও ওরা জলপ্রপাতের কাছে পৌঁছুতে পারেনি। তবু বিশ্রাম নেয়ার জন্যে নিমাকে থামতে বলল রানা। খাবার কিছু নেই, বোতল থেকে ঢক ঢক করে শুধু পানি খেলো নিমা। রানাও খেলো, মাত্র এক ঢোক।

কিন্তু রওনা হবার সময় দাঁড়াতে গিয়ে পারল না নিমা। 'সেরেছে!' অসহায়ভাবে তাকাল রানার দিকে। 'দাঁড়াব কি, পা তো নাড়তেই পারছি না!'

'কিছু আসে যায় না,' হেসে উঠে বলল রানা। বাম-ব্যাগ থেকে অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটা জিনিস ছাড়া সব বের করে ফেলল ও, তারপর সেটা কোমরে জড়িয়ে নিল। 'লাফ দিন, উঠে পড়ুন ঘোড়ার পিঠে।'

রানার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল নিমা। 'কি বলছেন!' তারপর চোখ তুলে ট্রেইলের দিকে তাকাল, খাড়া একটা মইয়ের মত উঠে গেছে। মাথা নাড়ল ও। 'অসম্ভব!'

'এই স্টেশন থেকে এটাই একমাত্র ট্রেন ছাড়ছে,' বলে নিমার সামনে পিছন ফিরে বসল রানা। খানিক ইতস্তত করার পর ক্রল করে ওর পিঠে উঠে পড়ল নিমা।

কিছু দূর উঠতেই হাঁপিয়ে গেল রানা, রসালাপ থেমে গেছে। ঘামে ওর শার্ট ভিজে গেল, সেই ঘাম নিমার শার্ট ভিজিয়ে দিয়ে চামড়ায় পৌঁছে গেল। উষ্ণ ভেজা ভেজা ভাবটুকু অন্য সময় হলে হয়তো অশ্লীল লাগত, এখন লাগল না। পুরুষ-পুরুষ গন্ধটাও খারাপ লাগছে না ওর, বরং আরাম আর স্বস্তিদায়ক বলে

মনে হচ্ছে।

প্রতি আধ ঘন্টা পরপর নিমাকে নামিয়ে বিশ্রাম নিল রানা, চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকল যতক্ষণ না আবার নিয়মিত হয় শ্বাস-প্রশ্বাস। বিশ্রাম বলতে ওইটুকু, দম ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার পিঠে বোঝা তুলে নিয়ে খাড়া ট্রেইল ধরে ওঠা; এভাবে সারাটা দিন পেরিয়ে গেল। তারপর একটা বাঁক ঘুরতেই ট্রেইলের সামনে ঝুলে থাকতে দেখা গেল জলপ্রপাতটাকে, লেস লাগানো পর্দার মত; হোঁচট খেতে খেতে বিপুল জলরাশির পিছনে চলে এল রানা, গুহার ভেতর ঢুকে নিমাকে মেঝেতে নামাল। কাত হয়ে ঢলে পড়ল একপাশে, লাশের মত স্থির হয়ে গেল।

আবার যখন চোখ মেলল রানা ততক্ষণে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে সন্ন্যাসীদের রেখে যাওয়া স্তূপ থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করেছে নিমা, ছোট একটা আগুন ধরিয়েছে। রানা উঠে বসতে যাচ্ছে দেখে ঝুঁকল ও, রানার মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে বলল, 'ওহ্ রানা, আজ আপনি আমার জন্যে যা করলেন, আমি এর প্রতিদান দেব কিভাবে?'

কৌতুক করে কিছু বলতে গিয়েও বলল না রানা, আসলে শক্তিতে কুলাল না। নিমার আলিঙ্গনের ভেতর চুপচাপ শুয়ে থাকল, ভয় লাগছে এই আরামটুকুর মেয়াদ হঠাৎ না শেষ হয়ে যায়। নিমা ওর মুখে আর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। 'বোকা নাকি!' হঠাৎ বলে উঠল রানা, নিমার চোখ থেকে গরম দু'ফোঁটা পানি পড়েছে ওর গালে। 'এর মধ্যে কাঁদার কি হলো?'

ধীরে ধীরে রানার মাথাটা নামিয়ে দিল নিমা, একটু সরে বসল। 'গৃহকর্তাকে স্যামন বা শ্যাম্পেন দিয়ে খুশি করতে পারছি না,' বলল ও। 'নির্ভেজাল ও পুষ্টিকর পাহাড়ী জল পেলে চলবে কি?' ভেজা চোখে হাসল ও। 'মেয়েরা কেন কাঁদে, পুরুষরা তা কোনদিনই বুঝতে পারে না, কাজেই সে প্রসঙ্গ থাক।'

'শুধু পানি খেয়ে রাত কাটাব?' মাথা নাড়ল রানা। বাম-ব্যাগ থেকে টর্চ বের করল, গুহার মেঝে থেকে খুঁজে নিল মুঠো আকৃতির একটা পাথর। টর্চের আলো ওপর দিকে তাক করতেই অসংখ্য পায়রার ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ উঠল। কার্নিসে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে ওগুলো। লক্ষ্যস্থির করে পাথরটা ছুঁড়ল রানা। এক ঢিলে তিন-চারটে পায়রা জখম হলো, তাড়াতাড়ি ছুরি বের করে সব ক'টাকে জবাই করল ও নিমার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'রোস্ট খেতে কেমন লাগবে গৃহকর্ত্রীর?'

পায়রাগুলোকে আগুনে সেঙ্ক করার সময় নিমা জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের চুরি যাওয়া কাগজ-পত্র যে প্রক্সির হাতে পড়েছে তাতে এখন আর কোন সন্দেহ নেই, তাই না?'

'নেই,' বলল রানা। 'জলপ্রপাতের ওপর ওদের বেস ক্যাম্পে অ্যান্টেনা দেখেছি, মনে আছে? আমাদের ফটো আর কাগজ-পত্র টেলিফ্যাক্স করে রাফেল তার বসের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে, তাতেও কোন সন্দেহ নেই।'

'তারমানে প্রক্সির মালিক ট্যানাস-এর সমাধিতে পাওয়া ফলক সম্পর্কে সবই জানে এখন। আর সপ্তম ক্রোল তো আগেই পেয়েছে। লোকটা যদি নিজে

ইজিপ্টোলজিস্ট না-ও হয়, তেমন একজনকে ভাড়া করতে পারে।'

'আমার ধারণা লোকটা হায়ারোগ্লিফিক্স নিজেই পড়তে পারে। আমার আরও ধারণা, লোকটা নিশ্চয়ই একজন কালেক্টর হবে। এদের টাইপ আমার জানা আছে। অবসেশনে ভোগে, ম্যানিয়াক হয়ে ওঠে।'

'চাচার তালিকায় এই টাইপের লোক ছিল দু'জন ফ্রেড ম্যাকমোহন আর হেস ডুগার্ড।'

'দু'জনই হোমিসাইডাল কালেক্টর,' বলল রানা। 'ফারাও মামোসের ট্রেজার পাবার চেষ্টায় মানুষ খুন করতে ওদের বাধবে না।'

নিমা বলল, 'কিন্তু আমি ওঁদের সম্পর্কে যত দূর জানি, দু'জনেই বিলিওনেয়ার।'

'টাকার সঙ্গে খুব একটা সম্পর্ক নেই,' বলল রানা। 'এই গুপ্তধন ওরা কেউ পেলে ছোট্ট একটা আইটেমও কখনও বিক্রি করবে না। ভল্টে লুকিয়ে রাখবে, দেখতে দেবে না কাউকে। একা একা উপভোগ করবে ব্যাপারটা।'

'এই কালেক্টরদের কেন যেন পাগল মনে হয় আমার,' মন্তব্য করল নিমা।

'পাগলের চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক,' বলল রানা। 'আমরা বিশাল ধনী একটা ম্যানিয়াকের পাল্লায় পড়েছি।'

পাঁচ

পায়রার মাংস দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারল ওরা। তারপর কিছু না বলে গুহার পিছন দিকে চলে গেল নিমা, দেখেও না দেখার ভান করল রানা। খানিক পর নিমা ফিরে আসতে কিছু না বলে রানাও গেল, নিমা ভান করল লক্ষ্য করছে না। আরও খানিক পর পালা করে কাপড়চোপড় খুলে জলপ্রপাতের পানিতে গোসল করে এল দু'জন।

গুহাটা থেকে বেরুবার আগে পরস্পরের ক্ষত পরীক্ষা করল ওরা। রানার খুলির জখম দ্রুত সেরে উঠছে, কিন্তু নিমার হাঁটুর অবস্থা কালকের মতই খারাপ। ব্যানড্যানাটা আবার বেঁধে দেয়া ছাড়া করার মত কিছু নেই রানার।

ব্যাম-ব্যাগ আর ডিক-ডিকের ছাল এখানে ফেলে রেখে যেতে হচ্ছে রানাকে। শরীরের সঞ্চিত শক্তি খরচ হতে শুরু করেছে, অতিরিক্ত এক পাউন্ড বোঝাও কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে, চূড়ায় পৌঁছুনোর আগে ট্রেইলের ওপরই ঢলে পড়তে পারে শরীর। ডে-প্যাকে ক্যামেরা সহ তিন রোল ডেভলপ না করা ফিল্ম ছিল, প্রতিটি প্লাস্টিক ক্যাপসুলে ভরা। ডে-প্যাকে ছিল বলেই প্রক্সির খুনীদের হাতে পড়েনি ওগুলো। ট্যানাস সমাধির ফলকে পাওয়া হায়ারোগ্লিফিক্স-এর একমাত্র রেকর্ড এগুলো, হারাবার ঝুঁকি রানা নিতে পারে না। কাজেই খাকি শার্টের বুক-পকেটে ভরে বোতাম লাগিয়ে দিল। ব্যাগ আর ছাল গুহার পিছন দিকের একটা ফাটলে

গুঁজে রাখল, পরে সুযোগ মত নিয়ে যাবে।

প্রস্তুতি নেয়ার পর শুরু হলো ওদের সবচেয়ে কঠিন যাত্রা। ট্রেইলের এই শেষ অংশটুকু অসম্ভব দুর্গম। প্রথম দিকে রানার কাঁধে হাত রেখে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল নিমা। কিন্তু মাত্র এক ঘণ্টা পরই পরাজয় স্বীকার করল, বলল, 'আর পারছি না।'

'কে বলেছে পারতে হবে?' নিমার সামনে পিছন ফিরে বসে পড়ল রানা।

আবার রওনা হবার পর দেখা গেল বিশ্রাম নেয়ার জন্যে ঘন ঘন থামছে রানা। ট্রেইল যেখানে ভাল, রানার পিঠ থেকে নেমে এক পায়ে হাঁটল নিমা, রানা এক হাতে জড়িয়ে ধরে রাখল ওকে। তারপর এক সময় ঢলে পড়ল নিমা, ওকে আবার নিজের পিঠে তুলে নিতে হলো রানার।

যাত্রাটা দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠছে। দু'জনেই সময়ের হিসাব ভুলে গেল। অসহ্য যন্ত্রণার ভেতর ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে যাচ্ছে এক সময় দেখা গেল ট্রেইলের ওপর পাশাপাশি পড়ে আছে ওরা, অসুস্থ, বমি করছে, ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর, ব্যথায় গোঙাচ্ছে।

'রানা, আপনি যান···আমাকে রেখে আপনি উঠে যান

সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল রানা 'পাগল নাকি!' চোখ রাঙাল ও।

'চূড়া আর বেশি দূরে নয়,' জিদ ধরল নিমা। 'উত্তাভের লোকজনকে ডেকে আনবেন, ওরা আমাকে তুলে নিয়ে যাবে।'

'ওরা ওখানে না-ও থাকতে পারে। প্রক্সির লোকজন আপনাকে পেয়ে যেতে পারে।' টলতে টলতে সিধে হলো রানা। 'উঠুন!' ধমক দিল ও। হাত ধরে সাহায্য করল দাঁড়াতে।

রানা পা ফেলছে, নিমা গুনছে রানারই নির্দেশ। একশো পর্যন্ত গোনা শেষ হলেই থেমে বিশ্রাম নিচ্ছে ও। দম ফিরে পেলেই আবার শুরু করছে যাত্রা। রানার গলাটা দু'হাতে জড়িয়ে রেখেছে নিমা, গুনছে ওর কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে। গোটা বিশ্ব যেন কুঁকড়ে ওদের সামনে সরু ট্রেইলে পরিণত হয়েছে ট্রেইলের একপাশে যে পাহাড়-প্রাচীর মাথাচাড়া দিয়েছে বা অন্য পাশে রয়েছে গভীর খাদ, সে-সম্পর্কে দু'জনের কেউই সচেতন নয়। রানা হোঁচট খেলে বা ঝাঁকি দিয়ে পিঠের বোঝাটা অ্যাডজাস্ট করলে হাঁটুর ব্যথা ইলেকট্রিক শকের মত নিমার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। দাঁতে দাঁত পিষে সহ্য করছে ও, রানাকে বুঝতে দিতে চায় না, চোখ বুজে গুনছে।

এরপর বিশ্রাম নেয়ার সময় পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে হেলান দিয়ে বসে থাকে রানা, জানে শুয়ে পড়লে আর উঠে বসতে পারবে না। তারপর বিশ্রাম নেয়ার সময় নিমাকে পিঠ থেকে নামাল না। কারণ আবার পিঠে তোলা বড় বেশি কষ্টকর।

'প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে,' রানার কানে ফিসফিস করল নিমা। 'আজ রাতের মত এখানেই থামুন। আপনি নিজেকে খুন করে ফেলছেন।'

'আর একশো কদম,' অস্ফুটে বলল রানা।

'না, রানা। নামিয়ে দিন আমাকে!'

জবাবে পাথুরে পাঁচিল থেকে কাঁধ সরিয়ে টলমল করতে করতে সিধে হলো

রানা, ট্রেইল বেঁয়ে ওপরে উঠছে। 'কাউন্ট!' নির্দেশ দিল।

'ফিফটি-ওয়ান, ফিফটি-টু,' নির্দেশ পালন করল নিমা। হঠাৎ করে পায়ের তলায় বিরাট একটা পরিবর্তন ঘটল, ফলে পড়ে যাবার অবস্থা হলো রানার। মাতালের মত বিক্ষিপ্ত পা ধাপে তুলতে চেয়েছিল, কিন্তু আর কোন ধাপ ওখানে নেই, পথটা অকস্মাৎ সমান হয়ে গেছে।

কোন রকমে ভারসাম্য রক্ষা করল রানা। খাদের কিনারায় টলমল করছে শরীরটা, গোধূলির আবছা অন্ধকার সামনে, কি দেখছে ভাল করে বুঝতে পারছে না। অন্ধকারে আলো আছে, তবে ধারণা করল চোখে ভুল দেখছে ও। তারপর কানে এল লোকজনের আওয়াজ। মাথাটা ঝাঁকাল রানা, বাস্তবে ফিরে আসতে চাইছে।

'ওহ্, ডিয়ার গড! রানা, ওহ্ রানা! আপনি পেরেছেন! আমরা চূড়ায়! ওই তো আমাদের ভেহিকেল! আপনি জিতেছেন, রানা! ইউ ডিড ইট, ম্যান। ইউ আর সো সুইট।'

কথা বলতে চাইছে রানা, কিন্তু গলা শুকিয়ে যাওয়ায় কোন শব্দ বেরুচ্ছে না। আলোটার দিকে এগোচ্ছে ও, ওর পিঠ থেকে চিৎকার জুড়ে দিল নিমা। 'এদিক আসুন, প্লীজ! প্লীজ, আমাদেরকে সাহায্য করুন!' প্রথমে ইংরেজিতে, তারপর আরবীতে। 'প্লীজ, সাহায্য করুন!'

আঁতকে ওঠার আওয়াজ হলো, তারপরই শোনা গেল লোকজনের ছুটোছুটির শব্দ। ধীরে ধীরে নিচু হলো রানা, নরম ঘাসে নিমাকে শুইয়ে দিল। গাঢ় ছায়ামূর্তিরা ঘিরে ধরল ওদেরকে। তারপর টর্চের আলো পড়ল রানার মুখে, বিশুদ্ধ ইংরেজিতে কথা বলে উঠল পুরানো বন্ধু ব্যারি গরডন। 'হ্যালো, রানা? নাইস সারপ্রাইজ। আদ্দিস থেকে আমি তোমার লাশের খোঁজে এসেছি। শুনলাম তুমি নাকি মারা গেছ, হাহ্?'

'হ্যালো, ব্যারি! এত কষ্ট করার জন্যে ধন্যবাদ, দোস্ত

দুটো ক্যাম্প চেয়ার আনতে বলল গরডন, যত্ন করে তাতে বসানো হলো রানা আর নিমাকে। কয়েক মিনিটের মধ্যে দু'জনের হাতে ধরিয়ে দেয়া হলো ধূমায়িত কফির মগ। খানিক পর রানা বলল, 'কোত্থেকে কি শুনেছ বলো আমাকে, ব্যারি। এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।'

'প্রথম খবর পাই সুদান সীমান্তের কাছে নদী থেকে তোমার গাইড ভ্লাদিমির উস্তাভের লাশ পাওয়া গেছে, বুলেটে ঝাঁঝরা।'

নিমার দিকে তাকাল রানা, ভুরু কুঁচকে সাবধান করে দিল। 'তার সম্পর্কে শেষ খবর জানি আমরা, একা একটা স্কাউটিং এক্সপিডিশনে বেরুল। চার রাত আগে আমাদের ক্যাম্প হামলা করে শুফতারা, সে-ও হয়তো তাদের সামনে পড়ে যায়।'

'হ্যাঁ, তোমাদের ওপর হামলার খবরও পেয়েছি আমরা। কর্নেল ঘুমা রেডিও মেসেজ পাঠিয়েছিলেন আদ্দিসে।'

লোকজনের ভিড়ে কর্নেল ঘুমা রয়েছেন, ভিড় ঠেলে এগিয়ে না আসা পর্যন্ত তাঁকে ওরা দেখতে পেল না। ক্যাম্প লণ্ঠনের আলোয় এসে দাঁড়ালেন তিনি, তাঁর

দিকে চোখ পড়তে শিউরে উঠে আড়ষ্ট হয়ে গেল নিমা। ও কিছু বলে ফেলবে, এই ভয়ে ওর হাতটা ধরে জোরে চাপ দিল রানা।

'আপনাকে দেখে বড়ই আনন্দ বোধ করছি, মি. রানা,' কর্নেল ঘুমা সাদা দাঁত বের করে অমায়িক হাসলেন। 'আমাদের সবাইকে আপনি ভয়ানক দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলেন!'

'সেজন্যে ক্ষমা চাই,' বিনয়ের অবতার সাজল রানাও।

'প্লীজ, স্যার,' বললেন কর্নেল, 'ভুল বুঝবেন না। প্রক্সি এক্সপ্লোরেশন-এর তরফ থেকে আমরা একটা রিপোর্ট পাই, তাতে বলা হয়েছে একটা ব্লাস্টিং অ্যাক্সিডেন্টের মধ্যে পড়ে যান আপনারা। এক্সপ্লোরেশন কোম্পানীর জ্যাক রাফেল যখন আপনাদেরকে সাবধান করে বলেন যে খাদের ভেতর তারা পাথর ধসাচ্ছে, আমি তখন ওখানে উপস্থিত ছিলাম।'

'কিন্তু আপনি...' রেগে গিয়ে ফোঁস করে ফণা তুলল নিমা, তবে রানা আবার ওর হাতে জোরে চাপ দিতে থেমে গেল।

'আপনি যেমন বলছেন, যা কিছু ঘটেছে তার জন্যে আমাদের অবহেলাই সম্ভবত দায়ী,' বলল রানা। 'তবে আমাদের তেমন কোন ক্ষতি হয়নি, ক্ষতি যা হবার ক্যাম্প স্টাফ আর সন্ন্যাসীদের হয়েছে। ওরা বেশ কয়েকজন আমাদের সঙ্গে ছিল, সবাই মারা গেছে। আদ্দিসে পৌঁছে কর্তৃপক্ষের কাছে ফুল স্টেটমেন্ট দেব আমি।'

'আশা করি আপনি কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনছেন না?'

'কারও বিরুদ্ধেই আমাদের কোন অভিযোগ নেই, কর্নেল ঘুমা,' বলল রানা। 'আপনার বিরুদ্ধে তো নয়ই। খাদের ভেতর শুফতারা আছে, এ-কথা বলে আপনি আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া, আপনি যেখানে উপস্থিত ছিলেন না, এ-সব ঠেকাতেন কিভাবে?'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, মি. রানা।' কর্নেলকে সন্তুষ্ট দেখাল। 'এবার বলুন, স্যার, আপনাদের জন্যে কি করতে পারি আমি?'

ওরে শালা, মনে মনে গাল দিল রানা। তারপর জোর করে হাসল ও। 'দেখুন আপনি আমার এই উপকারটা করতে পারেন কিনা। ডানডেরা জলপ্রপাতের নিচের গুহায় আমি আমার ব্যাগ আর হান্টিং ট্রফি ফেলে এসেছি। ব্যাগটায় আমাদের পাসপোর্ট আর ট্যাভেলার্স চেক আছে। একজন লোককে পাঠিয়ে ওগুলো আনিয়ে দিতে পারলে সত্যি কৃতজ্ঞ বোধ করব।' হবু আততায়ীকে দিয়ে এত নগণ্য একটা কাজ করাচ্ছে ভেবে হাসি পেল রানার।

কর্নেল ঘুমা আপাতত সরে গেলেন। গরডনকে রানা জিজ্ঞেস করল, 'এখানে তুমি পৌঁছুলে কিভাবে?'

'হালকা প্লেন নিয়ে ডেবরা মারিয়ামে আসি। ওখানে একটা ইমার্জেন্সী ল্যান্ডিং ফিল্ড আছে। কর্নেল ঘুমা দেখা করেন, আর্মি জীপে চড়িয়ে এখানে নিয়ে আসেন আমাদেরকে। পাইলট আর প্লেন ডেবরা মারিয়ামে অপেক্ষা করছে।'

ক্যাম্পের একজন সার্জেন্ট এসে খবর দিল, রানা আর নিমার গোসলের জন্যে

গরম পানি দেয়া হয়েছে।

পরদিন সকালে ডেবরা মারিয়াম থেকে প্লেনে চড়ে আদ্দিস আবাবায় ফিরছে ওরা। পাইলটের সঙ্গে সামনে বসেছে গরডন, নিমাকে নিয়ে রানা পিছনে। কাল রাতে নিভৃতে আলাপ করার সুযোগ হয়নি, প্লেনে বসে সেটা সেরে নিচ্ছে ওরা দু'জন। ডিক-ডিকের ছালটা রয়েছে রানার সীটের নিচে। কাল রাতেই একজন লোককে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কর্নেল ঘুমা, আজ সকালে ব্যাগ আর ছাল ফিরে পেয়েছে ও।

কাল রাতে গরডনের মুখ থেকে ওরা শুনেছে, ওদের নিখোঁজ সংবাদ ইংল্যান্ডে পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তারা তৎপর হয়ে ওঠেন, ওপরমহলে ধরাধরি করে হোয়াইট হলে পৌঁছান তাঁরা, কথা বলেন পররাষ্ট্র ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মাসুদ রানা ইংল্যান্ডেরও নাগরিক, আর যেহেতু ইথিওপিয়ায় বাংলাদেশের কোন কূটনৈতিক প্রতিনিধি নেই, তাই ব্রিটিশ সরকারকে অনুরোধ করা হয় তারা যেন প্রকৃত অবস্থা জানতে চেষ্টা করেন। হোয়াইট হলে আরও একজন পৌঁছান, তিনি হলেন নিমার মা। তিনিও তাঁর মেয়ের খোঁজ বের করার জন্যে চাপ দেন।

হোয়াইট হল থেকে সেই থেকে একের পর এক ফ্যাক্স আসছে। এখন যখন ওদের খোঁজ পাওয়া গেছে, ইথিওপিয়ার পুলিস কমিশনার বলেছেন তিনি নিজে রানা ও নিমার সঙ্গে কথা বলবেন। প্লেনে বসে ওরা দু'জন সিদ্ধান্ত নিল, উস্তাভের মৃত্যুর সঙ্গে অ্যালান শাফিকে কোনভাবেই জড়ানো চলবে না। আরও সিদ্ধান্ত হলো, প্রক্সিকে তো বটেই, ইথিওপিয়ান কর্তৃপক্ষকেও কোনভাবে সতর্ক করা হবে না। ওদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রক্সি, এটা ওরা জানে বলে স্বীকার করলে প্রতিপক্ষ ভয়ংকর কোন পদক্ষেপ নিতে পারে। আর ইথিওপিয়া কর্তৃপক্ষ যদি বুঝতে পারে মামোসের গুপ্তধন পাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, ওদের ভিসা বাতিল হয়ে যাবে, এমনকি ওদেরকে ইথিওপিয়ায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা করাও হতে পারে। অজ্ঞতার ভান করে নিরীহ ভাল মানুষ সাজাই সব দিক থেকে ভাল।

রানা আর নিমার ব্যাপারে লন্ডন এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছে যে, ব্রিটিশ অ্যামব্যাসাডর ওদেরকে নিজের বাড়িতে অতিথি হবার আমন্ত্রণ জানালেন গরডনের মাধ্যমে। তিনতলায় পাশাপাশি দুটো বেডরুম ছেড়ে দেয়া হলো ওদেরকে। উর্দি পরা বাটলার দু'জনকে দুই প্রস্থ কাপড়চোপড় দিয়ে গেল পাশের কামরার সংলগ্ন বাথরুম থেকে নিমার শাওয়ার সারার আওয়াজ শুনল রানা নিজের বাথটাবে আধ শোয়া অবস্থায়। খানিক পর বেডরুম থেকে ডাক্তারের গলা ভেসে এল, নিমার হাঁটু প্রসঙ্গে কথা বলছেন

ডিনারের খানিক আগে জানা গেল, সভ্য জগতে ওদের ফিরে আসা উপলক্ষে অ্যামব্যাসাডর রীতিমত একটা পার্টির আয়োজন করেছেন, অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বের মধ্যে দাওয়াত দেয়া হয়েছে ইথিওপিয়ার পুলিস কমিশনার জেনারেল উর্মিদ মানামাকেও।

অ্যামব্যাসাডর নিজে রানা ও নিমার সঙ্গে জেনারেলের পরিচয় করি...

দিলেন। উর্মিদ মানামা দীর্ঘদেহী মানুষ, ব্লু মেস ইউনিফর্ম তাঁকে মানিয়েছেও খুব। হ্যান্ডশেক করার সময়, নিমার হাতের ওপর কপালটা প্রায় ঠেকিয়ে ফেললেন ভদ্রলোক। খুবই রসিক আর হাসিখুশি মানুষ তিনি। রানার কাঁধ চাপড়ে প্রশংসা করলেন, 'আপনি অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন, স্যার! এ কি বিশ্বাস করার মত ঘটনা, কাঁধে আহত বান্ধবীকে নিয়ে এসকার্পমেন্ট বেয়ে উঠে আসা! আই কংগ্রাচুলেট ইউ, স্যার!' তারপর তিনি মনে করিয়ে দেয়ার সুরে বললেন, 'কাল আপনাদের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট। স্রেফ একটা রুটিন ইন্টারভিউ, আপনাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে চাই।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বলল রানা। 'কখন যেতে বলেন, জেনারেল?'

'সকাল এগারোটার দিকে আমার ড্রাইভার এসে নিয়ে যাবে।'

ডিনার শেষ হবার পর যে যার নিজের কামরায় ফিরে এল ওরা। কাপড় ছাড়তে যাচ্ছে নিমা, নক হলো দরজায়। কবাট সামান্য একটু ফাঁক করে বাইরে তাকাল ও, দেখল হাতে একটা কাগজ নিয়ে করিডরে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। 'এখানে এসেই লন্ডনে একটা ফ্যাক্স পাঠিয়ে ছিলাম, তার উত্তর এসে গেছে—ঘরে ঢুকে দেখি মেঝেতে পড়ে রয়েছে। ভদ্রবেশে আছেন তো?'

'এক মিনিট,' বলে দরজা বন্ধ করে দিল নিমা, খানিক পর আবার খুলল। 'আসুন।'

ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল রানা। 'প্রক্সির মালিককে এখন আমরা চিনি, নিমা।'

'কে, বলুন!' দুই হাত মুঠো করল নিমা।

একটা চেয়ার টেনে এনে রানা বলল, 'বসুন।' নিমা বসার পর ফ্যাক্স পেপারের ভাঁজ খুলে চোখ বুলাল আরেকবার। 'প্রক্সির পঁয়ষট্টি ভাগ শেয়ারের মালিক ভনহালা মাইনিং কোম্পানী, বাকি পঁয়ত্রিশ পার্সেন্টের মালিক অস্ট্রিয়ার ইকো মেটালস। প্রক্সি এক্সপ্লোরেশন অস্ট্রেলিয়ার সিডনি স্টক এক্সচেঞ্জে রেজিস্ট্রি করা, শেয়ার ক্যাপিটাল বত্রিশ মিলিয়ন...'

'এত ডিটেলস কে শুনতে চায়! আপনি আমাকে লোকটার নাম বলুন!'

'ভনহালা আর ইকো, দুটোরই আবার মালিক ডিএমআই- ডয়েটস ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ ডিএমআই-এর সমস্ত শেয়ারের মালিক হেস ডুগার্ড ফ্যামিলি ট্রাস্ট। দু'জন মাত্র ট্রাস্টি-হেস ডুগার্ড আর তাঁর স্ত্রী ইনগ্রিড।'

'হেস ডুগার্ড!' বিড়বিড় করল নিমা, এখনও রানার দিকে তাকিয়ে। 'সম্ভাব্য স্পনসর হিসেবে হাসলান চাচা তালিকায় তাঁর নাম রেখেছিল। উইলবার কিথের বইটা নিশ্চয়ই তিনি পড়েছেন। আমি জানি, জার্মান ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে ওটা। আপনার মত তিনিও সম্ভবত চাচার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন।'

'আমারও তাই ধারণা,' বলল রানা। 'কায়রো মিউজিয়ামের ভেতর আপনারা চাচা ভাইঝি কি করছিলেন, এটা জেনে নেয়া কঠিন কোন ব্যাপার ছিল না। বাকিটা তো সবই আমরা জানি।'

'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তিনি প্রক্সিকে ইথিওপিয়ায় নিয়ে গেলেন কিভাবে?'

'ব্যারি আমাকে জানিয়েছে, ওখানে তারা একটা কনসেশন পায় পাঁচ বছর

আগে। স্কোল হাতে পাবার অনেক আগে থেকে ওখানে রয়েছেন হেস ডুগার্ড। শুধু বেস ক্যাম্পটা অ্যাবি খাদে সরিয়ে আনতে হয়েছে ওদেরকে। খোঁজ নিলে জানা যাবে জ্যাক রাফেল হেস ডুগার্ডের একজন ম্যাসলম্যান। কর্নেল ঘুমাও ওদের পকেটে।'

'সব কিছু মিলে যাচ্ছে,' বলল নিমা। 'বসকে রাফেলই ওখানে আমাদের পৌঁছানোর খবর দেয়। হেস ডুগার্ডের নির্দেশেই, শুফতাদের দিয়ে আমাদের ক্যাম্পে হামলা করা হয়।'

'যাক, এখন অন্তত আমরা জানি কার সঙ্গে লড়ছি।'

মাথা নাড়ল নিমা। 'এই কাজে হেস ডুগার্ডকে কেউ সাহায্য করছে। কায়রোর কোন লোক।'

রানা জানতে চাইল, 'আপনার মিনিস্টারের নামটা যেন কি?'

'আরে না!' সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল নিমা। 'আতাহার আবু কাসিম হতে পারেন না! আমি তাঁকে সারাজীবন ধরে চিনি। অত্যন্ত সৎ মানুষ। সততার টাওয়ার বলব আমি।'

'মোটা টাকা ঘুষ পেলে এরকম বহু টাওয়ারকে কাত হয়ে যেতে দেখেছি আমি,' নরম সুরে বলল রানা, শুনে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল নিমা।

পরদিন সকালে পুলিস কমিশনারের গাড়ি হেডকোয়ার্টারে নিয়ে এল ওদেরকে। খুব আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালেন জেনারেল উর্মিদ মানামা বেশ কিছু প্রশ্ন করলেন তিনি, ইন্সপেক্টর সালাম সব লিখে নিলেন। ভ্লাদিমির উস্তাভ যে কেজিবির অফিসার ছিল, ওরা সেটা জানে কিনা জিজ্ঞেস করা হলো ইন্টারভিউ শেষ হতে একটা বিবৃতি টাইপ করা হলো, পড়ে দেখার পর সেটায় সই করল রানা। বিদায় দেয়ার সময় জেনারেল বললেন, 'যে-কোন ধরনের সাহায্য দরকার হলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবেন, মি. রানা, স্যার।' এরপর নিমার দিকে তাকালেন তিনি। 'আমি আশা করব আবার আপনি ইথিওপিয়ায় বেড়াতে আসবেন।'

'আসব না মানে! কিছুদিনের মধ্যেই আবার আমাদেরকে দেখতে পাবেন আপনি!' হাসছে নিমা।

বাইরে বেরিয়ে এসে রানাকে বলল ও, 'সত্যি, এরকম ভাল মানুষ আজকাল দেখা যায় না।'

'আমারও তাই ধারণা,' বলল রানা।

পরদিন সকালে ডাইনিং রুমে ব্রেকফাস্ট করতে নেমে দু'জনেই ওরা একটা করে এনভেলাপ পেল, ডাইনিং টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে। ওয়েটারকে কফি দিতে বলে নিজের এনভেলাপটা খুলল রানা। পড়ার পর অবাক হয়ে তাকাল নিমার দিকে, বলল, 'জেনারেল মানামা আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন! আপনাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে দুপুরের আগে পুলিস হেডকোয়ার্টারে হাজির হবেন মানে? প্লীজ বা থ্যাঙ্ক ইউ গেল কোথায়?'

'আমাকেও একই নির্দেশ দেয়া হয়েছে,' বলল নিমা। 'আমিও জানতে চাই,

এর মানে কি?

'ওখানে না গেলে জানা যাবে না।'

আজ সকালে কিন্তু ওদের কপালে উষ্ণ অভ্যর্থনা জুটল না। গার্ড ওদেরকে জেনারেল চার্জ অফিসে পাঠিয়ে দিল। ওখানে ডেস্ক অফিসারের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী ভুল বোঝাবুঝির ঝামেলা শুরু হলো। লোকটা ইংরেজি প্রায় জানে না বললেই হয়। অবশেষে টেলিফোনে ফিসফিস করে কার সঙ্গে যেন কথা বলল সে, কথা শেষ করে দেয়াল ঘেঁষে ফেলা কাঠের বেঞ্চ দেখিয়ে বসতে বলল ওদেরকে।

চল্লিশ মিনিট গরমে সেদ্ধ হলো ওরা। চোর-বদমাশদের ধরে এনে জেরা করা হচ্ছে, এটা ছাড়া উপভোগ করার মত আর কিছু নেই এখানে। অবশেষে ইন্সপেক্টর সালামকে পার্টিশনের দরজায় দেখা গেল; কালকের মত হাসলেন না, মুখ হাঁড়ি করে আছেন, হাতছানি দিয়ে ডাকলেন ওদেরকে। এগিয়ে এসে হাতটা বাড়িয়ে দিল রানা, ইন্সপেক্টর দেখতে না পাবার ভান করে ওদেরকে পথ দেখিয়ে পিছন দিকের একটা কামরায় নিয়ে এলেন। বসার কোন অনুরোধ এল না, রানাকে বলা হলো, 'আপনার দখলে একটা আগ্নেয়াস্ত্র ছিল, সেটা হারিয়ে ফেলার জন্যে আপনিই দায়ী।'

'হ্যাঁ, আমি আমার স্টেটমেন্টে বলেছি...'

ওকে বাধা দিয়ে ইন্সপেক্টর সালাম বললেন, 'অবহেলা করে আগ্নেয়াস্ত্র হারানো অত্যন্ত সিরিয়াস অফেন্স।'

'আমার তরফ থেকে কোন অবহেলা হয়নি,' অস্বীকার করল রানা।

'অস্ত্রটার ওপর আপনি নজর রাখার ব্যবস্থা করেননি। স্টীল সেফে ভরে রাখার কোন চেষ্টা করেননি।'

'অ্যাবি খাদে স্টীল সেফ, ইন্সপেক্টর?'

'অবহেলা,' বললেন ইন্সপেক্টর। 'অপরাধতুল্য অবহেলা। আমরা জানব কিভাবে অস্ত্রটা সরকারবিরোধী দুষ্কৃতকারীদের হাতে পড়েনি?'

'আপনি বলতে চাইছেন অজ্ঞাত পরিচয় কোন ব্যক্তি একটা রিগবি দিয়ে সরকারকে উৎখাত করতে পারে?'

রানার বিদ্রূপ গ্রাহ্য না করে দেরাজ খুলে দুই প্রস্থ ডকুমেন্ট বের করলেন সালাম। 'এগুলো আপনাদের বহিষ্কার আদেশ। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ইথিওপিয়া ছেড়ে যেতে হবে।'

অনেক তর্ক-বিতর্ক করেও কোন লাভ হলো না। অবশেষে রানা বলল, 'জেনারেল উর্মিদ মানামার সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি।'

'তিনি উত্তর সীমান্তে গেছেন, কয়েক হপ্তা পর ফিরবেন। প্লীজ, ডকুমেন্টে সই করুন।'

পরদিন ওদেরকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেয়ার সময় ব্যারি গরডন বারবার একই কথা বলছে, 'মি. অ্যামব্যাসাডর সাংঘাতিক রেগে গেছেন। আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ তো জানিয়েছেনই, আরও যা যা করার সবই তিনি করবেন...'

'এটা নিয়ে এত হৈ-চৈ করার দরকার কি,' বলল রানা। 'দু'জনের কেউই

আমরা এখানে আর ফিরে আসতে ইচ্ছুক নই। কাজেই বলা চলে না যে আমাদের কোন ক্ষতি হয়েছে।'

'কিন্তু তুমি আমার বন্ধু, তাছাড়া ব্রিটিশ সাবজেক্ট...'

'সবই ঠিক, তবু এত গুরুত্ব না দিলেও চলে।'

কেনিয়া এয়ারওয়েজের টিকেট আগেই বুক করা হয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ে প্লেনে চড়ে বসল ওরা। বিদায়ের সময় গরডনকে খুব বিষণ্ণ দেখাল। 'ছুটিছাটায় লন্ডনে গেলে আমার খোঁজ কোরো,' উৎসাহ দিয়ে হাসল রানা।

প্লেন গড়াতে শুরু করেছে, এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙকে পাশ কাটিয়ে এল। হঠাৎ রানার পাশের সীটে আড়ষ্ট হয়ে গেল নিমা। 'দেখুন!' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। 'প্রক্সি!'

এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙের দূর প্রান্তে একটা একজিকিউটিভ জেট এইমাত্র স্থির হলো প্লেনটা সবুজ রঙ করা, লম্বা টেইল ফিন-এ আঁকা হয়েছে সেই লাল ঘোড়ার ছবি–পিছনের পায়ে ভর দিয়ে আছে, সামনের পা দুটো শূন্যে। ওরা তাকিয়ে আছে, জেটের দরজা খুলে গেল। অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে ছোট্ট একটা ভিড় তৈরি হয়েছে টারমাকে। জেটের দরজায় প্রথমে উদয় হলেন ছোটখাট একজন মানুষ, পরনে ক্রীম ট্রপিক্যাল সুট, মাথায় সাদা পানামা হ্যাট। আকার-আকৃতি যা-ই হোক, ভদ্রলোকের হাবভাবে আত্মবিশ্বাস আর কর্তৃত্বের ছাপ স্পষ্ট। মাথা উঁচু করে রাখার ভঙ্গিটা দম্ভ হতে পারে, ঘাড় ফিরিয়ে তাকানোর ধরনটা ক্ষমতার গর্ব হওয়া বিচিত্র নয়। তাঁর চোয়াল কঠিন, যেন সারাক্ষণ জেদ ধরে আছেন।

দেখামাত্র চিনতে পারল রানা। ক্রিস্টি সহ নামকরা দু'একটা অকশন ফ্লোরে বেশ কয়েকবারই হেস ডুগার্ডকে দেখেছে ও। 'হেস ডুগার্ড,' বিড়বিড় করল ও।

'আমার চোখে লাগছে ফণা তোলা গোক্ষুর!'

সিঁড়ি বেয়ে জেট থেকে তরতর করে নেমে আসছেন হেস ডুগার্ড।

'দেখে বিশ্বাস হয়, ভদ্রলোকের বয়েস সত্তর? জিজ্ঞেস করল রানা। 'চুল আর ভুরু রঙ করেছেন, তা না হলে এত কালো দেখাত না।'

'সর্বনাশ, এ আমি কাকে দেখছি!' হঠাৎ আঁতকে উঠল নিমা।

ছোট্ট ভিড়টা থেকে বিচ্ছিন্ন হলেন ব্লু ইউনিফর্ম পরা জেনারেল উর্মিদ মানামা হেস ডুগার্ডকে স্যালুট করলেন তিনি।

'কি, বলিনি? হেস ডুগার্ডের পকেটে আরও কে কে আছে কে বলবে!'

'দেখুন, দেখুন!' আবার একবার আঁতকে উঠল নিমা, তাকিয়ে আছে জেটের দরজায়। এবার যে আরোহীটিকে ওখানে দেখা গেল তাঁর বয়েস বেশি নয় সুদর্শন তরুণ, মাথায় ঢেউ খেলানো কালো চুল, মাথায় হ্যাট নেই 'ওহ্ গড, কারিম ফারুকী!'

'কারিম ফারুকী...কে?'

'মিউজিয়ামে হাসলান চাচার অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল চাচার জায়গায় ওই এখন চাকরি করছে।'

টারমাক ধরে গড়াচ্ছিল ওদের প্লেন, হঠাৎ সেটার গতি বেড়ে গেল। প্রক্সির

জেট দৃষ্টিপথ থেকে সরে গেল। যে যার চেয়ারে হেলান দিল ওরা, বলা উচিত নেতিয়ে পড়ল।

'আর কোন সংশয় নেই। প্রতিপক্ষ কারা, পরিষ্কার হয়ে গেছে।'

মাথা ঝাঁকাল নিমা। 'হেস ডুগার্ড পাপেট-মাস্টার। আর কারিম ফারুকী তার শিকারী কুকুর। সন্দেহ নেই ফারুকীই কায়রোয় খুনীদেরকে ভাড়া করেছিল আমাদেরকে মেরে ফেলার জন্যে। ওহ্, রানা, চাচাকে কবর দেয়ার সময় ফারুকী কি বলেছিল তা যদি আপনি শুনতেন! চাচাকে নাকি পরম বন্ধু মনে করত সে, শ্রদ্ধা করত...'

নাইরোবি পৌঁছে প্লেন বদল করল ওরা, হিথরোতে পৌঁছুল পরদিন সকালে। ইতিমধ্যে ওরা দু'জন আলোচনা করে একটা প্ল্যান তৈরি করেছে, অ্যাবি গিরিখাদে ফিরে গিয়ে গহ্বরের ভেতর টাইটার পুল কিভাবে এক্সপ্লোর করা হবে।

লন্ডনে বৃষ্টি হচ্ছে। ট্যাক্সি নিয়ে রানার অফিস-কাম-রেসিডেন্সে পৌঁছুল ওরা। বাথরুমে ঢুকে শাওয়ারের নিচে দাঁড়াল নিমা, ছাতা মাথায় দিয়ে রাস্তার মোড়ের দোকান থেকে কয়েকটা জিনিস কিনে আনল রানা। দু'জন মিলে ব্রেকফাস্ট তৈরি করে খেলো। খাওয়া শেষ হতে রানা বলল, 'ফলকের ফিল্মগুলো ডেভলপ করিয়ে আনুন আপনি, আমার রেনকোটটা ধার হিসেবে নিয়ে যান। এদিকে আমি জরুরী কয়েকটা ফোন সারি।'

নিমা বেরিয়ে যেতে প্রাইভেট সেক্রেটারি স্বাতী চৌধুরীকে ফোন করল রানা। নিজের ফিরে আসার খবর দিয়ে বলল, 'নোটবুক আর পেন্সিল নাও তারপর শোনো কি কি করতে হবে তোমাকে।' দশ মিনিট ডিকটেশন দিল ও।

এরপর এক্স-রয়্যাল এঞ্জিনিয়ার টনি মারটিনকে ফোন করল রানা, ডেভনে ডাইভিং ও আন্ডারওয়াটার কনস্ট্রাকশনে এক্সপার্ট সে, প্রয়োজনে রানা এজেন্সির সঙ্গে চুক্তিতে কাজ করে। উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে তৈরি একটা জাগুয়ার আছে তার, শখ বলতে সেটা খুলে আবার জোড়া লাগানো আর মাছ ধরা। দু'বার রিঙ হতে রিসিভার তুলল, ভেসে এল মারটিনের গলা, 'কে হে?'

'রানা,' বলল ও। 'এজেন্সিরই কাজ, তবে ইংল্যান্ড ছেড়ে অনেক দূরে যেতে হতে পারে। একটু ঝুঁকিও আছে। সেই একই বেতন। রাজি?' কোন ভূমিকার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি প্রস্তাব দিল ও।

'ঠাট্টা কোরো না তো,' বলল মরটিন। 'তুমি ডাকলে কবে যাইনি? তবে বিস্তারিত সব জানতে হবে। কোথায় দেখা করব?'

'কাল আমার অফিস-কাম-ফ্ল্যাটে চলে এসো পাইপ রুলটা নিয়ে আসতে ভুলো না।' রানা জানে মারটিন পকেট কমপিউটর ব্যবহার করে না।

এরপর আন্দিস আবাবায় ফোন করে ব্যারি গরডনকে চাইল রানা। গরডন লাইনে আসতেই বলল, 'মিস নিমা তোমাকে শুভেচ্ছা আর ভালবাসা জানিয়েছেন।'

'বিশ্বাস করতে পারলে খুশি হতাম,' জবাব দিল গরডন। 'তোমরা তাহলে ভালয় ভালয় পৌঁচেছ, কেমন?'

'হ্যাঁ, কোন অসুবিধে হয়নি,' বলল রানা। 'আমার একটা উপকার করতে হয়, ব্যারি। কর্নেল মুসা মনসুর, ইথিওপিয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে কাজ করেন। তুমি তাঁকে চেনো?'

'সজ্জন ব্যক্তি,' বলল গরডন। 'খুব ভাল করে চিনি। শনিবারে তাঁর সঙ্গে টেনিস খেলেছি। কেন, কি দরকার তাঁকে তোমার?'

'আমি একটা ফোন নম্বর দিচ্ছি। তাঁকে তুমি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলবে। বলবে, ইমার্জেন্সী। প্লীজ, ব্যারি।' গরডনকে আর কোন প্রশ্ন করতে না দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

এরপর একে একে আমস্টারডাম, আলজিয়ার্স, খার্তুম আর রাবাতে ফোন করল ও, কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না নাসিমকে। কয়েক জায়গায় ফোন নম্বর দিয়ে রাখল, নাসিম যাতে বুঝতে পারে কে তাকে খুঁজছে।

আরও দুটো ফোন করল রানা, রিসিভার নামিয়ে রাখতেই কলিংবেল বেজে উঠল।

দরজা খুলে দিতে ভেতরে ঢুকল নিমা, কোটের পকেট থেকে হলুদ একটা প্যাকেট বের করে দেখাল রানাকে। 'আপনি সত্যি মাস্টার ফটোগ্রাফার। সবগুলো ছবি নিখুঁত হয়েছে। ফলকের প্রতিটি ক্যারেক্টর খালি চোখে পড়তে পারছি আমি। টাইটার সঙ্গে খেলাটায় আবার আমরা ফিরে এসেছি।'

ডেস্কের ওপর গ্লসি ফটোগ্রাফগুলো সাজাল ওরা, মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। 'আপনি দেখছি ডুপ্লিকেটও করিয়েছেন, গুড। নেগেটিভগুলো আমার ব্যাংকের সেফ ডিপোজিটে চলে যাবে। দ্বিতীয়বার ওগুলো হারাবার ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।'

রানার বড় সাইজের ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে প্রতিটি প্রিন্ট এক এক করে স্টাডি করল নিমা, ফলকের চারটে সাইডেরই একটা করে সবচেয়ে পরিষ্কার প্রিন্ট আলাদা করল। 'এগুলো ব্যবহার করব আমরা। রাবিংগুলো না থাকায় খুব একটা অসুবিধে হবে না।' তারপর হায়ারোগ্লিফিক্স-এর একটা অংশ পড়তে শুরু করল। 'গোক্ষুর কুণ্ডলী ছাড়িয়ে মণি পরানো ফণা তুলল। প্রভাতের তারাগুলো তার চোখে ঝিলিক মারল। তার কালো আর পিচ্ছিল জিভ তিনবার চুমো খেলো বাতাসকে। উত্তেজনায় গরম আর লালচে হয়ে উঠল ওর চেহারা। 'এখানে টাইটা কি বলতে বুঝতে পারছি না।' উদ্বিগ্ন ও অস্থির হয়ে উঠল ও।

'ও-সব এখন রেখে দিন,' একটু কঠিন সুরে বলল রানা। 'আপনাকে আমি চিনি, একবার শুরু করলে সারাদিন আর উঠবেন না। প্রথমে মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসুন, তারপর কাজের কথা ভাবা যাবে। উনি আপনাকে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে আছেন।'

হঠাৎ কি যেন মনে পড়ায় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল নিমা। 'হ্যাঁ, যাই তবে, রানা, আমাকে একবার দেশেও যেতে হবে।'

অবাক হলো রানা। 'দেশে মানে মিশরে?' নিমা মাথা ঝাঁকাতে আবার জানতে চাইল, 'কিন্তু কেন?'

'আমার পিতৃকুলের আত্মীয়স্বজন আছেন ওখানে, তাঁরা আমাকে অত্যন্ত

ভালবাসেন,' বলল নিমা। 'তাছাড়া, আমার জীবনের প্রীতিকর সমস্ত স্মৃতিই তো কায়রোয়। আমাকে বাধা দেবেন না, প্লীজ।'

'কিন্তু বিপদের কথাটা ভাববেন না? আমি যে আপনার সঙ্গে যাব, তা-ও সম্ভব নয়—প্রস্তুতি নিতে হলে এখানে আমাকে ব্যস্ত থাকতে হবে।'

'প্রক্সির মনোযোগ এখন ইথিওপিয়ার দিকে, মিশরের দিকে নয়,' বলল নিমা। 'তিন-চারদিনের বেশি থাকব না, কি আর হবে।'

হেরে গিয়ে অবশেষে রানা জানতে চাইল, 'কবে যেতে চান?'

'আজই সন্ধের ফ্লাইটে।'

বিকেলে নিমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেয়ার সময় রানা বলল, 'কর্নেল মুসা মনসুরের মাধ্যমে আমার বন্ধু অ্যালান শাফির সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। আমার প্ল্যানে মূল চাবিই হলো শাফি। তার সাহায্য ছাড়া টাইটার সঙ্গে খেলাটায় আমরা অংশগ্রহণই করতে পারব না।'

এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙে অদৃশ্য হবার আগে নিমা বলল, 'ফিরে এসে যেন দেখি সব প্রস্তুতি শেষ।'

ছয়

কর্মচারীরা সবাই জানে ভদ্রলোক তাদের কাছ থেকে ঠিক কি আশা করেন। প্রতিটি জিনিস যেমনটি চান তেমনটিই পেলেন তিনি। কোয়ানসেট হাট-এর চারদিকে সপ্রশংস দৃষ্টি বুলালেন হেস ডুগার্ড। বস্-এর আগমন উপলক্ষ্যে বেসটাকে ভালভাবেই সাজিয়েছে রাফেল।

লম্বা পোর্টেবল বিল্ডিঙের অর্ধেকটাই দখল করে রেখেছে তাঁর নিজের প্রাইভেট কোয়ার্টার। ভেতরে জীবাণুনাশক স্প্রে আর এয়ার ফ্রেশনার ব্যবহার করা হয়েছে। কাবার্ডে ঝুলছে তাঁর কাপড়চোপড়, কসমেটিক্স আর মেডিসিন সাজানো হয়েছে বাথরুম কেবিনেটে। প্রাইভেট কিচেনে সব রকম ইকুইপমেন্ট রাখা হয়েছে, তাঁর প্রিয় ডিশ তৈরির জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণেরও কোন অভাব নেই সঙ্গে করে নিজের চাইনীজ শেফকেও তিনি নিয়ে এসেছেন।

হেস ডুগার্ড নিরামিষভোজী, অধূমপায়ী ও টিটোটেলার। চা, মদ আর মাংস তিনি বিশ বছর আগে পরিত্যাগ করেছেন। তখন তিনি মোটা ছিলেন, চোখের নিচে কালচে পোঁটলা ঝুলত। এখন তিনি একহারা, চামড়ায় যথেষ্ট লাবণ্য ফিরে পেয়েছেন। শক্তির বিচারে এখনও তাঁকে তরুণই বলা যায়, অথচ বয়েস হয়েছে সত্তর।

সেই যৌবন কাল থেকেই শারীরিক চাহিদাকে দমিয়ে রেখে মনের চাহিদাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন তিনি। মানুষ বা জীবিত কোন প্রাণীর চেয়ে জড়পদার্থকেই বেশি মূল্য দিয়েছেন। যে রাজমিস্ত্রী হাজার বছর আগে মারা গেছে, তার হাতে খোদাই

[illegible] একটু বাকি যে-কোন সুন্দরীর নরম দেহের চেয়ে বেশি উত্তেজিত করে তাঁকে। তিনি শৃংখলা পছন্দ করেন, কর্তৃত্ব ফলাতে ভালবাসেন।

তাঁর বিশাল সংগ্রহে অমূল্য সব প্রাচীন বস্তু রয়েছে, সবই অন্য লোকদের আবিষ্কার করা। জীবনে এই একবার সুযোগ পেয়েছেন তিনি নিজে কিছু আবিষ্কার করার, একজন ফারাও-এর সমাধি ভেঙে ভেতরে ঢুকবেন, চার হাজার বছরের মধ্যে তিনিই হবেন প্রথম মানুষ যিনি নিজের চোখে দেখবেন কি আছে সেখানে। এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যে যে-কোন ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি আছেন হেস ডুগার্ড, পারেন না এমন কোন কাজ নেই এরইমধ্যে কিছু মানুষ মারা গেছে, আরও কিছু মারা গেলে তাঁর কিছু আসে যায় না। কোন মূল্যই তাঁর কাছে বেশি নয়।

প্রমাণ সাইজের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখলেন হেস ডুগার্ড ঘন, কর্কশ, কালো চুলে আঙুল চালালেন। অবশ্যই কলপ লাগানো, শরীর বা চেহারার এইটুকু যত্ন তাঁকে নিতেই হয়। কাঠের মেঝে ধরে এগিয়ে এসে কনফারেন্স রুমের দরজা খুললেন তিনি।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই। টেবিলের মাথার দিকে এগিয়ে এলেন হেস ডুগার্ড, দাঁড়ালেন কার্পেট মোড়া নিচু ও ছোট একটা মঞ্চের ওপর। এই মঞ্চটা সঙ্গে নিয়ে বেড়ান তিনি। মাত্র নয় ইঞ্চি উঁচু ওটা পুরুষ ও মহিলাদের দিকে এই উঁচু মঞ্চ থেকে তাকান তিনি। বেশ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকেন, সবাইকে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্যে . সবার চেয়ে উঁচু হয়ে থাকে তাঁর মাথা।

প্রথমে তিনি জ্যাক রাফেলের দিকে তাকালেন। টেক্সান রাফেল এক যুগ ধরে তাঁর কাজ করছে। অত্যন্ত বিশ্বস্ত, গায়ে গণ্ডারের মত শক্তি, মনটাও ইস্পাতের মত কঠিন। কোন প্রশ্ন ছাড়াই যে-কোন আদেশ পালন করা তার প্রধান গুণ পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তে যে-কোন কাজ দিয়েই পাঠানো হোক তাকে, সম্ভাব্য কম ঝামেলার মধ্যে কাজ সেরে নিরাপদে ফিরে আসবে

এরপর হেস ডুগার্ড সুন্দরী মহিলার দিকে তাকালেন। ক্যান্ডি ক্যাম্পবেল তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি। মনিবের সমস্ত ব্যক্তিগত দিকগুলো দেখেন তিনি । ওঁর অনুমতি ছাড়া হেস ডুগার্ডের সঙ্গে কেউ দেখা করতে পারে না। ক্যাম্পবেল হেস ডুগার্ডের কমিউনিকেশন এক্সপার্টও বটে। হাট-এর একদিকের দেয়ালে পরে পরে সাজানো ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্টগুলোর নিয়ন্ত্রণ ওঁর হাতে। বয়েস প্রায় চল্লিশ হলেও দেখে আরও কম মনে হয় দেখতে খুবই সুন্দর।

হেস ডুগার্ডের স্ত্রী, ইনগ্রিড, আজ বিশ বছর হলো প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী সেই থেকে খালি জায়গাটা পূরণ করছেন ক্যাম্পবেল

টেবিলের ওপর নিজের সামনে রেকর্ডিং ইকুইপমেন্ট নিয়ে বসেছেন ক্যাম্পবেল তাঁকে ছাড়িয়ে হেস ডুগার্ডের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল আরও দু'জন কর্মচারীর ওপর

আদ্দিস আবাবা থেকে জেট রেঞ্জার হেলিকপ্টারে চড়ে নাইল গিরিখাদের চূড়ায় নিজেদের বেস ক্যাম্পে আজ সকালে পৌঁচেছেন হেস ডুগার্ড, হেলিকপ্টার থেকে নামার সময় আজই প্রথম কর্নেল ঘুমাকে দেখেছেন। কর্নেল সম্পর্কে খুব

কমই জানেন তিনি, তবে রাফেলের নির্বাচন মন্দ হবে না বলে ধরে নিয়েছিলেন। কর্নেলের কাজ সম্পর্কে রাফেল সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেও, তিনি নিজে ঠিক তৃপ্ত হতে পারেননি। এরইমধ্যে দায়িত্ব পালনে গাফিলতির পরিচয় দিয়েছেন কর্নেল ঘুমা। মাসুদ রানা আর ইজিপশিয়ান মেয়েটাকে মুঠোয় পেয়েও বেরিয়ে যেতে দিয়েছেন। আফ্রিকায় বহু বছর ধরে অপারেশন চালাচ্ছেন ডুগার্ড, কালো মানুষদের ওপর তাঁর কোন শ্রদ্ধাবোধ জন্মায়নি কর্নেল ঘুমা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে। তবে আপাতত তাঁর সার্ভিস দরকার হবে। হাজার হোক দক্ষিণ গোজামের মিলিটারি কমান্ডার কর্নেল। চিন্তার তেমন কিছু নেই, কাজ ফুরালে উটকো ঝামেলা সরিয়ে ফেলা যাবে। রাফেলই সে-ব্যবস্থা করবে। কিভাবে কি করা হলো বিশদ জানতে চাইবেন না ডুগার্ড।

টেবিলে দাঁড়ানো শেষ লোকটার দিকে তাকালেন তিনি। এ আর এক লোক, আপাতত যাকে তাঁর খুব দরকার। কারিক ফারুকীই প্রথম তাঁকে সপ্তম স্ক্রোল সম্পর্কে সচেতন করেন যতটুকু তিনি শুনেছেন, ওই স্ক্রোলের সূত্র ধরে একজন ইংরেজ লেখক একটা থ্রিলার উপন্যাস লিখেছেন। না, উপন্যাসটি তিনি পড়েননি; এ-সব ছাই-পাঁশ কখনোই তাঁর পড়তে ইচ্ছে করে না। কথাটা সত্যি, ফারুকী সচেতন না করলে একজন ফারাও-এর গুপ্তধন উদ্ধারের এই সুযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত থেকে যেতেন।

আদি স্ক্রোলটা অনুবাদ করেন আল হাসলান, কাজটা শেষ হওয়া মাত্র তাঁর সঙ্গে দেখা করে ফারুকী; ইতিহাসে রেকর্ড করা হয়নি এমন একজন ফারাও আর তাঁর সমাধির অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করেন তাঁরা। সেই থেকে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছিলেন তাঁরা। হাসলান আর তাঁর ভাইঝি স্ক্রোলের সূত্র ধরে তদন্ত চালাচ্ছিলেন, তাঁদের তদন্তের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে জানার পর ফারুকীকে তিনি ওদের ব্যবস্থা করতে বলেন, বলেন স্ক্রোলটা তাঁর চাই।

স্ক্রোলটা এখন তাঁর কালেকশনের অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে, অন্যান্য অমূল্য সম্পদের সঙ্গে ইস্পাত আর কংক্রিটের ভল্টে রেখে দিয়েছেন যত্ন করে স্কলস্ পাহাড়ের নিচে তাঁর নিজের একটা নিভৃত দুর্গ আছে, ভল্টটা সেখানে।

তবে ফারুকী তাঁর উপকার যেমন করেছেন, অপকারও কম করেননি। হাসলান আর তাঁর ভাইঝিকে মেরে ফেলার দায়িত্বটা তাঁকে দেয়া উচিত হয়নি। উচিত ছিল প্রফেশনাল কাউকে পাঠানো কিন্তু ফারুকী জেদ ধরে বলেছিলেন কাজটা তিনি নিখুঁতভাবে সারতে পারবেন। এর জন্যে মোটা টাকা নেন তিনি, অথচ গোটা ব্যাপারটা লেজেগোবরে করে ছাড়েন। কাজেই, সময় হলে, ফারুকীকেও সরিয়ে ফেলা হবে। তবে এই মুহূর্তে ওঁকে তাঁর দরকার।

সন্দেহ নেই ইজিপ্টোলজি আর হায়ারোগ্লিফিক্স-এ ফারুকী একজন এক্সপার্ট হবে না, সারাজীবন এ-সব নিয়েই তো পড়ে আছেন। তিনি নিজেও কিছু কিছু বোঝেন বৈকি, তবে উৎসাহী অ্যামেচার ছাড়া আর কিছু বলা যায় না তাঁকে স্ক্রোল ছাড়াও নতুন যে-সব উপকরণ পাওয়া গেছে, সবই গড় গড় করে পড়তে পারেন ফারুকী, যেন বন্ধুকে লেখা চিঠির মতই সহজপাঠ্য। ওর সাহায্য নিয়ে ফারাও মামোস-এর সমাধি খুঁজে পাওয়া যাবে বলে আশাবাদী তিনি।

'বসুন সবাই, বসুন, প্লীজ,' বললেন হেস ডুগার্ড। 'আসুন শুরু করি আমরা।'

সবাই বসার পরও খুদে মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে থাকলেন ডুগার্ড। সবার চেয়ে উঁচু হয়ে থাকতে ভালবাসেন তিনি। 'একটা কথা পরিষ্কার বলে দিতে চাই। এই কামরা থেকে কোন পেপার, ডকুমেন্ট, নোট ইত্যাদি বাইরে বেরুতে পারবে না এখানকার সব কিছুই অত্যন্ত কনফিডেনশিয়াল, এবং আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ফ্রয়লিন ক্যাম্পবেল আপনাদেরকে একটা করে ডকুমেন্ট ফোল্ডার দেবেন, মীটিং শেষে ওগুলো আবার তাঁর কাছে ফিরে যাবে। আমার ইচ্ছা আর নির্দেশের এদিক ওদিক হলে তার পরিণতি ভাল হবে না।'

সবাইকে একটা করে ফোল্ডার বিলি করলেন প্রাইভেট সেক্রেটারি ক্যান্ডি ক্যাম্পবেল। টেবিল থেকে ডোশিয়ে তুলে খুললেন ডুগার্ড। 'আপনাদের ফোল্ডারে মাসুদ রানার ক্যাম্প থেকে সংগ্রহ করা পোলারয়েড ফটোগ্রাফির কপি আছে। প্লীজ, ওগুলো দেখুন।'

সবাই যে যার ফোল্ডার খুলল।

'স্টাডি করার পর ড. ফারুকী বলছেন ফটোগ্রাফে যে ফলকটা দেখা যাচ্ছে সেটা জেনুইন, প্রাচীন ঈজিপশিয়ান আর্টিফ্যাক্ট, প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া চলে যে সেকেন্ড ইন্টারমিডিয়েট পিরিয়ড সতেরোশো নব্বুই বি. সি.-র। আপনি নতুন আর কিছু বলতে চান, ড. ফারুকী?'

'ধন্যবাদ, হের হেস ডুগার্ড,' বলে হাসলেন ফারুকী, নার্ভাস দেখাচ্ছে তাঁকে। জার্মান ধনকুবেরের আচরণে ঠাণ্ডা এমন কিছু আছে যা তাঁকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। হাসলান আর নিমাকে খুন করার নির্দেশ দেয়ার সময় ভদ্রলোকের মধ্যে এক বিন্দু উত্তেজনা বা আবেগ দেখেননি তিনি। জানেন, তাঁকে খুন করার জন্যে অন্য কাউকে নির্দেশ দেয়ার সময়ও একদম নির্লিপ্ত দেখাবে ডুগার্ডকে। কোন সন্দেহ নেই, স্বেচ্ছায় বাঘের পিঠে চড়ে বসেছেন তিনি। 'আমি আমার আগের কথাই রিপিট করতে চাই। এই প্রিন্টের ফলকটা জেনুইন বলেই মনে হচ্ছে। তবে নিশ্চিত হবার জন্যে ফলকটা আমাকে দেখতে হবে।'

'সেটা যাতে আপনি দেখার সুযোগ পান তার ব্যবস্থা করার জন্যেই এখানে আমরা মিলিত হয়েছি,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন ডুগার্ড। 'এখন আপনার মতামত দিন, প্লীজ। ফলকটা যদি জেনুইন হয়, কোথায় পাওয়া যাবে? মানে, কোথায় আমরা খুঁজব?'

'শুধু ফলকটার কথা ভাবলে চলবে না,' বললেন ফারুকী 'কর্নেল ঘুমা যে পোলারয়েড সংগ্রহ করেছেন সেগুলোও বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে।' নিজের ফোল্ডার থেকে একটা ফটোগ্রাফ বেছে নিলেন তিনি। 'এই যেমন এটা।' তাঁর দেখাদেখি বাকি সবাইও যে যার ফোল্ডার থেকে নির্দিষ্ট ওই ফটোগ্রাফটা হাতে নিল।

'ফলকটার পিছনে তাকালে দেখতে পাবেন ছায়ার ভেতর একটা গুহার দেয়াল রয়েছে,' আবার বলল ফারুকী, ডুগার্ড উৎসাহ দিয়ে হাসলেন। 'আরও রয়েছে বার লাগানো একটা দরজা বা প্রবেশ পথ।' হাতেরটা রেখে দিয়ে আরেকটা ফটো তুললেন। 'এবার এটা দেখুন। অন্য এক সাবজেক্টের ছবি

দেয়ালচিত্র বলব আমি, প্লাস্টার করা দেয়ালে বা কোন গুহার মসৃণ পাথরের ওপর আঁকা হয়েছে। সম্ভবত গ্রিল বা বার লাগানো দরজার ভেতর ক্যামেরা গলিয়ে এই দেয়ালচিত্রের ছবি তোলা হয়েছে। দেয়ালচিত্রে ঈজিপশিয়ান স্টাইলের ছাপ ও প্রভাব স্পষ্ট। আপার ঈজিপ্টের কুইন লসট্রিসের সমাধিতে এ-ধরনের দেয়ালচিত্র আছে, ওখান থেকে আদি টাইটা স্ক্রোল উদ্ধার করা হয়। কাজেই আমার ধারণা, ওই একই গুহা বা সমাধি থেকে এসেছে এই ফলক আর দেয়ালচিত্রের ছবি।'

'তাহলে প্রশ্ন দাঁড়াল, ছবিগুলো মাসুদ রানা কোত্থেকে তুলেছেন। কর্নেল ঘুমা, এলাকাটা আপনি চেনেন। শোনা যাক এ-ব্যাপারে আপনার কি বলার আছে।'

অনেক আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পর সিদ্ধান্তে আসা হলো, ছবিগুলো তোলা হয়েছে একটা কপটিক ক্রিশ্চান চার্চের ভেতর থেকে। রানার ক্যাম্প থেকে স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করেছেন কর্নেল ঘুমা, একটা ফটোয় লাল কালির বৃত্ত দেখা যাচ্ছে। ক্যাম্পসাইট থেকে মাত্র এক মাইল দূরে জায়গাটা। বৃত্তের ভেতর ওটা সেন্ট ফ্রুমেনটিয়াসের মঠ।

'ওই মঠ সার্চ করা হোক,' নির্দেশ দিলেন ডুগার্ড। 'কর্নেল ঘুমা, ওখানে আপনার লোকজন ঢুকতে পারবে?'

'কেন পারবে না, হের ডুগার্ড? মঠের একজন সন্ন্যাসী আমার নিজের লোক। তাছাড়া, গোজাম এলাকায় এখনও মার্শাল ল বলবৎ রয়েছে, আর আমি ওখানকার কমান্ডার। বিদ্রোহী বা চোর-ডাকাতদের ধরার জন্যে যে কোন জায়গা আমি সার্চ করতে পারি।'

'ভেরি গুড,' বললেন ডুগার্ড। 'ওই ফলকটা আমি চাই।'

কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে তাঁকে স্যালুট করলেন কর্নেল ঘুমা।

কর্নেল ঘুমা শুধু নাস্তিক নন, জীবনে এমন কোন দুষ্কর্ম নেই যা তিনি করেননি। তাঁর অধীনস্থ সৈনিকরাও বেশিরভাগ এক সময় গুণ্ডা বা ডাকাত ছিল। তাদের মধ্যে থেকে বিশজনকে বাছাই করলেন তিনি, জানেন ধর্ম বা নৈতিকতার প্রতি তাদের কোন মোহ নেই। ভোর হবার দু'ঘণ্টা আগে নিরাপদ প্রক্সি কমপাউন্ডে প্যারেড করালেন তাদের, তারপর ফ্লাডলাইটের নিচে দাঁড় করিয়ে ব্রিফ করলেন। কাছেই জেট রেঞ্জার তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে, কন্ট্রোলে বসে আছে পাইলট। অস্ত্রশস্ত্র সহ এতগুলো লোককে একবারে বহন করা সম্ভব হবে না, কাজেই ঠিক হয়েছে চারবারে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রথম ফ্লাইটে ঘুমা থাকলেন, সঙ্গে কারিফ ফারুকী। মঠ থেকে তিন মাইল দূরে কপ্টার ওদেরকে নামিয়ে দিল, ডানডেরা নদীর কিনারা ঘেঁষে ফাঁকা একটা জায়গায়। এই একই জায়গায় মিলিত হয়েছিল তারা রানার ক্যাম্পে হামলা চালাবার আগে।

ভোরের প্রথম আলোয় মঠে পৌঁছুনোর প্ল্যান করেছেন কর্নেল। কনটিনজেন্ট নিয়ে পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন, রাবার সোল লাগানো প্যারাট্রুপার বুট থেকে প্রায় কোন শব্দই হচ্ছে না।

পাথুরে টেরেস বা চাতাল ফাঁকা পড়ে আছে। আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাথেড্রাল থেকে

পুরোহিত আর সন্ন্যাসীদের সম্মিলিত প্রার্থনাসঙ্গীতের একটানা ছন্দোবদ্ধ আওয়াজ ভেসে আসছে। মাঝে মধ্যে বিরতি নিচ্ছেন তাঁরা, তখন শুধু প্রধান পুরোহিতের গলা শোনা গেল। দরজাগুলোর সামনে সৈনিকদের নিয়ে থামলেন কর্নেল। কাউকে কোন নির্দেশ দেয়ার প্রয়োজন নেই, সবাই জানে কার কি কাজ। সবার ওপর একবার চোখ বুলালেন তিনি, তারপর লেফটেন্যান্টের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকালেন।

চার্চের আউটার চেম্বার খালি। সন্ন্যাসীরা জমায়েত হয়েছেন মিডল চেম্বারে। ভেতরে ঢুকে আউটার চেম্বারের মেঝে পেরিয়ে এলেন কর্নেল, পিছনে ডিটাচমেন্ট। মিডল চেম্বারে ঢোকার দরজা খোলা দেখা গেল। ভেতরে ঢুকলেন তিনি, তাঁর লোকজন দু'সারিতে ভাগ হয়ে সাইড ওয়াল ঘেঁষে পজিশন নিল, হাতের অ্যাসল্ট রাইফেল কক ও লক করা, ডগায় আটকানো বেয়নেট হাঁটু গেড়ে প্রার্থনারত ভক্তদের কাভার দিচ্ছে।

ব্যাপারটা নিঃশব্দে ও দ্রুত ঘটে গেছে; বেশ কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে সন্ন্যাসীরা টের পেলেন যে তাদের পবিত্র স্থানে বৈরী একদল লোক ঢুকে পড়েছে। ঢাক-ঢোল পেটানোর আওয়াজ থেমে গেল, থেমে গেল প্রার্থনাসঙ্গীত, গাঢ় মুখগুলো পিছন ফিরে সশস্ত্র লোকজনকে দেখছে। একা শুধু প্রধান পুরোহিত ওলি জারকাস সচেতন নন, চোখ বুজে নিবিষ্টচিত্তে প্রার্থনা করছেন এখনও।

নিস্তব্ধভাব ভেতর এগোলেন কর্নেল ঘুমা, হাঁটু গেড়ে বসে থাকা সন্ন্যাসীদের লাথি মেরে পথ থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন। ওলি জারকাসের হাড়সর্বস্ব কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকি দিলেন, তারপর ধাক্কা মেরে ফেলে দিলেন মেঝেতে। প্রধান পুরোহিতের মাথা থেকে খসে পড়ল মুকুটটা।

সন্ন্যাসীদের দিকে ফিরে অ্যামহ্যারিক ভাষায় কর্নেল বললেন, 'চোর-ডাকাত আর গুপ্তাবদমাশদের খোঁজে গোটা মঠ সার্চ করা হবে। আমার লোকজনকে কর্তব্য পালনে বাধা দিলে পরিণতি হবে ভয়াবহ।'

ক্রল করে তাঁর দিকে ঘুরলেন ওলি জারকাস, এমব্রয়ডারি করা পর্দা ধরে অনেক কষ্টে সিধে হলেন। স্পষ্ট ও কঠিন সুরে বললেন, 'এটা আমাদের পবিত্র স্থান। এখানে আমরা পরম পিতা, সন্তান ও পবিত্র আত্মার আরোধনা করি।'

'চোপ ব্যাটা!' গর্জে উঠলেন কর্নেল ঘুমা, হোলস্টার থেকে টোকারেভ পিস্তল বের করে তাক করলেন প্রধান পুরোহিতের বুকে।

হুমকিটা গ্রাহ্য না করে ওলি জারকাস বললেন, 'এখানে কোন শুষ্কতা নেই। আমরা সবাই আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যীশু ও পরম পিতার নামে বলছি, আপনারা চলে যান, আমাদেরকে নির্বিঘ্নে...

পিস্তলটা উল্টো করে ওলি জারকাসের চোয়ালে প্রচণ্ড বাড়ি মারলেন কর্নেল, গালটা তরমুজের মত ফেটে গিয়ে লাল হয়ে উঠল ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলেন প্রধান পুরোহিত, পর্দা ধরে কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি গোঙাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে সন্ন্যাসীরাও

হেসে উঠে ওলি জারকাসের পায়ে ল্যাং মারলেন কর্নেল। মেঝেতে একটা রক্তাক্ত স্তূপে পরিণত হলেন প্রধান পুরোহিত। 'বুড়ো বেবুন, কোথায় তোর গড?

যত জোরে পারিস ডাক, কোন সাড়া পাবি না।' হেসে উঠলেন ঘুমা, পিস্তল নেড়ে লেফটেন্যান্টকে সংকেত দিলেন।

মিডল চেম্বারে ছ'জনকে পাহারায় রেখে মাকডাস-এর দিকে এগোলেন কর্নেল। দরজায় তালা দেয়া দেখে লেফটেন্যান্ট সবাইকে পিছিয়ে যেতে বলে হাতের একে-ফরটিসেভেন তুলে গুলি করল। বন্ধ জায়গার ভেতর এক পশলা গুলি বিকট আওয়াজ করল, সেটা থামার পর শোনা গেল সন্ন্যাসীরা একযোগে বিলাপ শুরু করেছে।

কাঁধের ধাক্কায় বিশাল দরজা পুরোপুরি খুলে ফেলা হলো। ভেতরে কয়েকটা মাত্র কুপি জ্বলছে। হঠাৎ এমন কি নাস্তিকরাও এই পবিত্রতম স্থানে ঢুকতে ইতস্তত করছে। বুঝতে পেরে হাঁক ছাড়লেন কর্নেল, 'ফারুকী! এদিকে আসুন! হের ডুগার্ড আপনাকেই জিনিসটা খুঁজে বের করতে বলেছেন।'

একটা ঢোক গিলে মাকডাস-এ ঢুকলেন ফারুকী, টর্চ হাতে তাঁর পিছনেই থাকলেন ঘুমা। টর্চের আলো উপহার সামগ্রী ভরা শেলফ, রঙিন কাঁচ আর মূল্যবান পাথর, তামা আর রূপো, সোনা আর দেয়ালচিত্রের ওপর নাচানাচি করছে। আলোটা থামল উঁচু সিডারউড বেদির ওপর, উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এপিফানি মুকুট, পানপাত্র আর রূপালি কপটিক ক্রস।

'বেদির সামনে!' উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল ফারুকী। 'গ্রিল লাগানো দরজা! এখান থেকেই পোলারয়েড ছবি তোলা হয়েছে!' গ্রিল ধরে ঝাঁকাতে শুরু করলেন। 'আলো, আলো!'

কাপড় মোড়া ট্যাবট পাথরটাকে পাশ কাটিয়ে তাঁর দিকে ছুটে এলেন কর্নেল, গ্রিলের ভেতর টর্চের আলো ফেললেন।

এতক্ষণ চিৎকার করছিলেন ফারুকী, এখন গলা থেকে আওয়াজ বেরুতে চাইছে না, আবেগে ফিসফিস করছেন, 'এগুলো প্রাচীন দেয়ালচিত্র। কোন সন্দেহ নেই, ক্রীতদাস টাইটার কাজ!' কর্নেলের দিকে তাকালেন তিনি। 'দরজাটা ভাঙতে বলুন!'

কিন্তু প্রাচীন হলেও কাঠামোটা এখনও সাংঘাতিক মজবুত, সবাই মিলে চেষ্টা করেও নড়ানো গেল না। কর্নেলের নির্দেশে কয়েকজন ট্রুপারকে নিয়ে একজন জুনিয়ার অফিসার ছুটল সন্ন্যাসীদের কোয়ার্টার সার্চ করতে, গ্রিলের গেট ভাঙার জন্যে যন্ত্রপাতি দরকার।

ওরা চলে যেতে গ্রিল গেটের দিকে পিছন ফিরলেন কর্নেল। 'ফলকটার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি,' বলে মাকডাস-এর চারদিকে টর্চের আলো ফেললেন। কাপড় মোড়া ট্যাবট পাথরে স্থির হলো আলো। 'বোধহয় এটাই!' রূপো আর সোনার তৈরি সুতোয় এমব্রয়ডারি করা কাপড়টা ভারী বলে মনে হলো। সেটা ধরে টান দিলেন ঘুমা।

টাইটার স্টোন টেস্টামেন্ট, খোদাই করা ফলক বা পিলার, উন্মোচিত হলো। 'ফটোতে এই পাথরটাই দেখেছি আমরা!' বিড়বিড় করলেন তিনি। 'হের ডুগার্ড এটাই চেয়েছেন! আমরা সবাই রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেলাম!'

এগিয়ে এসে ফলকটার সামনে হাঁটু গাড়লেন ফারুকী, আলিঙ্গন করলেন

পিছনে ফারুকী থাকলেন।

হেস ডুগার্ড রাজধানীর এয়ারপোর্টে পৌঁছুলেন কোম্পানীর হেলিকপ্টারে চড়ে, সঙ্গে রয়েছেন ক্যান্ডি ক্যাম্পবেল। ওঁরা পৌঁছুবার কয়েক মিনিটের মধ্যে হাজির হলেন পুলিশ কমিশনার জেনারেল উর্মিদ মানামা। হের ডুগার্ডকে বিদায় জানাতে এসেছেন তিনি।

ত্রিশ ঘণ্টার কঠিন পথ পাড়ি দিয়ে প্রক্সি ট্রাকও সময়মতই পৌঁছুল। কাঠের বাক্সগুলো যখন হের ডুগার্ডের প্রাইভেট জেটে তোলা হচ্ছে, জেনারেল উর্মিদ মানামা তখন ডিউটিরত কাস্টমস অফিসারের সঙ্গে কথা বলছেন। 'জিওলজিক্যাল স্যামপল' হিসেবে ডকুমেন্ট তৈরি করা হয়েছে, তাতে সই করে নিঃশব্দে বিদায় নিলেন অফিসার।

একুশশো ঘণ্টায় ফ্রাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করল জেট প্লেনটা। সিনিয়র কাস্টমস আর ইমিগ্রেশন অফিসার যারা অপেক্ষা করছেন তাঁরা সবাই হের ডুগার্ডের পুরানো বন্ধু, খবর পাওয়ামাত্র এয়ারপোর্টে চলে আসেন। আনুষ্ঠানিকতা শেষে জেটে বসে হুইস্কি খেলেন তাঁরা, প্রত্যেককে একটা করে মোটাতাজা এনভেলাপ দেয়া হলো।

বাকি রাতটুকু পাহাড়ী পথ ধরে ছুটল ট্রাক। তেরপল দিয়ে ঢাকা ট্রাকটাকে অনুসরণ করছে হের ডুগার্ডের শোফার, কার্গো বা ট্রাক মুহূর্তের জন্যে চোখের আড়াল হতে দিচ্ছে না। ভোর পাঁচটার দিকে লোহার গেট দিয়ে দুর্গের ভেতর ঢুকল গাড়ি। দুর্গটা আকারে বিশাল, পরিবেশটাও ভৌতিক। বাটলার থেকে শুরু করে কর্মচারীরা সবাই মনিবের জন্যে অপেক্ষা করছিল। ডুগার্ডের কালেকশন দেখাশোনা করেন বেন ফার্গুসন, তিনিও স্টাফসহ উপস্থিত। বাক্স দুটো ফর্কলিফটে তোলা হলো, ভল্টে নিয়ে যাওয়া হবে।

কাঠের বাক্স খোলা হচ্ছে, দুর্গের উত্তর টাওয়ারে চলে এলেন ডুগার্ড। গোসল সেরে ব্রেকফাস্ট করলেন, পাশেই দাঁড়িয়ে থাকল চাইনিজ শেফ। নাস্তা শেষ করে স্ত্রীর বেডরুমে চলে এলেন তিনি। আগের চেয়ে রোগা আর নিষ্প্রভ লাগল ভদ্রমহিলাকে। সব চুলই একদম সাদা হয়ে গেছে, মুখ দেখে মনে হচ্ছে মোমের তৈরি। নার্সকে বিদায় করে দিয়ে স্ত্রীর কপালে চুমো খেলেন ডুগার্ড। কর্কট রোগ ধীরে ধীরে খেয়ে ফেলছে মহিলাকে, তবু ডুগার্ডকে তিনি এক জোড়া পুত্রসন্তান উপহার দিয়েছেন, এই কথাটা মনে রেখে এখনও স্ত্রীকে ভালবাসেন ডুগার্ড।

স্ত্রীর সঙ্গে এক ঘণ্টা কাটিয়ে নিজের বেডরুমে চলে এলেন তিনি, ঘুমালেন চার ঘণ্টা। যতই ক্লান্ত হন, এর বেশি ঘুম তাঁর দরকার হয় না। দুপুর পর্যন্ত ব্যবসার কাগজ-পত্র দেখলেন তিনি। তারপর তত্ত্বাবধায়ক ফার্গুসন ইন্টারকমে জানালেন, তাঁরা সবাই তাঁর জন্যে ভল্টে অপেক্ষা করছেন।

প্রাইভেট সেক্রেটারি ক্যাম্পবেলকে সঙ্গে নিয়ে এলিভেটরে চড়লেন ডুগার্ড। এলিভেটরের দরজা খোলার পর দেখা গেল ফার্গুসন ও ফারুকী অপেক্ষা করছেন। একবার চোখ বুলাতেই ডুগার্ড বুঝতে পারলেন দু'জনেই উত্তেজনায় অস্থির হয়ে আছেন। 'এক্স-রে শেষ হয়েছে?' আন্ডারগ্রাউন্ড প্যাসেজ ধরে ভল্টের দিকে যাবার সময় জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'জ্বী, হের ডুগার্ড!' ফার্গুসন জবাব দিলেন। বয়েসে তিনি প্রৌঢ়, আর্কিওলজি নিয়ে অক্সফোর্ড থেকে পিএইচডি করেছেন, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। 'টেকনিশিয়ানরা দারুণ কাজ দেখিয়েছে। প্লেটগুলো ভারি চমৎকার হয়েছে।'

সংশ্লিষ্ট ক্লিনিকে নিয়মিত চাঁদা দেন ডুগার্ড, কাজেই তাঁর যে-কোন অনুরোধ রাজকীয় আদেশ বলে গণ্য করা হয়। ক্লিনিকের ডিরেক্টর তাঁর সবচেয়ে আধুনিক পোর্টেবল এক্স-রে ইকুইপমেন্ট সহ দু'জন টেকনিশিয়ানকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, সঙ্গে একজন সিনিয়র রেডিওলজিস্ট। লর্ড হারাব-এর ছবি তোলা হয়েছে। প্লেটগুলো স্টাডি করে রিপোর্ট তৈরি করেছেন রেডিওলজিস্ট।

স্টীল ভল্টের তালায় প্লাস্টিক পাস কার্ড ঢোকালেন ফার্গুসন, হিস হিস শব্দ তুলে দরজা খুলে গেল সবার আগে ভেতরে ঢুকলেন ডুগার্ড। ভেতরে ঢুকে ভল্টের চারদিকে চোখ বুলালেন তিনি। বরাবরের মত উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে এল তাঁর।

ভল্টের দেয়াল দুই মিটার পুরু, ইস্পাত আর কংক্রিট দিয়ে তৈরি। ভল্টটা অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক ডিভাইস দিয়ে সুরক্ষিত। আরও ভেতরে চলে এলেন ডুগার্ড, থামলেন মেইন ডিসপ্লে রুমে। ইউরোপের বিখ্যাত ডিজাইনার এই কামরার প্ল্যান ও ডিজাইন তৈরি করেছেন। প্রধান রঙ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে নীল। কালেকশনের প্রতিটি আইটেম আলাদা কেসে রাখা হয়েছে।

মিডনাইট-ব্লু ভেলভেট কুশনে রাখা হয়েছে স্বর্ণালংকার আর মূল্যবান রত্ন, কামরার ভেতর এমন কোন জায়গা নেই যেখানে ওগুলো নেই। সুকৌশলে লুকানো স্পটলাইটের আলো এসে পড়েছে আইভরি আর অবসিডিয়ান-এর ওপর। প্রাচীন দেব-দেবীর অসংখ্য মূর্তি শোভা পাচ্ছে উঁচু মঞ্চের ওপর—থোথ, আনুবিস, হাপি আর সেথ আছেন, আছেন অসিরিস, আইসিস আর হোরাস।

কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে টাইটার স্টোন টেস্টামেন্ট। পাশে দাঁড়িয়ে ওটার মসৃণ গায়ে হাত বুলালেন ডুগার্ড, তারপর পাশের কামরায় চলে এলেন।

এখানে কাঠের জোড়া সেতুর ওপর রাখা হয়েছে ট্যানাস, লর্ড হারাব-এর কফিন। সাদা কোট পরা একজন রেডিওলজিস্ট আলোকিত ডিসপ্লে বোর্ডের সামনে ঝুঁকে রয়েছেন, বোর্ডে আটকানো রয়েছে কয়েকটা এক্স-রে প্লেট। পাশে এসে সেগুলোর দিকে তাকালেন ডুগার্ড। কাঠের কফিনের আউটলাইনের ভেতর কোঁকড়ানো মানুষের আকৃতি স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করা 'এই বডি সম্পর্কে আমাকে আপনার কি বলার আছে?' মহিলা রেডিওলজিস্টের দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ডুগার্ড।

'পুরুষ,' বললেন মহিলা। 'মধ্যবয়স্ক, মৃত্যুর সময় বয়েস ছিল পঞ্চাশের ওপর, তবে ষাটের নিচে। ছোটখাট আকৃতি।' উপস্থিত সবাই গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে। 'পাঁচটা দাঁত নেই...'

একটানা পাঁচ মিনিট লাশের বর্ণনা দিলেন রেডিওলজিস্ট, তারপর বললেন, 'মৃত্যুর সম্ভাব্য কারণ বুক ভেদ করা জখম। জখমের জন্যে দায়ী হতে পারে বল্লম বা বর্শা অস্ত্রটা কোনাকুনি ঢোকে, বাম ফুসফুস ফুটো করে ফেলে।'

'আর কিছু?'

'হের ডুগার্ড,' রেডিওলজিস্ট এক সেকেন্ড ইতস্তত করে বললেন, 'আপনার আরও অনেক মমি পরীক্ষা করেছি আমি। কিন্তু এরকম আগে কখনও দেখিনি ভিসারা বের করার জন্যে যেভাবে পেট কাটা হয়েছে, বোঝাই যায় অত্যন্ত দক্ষ কোন ফিজিশিয়ানের কাজ।'

'ধন্যবাদ,' বললেন ডুগার্ড, তাকালেন ফারুকীর দিকে। 'এ পর্যায়ে কোন মন্তব্য?'

'ট্যানাস, লর্ড হারাব-এর যে বর্ণনা সপ্তম স্ক্রোলে দেয়া হয়েছে তার সঙ্গে এ-সব মেলে না।'

'কোথায় মেলে না?'

'ট্যানাস ছিলেন দীর্ঘদেহী। বয়েস আরও কম। কফিনের ঢাকনিতে তাঁর ছবি দেখুন, হের ডুগার্ড।'

'বলে যান।'

এক্স-রে প্লেটের ডিসপ্লের সামনে এসে দাঁড়ালেন ফারুকী, হাত তুলে গাঢ় ও নিরেট কয়েকটা দাগের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। 'জুয়েলারি,' বললেন তিনি 'কবচ। বাজুবন্ধ। বুকের আচ্ছাদন বা বর্ম। কিছু নেকলেস। আঙটি আর কানের রিঙ। তবে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হলো মুকুটটা, মুকুটে বসানো গোক্ষুর সাপের ফণা। ওটা শুধু রাজপরিবারের সদস্যরা পরেন।'

'এ-সব কিসের ইঙ্গিত দেয়?' ডুগার্ডকে হতভম্ব দেখাল।

'এটা সাধারণ কোন মানুষের বডি নয়, কিংবা শুধু অভিজাত কারও বডিও নয়। অলংকারের পরিমাণ খুব বেশি। আমার বিশ্বাস এটা আসলে একটা রাজকীয় মমি।'

'অসম্ভব,' ধমক দিলেন ডুগার্ড। 'কফিনে কি লেখা রয়েছে পড়ুন। পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে এটা মিশরীয় একজন জেনারেলের মমি।'

'ক্ষমা করবেন, হের ডুগার্ড,' সবিনয়ে বললেন ফারুকী। 'সম্ভাব্য ব্যাখ্যা একটা নিশ্চয়ই আছে। রিভার গড বইটায় আভাস দেয়া হয়েছে টাইটা নাকি দুটো মমি অদলবদল করে—একটা ছিল ফারাও মামোসের মমি, অপরটা ছিল তার সুহৃদ ট্যানাসের।'

'অদলবদল করার কি কারণ ছিল?' ডুগার্ডের চেহারায় অবিশ্বাস।

'কুসংস্কার বা আধ্যাত্মিক কারণ থাকতে পারে, জাগতিক কোন কারণ যদি না-ও থাকে। টাইটা চেয়েছিল তার প্রিয় বন্ধু ট্যানাস ফারাও-এর গুপ্তধন মৃত্যুর পরও পাহারা দেবে এবং ব্যবহার করবে। বন্ধুর প্রতি এটা ছিল তার শেষ উপহার।'

'এ-সব আপনি বিশ্বাস করেন?'

'অন্তত অবিশ্বাস করি না। এই ধারণার পক্ষে আরও যুক্তি আছে, হের ডুগার্ড। এক্স-রে থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মমির তুলনায় কফিনটা আকারে অনেক বেশি বড়। আমার ধারণা, আরও দীর্ঘ কোন মানুষের জন্যে কফিনটা তৈরি করা হয়েছিল। জী, হের ডুগার্ড, প্রচুর সম্ভাবনা আছে যে এটা একটা রাজবংশীয় মমি।'

ডুগার্ডের চেহারা পাল্টে দেখাচ্ছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, কথা বললেন

কর্কশ সুরে, 'হোয়াট! কোন রাজার মমি?' ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে কফিনটার পাশে দাঁড়ালেন। 'খুলুন এটা। ফারাও মামোসের মমিটা আমাকে দেখান।'

সাত

কাজটা অত্যন্ত কঠিন। প্রথমে ফারুকীকে নিশ্চিত হতে হবে রঙের নিচে কোথায় রয়েছে ঢাকনির জয়েন্ট। সেটা জানার পরই কেবল বার্নিশ আর আঠা তোলার কাজে হাত দেয়া যাবে। কাজগুলো শেষ করতে প্রায় সারাটা দিন লাগিয়ে দিলেন তিনি।

ঢাকনি মুক্ত হবার পরও সেটা তোলা হলো না। হেস ডুগার্ড দুই ছেলের সঙ্গে মীটিঙে রয়েছেন, তাঁকে খবর পাঠানো হলো। জরুরী আলোচনা বাদ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ভল্টে চলে এলেন তিনি, খুদে মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে কফিনের দিকে তাকালেন। 'হ্যাঁ, তুলুন এবার ঢাকনি।'

ঢাকনি তোলা হলো। ভেতরে তাকালেন হেস ডুগার্ড। তাঁর চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠল। ঐতিহ্যবাহী ভঙ্গিতে একটা লাশকে শুয়ে থাকতে দেখবেন বলে আশা করেছিলেন, তার বদলে কফিনের ভেতরটা এলোমেলো ও আলগা লিনেন ব্যান্ডেজে ভর্তি দেখতে পাচ্ছেন। 'এ-সব কি...' মনে হলো রেগে উঠবেন, ঝুঁকে বিবর্ণ ব্যান্ডেজ ধরতে গেলেন।

'না! ছোঁবেন না!' বাধা দিলেন ফারুকী। চিৎকার করা হয়ে গেছে, বুঝতে পেরে আড়ষ্টবোধ করলেন তিনি। 'মাফ করবেন, হের ডুগার্ড। ব্যাপারটা সত্যি বিস্ময়কর। লাশ অদলবদল হবার সম্ভাবনাটা আরও বেড়ে গেল। আপনার অনুমতি পেলে ব্যান্ডেজ খোলার আগে আরও স্টাডি করতে চাই, হের ডুগার্ড।'

মঞ্চ থেকে নেমে পড়লেন হেস ডুগার্ড। গাঢ় নীল ডাবল-ব্রেস্টেড জ্যাকেটের ব্রেস্ট পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছলেন মুখের। 'ঠিক আছে। কিন্তু এ কি সম্ভব? সত্যি এটা ফারাও মামোসের মমি হতে পারে?' আবার মুখ মুছলেন তিনি। 'আলগা বাঁধনগুলো খোলা হোক।'

'তার আগে, হের ডুগার্ড, ফটো তোলা দরকার।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলেন ডুগার্ড 'আমরা আর্কিওলজিস্ট, বিজ্ঞানী, সাধারণ লুটেরা নই। তুলুন ছবি।'

আলগা বাঁধনও খুব সাবধানে, একটু একটু করে খুলতে হচ্ছে। এত বেশি সময় লাগছে যে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ার অবস্থা হলো ডুগার্ডের। পুরানো আলগা কাপড়ের শেষটুকু মমির গা থেকে সরিয়ে নিলেন ফারুকী, সময় তখন রাত একটা। আলগা কাপড়ের পর নিখুঁতভাবে কয়েক স্তরে বাঁধা হয়েছে ব্যান্ডেজ, তবে সেগুলোর ফাঁক দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারছে চকচকে সোনা।

'রাজকীয় কফিনে, কফিনের ভেতর আরও কয়েকটা কফিন থাকার কথা। এখানে সে-সব দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে না মুখোশগুলোও। ওগুলো নিশ্চয়ই

com/groups/BoilerplatePolapain
[illegible] কফিনের অন্ধকারে চাঁদনীর মমি শুয়ে আছে, আবিষ্কারের অপেক্ষায়। এখানে আমরা শুধু রাজবংশীয় মমির ইনার ড্রেসিং দেখতে পাচ্ছি।'

লম্বা ফরসেপ দিয়ে ব্যান্ডেজের ওপরের স্তরটা ছাড়ালেন ফারুকী। ইতিমধ্যে আবার মঞ্চে দাঁড়িয়েছেন হেস ডুগার্ড, ঝুঁকে কফিনের ভেতর তাকিয়ে আছেন।

'এটা মামোস রাজপরিবারের বক্ষাবরণ বা বুকের বর্ম,' রুদ্ধশ্বাসে ফিসফিস করলেন ফারুকী। স্পট লাইটের নিচে অলংকারটা ঝলমল করছে। বর্মটা সোনার তৈরি, বহুমূল্য রত্নখচিত, গোটা বুক জুড়ে আছে। মাঝখানে একটা শকুনের আকৃতি, সোনার ওপর, বিশাল ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে, বাঁকা নখে ধরে আছে রাজপরিবারের প্রতীক চিহ্ন, সোনার তৈরি সর্পিল অলংকরণ।

'আর কোন সন্দেহ নেই,' হেস ডুগার্ডও ফিসফিস করলেন। 'ওই প্রতীক চিহ্নই লাশের পরিচয় জানিয়ে দিচ্ছে।'

এরপর ওঁরা রাজার হাত মুক্ত করলেন, বক্ষাবরণের ওপর ভাঁজ করা ছিল আঙুলগুলো লম্বা, প্রতিটি আঙুলে একের পর এক আঙটি পরানো, হাতের মুঠোয় রাজদণ্ড। 'রাজার প্রতীক চিহ্ন। এটাই আসল প্রমাণ।' কথা বলার সময় হাঁপাচ্ছেন ফারুকী। 'উনি অষ্টম মামোস, প্রাচীন মিশরের আপার ও লোয়ার কিংডমের শাসনকর্তা।' রাজার মাথার দিকে এগোলেন তিনি, এখনও সেটা ব্যান্ডেজে মোড়া

'না, মাথা খুলবেন সবশেষে,' বাধা দিলেন ডুগার্ড 'ফারাও-এর মুখ দেখার জন্যে এখনও আমি প্রস্তুত নই।'

কাজেই রাজার শরীরের নিচের দিকটায় কাজ শুরু করলেন ফারুকী আর ফার্গুসন। ব্যান্ডেজের প্রতিটি স্তরের নিচ থেকে বেরুল মন্ত্রঃপূত কবচ, সবই সোনার তৈরি, বহুমূল্য রত্নখচিত। আকাশ, জমিন আর পানিতে এমন কোন প্রাণী নেই যার নকশা খোদাই করা হয়নি কবচগুলোয়, সবই রঙিন। প্রতিটি কবচের ফটো তোলা হলো, তারপর কফিন থেকে তুলে রাখা হলো রূপোর ট্রেতে।

'অনেক রাত হয়েছে, হের ডুগার্ড,' এক সময় বললেন ফারুকী। 'আপনি যদি বিশ্রাম নিতে চান...'

'না!'

এরপর রাজার আঙুল থেকে আঙটিগুলো খোলা হলো এক এক করে সবশেষে ফারুকী আর ফার্গুসন এসে দাঁড়ালেন মাথার দু'পাশে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে ফারাও-এর মুখ আর মাথা, প্রায় চার হাজার বছর পর এই প্রথম। চুল খুব পাতলা, হেনা দিয়ে রাঙানো। চামড়ায় সুগন্ধী লাক্ষার প্রলেপ দেয়া হয়েছিল, পালিশ করা অ্যাম্বারের মত শক্ত হয়ে গেছে। নাকটা বড়, টিকালো। ঠোঁট জোড়া পিছন দিকে সামান্য ঢুকে আছে, যেন স্বপ্নের ভেতর হাসছেন। চোখের পাতায় রেজিন বা লাক্ষার প্রলেপ থাকায় অশ্রুতে ভেজা মনে হলো, পাতাগুলো আধবোজা। ফারাও তাঁর কপালে রাজকীয় মুকুট পরে আছেন। গোক্ষুরের মাথার প্রতিটি বৈশিষ্ট্য এখনও নিখুঁত ও স্পষ্ট। লম্বা জিভ মাঝখানে চেরা। চোখগুলো চকচকে নীল কাঁচ। ফণার পিছনে রাজপরিবারের প্রতীক চিহ্ন।

'ওই মুকুট আমার চাই,' আবেগে কেঁপে গেল ডুগার্ডের কণ্ঠস্বর। 'তুলুন ওটা, আমার হাতে দিন।'

'কিন্তু তুলতে গেলে মমির ক্ষতি হতে পারে...'

ফারুকীকে ধমক দিলেন ডুগার্ড। 'আবার তর্ক করেন!'

'এখুনি তুলছি, হের ডুগার্ড,' তাড়াতাড়ি বললেন ফারুকী। 'তবে সময় লাগবে। হের ডুগার্ড যদি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেন, তোলার পর আমরা খবর পাঠাব...'

রেজিন মোড়া কপালের চামড়ার সঙ্গে সোনার বৃত্তটা শক্তভাবে আটকে আছে। কপাল থেকে ওটাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে কফিন থেকে গোটা মমিটা তুলতে হলো প্রথমে। তোলার পর স্টেইনলেস স্টীলের স্ট্রেচারে শোয়ানো হলো। বিশেষভাবে তৈরি সলভেন্টের সাহায্যে নরম করা হলো রেজিন। কাজটা শেষ করতে প্রচুর সময় লাগল।

মুকুটটা আলাদা করে রাখা হলো নীল ভেলভেট কুশনে। ভল্টের সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে একটা মাত্র স্পট লাইটের আলো সরাসরি ফেলা হলো ওটার ওপর। তারপর ফারুকী আর ফার্গুসন ওপরতলায় গেল ডুগার্ডকে খবর দিতে।

মুকুট দেখার জন্যে ভল্টে যখন আবার নামলেন ডুগার্ড, সঙ্গে ওদের কাউকে রাখলেন না, ওদের বদলে পাশে থাকলেন প্রাইভেট সেক্রেটারি ক্যান্ডি ক্যাম্পবেল।

মুকুটটা দেখামাত্র হাঁপাতে শুরু করলেন তিনি, হেলান দিলেন মহিলার গায়ে। মহিলা, ক্যাম্পবেল, জড়িয়ে ধরে রাখলেন ডুগার্ডকে। কোন কথা হলো না। নিজে থেকেই ধীরে ধীরে বসকে বিবস্ত্র করলেন তিনি। তারপর নিজেও বিবস্ত্র হলেন।

এক পর্যায়ে নগ্ন মহিলাকে কফিনের ভেতর শুইয়ে দিলেন ডুগার্ড। কেউ কোন কথা বলছেন না, সব যেন আগে থেকে ঠিক করা আছে। এরপর তিনি নিজেও ঢুকলেন কফিনে।

দশদিন পর কায়রো থেকে লন্ডনে ফিরল নিমা। রাত বারোটার ফ্লাইটে এয়ারপোর্টে রানা ওকে নিতে এসেছে।

মাত্র দশদিনের ব্যবধান, অথচ নিমার মনে হলো কত যুগ পরে আবার রানাকে দেখছে ও। ওকে আবার কাছে পেয়ে রানার আনন্দ-উচ্ছ্বাসও দেখার মত হলো। 'আপনার হাঁটুর খবর কি?' প্রথমেই জানতে চাইল রানা। 'এখনও কি পিঠে তুলে নেয়ার প্রয়োজন আছে?'

'প্রায় সেরে গেছে,' হাসতে [illegible] ঠিক এবার ফেলে দিলেই পারি।'

রেঞ্জ রোভারে চড়ে রানার অফিস কম-ফ্ল্যাটে ফিরতে ও [illegible] রানা চাইল, 'কি ঘটল কায়রোয়? কি করলেন, কোথায় গেলেন?'

'পরে বলব,' ম্লান সুরে জবাব দিল নিমা। একটু চিন্তিত হলো রানা, তবে আর কোন প্রশ্ন করল না।

ফ্ল্যাটে পৌঁছে নিমার ব্যাগ নিয়ে করিডর ধরে এগোচ্ছে রানা, পাশের একটা

কামরা থেকে নাক ডাকার আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়াল নিমা। 'কে ওখানে?'

'টনি মারটিন,' বলল রানা। 'টীমের নতুন সদস্য। আমাদের নিজস্ব এঞ্জিনিয়ার। কাল আপনার সঙ্গে পরিচয় হবে।' দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা, ওর পিছনে এসে দাঁড়াতে হলো নিমাকেও।

হঠাৎ নিমার নাকে রানার গন্ধ লাগল, এবং চোখের পলকে অ্যাবি গিরিখাদে ফিরে গেল ও। রানার মেদহীন একহারা কাঠামো, ঘামে ভেজা, খাড়া ট্রেইল ধরে উঠে যাচ্ছে, পিঠে ঝুলে রয়েছে ও। সেই স্পর্শে কোন লোভ-লালসা ছিল না, ছিল আশ্বাস আর নিরাপত্তা, ত্যাগ আর যত্ন-আত্তি, সহানুভূতি আর দরদ। নিজেকে খুব ছোট মনে হলো নিমার, নিজের জীবন বিপন্ন করে রানা ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে অথচ মন খুলে এখনও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়নি।

তারপর ভাবল, শুধু মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করায় তৃপ্তি নেই। অথচ কিছু দিয়ে রানাকে সন্তুষ্ট করাও সম্ভব নয়। দেয়ার মত কি আছে ওর?

ব্যাগগুলো ওর কামরায় পৌঁছে দিয়ে নিজের কামরায় ফিরে এল রানা।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেতে বসে নিমার সঙ্গে টনি মারটিনের পরিচয় করিয়ে দিল ও। মারটিন নিগ্রো, বয়স পঁয়ত্রিশের মত, দেখতে নাদুসনুদুস নিমাকে সে বলল, 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মিস আল নিমা।'

'ড. আল নিমা,' সংশোধন করে দিল রানা।

মাথা নাড়ল নিমা। 'না, আমাকে শুধু নিমা বলে ডাকবেন, প্লীজ।'

ব্রেকফাস্টে বসে ইথিওপিয়া বা টাইটা প্রসঙ্গে কোন আলোচনা হলো না, মারটিন আর রানা নিজেদের অতীত স্মরণ করে খানিকক্ষণ হাসাহাসি করল। তারপর হাতে কফির কাপ নিয়ে দাঁড়াল রানা, 'আসুন,' নিমাকে বলল। 'আপনাকে একটা জিনিস দেখাই।'

ওর পিছু নিয়ে সিটিংরুমের সামনে এসে দাঁড়াল নিমা আর মারটিন কামরাটার দরজা খুলে নাটকীয় ভঙ্গিতে কুর্নিশ করল রানা, বলল, 'দয়া করে ভেতরে ঢুকুন!'

সেন্ট্রাল টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে জলজ্যান্ত ডোরাকাটা ডিক-ডিক, শিং সহ। আফ্রিকা থেকে আনা ছালটা কিছু দিয়ে ভরা হয়েছে, জায়গামত বসানো হয়েছে শিং দুটো–ব্যস, তৈরি হয়ে গেছে নিখুঁত মডেল। নিমার মনে হলো, এখুনি ওটা লাফ দেবে। 'ওহ্, রানা, কি সুন্দর!' ডিক-ডিককে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে ও।

মডেলটা সব কথা মনে করিয়ে দিল নিমাকে। গিরিখাদের ঝোপের ভেতর প্রচণ্ড গরম, খাদ থেকে নিচে পড়ে যাবার ভয়, ডানডেরা নদী, টাইটার পুল, প্রক্সির হেলিকপ্টার, মঠ, সন্ন্যাসী, আর বাটির মর্মান্তিক মৃত্যু, সব যেন একসঙ্গে ভিড় করে এল মনের কানাচে। অদ্ভুত এক বিষণ্ণতা গ্রাস করল ওকে। সেটা বুঝতে পেরে ওর একটা হাত ধরে টান দিল রানা, ফিরিয়ে আনল ডাইনিং রুমে।

'ডানডেরা নদীর গহ্বরে কিভাবে নামব, আসুন আলোচনা করি,' বলল রানা। 'আপনি ছিলেন না, মারটিন আর আমি একটা প্ল্যান তৈরি করেছি। আপনার মনে আছে তো, টাইটার পুলে ডুব দেয়ার জন্যে স্কুবা ব্যবহার করার কথা ভেবেছিলাম আমরা? কি কি সমস্যা আছে তা-ও বলেছিলাম।'

'হ্যাঁ, মনে আছে,' বলল নিমা। 'আপনি বলেছিলেন অ্যান্ডারওয়াটার ফাটলের কাছে প্রেশার খুব বেশি, কাজেই অন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।'

'হ্যাঁ। সেই অন্য পদ্ধতির কথা আমাকে জানিয়েছেন মারটিন। বলা যায়, সমস্যাটার সমাধান হয়ে গেছে।'

মারটিনের দিকে তাকাল নিমা। মারটিন একবার কেশে গলা পরিষ্কার করল, তারপর বলল, 'একটু আভাস দিই। মাঝে মধ্যে পুরানো পদ্ধতিই সবচেয়ে ভাল কাজ দেয়।'

ওকে অপেক্ষা করিয়ে রাখা হচ্ছে, বুঝতে পেরে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিল নিমা। 'আপনার যদি এতই বুদ্ধি, তাহলে বিখ্যাত নন কেন?' প্রশ্নটা করার পর হঠাৎ ভুরু কোঁচকাল। 'পুরানো পদ্ধতি? তারমানে টাইটা যেভাবে কাজটা করেছিল? ডাইভিং ইকুইপমেন্ট ছাড়া যেভাবে সে পুলের তলায় পৌঁচেছিল?'

'কি সাংঘাতিক! উনি তো ধরে ফেলেছেন! রানা, কে কাকে সারপ্রাইজ দিচ্ছে?' অসহায় দেখাল মারটিনকে।

একবার তালি মারল নিমা। 'বাঁধ!' বলল ও। 'চার হাজার বছর আগে টাইটা যেখানে বাঁধ দিয়েছিল আপনারাও সেখানে আবার বাঁধ দিতে চাইছেন!'

টেবিল ছেড়ে দেয়ালের পাশে এসে দাঁড়াল মারটিন, দেয়াল ঘেঁষে খাড়া করা পর্দা ঢাকা একটা বোর্ড রয়েছে ওখানে। পর্দাটা সরাল সে, উন্মোচিত হলো পিন দিয়ে আটকানো এনলার্জ করা ফটোগুলো। ডানডেরা নদীর যেখানে টাইটা বাঁধ তৈরি করেছিল বলে ধারণা করে ওরা, রানার তোলা সেই জায়গার ফটো রয়েছে এখানে। আর রয়েছে বাটির দেখানো প্রাচীন কোয়ারির ফটো। ওগুলোর ওপর মার্কার পেন দিয়ে রেখা টানা হয়েছে, দূরত্বের হিসাব লেখাও হয়েছে।

'রানা আমাকে এই পয়েন্টে রিভার বেড-এর ডাইমেনশন-এর হিসাব দিয়েছে, আগের প্রবাহ ফিরে পেতে হলে কতটা উঁচু করতে হবে পাঁচিল, তারও আনুমানিক একটা হিসাব আমরা বের করেছি। সঙ্গে খুব কম ইকুইপমেন্ট থাকবে, তবু কাজটা করা সম্ভব বলে মনে করি আমি।'

'প্রাচীন মিশরীয়রা যদি করতে পারে, আপনার জন্যে কাজটা পানির মত সহজ হবার কথা, মারটিন,' মন্তব্য করল নিমা।

'ধন্যবাদ, নিমা,' আড়ষ্ট হেসে বলল মারটিন। 'তবে কাজটা সহজ নয় মোটেই।' বোর্ডে আটকানো ড্রইংগুলোর দিকে তাকাল সে। 'বাঁধ তৈরি করার অনেক পদ্ধতি আছে, তবে আজকাল যে পদ্ধতিতে তৈরি করা হয় তাতে হাতের কাছে রিইনফোর্সড কংক্রিট আর হেভি আর্থ-মুভিং ইকুইপমেন্ট দরকার। এ-সব আধুনিক সুবিধে আমরা পাব বলে মনে হয় না।'

'টাইটা তো বুলডোজারের সাহায্য ছাড়াই কাজটা করেছিল।'

'কিন্তু তার ছিল বিপুল লোকবল।'

'লোকবল কমবেশি আমরাও যোগাড় করতে পারব।'

রানা বলল, 'বর্ষা শুরুর আগে আমাদের হাতে সময় মাত্র দু'মাস। ভাবছি মঠ সন্ন্যাসীদের সাহায্য পাওয়া যাবে কিনা।'

'তোমরা আমাকে শ্রমিক এনে দেবে, আমি তোমাদেরকে বাঁধ তৈরি করে

দেব,' প্রতিশ্রুতি দিল মারটিন। 'আগে যেমন বলেছি, পুরানো পদ্ধতিই ভাল। প্রাচীন মিশরীয়রা মূল বাঁধের ভিত তৈরির জন্যে যে কফার ড্যাম আর গ্যাবিয়ন সিস্টেম ব্যবহার করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'সরি,' বাধা দিল নিমা। 'গ্যাবিয়ন? এঞ্জিনিয়ারিঙে আমার কোন ডিগ্রী নেই।'

'সরি বলা উচিত আমার,' আড়ষ্ট হেসে বলল মারটিন। 'আমার ড্রইংগুলো দেখুন, প্লীজ।' বোর্ডের দিকে ফিরল সে। 'এই টাইটা ভদ্রলোক সম্ভবত বাঁশ বা বেত দিয়ে বিশাল আকারের ঝুড়ি তৈরি করে সেগুলোয় পাথর ভরেছিলেন। এগুলোকে গ্যাবিয়ন বলে।' বোর্ডের আঁকা নকশা দেখাল সে। 'তারপর গ্যাবিয়নগুলোর মাঝখানে বৃত্তাকার পাঁচিল তোলার জন্যে কাঠ ব্যবহার করেন সেগুলোও তিনি পাথর আর মাটি দিয়ে ভরাট করেন।'

'মোটামুটি একটা ধারণা পাচ্ছি,' বলল নিমা। 'তবে এত সব খুঁটিনাটি আমার না জানলেও চলে।'

'তা ঠিক,' বলল মারটিন। 'রানা আমাকে জানিয়েছে, কাঠের কোন অভাব হবে না। তবে বাঁশ বা বেতের বদলে ব্যবহার করব তারের জাল, গ্যাবিয়ন তৈরির কাজে।'

'তারের জাল?' নিমা অবাক। 'অ্যাবি উপত্যকায় আপনি তারের জাল পাবেন কোত্থেকে?'

'কাছাকাছি একটা এঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে তৈরি হচ্ছে ওগুলো,' বলল মারটিন। 'অন্যান্য ইকুইপমেন্টেরও অর্ডার দেয়া হয়েছে।'

'কোয়ারির কথাটাও বলো,' উৎসাহ যোগাল রানা।

মাথা ঝাঁকাল মারটিন। 'কোয়ারির ফটো দেখেছি আমি। দেড়শোর বেশি গ্র্যানিট ব্লক সাইজ করা আছে। তারের জাল আর টিম্বার কফার ওয়াল-এর সঙ্গে যদি এই ব্লকগুলো ব্যবহার করি, মূল বাঁধের ভিত খুব শক্ত হবে।'

'একেকটা ব্লক কত টন ওজন, আন্দাজ করতে পারেন? আনবেন কিভাবে?' প্রশ্ন করার পর হাত তুলল নিমা। 'থাক, বলতে হবে না। আপনি সম্ভব বললে আমি মেনে নেব।'

'সম্ভব,' আশ্বস্ত করল মারটিন।

'টাইটা যখন আনতে পেরেছে, আমরাও পারব,' বলল রানা। 'তার পদ্ধতিই ব্যবহার করব আমরা। আপনার এতে খুশি হবারই কথা। হাজার হোক, সে আপনার আত্মীয়।'

'ঠাট্টা নয়, আত্মীয়ই তো।'

'সমস্ত ইকুইপমেন্ট কাল থেকে লোড করার কাজ শুরু হবে,' বলল রানা। 'আপনাকে বলা হয়নি, আমরা মাল্টায় যাচ্ছি।'

'মাল্টায় কেন?'

'আমার বন্ধুর স্ত্রী সেলিনা নাসিম জানিয়েছেন, হাতে প্লেন না থাকায় সাহায্য করতে পারছেন না,' বলল রানা। 'তবে আফ্রিকান স্কাই নামে একটা চার্টার কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন আমার। দুই বাপ-ব্যাটা চালায় ওটা, ইস্কান্দর আর কালান্দার। মাল্টা ওদের বেস। ওদের সম্পর্কে আগে থেকেই

জানি আমি। ওদের হারকিউলিস প্লেন আছে। অ্যাবে গিরিখাদে ওরাই আমাদেরকে নিয়ে যাবে। ইতিমধ্যে যে-সব ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে সবই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে মাল্টায়। বাকি সব নিয়ে দু'তিন দিনের মধ্যে রওনা হয়ে যাবে মারটিন। আমরা যাব এক হপ্তা পর।'

'ইথিওপিয়া থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে আমাদের,' বলল নিমা। 'ফিরব কিভাবে?'

'খিড়কি দরজা দিয়ে।' নিঃশব্দে হাসল রানা। 'গেট কীপার হিসেবে থাকবে পুরানো দোস্ত শাফি।'

'শাফির সঙ্গে আপনি যোগাযোগ করেছেন?'

'রুবির মাধ্যমে মনে হলো রুবিই এখন শাফির প্রাইভেট সেক্রেটারি। বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে শাফি, কারণ বিশাল পরিধি জুড়ে রুবির যোগাযোগ, শাফির দূত হিসেবে আফ্রিকার যে-কোন শহরে যেতে পারবে ও, যে-সব জায়গায় যাওয়া শাফির জন্যে নিরাপদ নয়।'

'দেখা যাচ্ছে অনেক কাজই সেরে ফেলেছেন আপনি,' বলল নিমা। 'শাফি কি টাইটার ব্যাপারটা জানেন?'

'বিশদ জানে না,' মাথা নাড়ল রানা। 'তবে সন্দেহ করেছে। কিছু আসে যায় না, আমি তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করি।'

'ওদিকের আর সব খবর কি?'

'ফোনে কথা বলার সময় রুবিকে খুব উত্তেজিত মনে হলো,' বলল রানা। পরিষ্কার কিছু বলতে পারল না, তবে শুনেছে সেইন্ট ফ্রুমেনটিয়াস মঠে নাকি হামলা করা হয়েছে। ওলি জারকাস সহ চল্লিশ জনের মত সন্ন্যাসী হতাহত হয়েছেন। চার্চে যে-সব পবিত্র পুরানিদর্শন ছিল সবই নাকি লুঠ হয়ে গেছে।'

'ওহ্, ডিয়ার গড, নো!' স্তম্ভিত দেখাল নিমাকে। 'এ কিভাবে সম্ভব! কারা করল?'

'হাসলানকে যারা খুন করেছে,' বলল রানা। 'আর আপনাকে খুন করার জন্যে তিনবার চেষ্টা করেছে।'

'প্রক্সি।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা 'হেস ডুগার্ড।'

দৈত্যাকার হারকিউলিস সি এমকে ওয়ান চার এঞ্জিন বিশিষ্ট টারবোপ্রপ প্লেন, গায়ের রঙ [illegible] ফিউজিলাজের আইডেনটিফিকেশন লেটারিং ঝাপসা হয়ে গেছে। প্লেনের [illegible] আফ্রিকান স্কাই লেখা নেই। ইস্কান্দারের হাতে পড়ার আগে চল্লিশ বছরে পাঁচ লাখ ঘণ্টা উড়েছে ওটা।

মাল্টার ভ্যালেটা এয়ারফিল্ডের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকা প্লেনটার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে আছে নিমা 'উড়বে তো?' জিজ্ঞেস করল ও।

'ইস্কান্দার ইচ্ছে করেই ওটার চেহারা এরকম করুণ করে রেখেছেন,' ওকে আশ্বস্ত করল রানা। 'চুপিচুপি বলি, এই প্লেন স্মাগলিং-এর কাজে ব্যবহার করা হয়।'

'পাইলট হিসেবে কেমন ওঁরা?'

'দু'জনেই, মানে বাপ ও ব্যাটা, ফার্স্ট-রেট অ্যারো-এঞ্জিনিয়ার।'

হ্যাঙ্গার থেকে বেরিয়ে এলেন ইস্কান্দার গাউস, হাতছানি দিয়ে ডাকলেন ওদের। তাঁর পিছু নিয়ে বিশাল হ্যাঙ্গারে ঢুকল ওরা, থামল ছোট একটা অফিসের সামনে, দরজায় লেখা রয়েছে আফ্রিকান স্কাই। ভেতরে সুন্দরী একটা মেয়ে বসে রয়েছে।

'ইস্কান্দারের নতুন সেক্রেটারি,' ফিসফিস করল রানা। 'শুনেছি ছেলের বউ করবে। ওর নাম ফাতেমা।'

'আপনি তো আমার সঙ্গে লন্ডন থেকে আসছেন, এত কথা জানলেন কিভাবে?'

'আগেই জেনেছি,' বলল রানা। 'বেশিরভাগ নাসিমের কাছ থেকে।'

ফাতেমা ওদেরকে কফি পরিবেশন করল। ইস্কান্দারের সঙ্গে ফ্লাইট প্ল্যান নিয়ে কথা হলো রানার।

'জ্ঞাতি ভাই গাদ্দাফীর সঙ্গে এই মুহূর্তে আমার একটু মন কষাকষি চলছে, তাই তাঁর রাজ্য এড়িয়ে প্লেন চালাতে হবে আমাকে। মিশরের ওপর দিয়ে যাব, তবে ল্যান্ড করব না।' হাত তুলে ডেস্কে ছড়ানো ম্যাপগুলো দেখালেন তিনি। 'সুদানে আবার গৃহযুদ্ধ চলছে, তবে উত্তর দিকটায় রাডার ব্যবস্থা আধুনিক নয়, তাই ব্ল্যাক স্পট দেখে উড়ে যাওয়া কঠিন হবে না। সামরিক স্থাপনাগুলোর কাছ থেকে দূরে থাকব আমরা। ল্যান্ড করব সীমান্তের বেশ খানিক এদিকে।'

'ফ্লাইং টাইম সম্পর্কে একটা ধারণা দিন,' বলল রানা।

'পনেরো ঘণ্টা।'

'রিফুয়েলিং?'

'দরকার হবে না। এক্সট্রা ট্যাংক আছে। একাত্তর হাজার কিলো ফুয়েল নিচ্ছি।' হ্যাঙ্গারের গেট দিয়ে বড় একটা ট্রাক ঢুকল। 'কালান্দার আর মারটিন ফিরে এসেছে।'

ট্রাকটা থামল হ্যাঙ্গারের শেষ মাথায়, ওখানে ইকুইপমেন্ট ও স্টোর স্তূপ হয়ে রয়েছে, লোড করার জন্যে তৈরি। ট্রাক থেকে নেমে এল কালান্দার, রানা ও নিমার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। ছেলেটা বাপেরই তরুণ সংস্করণ।

'এটাই শেষ ট্রাক,' ট্রাকের সামনের দিকটা ঘুরে এগিয়ে এল মারটিন। 'আর কোন কার্গো নেই। ইচ্ছে করলে এখুনি আমরা প্লেনে ওগুলো তুলে ফেলতে পারি। আমার ফ্রন্ট-এন্ড লোডিং ট্র্যাক্টর একদম শেষে তুলব।'

'ভোর চারটের সময় রওনা হতে চাই আমরা,' বলল রানা। 'সব কার্গো একসঙ্গে নেয়া যাচ্ছে না, হারকিউলিসকে আরও একবার কার্গো নিয়ে যেতে হবে।'

ইস্কান্দার বললেন, 'নো প্রবলেম।'

'টাইটা, আসছি আমরা!' নিমার ফিসফিসানি একা শুধু রানা শুনতে পেল।

'প্রব্লি, তোমরাও তৈরি থাকো,' বিড়বিড় করল রানা, একা শুধু নিমা শুনতে পেল কথাটা।

'ওরা আবার ইথিওপিয়ায় ফিরে যাচ্ছে,' গম্ভীর সুরে বললেন হেস ডুগার্ড।

'আচ্ছা! আপনি ঠিক জানেন, হের ডুগার্ড?'

ফারুকীর দিকে কটমট করে তাকালেন ডুগার্ড। এই মিশরীয় আর্কিওলজি এক্সপার্ট তাঁর বিরক্তি উৎপাদনের কারখানায় পরিণত হয়েছেন। ভদ্রলোককে চাকরি দেয়ায় নিজের ওপর এখন তিনি অসন্তুষ্ট। নিজের জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লম্বা-চওড়া বক্তৃতা ঝাড়লেও, মঠ থেকে উদ্ধার করে আনা ফলকটার খোদাই অনুবাদ করতে মোটেও সফল হননি ফারুকী। কেন দেরি হচ্ছে জিজ্ঞেস করায় একের পর এক খোঁড়া অজুহাত খাড়া করছেন। 'আপনি কি ভাবেন, প্রতিপক্ষ কি করছে না করছে আমি তার খবর রাখব না? জেনারেল উর্মিদ মানামা ওদের ওপর নজর রাখছেন, তাঁর কাছ থেকে সব খবর পাচ্ছি আমি। ইংল্যান্ড থেকে আল নিমা মিশরে গিয়েছিলেন...'

'সেক্ষেত্রে, হের ডুগার্ড, তার ব্যবস্থা করেননি কেন?'

'আপনি গাধা নাকি?' রেগে গেলেন ডুগার্ড। 'ব্যবস্থা করিনি, কারণ আমার ধারণা আপনি নন, আল নিমাই আমাকে ফারাও-এর সমাধিতে নিয়ে যাবে।'

'কিন্তু, স্যার, আমি তো...'

'এখন পর্যন্ত কিছুই আপনি করেননি, ফারুকী। ফলকটা এখনও দুর্বোধ্য...'

'কাজটা খুব কঠিন, হের ডুগার্ড।'

'কঠিন বলেই তো মোটা টাকা বেতন দিয়ে আনা হয়েছে আপনাকে। ওই ফলকে সত্যি যদি মামোসের সমাধিতে পৌঁছুনোর সূত্র থাকে, তাহলে লেখক টাইটা সেটাকে জটিল করেই তো রাখবে।'

'আমাকে যদি আরও খানিক সময় দেয়া হয়...'

'কি বলছি শুনতে পাচ্ছেন না? মাসুদ রানা অ্যাবে গিরিখাদে ফিরে যাচ্ছেন। মান্টা থেকে একটা চার্টার করা প্লেন নিয়ে রওনা হয়ে গেছেন তাঁরা, সঙ্গে সমস্ত ইকুইপমেন্ট আছে, ট্র্যাক্টর সহ। আমার কাছে এর অর্থ হলো, তাঁরা সমাধিটা খুঁজে পেয়েছেন, ফিরে যাচ্ছেন মাটি খুঁড়ে বের করতে।'

'ওরা মঠে পৌঁছাক না, খতম করা কোন ব্যাপার না,' বললেন ফারুকী, যেন নিজেই আশ্বস্ত হতে চাইছেন। 'কর্নেল ঘুমাকে বললেই তিনি ব্যবস্থা করবেন।'

'আপনি একটা উজবুক!' গর্জে উঠলেন ডুগার্ড। 'যারা আমাকে মামোসের সমাধি পাইয়ে দেবেন, আমি তাঁদেরকে মেরে ফেলব?' ফারুকীর দিকে চোখ গরম করে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। 'আপনাকে আমি ইথিওপিয়ায় ফেরত পাঠাচ্ছি। ওখানে কোন কাজে এলেও আসতে পারেন।'

ফারুকী চুপ করে থাকলেন।

'বেস ক্যাম্পে গিয়ে রাফেলের অধীনে কাজ করবেন আপনি,' বললেন ডুগার্ড। 'সে আপনাকে অর্ডার করবে, আপনি তার অর্ডার মত কাজ করবেন। মাসুদ রানা বা আল নিমার বিরুদ্ধে কোন অ্যাকশন নিতে যাবেন না।'

'ওখানে তাহলে আমার কাজটা কি হবে?'

'অ্যাকশন নেবেন না, তবে ওদের ওপর নজর রাখবেন। কিন্তু সাবধান, নজর

রাখতে গিয়ে ওদেরকে আবার সতর্ক করে দেবেন না যেন। কর্নেল ঘুমার একজন স্পাই আছে, ওদের গতিবিধি সম্পর্কে সে কর্নেলকে রিপোর্ট করবে, আপনি কর্নেলের কাছ থেকে সে-সব জেনে নিয়ে বিশ্লেষণ করবেন, বুঝতে চেষ্টা করবেন মাসুদ রানা ঠিক কি অর্জন করতে চাইছেন।'

'আর আপনি? ইথিওপিয়ায় আসছেন না?'

'এত প্রশ্ন করেন কেন? সময় হলে ঠিকই আমি ওখানে পৌঁছে যাব।'

'ফলকটার কি হবে?'

'আপনি ওটার ফটো তুলে নিয়ে যান। স্যাটেলাইটে রিপোর্ট পাঠাবেন।'

'আমাকে কখন আপনি পাঠাতে চান?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। সম্ভব হলে এখুনি। আমার সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলুন, যান।'

পনেরো ঘণ্টার ফ্লাইট শেষ হয়ে এল। পুব দিগন্তে ইথিওপিয়ান পাহাড়-শ্রেণীর নীলচে আভাস ফুটে উঠল গাঢ় নীল আফ্রিকান আকাশের গায়ে, হাত তুলে রানা না দেখানো পর্যন্ত নিমার চোখে ধরা পড়ল না। 'প্রায় পৌঁছে গেছি,' বলল ও। 'চলুন, ফ্লাইট ডেকে যাই।'

উইন্ডশীল্ডের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে সামনে কোথাও ল্যান্ডমার্ক দেখল না ওরা, যতদূর দৃষ্টি যায় ধু-ধু বৃক্ষহীন প্রান্তরই শুধু চোখে পড়ে।

'আমার হিসেবে দশ মিনিটে পৌঁছে যাব আমরা,' বললেন ইস্কান্দার। 'কেউ কিছু দেখতে পাচ্ছেন?' উত্তরে কেউ কিছু বলল না।

'পাঁচ মিনিট।'

'ওদিকে!' ইস্কান্দারের কাঁধের ওপর দিয়ে হাত লম্বা করে দেখাল রানা। 'ওটাই নীলনদের কোর্স।' বহু দূর সামনে ঘন কাঁটাঝোপ গাঢ় একটা রেখা তৈরি করেছে। 'সুগার মিলের চিমনিটাও দেখা যাচ্ছে। শাফি বলেছে মিল থেকে তিন মাইল দূরে এয়ারস্ট্রিপটা।'

'কিন্তু চার্টে নেই,' বললেন ইস্কান্দার। 'কোঅর্ডিনেটস-এ পৌঁছুতে আর এক মিনিট।' স্পিওয়াচে ধীরে ধীরে পার হলো সময়টা।

'এখনও কিছু দেখছি না,' কো-পাইলটের সীট থেকে বলল কালান্দার। তার কথা শেষ হওয়া মাত্র হারকিউলিসের নাকের সামনে দিয়ে একটা ফ্লেয়ার উঠে গেল আকাশের আরও ওপরে। ককপিটে উপস্থিত সবাই স্বস্তির হাসি হাসল।

ইস্কান্দারের পিঠ চাপড়ে দিল রানা। 'ধন্যবাদ। এতটা সরাসরি আমি নিজেও পৌঁছুতে পারতাম না।'

কয়েকশো ফুট ওপরে উঠল প্লেন, ওয়ান-এইটি টার্ন নিয়ে ফিরে আসছে। প্রান্তরে এখন দুটো সিগন্যাল ফ্লেয়ার জ্বলছে—একটা কালো ধোঁয়া ছাড়ছে, অপরটা সাদা। মাইলখানেক দূরে থাকতে ঝোপে ঢাকা ও পরিত্যক্ত ল্যান্ডিং স্ট্রিপের অস্পষ্ট রেখা ধরা পড়ল চোখে। বিশ বছর আগে রোজিরেস এয়ারস্ট্রিপ তৈরি করেছিল একটা বেসরকারী কোম্পানী। নীলনদ থেকে পানি নিয়ে আখ চাষ করার পরিকল্পনা ছিল তাদের। কিন্তু বরাবরের মত আফ্রিকান খরা জিতে যায়, পাততাড়ি

গুটিয়ে বিদায় নেয় কোম্পানী। সেই থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে এয়ারস্ট্রিপটা। অ্যালান শাফি রদেভো হিসেবে এই জায়গাটা বেছে নিয়েছে।

'কাউকেই তো দেখছি না,' বললেন ইস্কান্দার। 'আমাকে এখন কি করতে বলেন?'

'আরেকটা ফ্লেয়ার থাকার কথা...ওই তো!' রানওয়ের শেষ প্রান্ত থেকে আকাশে উঠল আরেকটা ফ্লেয়ার। হাসছে রানা। কাঁটাঝোপের আশপাশে এই প্রথম মানুষের নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছে। একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গা ঢাকা দিয়েছিল ওরা।

'শাফি, সন্দেহ নেই। আপনি ল্যান্ড করতে পারেন।'

ওদের সামনে রানওয়েতে এখন ক্যামোফ্লেজ ফেটিগ পরা সচল মূর্তি দেখা যাচ্ছে।

প্লেন থামার পর লোডিং র‍্যাম্প নিচু করা হলো, সেটা বেয়ে তরতর করে ওপরে উঠে এল শাফি 'রানা!' আলিঙ্গন করল রানাকে, সশব্দে চুমো খেলো দু'গালে, আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে আছে চেহারা। 'আমার কথাই ঠিক! শুধুই ডিক-ডিক শিকার নয়, অন্য কোন রহস্য আছে! কি?'

'পুরানো বন্ধুকে মিথ্যে বলি কিভাবে!' কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

'তাহলে কি ধরে নিতে পারি দু'জন মিলে খুব মজা করা যাবে? জীবন এখানে বড়ই একঘেয়ে।'

'কথা দিচ্ছি।'

একহারা দেহ সৌষ্ঠব, একটা নারীমূর্তি উঠে এল র‍্যাম্প বেয়ে মেয়েটার পরনে জলপাই-সবুজ ফেটিগ। কথা না বলা পর্যন্ত রুবিকে রানা চিনতেই পারল না। ক্যানভাস প্যারা বুট আর কাপড়ের তৈরি ক্যাপ্ পরে আছে, দেখে মনে হবে একটা ছেলে।

'স্যার, মি. রানা! ম্যাডাম, ড. নিমা! ওয়েলকাম ব্যাক!' চিৎকার জুড়ে দিল রুবি, হাঁপাচ্ছে। নিমা আর রুবি জোড়া লেগে গেল।

'এটা অস্বস্তিকর একটা সমস্যা,' বলল রানা। 'বারণ করলেও শোনে না।'

সবাই চুপ করে গেল, তাকিয়ে আছে ওর দিকে 'রুবিকে বলছি,' আবার বলল রানা। 'একশোবার বারণ করেছি, আমাকে স্যার বলা যাবে না, নিমাকেও ম্যাডাম বলার দরকার নেই। কেন, মাসুদ ভাই আর নিমা আপা বলতে অসুবিধে কি?'

লজ্জা পেয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল রুবি। 'ঠিক আছে, তাই বলব, মাসুদ ভাই।'

হেসে উঠল সবাই।

'আরে, এরা তো দেখছি খোশগল্পে মগ্ন হয়ে পড়ল!' ইস্কান্দারও হাসছে। 'আমাকে আজ রাতেই মাল্টা ফিরতে হবে। সন্ধের আগেই টেক-অফ করতে চাই।'

শাফির নেতৃত্বে দ্রুত মাল খালাস করার কাজ শুরু হলো। তার লোকজন প্লেনে ঢুকে রোলারে চড়াল ভারী বাক্সগুলো। মারটিন অবশ্য নিজের ফ্রন্ট-এন্ড

লোডার স্টার্ট দিল, বাছাই করা কিছু কার্গো নামিয়ে এনে জড়ো করল কাঁটাঝোপের আড়ালে। সূর্য পাটে বসেছে, এই সময় খালি হয়ে গেল প্লেন।

ককপিটে বসে শেষ একবার আলোচনা করল রানা ও ইস্কান্দার।

'আজ থেকে চারদিন পর,' একমত হলেন ইস্কান্দার, হ্যান্ডশেক করলেন রানার সঙ্গে।

'ভদ্রলোককে যেতে দাও, রানা,' নিচে থেকে হাঁক ছাড়ল শাফি। 'ভোরের আগে সীমান্ত পেরুতে হবে আমাদের।'

প্লেন ফিরে যাবার পর রুবিকে নিয়ে একটা ঝোপের সামনে বসল নিমা। আবার দেখা হওয়ায় দু'জনেই খুব খুশি।

'তোমাদের মাল-পত্র পাহারা দেয়ার জন্যে পুরো একটা কমব্যাট প্ল্যাটুন রেখে যাচ্ছি এখানে,' রানাকে বলল শাফি। 'সীমান্ত পর্যন্ত খুব ছোট একটা দল যাব আমরা। আপাতত এদিকে শত্রুপক্ষের তৎপরতা খুবই কম, কাজেই কোন বিপদ না হবারই কথা।'

'ইথিওপিয়ান বর্ডার কত দূরে?' জানতে চাইল রানা।

'পাঁচ ঘণ্টা হাঁটতে হবে,' বলল শাফি। 'চাঁদ ওঠার আগেই সীমান্ত পেরুতে চাই। আমার দলের বাকি লোকজন অ্যাবে গিরিখাদের মুখে অপেক্ষা করছে। কাল ভোরে ওদের সঙ্গে মিলিত হব।'

'ওখান থেকে মঠ পর্যন্ত?'

'আরও দু'দিনের পথ,' জবাব দিল শাফি। 'ওখানে কার্গো ড্রপ করবেন তোমার পাইলট, কাজেই পৌঁছুতে দেরি করলে চলবে না।'

প্ল্যাটুন কমান্ডারের সঙ্গে কথা বলার জন্যে একপাশে সরে গেল শাফি, রোজিরেসে রেখে যাওয়া অবশিষ্ট কার্গো তার অধীনেই পাহারা দেবে গেরিলারা তারপর ছ'জন লোককে ডাকল সে, বর্ডার পেরুবার সময় এসকর্ট হিসেবে থাকবে ওরা।

হঠাৎ গলা চড়িয়ে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল শাফি। 'ওটা উনি কোন্ বুদ্ধিতে প্লেনে করে এনেছেন, রানা?' থিয়ডালাইট-এর মোটাতাজা পায়াগুলোর দিকে বিরূপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। বিশাল এক বাক্স খুলে প্লেন থেকে ওটা বের করে এনেছে মারটিন।

মারটিন আরবী জানে না, কাজেই অনুবাদকের ভূমিকা নিতে হলো রানাকে 'মারটিন বলছে ওটার ডেলিকেট ইন্সট্রুমেন্ট। প্লেন থেকে ড্রপ করার ঝুঁকি নিতে রাজি হয়নি। বলছে, এটার কোন ক্ষতি হলে যে কাজের জন্যে তাকে আনা হয়েছে সে-কাজ করতে পারবে না।'

'কে ওটা বহন করবে?' জিজ্ঞেস করল শাফি। 'আমার লোকদের বললে বিদ্রোহ করবে তারা।'

'বুনো ভাঁড়টাকে বলো আমি নিজে এটা বহন করব,' বলল মারটিন। 'তার বাঁদরগুলো এটা ছুঁলে তাদের হাত আমি ভেঙে দেব।' বোঝাটা হ্যাঁচকা টানে নিজের কাঁধে তুলে নিল সে।

হারকিউলিস ফিরে যাবার আধঘণ্টা পর অন্ধকার ও নিস্তব্ধ প্রান্তর ধরে রওনা

হলো ওরা, অ্যাডভান্স গার্ড পাঁচ মিনিট আগে রওনা হয়েছে। পুব দিকে যাচ্ছে ওরা। লম্বা পা ফেলে দ্রুত হাঁটছে শাফি। নিমা ভাবল, রানা আর শাফির চোখ শিকারী বিড়ালের মত সতর্ক: ওদের দু'জনের ঠিক পিছনেই রয়েছে ও। অন্ধকারে কিভাবে দেখতে পাচ্ছে কে জানে, মাঝে মধ্যেই ফিসফিস করে সাবধান করে দিচ্ছে ওকে–কখনও শাফি, কখনও রানা–সাবধান করায় গর্ত বা পাথরের স্তূপগুলোকে এড়িয়ে যেতে পারছে নিমা। তারপরও যখন হোঁচট খেলো, সব সময় মনে হলো ওর পাশেই আছে রানা, শক্ত হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল প্রতিবার।

নিস্তব্ধতার ভেতর শৃংখলা বজায় রেখে এগোচ্ছে দলটা। প্রতি ঘণ্টায় পাঁচ মিনিট করে বিশ্রাম। বিশ্রামের সময় একসঙ্গে বসছে রানা আর শাফি, ওদের দু'একটা কথা নিমার কানে ভেসে আসছে। অ্যাবে গিরিখাদে ওদের ফিরে আসার কারণটা শাফিকে ব্যাখ্যা করছে রানা। 'মামোস' আর 'টাইটা' শব্দ দুটো কয়েকবার উচ্চারণ করল রানা। শাফির ভরাট কণ্ঠস্বর থেকে প্রশ্নবোধক আওয়াজ বেরুচ্ছে। বিশ্রাম শেষে আবার শুরু হলো যাত্রা।

এক পর্যায়ে সময়ের আর কোন হিসাব থাকল না নিমার। শরীর ও মন দুটোই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। প্রতিটি পদক্ষেপ পরিশ্রম সাপেক্ষ ও কষ্টকর মনে হলো। ক্ষতটা প্রায় সেরে গেলেও, আবার ব্যথা শুরু হলো হাঁটুতে। মাঝে মধ্যে অনুভব করল রানা ওর বাহু বয়েছে, খানা-খন্দটুকু পার করে দিচ্ছে। আবার কখনও বা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল গোটা দল, সামনে থেকে নিচু গলার সতর্ক সংকেত ভেসে এসেছে। অন্ধকারে চুপচাপ অপেক্ষা। সবাই উত্তেজিত ও নার্ভাস। তারপর আরও একটা সংকেত এল। আবার শুরু হলো কষ্টকর পদযাত্রা। একবার নদীর গন্ধ পেল নিমা, ভাবল নীলনদের কাছাকাছি কোথাও রয়েছে ওরা। কেউ কোন কথা বলেনি, তবু পুরুষদের আড়ষ্ট ভাব লক্ষ্য করে বুঝতে পারল সামনে কিছু একটা আছে। গেরিলারা কাঁধ থেকে অস্ত্র নামিয়ে বাগিয়ে ধরল।

'সামনে বর্ডার,' নিমার মুখের কাছাকাছি নিঃশ্বাস ফেলল রানা। উত্তেজনাটা সংক্রামক। ক্লান্তির কথা ভুলে গেল নিমা। পালস রেট বেড়ে গেছে।

এক ঘণ্টা পার হলো। তবু বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থামল না ওরা। আরও এক ঘণ্টা পর সামনে থেকে কারও হাসির অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে এল। 'অল ক্লিয়ার,' নিমাকে বলল রানা। 'ইথিওপিয়ায় ঢুকে পড়েছি আমরা। আপনার খবর কি, নিমা?'

'ভাল আছি।'

'ক্লান্ত আমিও।' চাঁদের আলোয় হাসল রানা। 'খানিক পরই ক্যাম্প ফেলা হবে।'

সন্দেহ হলো মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছে রানা। পথ যেন ফুরোবার নয়, কাজেই হাঁটারও কোন বিরাম নেই। এক সময় কান্না পেল নিমার। তারপর হঠাৎ নদীর আওয়াজ ভেসে এল কানে। ইতিমধ্যে ভোর হয়ে এসেছে। সামনে যারা অপেক্ষা করছিল, তাদের একজনের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেল শাফিকে। হাত ধরে পথ থেকে নিমাকে সরিয়ে আনল রানা, এক জায়গায় বসিয়ে নিজের হাতে খুলে দিল পায়ের বুট।

.com/groups/boiLove/ ২০ ডিসেম্বর
সত্যি আপনি তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। আপনাকে নিয়ে গর্ব করা চলে,' নিমার মোজা খোলার সময় বলল রানা, পায়ের ফোস্কাগুলো পরীক্ষা করল। হাঁটুর ব্যান্ডেজটাও খুলল। সামান্য ফুলে আছে। নরম ছোঁয়ায় ডলে দিল রানা। 'পেইনকিলার দিচ্ছি, আরাম পাবেন।' ব্যাগ থেকে ট্যাবলেট বের করল ও। তারপর প্যাড লাগানো নিজের জ্যাকেটটা মাটিতে বিছাল। 'দুঃখিত, পিপিং ব্যাগ পিছনে ফেলে আসা হয়েছে। এয়ার ড্রপের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।' ট্যাবলেট আর পানির বোতলটা নিমার হাতে ধরিয়ে দিল। সবশেষে ইমার্জেন্সী রেশনের প্যাকটা খুলল।

মুখে খানিকটা শুকনো মাংস নিয়েই ঘুমিয়ে পড়ল নিমা। হাতে গরম এক মগ চা নিয়ে রানা যখন ওর ঘুম ভাঙাল, তখন বিকেল যাই যাই করছে। ওর পাশে বসে রানাও চুমুক দিচ্ছে নিজের মগে। 'শুনে খুশি হবেন, শাফি এখন সব কথাই জানে আমাদেরকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছে সে।'

'কতটুকু কি বললেন?'

'আগ্রহী করে তোলার জন্যে যতটুকু প্রয়োজন ঠোঁট টিপে হাসল রানা। 'সব কথা একসঙ্গে বলা ঠিক না, প্রতিবার একটু একটু করে বলতে হয়। আমরা কি খুঁজছি, জানে। আরও জানে নদীতে একটা বাঁধ দিতে যাচ্ছি।'

'বাঁধ তৈরির জন্যে লোকবল দরকার, তার কি ব্যবস্থা?'

'সেন্ট ফ্রুমেনটিয়াসের সন্ন্যাসীরা তার কথা শুনবেন। ওঁরা তাকে বীরপুরুষ বা হিরো বলে মনে করেন।'

'বিনিময়ে নিশ্চয়ই কিছু দেয়ার কথা বলেছেন কি?'

'এ বিষয়ে এখনও কোন আলোচনা হয়নি। আমি বলেছি, কি পাব জানা নেই। হেসে উঠে বলল, আমাকে ও বিশ্বাস করে।'

'উনি খুব চালাক, তাই না?'

'চালাক শব্দটা যদি নিন্দার অর্থে ব্যবহার করেন, আমি একমত হব না,' বিড়বিড় করল রানা। 'আমি জানি সময় হলে স্পষ্ট করেই বলবে সাহায্যের বিনিময়ে কি সে চায়।' হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল ও। 'তোমার কথাই হচ্ছিল, শাফি।'

এগিয়ে এসে রানার পাশে উবু হয়ে বসল শাফি। 'আমাকে নিয়ে কি ষড়যন্ত্র করছিলে তোমরা?'

'নিমা বলছেন, তোমার মধ্যে দয়া-মায়া বলে কিছু নেই, সারারাত তাকে হাঁটিয়েছ।'

'রানা আসলে আপনাকে পঙ্গু বানাচ্ছে। দেখলাম তো, আপনাকে নিয়ে কি রকম ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমার কথা হলো, ওদের সঙ্গে কঠিন ব্যবহার করতে হবে। মেয়েরা সেটা উপভোগ করে।' তারপরই সিরিয়াস হয়ে উঠল শাফি। 'সত্যি দুঃখিত, নিমা। সীমান্ত মানেই হাজার রকম বিপদ। হোম গ্রাউন্ডে চলে এসেছি, এখন আর আমাকে আপনার অতটা দানব বলে মনে হবে না।'

নিমা বলল, 'ধ্যেত, আমরা তো আসলে আপনার প্রশংসা করছিলাম। সত্যি কৃতজ্ঞ বোধ করছি, শাফি।'

'রানী আমার পুরানো বন্ধু না!'

প্রসঙ্গ বদলে নিমা বলল, 'মঠে কি ঘটেছে রুবির কাছে খানিকটা শুনলাম। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।'

রাগে দু'হাত দিয়ে ধরে নিজের দাড়ি টানছে শাফি। 'ওখানে যা ঘটেছে তার জন্যে ঘুমা আর তার ট্রুপাররা দায়ী। ওরা পশুরও অধম। এ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় আমরা কাদের বিরুদ্ধে লড়ছি। মেনজিসটুর নির্যাতন থেকে মুক্তি পেলাম, তার জায়গায় নতুন একটা আতংক ছড়িয়ে পড়ল।'

'ওখানে ঠিক কি ঘটেছে, শাফি?'

ধীরে ধীরে পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞের বর্ণনা দিল শাফি, বলল কি কি লুট হয়েছে। 'ঘুমা যে দায়ী তাতে কোন সন্দেহ নেই। সন্ন্যাসী যারা পালাতে পেরেছেন তারা সবাই তাকে চেনেন।'

রাগে দাঁড়িয়ে পড়ল শাফি। থরথর করে কাঁপছে সে। 'যে-কোন গোজামবাসীর কাছে ওই মঠ প্রাণের চেয়েও প্রিয়। আমি নিজে ধর্ম-কর্ম করি না, কিন্তু যাঁরা করেন তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ আছে। ওলি জারকাসকে আমি গুরুজন বলে মানতাম। প্রধান পুরোহিতকে খুন করে আমাকে খেপিয়ে তুলেছে ওরা এর ফল ওদেরকে ভোগ করতে হবে।' মাথায় ক্যাপ পরল সে। 'চলুন, এবার রওনা হতে হয়। সামনের পথ অত্যন্ত দুর্গম।'

আট

সীমান্ত অনেকটা পিছনে ফেলে আসায় এখন দিনের বেলাও হাঁটা নিরাপদ। দ্বিতীয় দিনের পদযাত্রা ওদেরকে গিরিখাদের গভীরে পৌঁছে দিল। বড় পাহাড়ের সামনে যে ছোট পাহাড় থাকে, এখানে তেমন কিছু নেই—এ যেন অকস্মাৎ মাথাচাড়া দেয়া একটা বিশাল দুর্গে ঢুকে পড়া। দু'দিকে পাহাড়ের স্তূপ বা গুচ্ছের পাঁচিল প্রায় চার হাজার ফুট ওপরের আকাশ ছুঁয়েছে, মাঝখানের গভীরতায় সাপের মত এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে নদীটা, দৈর্ঘ্যে যত দূর দেখা যায় আলোড়ন আর উচ্ছ্বাস, দ্রুতগতি স্রোত আর ঘূর্ণি সমস্ত পানিকে সাদা করে রেখেছে। দুপুরে নদীর ধারে ঝোপ আর গাছপালার নিচে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থামার অনুমতি দিল শাফি ওদের নিচে সৈকত, প্রকাণ্ড সব বোল্ডারের ছড়াছড়ি। ওগুলো নিশ্চয়ই পাহাড়-প্রাচীরের গা বেয়ে গড়িয়ে নেমেছে।

সামান্য ব্যবধানে বসে আছে ওরা পাঁচজন। থিয়ডালাইট নিয়ে শাফির সঙ্গে মারটিনের মন কষাকষি এখনও থামেনি। মারটিন বেশি কথা না বলে নির্লিপ্ত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারী ইন্সট্রুমেন্টটার কাছাকাছি বসে আছে সে। শাফি আর রুবি একদমই চুপচাপ। তবে হঠাৎ রুবি হাত লম্বা করে শাফির বাহু স্পর্শ করল। 'ওদেরকে আমি জানাতে চাই,' বলল সে।

উত্তর দেয়ার আগে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকল শাফি, তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'অসুবিধে কি,' বলল সে, কাঁধ ঝাঁকাল।

COMMUNITY SUPPORTED BY ...
আমিটাই ওরা জানুন,' আবার বলল রুবি। 'উস্তাভকে ওরা চিনতেন। কাজেই বুঝবেন।'

'তুমি চাও আমি বলি?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল শাফি, রুবির একটা হাত ধরল।

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকাল রুবি। 'তুমি বললেই ভাল হয়।'

কিছুক্ষণ কথা বলল না শাফি, নিজের চিন্তা-ভাবনা গুছিয়ে নিচ্ছে। তারপর যখন শুরু করল, রানা বা নিমার দিকে তাকাল না, তাকিয়ে থাকল রুবির দিকে। 'এই মেয়েটার ওপর প্রথম যখন আমার চোখ পড়ল, উপলব্ধি করলাম ওর আর আমার নিয়তি এক সুতোয় বাঁধা।'

শাফির আরও গা ঘেঁষে বসল রুবি।

'রুবি আর আমি তিমকাত উৎসবের রাতে শপথ নিই এবং ঈশ্বরের ক্ষমা প্রার্থনা করি, তারপর আমি ওকে আমার মেয়েমানুষ হিসেবে গ্রহণ করি।'

শাফির পেশীবহুল কাঁধে হাত রাখল রুবি।

'রাশিয়ান লোকটা আমাদের পিছু নিল। সে এইখানটায় আমাদেরকে ধরে ফেলে, ঠিক এখন যেখানে বসে আছি। আমি তাকে আলোচনায় বসে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে বললাম। কিন্তু সে রাজি হলো না। তখন আমি বললাম, রুবি যদি স্বেচ্ছায় তার সঙ্গে যেতে রাজি হয়, আমি বাধা দেব না। সে বলল, রুবিকে চায় না, চায় ওর লাশ। তারপরই গুলি করল সে, প্রথমে আমাকে লক্ষ্য করে, তারপর রুবিকে। কিন্তু সে জানত না, আড়াল থেকে তার ওপর আমার লোকজন নজর রাখছিল।'

ঘটনাটা স্মরণ করে শিউরে উঠল রুবি।

'উস্তাভ নিজের বোকামিতে মারা গেছে। তার লাশটা আমরা নদীতে ভাসিয়ে দিই।'

'উস্তাভ যে মারা গেছে আমরা তা জানি,' এই প্রথম কথা বলল নিমা। তারপর প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্যে জিজ্ঞেস করল, 'মঠে পৌঁছুতে আর কতক্ষণ লাগবে আমাদের?'

'এখুনি রওনা হলে সন্ধের আগেই পৌঁছে যাব,' বলল শাফি।

ময়সি মাতুবা, সেইন্ট ফ্রুমেনটিয়াসের নব নির্বাচিত প্রধান পুরোহিত, মঠের টেরেসে ওদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর মাথায় রূপোলি চুল, ওলি জারকাসের চেয়ে বয়েস কিছু কম হবে, একহারা ও লম্বা। আজ তিনি বিশিষ্ট অতিথি অ্যালান শাফির সম্মানে নীল মুকুটটা পরেছেন।

অতিথিদের জন্যে আলাদা সেল বরাদ্দ করা হয়েছে, গোসলের পর সেখানে এক ঘণ্টা বিশ্রাম নিল ওরা। তারপর সন্ন্যাসীরা এসে নিয়ে গেলেন ওদেরকে খানাপিনার বিরাট আয়োজন করা হয়েছে। তেজ-এর পাত্র তৃতীয়বার ভরার পর প্রধান পুরোহিত আর সন্ন্যাসীদের মন-মেজাজ হালকা ও নরম হয়ে উঠল, লক্ষ করে ময়সি মাতুবার কানে ফিসফিস করল শাফি।

'সেইন্ট ফ্রুমেনটিয়াসের ইতিহাস নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে—ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ

সাগর থেকে কিভাবে ঈশ্বর তাঁকে আমাদের তীরে তুলে দিলেন, তিনি যাতে আমাদের সত্যিকার ঈমানদার হতে সাহায্য করতে পারেন?'

প্রধান পুরোহিতের চোখ পানিতে ভরে উঠল। 'তাঁর পবিত্র শরীর এখানে সমাধিস্থ করা হয়, আমাদের মাকডাসে। বর্বররা এল, আমাদের ধর্মীয় ঐশ্বর্য লুঠ করে নিয়ে গেল। আমরা পিতৃহীন বালকে পরিণত হয়েছি। এখন আর পুণ্য অর্জনের জন্যে ইথিওপিয়ার প্রতিটি প্রান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা এখানে আসবে না। আমরা নিঃস্ব হয়ে গেছি। এই মঠ ধ্বংস হয়ে যাবে। সন্ন্যাসীরা চলে যাবে ঝরে পড়া পাতার মত।'

'সেইন্ট ফ্রুমেনটিয়াস যখন ইথিওপিয়ায় আসেন, একা আসেননি। বাইজানটিয়াম চার্চ থেকে তাঁর সঙ্গে আরও একজন ক্রিশ্চান এসেছিলেন,' নরম সুরে তাঁকে মনে করিয়ে দিল শাফি।

'সেইন্ট অ্যান্টোনিয়া,' তেজ পাত্র থেকে আরও এক ঢোক পান করলেন প্রধান পুরোহিত।

'সেইন্ট অ্যান্টোনিয়া,' সায় দিল শাফি। 'সেইন্ট ফ্রুমেনটিয়াসের আগেই তিনি মারা যান। তবে তিনি তাঁর ভাইয়ের চেয়ে কম পবিত্র ছিলেন না।'

'অবশ্যই তিনি অতি পবিত্র এবং মহান সেইন্ট ছিলেন, আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁর প্রাপ্য,' বলে আরও এক ঢোক তেজ পান করলেন ময়সি মাতুবা।

'ঈশ্বরের চাল বড়ই রহস্যময়, নয় কি?' সবিস্ময়ে মাথা নাড়ল শাফি।

'তাঁর পথ অত্যন্ত গভীর, আমাদের বুঝতে চাওয়ার বা প্রশ্ন তোলার কোন অধিকার নেই।'

'তবে তিনি করুণাময়, এবং বিশ্বাসীদের পুরস্কৃত করেন।'

'তিনি পরম করুণাময়,' ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন প্রধান পুরোহিত।

'আপনারা, আপনাদের মঠ, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে,' বলল শাফি। 'সেইন্ট ফ্রুমেনটিয়াসকে লুঠ করে নিয়ে গেছে ওরা–হায়, তা আর কোনদিন উদ্ধার করা সম্ভব নয়। কিন্তু ঈশ্বর যদি আরেকজনকে পাঠান, তাহলে কেমন হয়? তিনি যদি আপনাদেরকে সেইন্ট অ্যান্টোনিয়ার শরীর পাঠিয়ে দেন, তখন আপনারা কি করবেন?'

ভেজা চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো, মনে হলো প্রধান পুরোহিত একটা হিসাব মেলাবার চেষ্টা করছেন। 'সেটা হবে সত্যিকার একটা মিরাকল।'

বৃদ্ধ প্রধান পুরোহিতের কাঁধে একটা হাত রেখে নরম সুরে ফিসফিস করল শাফি, কান্না থামিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তার কথা শুনছেন ময়সি মাতুবা।

'শ্রমিকের ব্যবস্থা করা হয়েছে,' পরদিন সকালে উপত্যকার ঢাল বেয়ে ওঠার সময় ধানাকে বলল শাফি। 'ময়সি মাতুবা কথা দিয়েছেন দু'দিনের মধ্যে একশো লোক যোগাড় করে দেবেন। আরও পাঁচশো দেবেন আগামী হপ্তায়। দূর-দূরান্তের ক্রিশ্চান গ্রামগুলোয় খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন উনি, বাঁধ তৈরির কাজে সাহায্য করলে দরকের আজাব থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে, কারণ এই বাঁধ তৈরির মাধ্যমে উদ্ধার হবে সেইন্ট অ্যান্টোনিয়ার পবিত্র দেহাবশেষ।'

দুই মেয়েই ঢালের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল।

'বেচারা বুড়ো মানুষটাকে এসব বলে লোভ দেখিয়েছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল রুবি।

'সেইন্ট ফ্রুমেনটিয়াসের বদলে অন্য একজন সেইন্টের দেহ। আমরা যদি সমাধিটা খুঁজে পাই, মঠের পাওনা হবে মামোসের মমি।'

'কাজটা অত্যন্ত নীচ হয়েছে,' বিস্ফোরিত হলো নিমা। 'সাহায্য পাবার বিনিময়ে আপনি তাঁকে চিট করবেন?'

'কেন, চিট করা হবে কেন?'

অভিযোগ শুনে রেগে গেল শাফি। 'কোন প্রমাণ নেই যে ওটা আসলেই সেইন্ট ফ্রুমেনটিয়াসের লাশ ছিল। অথচ তারপরও কয়েকশো বছর ধরে এলাকার ক্রিশ্চানদের ঐক্যবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্য পূরণ করছিল, গোটা ইথিওপিয়ার তীর্থযাত্রীদের আকর্ষণ করছিল, উৎসাহ দিচ্ছিল ভক্তবৃন্দকে সন্ন্যাসী হতে। এখন সেটা লুঠ হয়ে যাওয়ায় মঠের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছে।'

'তাই আপনি মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেবেন?' নিমা এখনও রেগে আছে।

'ওঁরা যেটা হারিয়েছেন সেটার চেয়ে কোন অংশে মামোসের লাশ কম অথেনটিক নয়। প্রাচীন ক্রিশ্চানের লাশের বদলে প্রাচীন মিশরীয়র লাশ হলে কি আসে যায়, যদি সবগুলো উদ্দেশ্য সেটা পূরণ করতে পারে, এবং আরও পাঁচশো বছর টিকে থাকতে পারে মঠটা?' রানার দিকে ফিরল শাফি 'তুমি কি বলো, রানা?'

'ধর্মীয় ব্যাপারে আমি কোন মন্তব্য করতে চাই না,' বলল রানা। 'তবে মনে হচ্ছে শাফির কথায় খানিকটা বোধহয় যুক্তি আছে।'

'ক্রিশ্চানিটি সম্পর্কে আপনি আবার কবে থেকে এক্সপার্ট হলেন? আপনি তো, আমি যতদূর জানি, অজ্ঞেয়বাদী।'

'নো কমেন্ট,' বলে ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে হাতজোড় করে উঠে দাঁড়াল রানা। 'আমি বরং যাই মারটিনের সঙ্গে বাঁধটা নিয়ে আলোচনা করি।' হন হন করে এগিয়ে এঞ্জিনিয়ারের পাশে চলে এল, লাইনের একেবারে মাথায়।

পিছন থেকে মাঝে মধ্যেই উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের আওয়াজ ভেসে আসছে রানার কানে। আপনমনে হাসল ও। শাফিকে ওর চেনা আছে, নতুন করে চেনা হচ্ছে নিমাকে। ওদের মধ্যে কে জেতে দেখার খুব আগ্রহ জাগল

মাঝ দুপুরে গহ্বরের মাথায় পৌঁছুল ওরা ক্যাম্প ফেলার জন্যে জায়গা খুঁজছে শাফি, মারটিনকে নিয়ে নদীর সরু গলায় চলে এল রানা, ঠিক নদী যেখানে জলপ্রপাতে পরিণত হয়ে নিচে লাফ দিয়েছে, তার ওপরে। থিয়ডালাইট সেট করার পর হাত ইশারায় রানাকে লেভেলিং স্টাফ নিয়ে পাহাড়-প্রাচীরে ওঠা-নামা করতে বলল মারটিন, সারাক্ষণ থিয়ডালাইটের লেন্সে চোখ। ওঠা-নামা করার সময় লেভেলিং স্টাফটা খাড়া রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে রানা

'ঠিক আছে,' হাঁক ছাড়ল মারটিন, বিশটা শট নেয়ার পর। 'এবার তুমি নদীর ওপারে চলে যাও।'

'কি বলে! কিভাবে যাব? সাঁতরে, নাকি উড়ে?'

উজানের দিকে তিন মাইল হাঁটতে হলো রানাকে, ট্রেইলটা যেখানে অগভীর ভানডেরা নদীর ওপর দিয়ে ওপারে পৌঁচেছে। ওপারে পৌঁছে কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়ে উল্টোদিকে হাঁটতে হলো ওকে, থামল অপর পাড়ে বসে যেখানে মারটিন সিগারেট ফুঁকছে। 'ফুসফুসে ক্যান্সার বাধিয়ো না, কেমন?' পানির এদিক থেকে চিৎকার করে বলল রানা।

প্রয়োজনীয় শট নিতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ফেরার জন্যে আবার নদীর অগভীর অংশটুকু পার হতে হলো রানাকে শেষ এক মাইল প্রায় গাঢ় অন্ধকারে হাঁটতে হলো ওকে, তবে পথ দেখাল ক্যাম্পসাইটের কাঁপা কাঁপা অস্পষ্ট আলো ক্যাম্পে পৌঁছে লেভেলিং স্টাফটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'এত খাটালে, ফলটা কি পেলাম?'

পাইড রুল থেকে চোখ তুলল না মারটিন। লণ্ঠনের আলোয় ড্রইংগুলো স্টাডি করছে সে, কিছু রদবদলও করছে 'তোমার আনুমানিক হিসাব প্রায় নির্ভুলই বলতে হবে,' এক সময় মুখ তুলে বলল সে জলপ্রপাতের ওপর ক্রিটিকাল পয়েন্টে নদীটা একচল্লিশ গজ চওড়া, যেখানে আমি স্ট্রাকচারটা খাড়া করতে চাই।'

'আমি শুধু জানতে চাই ওখানে একটা বাঁধ তৈরি করা সম্ভব কি না'

নাকের পাশে আঙুল ঘষল মারটিন, হাসছে। 'তুমি আমাকে ফ্রন্ট-এন্ডার এনে দাও, আমি নীলনদকেও বাঁধতে পারব।'

রাত একটু বেশি হতে আগুনের ধারে বসে সবাই একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া সারল ক্যাম্পফায়ারের ওদিক থেকে রানার দিকে তাকিয়ে আছে নিমা, চোখাচোখি হতে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে আমন্ত্রণ জানাল কয়েক সেকেন্ড পর স্বাভাবিক ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে ক্যাম্প এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, একবার পিছন ফিরে দেখে নিল রানা ওকে অনুসরণ করছে কিনা। পাশে চলে এসে টর্চ জ্বালল রানা, দুজন ফিরে এল আবার ড্যাম সাইটে, বসল একটা বোল্ডারের ওপর

টর্চ নিভিয়ে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকল ওরা, চোখে অন্ধকার সয়ে আসতে তারার আলোয় এখন অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে খুব নিচু গলায় কথা বলছে, 'গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে, জানেন। ভেবেছিলাম আর বোধহয় কোনদিন এখানে আমাদের ফিরে আসা হবে না।'

'শাফি আর প্রধান পুরোহিত সাহায্য না করলে ব্যাপারটা সম্ভব হত না'

'শাফি আর আপনিই জিতলেন,' ক্ষীণ হাসির শব্দ নিমার গলায় 'হ্যাঁ, সন্ন্যাসীদের সাহায্য আমাদের দরকার। স্বীকার করছি, শাফির সঙ্গে তর্কে পারা সম্ভব নয়।'

'তারমানে পুরস্কার হিসেবে ওদেরকে মামোসের মমি দিতে আপনার আপত্তি নেই?'

'যে মমিই পাই, আদৌ যদি পাই,' বলল নিমা 'আমরা যত দূর জানি

আসল মামোসের মমিটা চুরি করে নিয়ে গেছেন কর্নেল ঘুমা।'

খুব সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে নিমার কাঁধটা এক হাতে জড়িয়ে ধরল রানা। কিন্তু নিমা ব্যাপারটাকে ঠিক সহজভাবে নিল না। আড়ষ্ট হয়ে গেল শরীর। তবে কিছু বলল না, হাতটাও সরিয়ে দিল না, খানিক পর বরং একটু পর ঢিল পড়ল পেশীতে। 'ওহ্, রানা, আমার যেমন ভয় লাগছে তেমনি উত্তেজিত হয়ে আছি। ভয় লাগছে এই ভেবে যে আমাদের আশা হয়তো পূরণ হবে না। আর উত্তেজিত হয়ে আছি এই আশায় যে টাইটার সঙ্গে খেলাটায় আমরাই জিতব।' মুখ ফেরাল, ওর নিঃশ্বাস অনুভব করল রানা নিজের ঠোঁটে।

ঠিক এই সময়টার জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিল রানা। নিমাকে চুমো খেতে গেল ও।

কোন তরুণীকে দেখে লোভনীয় মনে হলে রানার স্বাভাবিক প্রবণতা হলো সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে নেয়া, নিজেকে চোখ রাঙানো, সংযমী ও সভ্য-ভব্য হবার কথা স্মরণ করা। নিমার ক্ষেত্রেও এ-সবের ব্যতিক্রম ঘটেনি। তারপর ওরা লন্ডন থেকে ইথিওপিয়ায় এল, দুর্গম পার্বত্য-এলাকায় একসঙ্গে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়াল, হাস্য-কৌতুক ভাগাভাগি করল, একসঙ্গে রাত কাটাল কোয়ারিতে পরস্পরকে জানার সুযোগ পেয়েছে ওরা, পরস্পরকে ভাল লাগার অনেক কারণ সৃষ্টি হয়েছে। তবে যতই ঘনিষ্ঠতা হোক, নিমার তরফ থেকে কখনোই কোন আমন্ত্রণ আসেনি। আর রানাও কঠিন ব্রত পালনের মত সংযম রক্ষা করে আসছিল। তারপর সব ওলটপালট হয়ে গেল ফেরার পথে, নিমাকে যখন পিঠে তুলে এসকার্পমেন্টের চূড়ায় উঠতে হচ্ছে ওকে। নারীদেহের তীব্র আকর্ষণ উন্মাদপারা করে তুলেছিল, যদিও ক্লান্তি এমনভাবেই গ্রাস করে যে তার কোন প্রকাশ ঘটেনি। তা না ঘটলেও, সেই ঘটনার পর রানার মনের একটা দিক প্রশ্ন ধরেই নিয়েছে যে নিমার প্রতি ওর অধিকার জন্মেছে। অবশ্য তারপরও রানা সংযম হারায়নি। অপেক্ষা করেছে নিমা কখন ইঙ্গিত দেবে।

আজ নিমার কাঁধে হাত রাখার সময় কিছু ভাবেনি রানা, কোন স্বার্থবুদ্ধি কাজ করেনি তবে হাতটা নিমা সরিয়ে না দেয়ায় অধিকারের কথাটা মনে পড়ে গেল উৎসাহী হয়ে উঠল মন ভাবছে, নিমার অন্তত আপত্তি হবে না। চুমো খেতে চাওয়ার সেটাই কারণ

কিন্তু ধাক্কা খেতে হলো ঝট করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল নিমা বোল্ডার থেকে নেমে পড়ল 'না!'

রানাও নিজেকে সামলে নিয়েছে 'সরি,' ম্লান সুরে বলল ও 'সত্যি দুঃখিত।'

'না, আমি দুঃখিত,' দ্রুত ফিসফিস করল নিমা। 'আমারই আসলে উচিত ছিল আপনাকে সাবধান করা।'

কথা না বলে তাকিয়ে আছে রানা।

'আপনাকে আমার অসম্ভব ভাল লাগে,' আবার বলল নিমা। 'আমি অকৃতজ্ঞও নই, রানা।' কথা বলার সময় প্রায় হাঁপাচ্ছে। 'কিন্তু ক্রিশ্চান হলেও আমি অত্যন্ত রক্ষণশীল একটা সমাজে বড় হয়েছি। তাই...সত্যি আমি দুঃখিত, রানা।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' জোর করে হাসল রানা। 'এতে এত বিব্রত বোধ করার কিছু নেই।' তারপর গলা একেবারে খাদে নামিয়ে বলল, 'আমি অপেক্ষা করতে রাজি আছি।'

'কিছু বললেন?'

'না, কিছু বলিনি,' অস্বীকার করল রানা। 'চলুন, আপনাকে ক্যাম্পে ফিরিয়ে নিয়ে যাই।'

'হ্যাঁ, তাই চলুন।'

পরদিন ভোরের আলো ভাল করে ফোটার আগেই ময়সি মাতুবার প্রতিশ্রুতি অনুসারে সন্ন্যাসীদের প্রথম দলটা উপত্যকা বেয়ে উঠে এল। এক লাইনের একটা মিছিল, সন্ন্যাসীরা সবাই তরুণ, সবার পরনে সাদা আলখেল্লা, সুর করে গান করতে করতে আসছে

'কি সর্বনাশ!' অকারণে হাসি পাচ্ছে রানার। 'আবার না ক্রুসেড বেধে যায়

একটা হাই তুলে নিমা বলল, 'ওরা নিশ্চয়ই মাঝরাতে রওনা হয়েছে!'

ডাকাডাকি করে রুবিকে খুঁজল রানা, সে কাছে আসার পর বলল, 'অনুবাদক হিসেবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হলো তোমাকে। মারটিন অ্যামহ্যারিক বা আরবীর একটা বর্ণও জানে না, কাজেই ওর কাছাকাছি থাকতে হবে তোমাকে।'

'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই।'

দিনের আলো আরও উজ্জ্বল হতে শাফিকে নিয়ে ড্রপ সাইট দেখতে বেরুল রানা দুপুরের দিকে সিদ্ধান্তে এল, উপত্যকাটাই ব্যবহার করতে হবে। ওদেরকে ঘিরে পাথুরে যে রিজগুলো দাঁড়িয়ে আছে, তার তুলনায় উপত্যকার মেঝেই বেশি সমতল, বাধা-বিঘ্নও কম তাছাড়া, প্লেন থেকে জিনিসগুলো ফেলা দরকার ড্যাম সাইটের যতটা সম্ভব কাছাকাছি

পরদিন সকালে নির্বাচিত সাইটে দাঁড়িয়ে শাফিকে রানা বলল, 'টাইম একটা মেজর ফ্যাক্টর। প্রতিদিন একটু একটু করে এগিয়ে আসছে বর্ষা'

আকাশের দিকে তাকাল শাফি 'সন্ন্যাসীদের ধরলে ওরা দেরিতে বর্ষা করার জন্যে প্রার্থনায় বসবে।'

ড্রপ শুরু করার আগে প্লেন নিয়ে পাঁচ মাইল সোজা এগিয়ে আসার মত উন্মুক্ত আকাশ পাবেন ইস্কান্দার। ফ্লেয়ার আর মার্কার গতকালই কিছু কিছু বসানো হয়েছে, আজ সেগুলো চেক করল ওরা। উপত্যকার মাথায় রয়েছে মারটিন, আকাশের গায়ে তার নড়াচড়া টের পাওয়া যাচ্ছে: স্মোক ফ্লেয়ার সেট করছে সে। ঘাড় ফিরিয়ে উল্টো দিকে তাকাল রানা, উপত্যকার দূর প্রান্তে একটা পাথরের ওপর বসে রয়েছে নিমা আর রুবি। ওদেরকে ফ্লেয়ার বসাতে সাহায্য করেছে মারটিন। শাফির লোকজন এখনও মার্কার বসানোর কাজ পুরোপুরি শেষ করতে পারেনি, তবে জানিয়েছে আর বেশি সময় নেবে না

সব কিছু সুষ্ঠুভাবেই ঘটল। ঘড়ির কাঁটা ধরে উড়ে এল ইস্কান্দারের প্রকাণ্ড হারকিউলিস। মোট ছ'বার উপত্যকার ওপর দিয়ে উড়ে গেলেন তিনি, প্রতিবার চারটে করে ভারী ও চৌকো বাক্স ফেললেন নিচে। বাতাসে ভর করে

প্যারাসুটগুলো উপত্যকার নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আগেই নির্দেশ দেয়া আছে দল বেঁধে ছুটল তরুণ সন্ন্যাসীরা, বাক্সগুলো ধরাধরি করে তুলে আনবে। রানা শাফি আর মারটিন আলোচনা করে আগেই ঠিক করে রেখেছে ক্যাম্পের কোথায় কি রাখা হবে। প্রতিটি বাক্সে নম্বর দেয়া আছে, নম্বর দেখে বোঝা যাবে কোনটায় কি আছে. এক নম্বর বাক্সে আছে শুকনো খাবার, ওদের ব্যক্তিগত জিনিস-পত্র ক্যাম্পিং ইকুইপমেন্ট, মশারি সহ; শাফিকে খুশি করার জন্যে কয়েক বোতল হুইস্কিও আনা হয়েছে। এই বাক্সটার দায়িত্বে রানা নিজে থাকল।

নির্মাণ সামগ্রী আর হেভি ইকুইপমেন্টের দায়িত্ব থাকল মারটিনের ওপর তার নির্দেশ অনুবাদ করছে রুবি, সন্ন্যাসীরা বাক্সটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে প্রাচীন কোয়ারিতে

রাত হয়ে গেল, অথচ অর্ধেক বাক্সও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, যেখানে পড়েছে সেখানেই পড়ে থাকল সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা করল শাফি, কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নয় সে

পরদিন [illegible] হারাকিউলিস নিয়ে ফিরে এলেন ইস্কান্দার, এবার তিনি [illegible] তুলে এনেছেন সব বাক্স উপত্যকা থেকে তুলে আনতে আরও দুটো দিন লেগে গেল। প্রায় সবই জমা করা হলো প্রাচীন কোয়ারিতে, বাক্স খোলার পর জিনিসগুলো এমনভাবে সাজানো হলো যাতে যেটা যখন দরকার চাইলেই পাওয়া যাবে।

এই ক'দিন কাজ করার সময় সন্ন্যাসীদের ওপর নজর ছিল রানার কয়েকজনের পরিচয় আলাদাভাবে জানার সুযোগ হয়েছে। এদের মধ্যে কারও কারও রয়েছে নেতৃত্ব দেয়ার গুণ। দু'একজন আরবী ও অল্পস্বল্প ইংরেজী জানে তাদের মধ্যে একজন টোরা নাবু। রানা তাকে সহকারী হিসেবে বেছে নিল দোভাষীর কাজও চালানো যাবে।

ক্যাম্প গুছিয়ে নেয়ার পর কাজ ভাগাভাগির পালা। নিমা আর রুবির কাছ থেকে রানাকে দূরে সরিয়ে এনে শাফি বলল, 'এখন থেকে আমার কাজ হবে সাইটের সিকিউরিটি রক্ষা করা তৃতীয়বার হামলা করতে পারে ঘুর্মা, কাজেই সতর্ক থাকা দরকার তোমরা যে খাদে ফিরে এসেছ, এ খবর পেতে দেরি হবে না তার

'শাবলের চেয়ে একে-ফরটিসেভেনই মানাবে তোমার হাতে,' সায় দিল রানা [illegible] একে এখানে রেখে যাও। ওকে আমার দরকার।'

'তা থাকুক, তবে আশা করব ওর ওপর নজর রাখবে তুমি রাতে এসে একবার করে দেখে যাব আমি

নিজের লোকজনকে ডিফেন্সিভ পজিশনে পাঠিয়ে দিল শাফি। ট্রেইলের অনেক দূর পর্যন্ত থাকল তারা, ক্যাম্পের চারধারেও পজিশন নিল। কাজ থেকে মুখ তুলে তাকালে রানা তাদের দু'একজনকে উঁচু জমিনের মাথায় নড়তে চড়তে দেখতে পায়।

সেই থেকে রোজ রাতে ক্যাম্পে এসে রুবির সঙ্গে মিলিত হচ্ছে শাফি। কোন কোন গভীর রাতে রুবির তাঁবু থেকে তার ভরাট গলার উল্লাসধ্বনি ভেসে আসে

তার সঙ্গে মিশে থাকে রুবির জলতরঙ্গ হাসি। তখন নিমার কথা মনে পড়ে যায় রানার। পাশের তাঁবুতেই রয়েছে মেয়েটা, অথচ কত দূরে। একসঙ্গে যখন থাকে, কারণে-অকারণে রানার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ও, কিন্তু রানা হাত ধরলেই আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। মেয়েটাকে ঠিক বুঝতে পারা যায় না।

পঞ্চম দিনে তিনশো শ্রমিক পাঠালেন ময়সি মাতুবা। এরা কেউই সন্ন্যাসী নয়, পাহাড়ী গ্রামগুলোর তরুণ অধিবাসী। সবাইকে নিয়ে দল গঠন করা হলো, প্রতি দলে থাকল ত্রিশজন শ্রমিক। দলের নেতা নির্বাচন করা হলো একজন সন্ন্যাসীকে। বাঘ, সিংহ, মৌমাছি–এভাবে রাখা হলো দলের নাম। স্বেচ্ছাসেবক হয়ে এসেছে সবাই, একঘেয়ে লাগলেই পালাবে। তাই পারিশ্রমিক দেয়ার কথা ঘোষণা করল রানা, কাজের বিনিময়ে সবাইকে রূপালি ডলার, অর্থাৎ মারিয়া থেরেসা দেয়া হবে একটা লোহার সিন্দুকে ভরে এই ডলার প্রচুর পরিমাণে নিয়েও এসেছে রানা।

ফ্রন্ট-এন্ডারের উঁচু সীটে বসে কলকাঠি নাড়ল মারটিন, ট্র্যাক্টরের হাইড্রলিক বাহু তুলে নিল তারের জাল দিয়ে তৈরি প্রথম গ্যাবিয়ন। বোল্ডার ভর্তি পার্সেল, ওজন হবে কয়েক টন। সবাই যে যার কাজ ফেলে ডানডেরা নদীর কিনারায় জড়ো হয়েছে দেখার জন্যে হলুদ ট্র্যাক্টর নিয়ে খাড়া পাড় বেয়ে সাবধানে নেমে যাচ্ছে মারটিন, বিস্ময়সূচক গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। গ্যাবিয়ন শূন্যে ঝুলছে, নদীতে নেমে এলে ট্র্যাক্টর। বাধা পেয়ে খেপে উঠল নদীর স্রোত, পিছনের চাকার চারপাশে ফণা তুলছে! কিছুই গ্রাহ্য করছে না মারটিন, নদীর আরও গভীরে নেমে যাচ্ছে সে।

মেশিনটার পেট ডুবে গেল পানিতে। সন্ন্যাসীরা গান ধরল, বাকি সবাই তালি দিচ্ছে। মেশিন লক করে ব্রেক কষল মারটিন, ভারী গ্যাবিয়ন নিচে নামিয়ে এনে খালাস করল পানিতে, তারপর পিছিয়ে আনছে ট্র্যাক্টর। গ্যাবিয়ন সঙ্গে সঙ্গে ডুবে গেছে, তবে ছোট একটা ঘূর্ণি ওটার অবস্থান চিহ্নিত করছে। নদীর কিনারায় আরেকটা গ্যাবিয়ন তৈরি রাখা হয়েছে, হাইড্রলিক বাহু তুলে নিল সেটাকে।

চিৎকার করে শ্রমিদের কাজে ফিরতে বলল রানা। উপত্যকা ধরে এক লাইনে উঠতে শুরু করল তারা। রানার নির্দেশে কাজের সময় তারা শুধু ল্যাঙট বা নেংটি পরে আছে। প্রচণ্ড গরমে দরদর করে ঘামছে সবাই, কয়লার মত কালো চামড়া চকচক করছে।

কোয়ারি থেকে পাথর বয়ে আনতে হচ্ছে নদীর কিনারায়, ওখানে তারের জালে ভরা হচ্ছে গ্যাবিয়ন।

প্রথম কয়েকদিন কাজের কোন অগ্রগতি খালি চোখে ধরা পড়ল না। জালে আটকানো যত বোল্ডারই ফেলা হলো সব বেমালুম হজম করে ফেলছে ডানডেরা। তারপর অবশ্য ধীরে ধীরে উঁচু হতে শুরু করল বাঁধ। অমনি কাজের উৎসাহ বেড়ে গেল সবার। আরও দু'দিন পর নদীর এদিক থেকে পানিতে বোল্ডার ফেলা অসম্ভব মনে হলো, এবার কাজ শুরু করতে হবে নদীর ওপার থেকে।

শ্রমিকদের ঘন ঘন আসা-যাওয়ায় ডানডেরার অগভীর পয়েন্ট পর্যন্ত একটা

রাস্তা তৈরি হয়ে গেল। ট্যাঙ্কিরটাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওপারে, একশো লোক রশি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে গেছে। ওখান থেকে ড্যাম সাইটে আসার জন্যে আরও একটা পথ তৈরি করতে হলো। তারপর থেকে প্রতিদিন কয়েক মিটার করে লম্বা হচ্ছে বাঁধটা, মাঝখানের ফাঁক ক্রমশ সরু হয়ে আসছে।

ওদিকে পিপড়ে আর কাঁকড়া, শ্রমিকদের দুটো দল, ড্যাম সাইট থেকে দুশো মিটার দূরে কঠিন পরিশ্রম করছে। জঙ্গল থেকে কেটে আনা গাছের কাণ্ড দিয়ে ভেলা তৈরি করছে তারা। গাছের কাণ্ড পাশাপাশি জোড়া লাগিয়ে হেভি পিভিসি দিয়ে মোড়া হচ্ছে, ওয়াটারপ্রুফ করার জন্যে। কাঠামোটার ওপর চাপানো হচ্ছে একই আকৃতির আরও একটা কাঠামো। দৈত্যাকার একটা স্যান্ডউইচ তৈরি হলো। বাঁধা হলো মোটা তার দিয়ে সবশেষে জোড়া লাগানো কাঠামোর একপ্রান্তে বোল্ডার ভরে ব্যালাস্ট তৈরি করা হলো। ভেলার একটা দিক ভারী করতে চেয়েছে মারটিন, ওটা যাতে পানিতে প্রায় খাড়াভাবে ভেসে থাকে—একটা প্রান্ত নদীর তলায় আঁচড় কাটবে, অপরপ্রান্তটা ভেসে থাকবে সারফেসের ওপর। এই ভেলা বাঁধের দুই বাহুর মাঝখানের ফাঁকে আলম্ব বা ঠেকনা হিসেবে কাজ করবে।

হাতি, মোষ আর গণ্ডার, এই তিনটে দল উপত্যকার মাথায় মাটি খুঁড়ে একটা খাল তৈরি করছে; নদী দিক বদলে ওই খালে ঢুকবে।

পনেরো দিনের দিন তৈরি হয়ে গেল বাঁধ। সেদিনই নতুন কাটা খাল বেয়ে ছুটল ডানডেরা, কিছুদূর গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল গোটা উপত্যকায়।

খালের পাড় ধরে নিমাকে নিয়ে হাঁটছে রানা, লম্বা উপত্যকার পুরোটা দৈর্ঘ্য পেরিয়ে এল ওরা। অবশেষে সেই প্রবাহটার কাছে পৌঁছুল দু'জন, যে ঝর্ণায় বাটির সঙ্গে এসেছিল ওরা—বাটি হাত লম্বা করায় আঙুলে এসে বসেছিল রঙিন প্রজাপতি। পাড়ে এসে দাঁড়াল ওরা, তারপর কথা না বলে পরস্পরের দিকে তাকাল। প্রবাহটা নেই, শুকিয়ে গেছে।

ঘুরে গিয়ে খালি ঝর্ণার তলা অনুসরণ করল ওরা, ঢাল বেয়ে উঠছে। খানিক দূর ওঠার পর একটা কার্নিসে পৌঁছুল, প্রজাপতি ঝর্ণা এখান থেকেই নির্গত হত গুহাটা এখনও গাঢ় সবুজ লতা-গুল্মে ভরে আছে, তবে এখন দেখতে হয়েছে কঙ্কালের খুলির অক্ষিগোলকের মত, অন্ধকার ও খালি।

'ঝর্ণা শুকিয়ে গেছে!' ফিসফিস করল নিমা, রানার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। 'বাঁধ তৈরি হবার ফলে পানির সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেছে। এ থেকেই প্রমাণ হয় টাইটার পুল থেকেই এখানে পানি আসছিল!'

'আসুন,' উত্তেজনায় নিমার একটা হাত চেপে ধরল রানা 'এখানে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না।'

'কোথায়?' নিমা অবাক। রানার আরও কাছে সরে এলো ও।

'কোথায় আবার, টাইটার পুলে!' ফিসফিস করল রানা। তারপর নিমাকে কাছে টানল।

কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে প্রথমে শক্ত কাঠ হয়ে গেল নিমা। তারপর ভয় পেয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল, পিছু হটল এক পা। 'না, প্লীজ!'

Rkarim

'কেন, নিমা?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমি পরিষ্কার বুঝতে পারি, আপনি চান। তাহলে আপত্তি করেন কেন?'

'চাই,' মাথা নিচু করে স্বীকার করল নিমা। 'কিন্তু...আমার সংস্কার পাঁচিল তুলে রেখেছে। আমিই আপনাকে প্ররোচিত করেছি, সেজন্যে ক্ষমা চাই, রানা। প্লীজ, আমাকে পাবার আশা আপনি ত্যাগ করুন।'

নিমার চোখে পানি দেখে হেসে উঠল রানা, নরম সুরে বলল, 'এই মেয়ে, এর মধ্যে কান্নার কি হলো? সত্যি কথা বলতে কি, আপনি ধরা না দেয়ায় আপনাকে নিয়ে আমার গর্ব হচ্ছে, তা জানেন? তবে একটা চ্যালেঞ্জও অনুভব করছি, স্বীকার না করলে মিথ্যে ভান করা হবে। ঠিক আছে, মাঝেখানের পাঁচিলটা না ভেঙে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমি, হলো?'

'ওটা বোধহয় কোনদিনই ভাঙবে না,' চোখের জল মুছে রানার দিকে মুখ তুলল নিমা। হাসছে ও। 'আপনি সত্যি খুব বিবেচক মানুষ। আপনাকে সত্যি আমার ভাল লাগে।'

এক পা পিছিয়ে গেল রানা। 'এই দেখুন, আপনার কথার আমি কোন ভুল অর্থ করছি না। কি, নিজেকে এখন নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে তো?'

এগিয়ে এসে রানার মুখে একবার হাত বুলাল নিমা। 'আপনি আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন।'

নয়

টাইটার পুলে প্রথমে নামল মাসুদ রানা। পাহাড়-প্রাচীরের মাথা থেকে নিচে নামার জন্যে এবার চওড়া কপিকল ব্যবহার করা হচ্ছে, দোলনার মত দেখতে রশির শেষ প্রান্তে কাঠের চেয়ার সহ। পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে ফুলে থাকা ঝুল-পাথরটাকে এড়াবার সময় আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দুলতে শুরু করল চেয়ার, পাঁচিল আর চেয়ারের মাঝখানে আটকা পড়ল ওর ডান হাতটা। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল রানা, হাতটা ছাড়িয়ে আনার পর দেখল একটা আঙুলের গিটের চামড়া উঠে গেছে, টপ টপ করে রক্ত ঝরছে ক্ষতটা থেকে। জখমটা তেমন গুরুতর নয়, মুখের ভেতর পুরে চুষে পরিষ্কার করে নিল। তারপরও অবশ্য রক্ত বেরুচ্ছে, তবে এই মুহূর্তে আর কিছু করার নেই ওর।

ঝুল-পাথরটাকে ছাড়িয়ে এসেছে কপিকল, ওর নিচে উন্মুক্ত হয়ে পড়ল অতল গহ্বর, প্রায় অন্ধকার গা ছমছম করা পরিবেশ। পাথর পাঁচিলের গায়ে খোদাই করা নকশাটার ওপর চোখ আটকে গেল, খাড়া দুই সারি কুলুঙ্গির মাঝখানে। কি খুঁজতে হবে জানে বলেই এবার পঙ্গু বাজপাখিটার আউটলাইন চিনতে পারল ও। প্রায় এক মাস আগে গিরিখাদ ছেড়ে চলে যাবার পর মনে প্রায়ই একটা সংশয় জাগত যে ব্যাপারটা বোধহয় তাদের কল্পনা, পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে টাইটা নিজের কোন প্রতীক চিহ্ন খোদাই করেনি, আবার ফিরে এলে দেখতে পাবে পাঁচিলটা মসৃণ ও নিষ্কলঙ্ক। কিন্তু না, ব্যাপারটা কল্পনা নয়। প্রতীক চিহ্ন একটা সত্যি

.com/groups/1509LoverSPolapam

পায়ের নিচে গিরিখাদের তলায় তাকাল রানা, পুলের ওপর জলপ্রপাতের ধারা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। উজানে তৈরি বাঁধের ভেতর দিয়ে চোয়ানো পানি এখনও নেমে আসছে, তবে খুব বেশি নয়। ওর নিচে পুলের লেভেল নাটকীয়ভাবে কমে গেছে, পাথর পাঁচিলের গায়ে পানির ভেজা দাগ দেখে বোঝা গেল। এখন আরও পঞ্চাশ ফুট পাঁচিল পানির ওপর রয়েছে। আরও আট জোড়া কুলুঙ্গি দেখা যাচ্ছে পানির ওপর। আগে যেখানে ওগুলোর কাছে যাবার জন্যে সাঁতরাতে হয়েছে রানাকে, এখন সেখানে প্রায় কোন পানিই নেই।

তবে পুলটা পুরোপুরি পানি শূন্য হয়ে পড়েনি। মাঝখানটায় এখনও কালো পানি জমে আছে, চারপাশে সরু কার্নিস। ওই কার্নিসেই নামল রানা। বিচিত্র অভিজ্ঞতাই বলতে হবে। এখানে যখন শেষবার এসেছিল, পানির নিচের ফাটলটা ওকে টেনে নিতে চেয়েছিল ভেতরে, প্রাণ বাঁচাবার জন্যে মরণপণ যুদ্ধ করতে হয়েছিল ওকে।

মুখ তুলে তাকাল রানা, গহ্বরের ওপরের স্তরে, রোদ যেখানে প্রবেশাধিকার পেয়েছে। ও যেন একটা মাইনশ্যাফটের তলায় রয়েছে। তলপেটের ভেতরটা খালি খালি লাগল, সেঁতসেঁতে বাতাসে কেঁপে উঠল শরীর। কপিকলের রশিতে ঝাঁকি দিল ও, ওপর থেকে সেটা টেনে নিল ওরা। পিচ্ছিল পাথুরে কার্নিস ধরে পাহাড়-প্রাচীরের দিকে এগোল রানা, ওখানে কুলুঙ্গির সারিগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

পাঁচিলের গায়ে ফাটলটার আকৃতি এখন পরিষ্কারই দেখতে পাচ্ছে রানা। ওই ফাটলই ওকে নিজের শ্যাওলা ভরা গলায় টেনে নিতে চেয়েছিল। পাঁচিলের গোড়ায় পানি জমে আছে, গভীরতাও একটু বেশি, ফলে ফাটলটা প্রায় পুরোপুরি ডুবে আছে এখনও। সারফেসের ওপর দেখা যাচ্ছে শুধু নেমে আসা কুলুঙ্গি সারির নিচে খিলান আকৃতির ফাটলটার ওপরের অংশ। বাকিটা পানির নিচে।

কার্নিস ধরে পাঁচিল ঘেঁষে এগোচ্ছে রানা, ক্রমশ সরু হয়ে আসছে কার্নিস পাঁচিলে পিঠ ঘষে এগোতে হচ্ছে ওকে, পায়ের গোড়ালি পানি ছুঁয়ে থাকছে তারপর আর পানিতে না নেমে এগোবার উপায় থাকল না অথচ এখানে পানির গভীরতা সম্পর্কে ওর কোন ধারণা নেই।

তবু পা শুকনো রাখার জন্যে সরু কার্নিসে উবু হয়ে বসল রানা, একটা হাত পাঁচিলে রেখে ঝুঁকল, অপর হাতটা দিয়ে ডোবা ফাটলটার নাগাল পেতে চাইছে।

গর্তটার ঠোঁট মসৃণ কিনারাগুলো এত বেশি সরল আর ফাটলটা এত বেশি চৌকো, ধরেই নিতে হয় মানুষের তৈরি। শার্টের আস্তিন গুটাবার সময় রানা লক্ষ্য করল, ওর আহত আঙুলটা থেকে এখনও রক্ত গড়াচ্ছে। তবে গ্রাহ্য না করে হাতটা ডুবিয়ে দিল পানির তলায়। নিচের দিকটা হাতড়াচ্ছে, ফাঁকটার সিল বা গোবরাট খুঁজছে। আঙুলের ডগায় কর্কশ পলস্তারা করা একটা ব্লক ঠেকল। আরও ঝুঁকল রানা, পানির নিচে বাইসেপের অর্ধেকটা ডুবে গেল।

অকস্মাৎ জ্যান্ত একটা প্রাণী, ক্ষিপ্র ও ভারী; ঠিক ওর চোখের সামনে পানির ভেতর পাক খেলো, আঁতকে উঠে ঝট করে হাতটা পানি থেকে তুলে নিল রানা।

প্রাণীটা ওর হাতের পিছু নিয়ে সারফেস পর্যন্ত উঠে এল,- ওর নগ্ন মাংসে লম্বা সূচের মত দাঁত বসাতে চেষ্টা করল। পলকের জন্যে কুৎসিত ও ভীতিকর ব্যারাকুডার মত মাথাটা দেখতে পেল ও, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল আঙুলের ক্ষত থেকে বেরুনো রক্তের গন্ধই ওটাকে আকৃষ্ট করেছে।

লাফ দিয়ে সিধে হলো রানা, সরু কার্নিসে টলমল করছে, অক্ষত হাতে অপর হাতের বাহু খামচে ধরেছে। প্রাণীটার শুধু সামনের একটা দাঁত স্পর্শ করেছে ওকে, অথচ তাতেই ডান হাতের উল্টোপিঠের চামড়া যেন ধারাল ক্ষুর দিয়ে চিরে দেয়া হয়েছে। ওর পায়ের সামনে পানির ওপর ঝর ঝর করে রক্ত ঝরছে।

চোখের পলকে কালো পানি যেন জ্যান্ত হয়ে উঠল, জলজ প্রাণীর আকৃতি তীব্র উন্মাদনায় মোচড় খাওয়ায় আলোড়িত পানিতে ফেনা তৈরি হলো। পাঁচিলে পিঠ সাঁটিয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে রানা। আকৃতিগুলো অস্পষ্ট ভাবে দেখতে পাচ্ছে ও, মোচড়ানো ও আঁকাবাঁকা ফিতের মত, কোন কোনটা ওর কব্জির মত চওড়া, কালো আর চকচকে।

ঈল, বুঝতে পারল রানা। ওর জানা আছে ট্রপিক্যাল ঈল এরকম দৈত্যাকারই হয়। বদ্ধ জলে আটকা পড়েছে ওগুলো, ছোট্ট জায়গায় সংখ্যায় খুব বেশি হওয়ায় সমস্ত মাছ ইতিমধ্যে সাবাড় করে ফেলেছে, ফলে খিদের জ্বালায় একেকটা রাক্ষসে পরিণত হয়েছে। শেষবার এখানে সাঁতার কাটার সময় ওর শরীর থেকে রক্ত ঝরেনি, সেজন্যে ভাগ্যকে কৃতজ্ঞতা জানাল রানা।

গলা থেকে সুতি রুমালটা খুলে হাতের ক্ষতটা বাঁধল। পাহাড়-প্রাচীরের ফাটলটা পরীক্ষা করা সম্ভব নয়, ঈলগুলো মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। তবে এরইমধ্যে ওগুলোর কি ব্যবস্থা করে যায় চিন্তা করে ফেলেছে রানা।

ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল পুলের পানি। চেয়ার সহ কপিকলটা নেমে আসছে আবার। 'ফাটলের ভেতর কোনও টানেল পেলেন?' চেয়ার থেকে জানতে চাইল নিমা। তারপর রানার হাতে বাঁধা রুমালটা দেখে আঁতকে উঠল। 'আরে, রক্ত কেন? কিভাবে কাটল?'

'রক্ত একটু বেশি বেরুচ্ছে, তবে ক্ষতটা গভীর নয়,' বলল রানা। 'কিভাবে হলো?' রক্তে ভেজা রুমালের একটা কোণ ছিঁড়ে পানিতে ফেলল ও। 'দেখুন।'

লম্বা আকৃতিগুলো পানিতে আলোড়ন তুলতে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল নিমা। একটা ঈল পানির ওপর মাথা তুলে শরীরের অর্ধেকটা আছড়াল সরু কার্নিসে, তারপর কয়েকটা মোচড় খেয়ে আবার অদৃশ্য হলো পানির নিচে। 'কি... কি ওগুলো?'

'বিশ্বস্ত দারোয়ান রেখে গেছে টাইটা,' বলল রানা। 'আমরা যাতে পানির নিচে ফাটলটায় ঢুকতে না পারি।'

বাঁশ দিয়ে রানা ও মারটিন যে ভারাগুলো বানিয়েছে সেগুলো ঝুলে আছে প্রায় চার হাজার বছর আগে পাথর কেটে তৈরি করা কুলুঙ্গিতে গাঁথা অবস্থায়। টাইটা প্রতিটি কাঠামো জোড়া লাগিয়েছিল সম্ভবত গাছের বাকল দিয়ে তৈরি রশি দিয়ে, তবে মারটিন ব্যবহার করেছে হেভী-গজ গ্যালভানাইজ ওয়ায়্যার, ফলে অনেক লোকের

ভার সহ্য করার মত পোক্ত হয়েছে। বাঘ নামে শ্রমিকদের গ্রুপটা একটা চেইন তৈরি করল, সমস্ত জিনিস-পত্র আর ইকুইপমেন্ট হাতে হাতে নামতে শুরু করল এক ভারা থেকে আরেক ভারায়।

খাদের নিচে প্রথমে নামানো হলো পোর্টেবল হোন্ডা ইএমফাইভ হানড্রেড জেনারেটর। পাহাড়-প্রাচীরের গোড়ায় ফ্লাডলাইট সাজানো হয়েছে আগেই, কানেকশন দেয়ার পর জেনারেটর চালু করতেই উজ্জ্বল আলো বহুদূরে তাড়িয়ে নিয়ে গেল ছায়াগুলোকে। ভারার ওপর থেকে শ্রমিকদের হাততালি আর হাসির আওয়াজ ভেসে এল। ফুয়েল বাঁচানোর জন্যে একটু পরই অবশ্য বন্ধ করে দেয়া হলো জেনারেটর।

জলমগ্ন ফাটলটার চারধারে গ্যাবিয়ন অর্থাৎ তারের জালে আটকানো বোল্ডার ফেলা হলো, এরপর বালতি করে শুরু হবে পানি সেচা। তার আগে সবাইকে ভারার ওপর আশ্রয় নিতে বলল রানা, পুলের কিনারায় একা থেকে গেল ও, সঙ্গে ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেড ভরা একটা ব্যাগ। গ্রেনেডগুলো গেরিলা লীডার অ্যালান শাফির কাছ থেকে দান হিসেবে পেয়েছে ও।

পিন খোলার সাত সেকেন্ড পর বিস্ফোরিত হলো ওগুলো, পুলের মাঝখানে একের পর এক অনেকগুলো ছুঁড়ে দিল রানা। একটা করে ছোঁড়ে, কার্নিস ধরে যতটা সম্ভব দূরে সরে আসে, কানে হাত। শেষ গ্রেনেডটা বিস্ফোরিত হবার পর পুলের কিনারায় ফিরে এসে রানা দেখল অসংখ্য ঈল মারা গেছে, তবে আহত হয়ে মোচড় খাচ্ছে তারচেয়েও বেশি, বিস্ফোরণের ধাক্কায় পুলের পানি থেকে ডাঙায় উঠে এসেছে। ভারা থেকে নেমে এসে শ্রমিকরা মরা ও আধমরা ঈলগুলো তুলে যত্ন করে সাজিয়ে রাখছে দেখে রানা একজন সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা এগুলো খান?'

পেটে হাত বুলিয়ে সন্ন্যাসী একগাল হাসলেন, 'ভারি স্বাদ!'

একটা বাঁশ দিয়ে পুলের গভীরতা মাপল রানা, প্রায় সাত ফুট। গ্যাবিয়ন ফেলে পুলটাকে অর্ধচন্দ্র আকৃতিতে ঘিরে ফেলা হয়েছে, বালতি দিয়ে বাঘেরা পানি সেচতে শুরু করল পানির লেভেল নিচে নামছে, সেই সঙ্গে পাহাড়-প্রাচীরের গোড়ার ফাটলটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে।

একটু পরই বোঝা গেল ফাটলটা প্রায় চৌকোই, তিন মিটারের মত চওড়া, দু'মিটারের মত উঁচু। পাশ আর ছাদ পানির তোড়ে ক্ষয়ে গেছে, তবে পানির লেভেল আরও নিচে নামতে সুগঠিত পাথুরে ব্লক-এর অবশিষ্ট দেখতে পেল ওরা, ওগুলো সম্ভবত ফাটলটা বন্ধ করে রেখেছিল। চার প্রস্থ ব্লক এখনও অক্ষত রয়েছে, প্রাচীন রাজমিস্ত্রী ফাটলটার গোড়ায় যেখানে বসিয়েছিল; বাকিগুলো কয়েক হাজার বছরের বন্যায় ভেঙে গেছে, ঢুকে পড়েছে পিছনের টানেলে। ফলে আংশিক বন্ধ হয়ে আছে টানেলটা।

পুলে নামল রানা। পানি এখনও হাঁটু সমান। ফাটলটার সামনে হেঁটে এসে খালি হাতে পাথুরে আবর্জনা সরাচ্ছে। নিমাও ধৈর্য ধরতে পারল না, পুলে নেমে রানার পাশে চলে এল। 'টানেল বলেই তো মনে হচ্ছে!' উত্তেজনায় ফিসফিস করল ও। 'নাকি শ্যাফট? কিন্তু বাধাটা কেন? টাইটার ইচ্ছাকৃত নয় তো?'

'বলা কঠিন। নদীর মূল স্রোত থেকে প্রচুর আবর্জনা ঢুকেছে ভেতরে।' খানিকটা হতাশ দেখাল রানাকে। 'আর্কিওলজির নিয়ম ধরে পথটা পরিষ্কার করতে হলে কয়েক হপ্তা লেগে যাবে। ও-সব এখানে আমাদের পোষাবে না। আলো আর লোকবল যখন আছে, রাতদিন হাত লাগিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করতে হবে কাজটা।'

'ওঁরা ডানডেরা নদীতে বাঁধ দিয়েছেন,' হেস ডুগার্ডকে বললেন কারিক ফারুকী। 'মাসুদ রানার ক্যাম্পে আমাদের স্পাই আছে, সেই রিপোর্ট পাঠিয়েছে। খাদের ভেতর তিনশো লোককে কাজে লাগিয়েছেন তিনি, ইকুইপমেন্ট আর সাপ্লাইয়ের পরিমাণও বিপুল। এমন কি একটা ট্র্যাক্টরও নিয়ে গেছেন।'

ভুরু কুঁচকে জ্যাক রাফেলের দিকে তাকালেন হেস ডুগার্ড, রাফেল মাথা ঝাঁকাল। গম্ভীর দেখাল জার্মান বিলিওনিয়ারকে। জরুরী স্যাটেলাইট মেসেজ পেয়ে আদ্দিস আবাবায় চলে আসেন তিনি, ওখান থেকে জেট রেঞ্জার হেলিকপ্টারে চড়ে পৌঁছেছেন অ্যাবে গিরিখাদের ওপর প্রক্সি বেস ক্যাম্পে, এসকার্পমেন্টের চূড়ায়।

ডানডেরা নদীকে বাঁধ দিয়ে বাঁধা চাট্টিখানি কথা নয়, জানেন তিনি। অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা আবিষ্কার না করলে এত বড় একটা কাজে হাত দেবে না তাঁর প্রতিপক্ষ মাসুদ রানা, এ-ও তাঁর কাছে পরিষ্কার। ঠিক কোথায় বাঁধটা দেয়া হয়েছে দেখতে চাইলেন তিনি। স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফের ওপর একটা ক্রশ চিহ্ন আঁকল রাফেল। তাকে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কেন বাঁধ দিল ওরা? কারণটা ব্যাখ্যা করো, রাফেল।'

প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে অনুমান পাল্টা অনুমান করার পর সবাই একমত হলো, পানির নিচে কিছু একটার নাগাল পেতে চেয়েছে রানা। তারপর প্রশ্ন উঠল, ড্যাম সাইটের নিচে কি আছে? রাফেল জানাল, বাঁধটার ঠিক নিচে নদী ঢুকে পড়েছে সরু ও গভীর একটা নালার ভেতর। নালাটা আট মাইল লম্বা, শেষ মাথার ওপরে রয়েছে মঠটা। ওই নালার ওপর দিয়ে হেলিকপ্টার নিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব, তবু কয়েকবার গেছে রাফেল। একবার তারা রানা আর ওঁর বান্ধবীকে নালার ওপর উঁচু জমিনে দাঁড়িয়ে থাকতেও দেখেছে। কি করছিল ওরা? না, কিছু করছিল না, নালার ওপর পাহাড়-প্রাচীরের মাথায় বসে ছিল শুধু। হেলিকপ্টারটা ওরা দেখতে পায়? হ্যাঁ, অবশ্যই, দেখতে পেয়ে রানা হাতও নাড়ে। হেস ডুগার্ড বললেন, 'তোমাদের আওয়াজ পেয়ে বসে পড়েছিল ওরা, তার আগে নিশ্চয়ই ওখানে কিছু করছিল।' তারপর সিদ্ধান্তে আসলেন, 'রানা বিশ্বাস করে ড্যামের নিচে খাদের ভেতর সমাধিটা আছে।' রাফেলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'স্পাই লোকটা কখন আর কিভাবে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করে?'

রাফেল ব্যাখ্যা করল। এসকার্পমেন্টের কয়েকটা গ্রাম থেকে কিছু কিছু সাপ্লাই গ্রহণ করছে রানা, খচ্চরের পিঠে মাল-পত্র চাপিয়ে ওদের ক্যাম্পে আসা-যাওয়া করছে কয়েকজন মহিলা। স্পাই লোকটা ওই মহিলাদের হাতে রিপোর্ট পাঠায়।

'পরশুর মধ্যে রিপোর্ট করো আমাকে, বাঁধের নিচে কি করছে রানা,' নির্দেশ দিলেন হেস ডুগার্ড। কনফারেন্স টেবিলের উল্টোদিকে বসা কর্নেল জুলিয়াস ঘুমার

দিকে তাকালেন। 'এলাকায় কতজন লোককে আপনি ডিউটিতে রাখছেন?'

'তিনটে পুরো কোম্পানী, সব মিলিয়ে তিনশো'র বেশি লোক,' জবাব দিলেন কর্নেল ঘুমা। 'সবাই অভিজ্ঞ যোদ্ধা।'

'কোথায় তারা? ম্যাপে আমাকে দেখান।'

তাঁর পাশে চলে এলেন কর্নেল। 'একটা কোম্পানী এখানে। দ্বিতীয়টা ডেবরা মারিয়াম গ্রামে। তৃতীয়টা এসকার্পমেন্টের নিচে, রানার ক্যাম্পে হামলা চালাবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে।'

'আমার ধারণা হামলাটা এখুনি চালানো দরকার,' কারিফ ফারুকী বললেন। 'শত্রুকে সময় দিতে নেই।'

'চুপ করুন!' ধমক দিলেন হেস ডুগার্ড। 'আমি আপনার মতামত চেয়েছি?' ম্যাপটা কিছুক্ষণ দেখার পর কর্নেলকে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'গেরিলা কমান্ডারের সঙ্গে কতজন রয়েছে, জানেন? কি যেন নাম তার, রানাকে সাহায্য করছে?'

'অ্যালান শাফি। একশোরও কম, সম্ভবত পঞ্চাশজন, বাঁধ আর ক্যাম্প পাহারা দিচ্ছে।'

দু'আঙুলের মাঝখানে ধরে কানের লতি মোচড়াচ্ছেন হেস ডুগার্ড। গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন তিনি। বেশ কিছুক্ষণ পর তাঁর ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি ফুটল 'দ্বিতীয়বার যে পথে ইথিওপিয়ায় ঢুকেছে রানা, বেরিয়েও যাবে সেইপথে, গেরিলা কমান্ডারের সাহায্য নিয়ে,' বললেন তিনি। 'ঢোকার সময় বৈধ পথ ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না, বেরিয়ে যাবার সময় আরও সম্ভব হবে না। কাজেই আমি চাই ওই পথে ডেবরা মারিয়াম কোম্পানীটাকে মোতায়েন করুন আপনি, কর্নেল ঘুমা নদীটার দুই দিকেই পাহারায় থাকুক তারা, মঠের নিচে। রানা যেন উদ্ধার করা ট্রেজার নিয়ে সুদান সীমান্তে পৌঁছুতে না পারে।'

'ইয়েস, গুড্ আইডিয়া!' কর্নেলকে উল্লসিত দেখাল।

'আপনার বাকি লোককে এসকার্পমেন্টের নিচে জড়ো করুন। গেরিলাদের চোখে ধরা পড়া চলবে না, তবে বাঁধ দখল করার জন্যে তৈরি হয়ে থাকতে হবে আমি নির্দেশ দিলেই যাতে হামলা শুরু করতে পারে।'

'হামলাটা কখন শুরু করব আমরা?'

'রানার ওপর কড়া নজর রাখা হবে,' বললেন হেস ডুগার্ড। 'আর্টিফ্যাক্ট সরাতে শুরু করলে আমরা জানতে পারব। অনেকগুলোই এত বড় হবে যে লুকানো সম্ভব নয়। তখনই হামলা করব আমরা। ওরা চুরি করছে, আমরা ওদের ওপর বাটপারি করব।'

টানেলের মুখ পরিষ্কারের কাজ পুরোদমে শুরু হয়েছে। শিফটিং পদ্ধতিতে কাজ চলছে, নতুন শিফট শুরু হবার আগে মারটিনের স্টীল টেপ নিয়ে টানেলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে রানা। শেষবার মাপার পর বলল, 'একশো বিশ ফুট পরিষ্কার করা হয়েছে। শাবাশ, বাঘের বাচ্চা,' টোরা নাবুকে বলল ও। টোরা নাবু স্বেচ্ছাসেবী সন্ন্যাসীদের ফোরম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

টানেলের মেঝে এখনও তির্যক একটা পথ ধরে নিচের দিকে ঢালু হয়ে

আছে। ফ্লাডলাইটের আলোয় টানেলের প্রবেশ মুখটা এখন পরিষ্কারই চৌকো দেখাচ্ছে। টানেলটা যে একজন এঞ্জিনিয়ারের নকশা ধরে তৈরি করা হয়েছে, এখন আর তাতে কোন সন্দেহ নেই। পায়ের কাছে পানি-কাদায় পড়ে থাকা একটা জিনিস দেখতে পেয়ে ঝুঁকল রানা, দু'আঙুলে ধরে ফ্লাডলাইটের আলোয় পরীক্ষা করল

টানেল থেকে বেরিয়ে এল রানা হাসতে হাসতে। পুলটাকে ঘিরে থাকা নিচু পাঁচিলের ওপর বসে রয়েছে নিমা, জিনিসটা ওকে দেখাল। ছোঁ দিয়ে রানার হাত থেকে নিয়ে নিল নিমা, চিৎকার করে উঠল, 'ওহ, সুইট মেরি! রানা, এ আপনি কোথায় পেলেন?'

'কাদায় পড়েছিল,' বলল রানা, 'চার হাজার বছর ধরে। জিনিসটা কি চিনতে পারছেন? মদের পাত্র ছিল এক কালে, তারই ভাঙা একটা টুকরো। সম্ভবত টাইটার কোন শ্রমিকের হাত থেকে পড়ে ভেঙে যায়।'

মৃৎপাত্রের টুকরোটা হাত দিয়ে ঘষে চুমো খেলো নিমা। 'আমরা যে ঠিক পথ ধরে এগোচ্ছি, এটা তার আরেকটা প্রমাণ।'

পরবর্তী শিফটের কাজ দু'ঘণ্টা চলার পরই শেষ বাধাটা অপসারিত হলো, হৈ-চৈ শুনে টানেলের ভেতরে ঢুকে রানা দেখল বড় একটা বোল্ডার এক পাশে সরিয়ে আনার পর সামনে একটা ফাঁক তৈরি হয়েছে। পাঁচিলের এই জানালার ভেতর টর্চের আলো ফেলল ও। খালি ও কালো শূন্যতা ছাড়া আর কিছু দেখার নেই পিছিয়ে এসে টোরা নাবুর পিঠ চাপড়ে দিল ও। 'প্রত্যেকের জন্যে এক উপার করে বোনাস। তবে কাজ চালিয়ে যাও, সমস্ত আবর্জনা সরিয়ে ফেলতে হবে।' আবর্জনা সরাতে আরও দু'শিফট লাগল। ফাঁকটা বড় হবার পর দেখা গেল সামনে একটা গুহা রয়েছে।

গুহা মানে বিরাট একটা গর্ত। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার দশ ফুট নিচে পানি দেখা যাচ্ছে, চারপাশে গোলাকার ও খাড়া পাঁচিল। টর্চের আলোয় দেখা গেল ছাদে কয়েকটা ফাটল তৈরি হয়েছে, সম্ভবত কোন এক কালে পাথর ধসে পড়েছিল গুহা বা গর্তের ওপারে কালো ছায়া ছাড়া কিছুই দেখা যায় না, দূরত্ব হবে একশো ফুট বা আর কিছু বেশি

পানিতে না নেমে এই বাধা পেরুনো সম্ভব নয়। ত্রিশ ফুট লম্বা একটা বাঁশ এনে গভীরতা মাপার চেষ্টা করা হলো, কিন্তু থই পাওয়া গেল না 'এর মানে?' রানাকে জিজ্ঞেস করল নিমা, বিহ্বল দেখাচ্ছে ওকে

'আমার ধারণা, এটা একটা ন্যাচারাল ফল্ট,' বলল রানা। 'পানিকে পথ দেখিয়ে পাহাড়ের অপরদিকে নিয়ে গেছে, সারক্কেসে আবার বেরিয়েছে সেই প্রজাপতি ফোয়ারায় নদী আসলে নিজেই নিজের পথ খুঁড়ে নিয়েছে।'

'পানি তাহলে জমে আছে কেন?'

'শ্যাফটে একটা ইউ বেন্ড থাকায়, সম্ভবত,' বলে নিচের পানিতে টর্চের আলো ফেলল রানা আলোয় আকৃষ্ট হয়ে সারক্কেসের দিকে উঠে এল একটা ঈল, দেখে আঁতকে উঠল নিমা

গুহাটার ওপারে আরেক বার টর্চের আলো ফেলল রানা। গর্তটা যদি পাথর

ধসে তৈরি হয়ে থাকে, টাইটার টানেল তাহলে তো গুহার ওপারেও থাকার কথা। আছেও, যদিও ওর চোখে নয়, ধরা পড়ল নিমার চোখে। 'ওটা কি, চৌকো ফাঁকটা?'

মুচকি হেসে রানা বলল, 'ওটাই আমি খুঁজছিলাম। এই টানেলেরই অংশ ওটা।'

'আমরা ওপারে যাব কিভাবে?' নিমা উদ্বিগ্ন।

'আশপাশে প্রচুর বেওব্যাব গাছ আছে, ওগুলোর শুকনো কাঠ খুব হালকা,' বলল রানা। 'ভাসমান একটা ব্রিজ বানাতে কতক্ষণই বা লাগবে।'

বেওব্যাব গাছের কাণ্ড পাশাপাশি পানিতে ফেলে তার দিয়ে বাঁধা হয়েছে, ভাসমান সেতু পেরিয়ে সিঙ্ক-হোল-এর ওপারে প্রথমে পৌঁছাল রানা, তারপর ওর পিছু নিয়ে নিমা। টানেলের দ্বিতীয় অংশের মুখে দাঁড়াল দু'জন, ভেতরে টর্চের আলো ফেলার সঙ্গে সঙ্গে দুই অংশের পার্থক্যটা ধরা পড়ল চোখে। মূল স্রোতটা নিশ্চয়ই সিঙ্ক-হোল দিয়ে বেরিয়ে যেত। টানেলের দ্বিতীয় অংশের মাপ প্রথমটার মতই–তিন মিটার চওড়া, দুই মিটার উঁচু। তবে চৌকো আকৃতি আরও বেশি স্পষ্ট। পাঁচিল আর ছাদ কর্কশ হলেও, এগুলোকে আকৃতি দেয়ার জন্যে যে টুলস ব্যবহার করা হয়েছে তার চিহ্ন পরিষ্কার চোখে পড়ল। পায়ের নিচে টানেলের মেঝে চ্যাপ্টা পাথর ফেলে তৈরি করা হয়েছে, পলেস্তারার কাজ এখনও সবটুকু ক্ষয়ে যায়নি। টানেলের পুরোটা দৈর্ঘ্য জলমগ্ন ছিল, পানি সরে যাবার পরও পিচ্ছিল হয়ে আছে শ্যাওলায়। ভেতরের বাতাসে পচা একটা গন্ধ ভেসে আছে। মারটিন তার টেনে নিয়ে এসে আলো জ্বালার ব্যবস্থা করল। ওরা দেখল, দ্বিতীয় অংশের শ্যাফট ক্রমশ ওপর দিয়ে উঠে গেছে।

'টাইটা প্রথমে টানেলটাকে নিচে নামিয়ে ডুবিয়ে দিয়েছিল, পরে আবার ওপরে তুলেছে,' মন্তব্য করল নিমা, হাসছে। রানার পাশে রয়েছে ও, দু'জনেই শ্যাফট ধরে সাবধানে এগোচ্ছে। প্রতিটি পদক্ষেপ গুনছে রানা।

একশো দশ কদম হাঁটার পর দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। সামনের টানেল ভিজে নয়, মেঝে ও পাঁচিল শুকনো খটখটে আরও পঞ্চাশ পা এগোল ওরা, পাঁচিলের দাগ দেখে বোঝা গেল বন্যার সময়ও এই লেভেলে পানি উঠত না। এদিকের মেঝে ও পাঁচিল চার হাজার বছর আগে মিশরীয় ক্রীতদাসরা যেভাবে তৈরি করে রেখে গেছে এখনও ঠিক তেমনি আছে। ব্রোঞ্জের তৈরি বাটালির দাগগুলো এত তাজা, মনে হচ্ছে মাত্র ক'দিন আগে কাজ শেষ করে ফিরে গেছে তারা। আরও দশ গজ এগোবার পর একটা পাথুরে ল্যান্ডিঙে পৌঁছুল ওরা। মেঝে এখানে সমতল। টানেল এখানে তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়েছে, একশো আশি ডিগ্রী কোণ ঘুরে।

'পানির লেভেল এখান পর্যন্ত কোনদিনই উঠবে না, এ-কথা টাইটা জানল কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তখনকার দিনে নিখুঁত মাপজোকের জন্যে কোন যন্ত্রপাতি ছিল না, অথচ হিসেবে তার এতটুকু ভুল হয়নি।'

'কেন, স্ক্রোলে তো সে বারবার বলেছে, আমি একটা জিনিয়াস। তার দাবি স্বীকার করে নিতে হয়,' বলল নিমা।

পাশাপাশি একশো আশি ডিগ্রী বাঁকটা ঘুরল ওরা। হাতের ইলেকট্রিক ল্যাম্পটা উঁচু করে ধরে আছে রানা, পিছনে কেবল ঝুলছে। সামনের দিকটা আলোকিত হয়ে উঠতে বিস্ময়সূচক একটা আওয়াজ করল নিমা, রানার খালি হাতটা খামচে ধরল। দাঁড়িয়ে পড়ল দু'জনেই, অবাক চোখে তাকিয়ে আছে।

টানেলের নিচের যে অংশটা ওরা পেরিয়ে এসেছে সেটা তৈরি করার সময় তেমন একটা যত্ন নেয়া হয়নি, দেয়াল আর মেঝে এবড়োখেবড়ো ছিল, ছাদে ছিল শটল। তারমানে টাইটা জানত নিচের লেভেলটা পানিতে ডুবে থাকবে, তাই সৌন্দর্য বাড়ানোর কোন চেষ্টা করেনি।

এখন ওদের সামনে থেকে ওপরে উঠে গেছে একটা চওড়া সিঁড়ি। একটু বিপজ্জনক ভঙ্গিতে উঠেছে, ফলে সিঁড়ির মাথাটা দেখা যাচ্ছে না। প্রতিটি ধাপ টানেলের পুরো প্রস্থের সমান লম্বা, পুরো এক হাত চওড়া। চকচকে, মসৃণ পাথরের টুকরো দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ধাপগুলো, এত নিখুঁত কাজ যে জয়েন্টগুলো চোখে পড়ে না। নিচের অংশের টানেলের চেয়ে এদিকের টানেলের ছাদ তিনগুণ বেশি উঁচু, সারি সারি গম্বুজের মত দেখতে, প্রতিটি গম্বুজের মাপ সমান। দেয়াল আর ছাদের গম্বুজে আবরণ হিসেবে বসানো হয়েছে নীল গ্র্যানিট পাথর। তবে কোথাও কোন অলংকরণ চোখে পড়ল না।

রানার হাতে মৃদু চাপ দিল নিমা। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা। ধাপগুলো মিহি ধুলোয় ঢাকা, নরম আর ট্যালকম পাউডারের মত সাদা। কিছু দূর যাবার পর সিঁড়ির মাথাটা দৃষ্টিপথে চলে এল। রানার হাতের তালুতে নখ ঢুকিয়ে দিল নিমা। সিঁড়িটা শেষ হয়েছে আরেকটা ল্যান্ডিঙে, ল্যান্ডিঙের ওপারে চারকোনা একটা দরজা দেখা যাচ্ছে। ল্যান্ডিঙ পেরিয়ে দরজাটার সামনে দাঁড়াল ওরা। বিরল এক শুভ মুহূর্ত উপস্থিত, ওরা যেন নিঃশব্দে অনন্তকাল ওখানে দাঁড়িয়ে থাকল, পরস্পরের হাত শক্ত করে ধরে আছে।

নদীর সাদা মাটি দিয়ে প্লাস্টার করা দরজা, দেখে মনে হলো আইভরি দিয়ে মোড়া। কোথাও কোন দাগ নেই, যেন ত্রুটি হীন কোন কুমারীর ত্বক। সাদা প্লাস্টারের মাঝখানে এমবস করা একজোড়া সীল রয়েছে। ওপরের সীলটার আকৃতি চৌকো একটা গিঁট, মুড়ে রেখেছে শিং-ওয়ালা গুবরে পোকা। বৃত্তাকার শিং অনন্তকাল বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। এটা রাজকীয় একটা প্রতীক চিহ্ন। লেখাগুলো, হায়ারোগ্লিফিকস, পড়ল নিমা, তবে নিঃশব্দে।

'সর্বশক্তিমান। ঐশ্বরিক ও স্বর্গীয়। মিশরীয় নিম্ন ও উচ্চ রাজ্যসমূহের শাসক গড হোরাস-এর ঘনিষ্ঠ। অসিরিসি আর আইসিসি-এর প্রিয়পাত্র রামেসস, তিনি যেন চিরজীবী হন।'

রাজকীয় সীলের নিচে ছোট আরেকটা ডিজাইন রয়েছে, বাজপাখির আকৃতি, ডানা ডানা সেঁটে আছে বুকে, আর লেখাগুলো—'আমি, ক্রীতদাস টাইটা, আপনার নির্দেশ পালন করেছি, স্বর্গীয় ফারাও।' পঙ্গু বাজপাখির নিচে আর মাত্র একটা লাইন দেখা গেল, তার অর্থ করলে দাঁড়ায়—'আগন্তুক! দেবতারা দেখছেন! রাজার চিরকালীন বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটালে চড়া মাশুল দিতে হবে।'

***

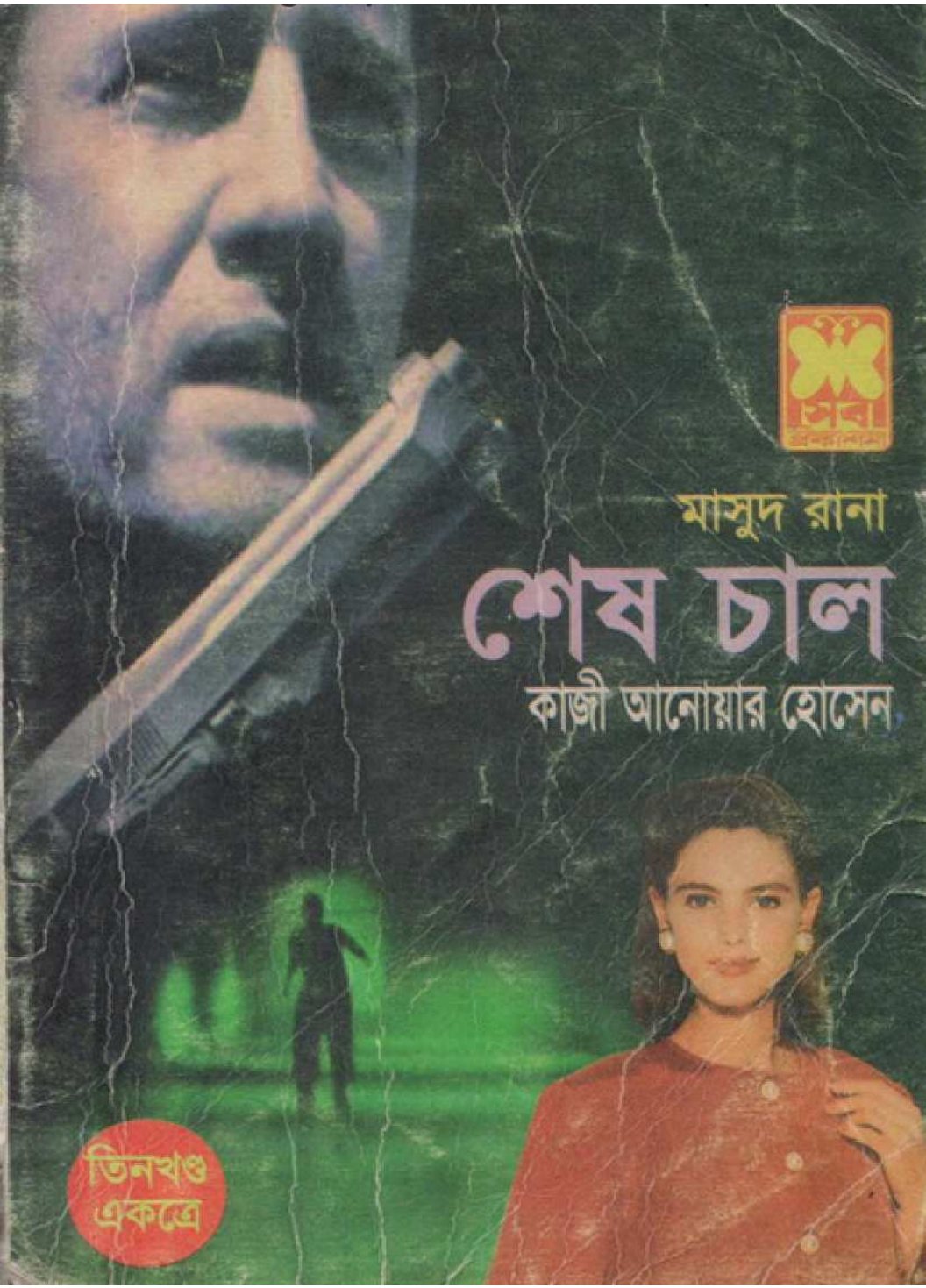
সেবা প্রকাশনী
মাসুদ রানা
শেষ চাল
কাজী আনোয়ার হোসেন
তিনখণ্ড একত্রে

মাসুদ রানা
(তিনখণ্ড একত্রে)

শেষ চাল

কাজী আনোয়ার হোসেন

সুন্দরী মরুকন্যা নিমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে মাসুদ রানা কি চার হাজার বছর আগেকার এক ফারাও সম্রাটের বিত্তবৈভব উদ্ধার করতে আফ্রিকা যাবে? বিপদটা কী ধরনের জানার পরও?

প্রায় চার হাজার বছর আগে ক্রীতদাস টাইটা যা করেছিল, মাসুদ রানাও তাই করতে চাইছে–গিরিখাদের ভিতর ডানভেরা নদীতে একটা বাঁধ দেবে। নদীর তলায়, পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে একটা ফাটল আছে; সেই ফাটলের ভিতর কোথাও থাকলেও থাকতে পারে ফারাও মামোসের সমস্ত ও গুপ্তধন।

সমস্ত বিপদ পায়ে দলে ওরা যখন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত, সরকারি সৈন্য নিয়ে হামলা করে বসলেন কর্নেল ঘুমা, জার্মান ধনকুবের হেস ডুগার্ড ফারাও মামোসের সমস্ত গুপ্তধন রানার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চান। একই সঙ্গে শুরু হলো তুমুল মরশুমি বর্ষণ, সমাধির ভিতর চিরকালের জন্য আটকা পড়তে হলো ওদেরকে। বেইমানীর আভাস পেয়ে রানা, প্রশ্ন উঠল, শেষ হাসিটা কে হাসবে? কে দেবে শেষ চাল?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

এক

দরজার সীল ভাঙা বিশাল একটা কাজ, এবং সময় সাপেক্ষ, অথচ বর্ষা শুরু হবার আগে হাতে অল্প যে সময় আছে তা দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। দরজা ভেঙে সমাধি ভেতর ঢোকার প্রস্তুতি নিতে মূল্যবান একটা দিন বেরিয়ে গেল। স্বভাবতই সমাধি এলাকার নিরাপত্তা বিধান রানার প্রথম উদ্বেগ। সিঙ্ক-হোলের ওপর ভাসমান সেতুর মুখে শাফিকে সশস্ত্র প্রহরার ব্যবস্থা করতে বলল ও, এই সীমা রেখার সামনে বাড়া নিষিদ্ধ করা হলো। সেতু পেরুতে পারবে সব মিলিয়ে মাত্র নয়জন—রানা, নিমা, মারটিন, শাফি, রুবি আর চারজন সন্ন্যাসী।

লোয়ার টানেল পরিষ্কার করার কাজে টোরা নাবু বারবার নিজের বুদ্ধিমত্তা ও শারীরিক সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছে, ফলে আগেই তাকে প্রধান সহকারী হিসেবে বেছে নিয়েছে রানা। সিদ্ধান্ত হলো, এখন থেকে যা কিছু আবিষ্কার করা হবে প্রতিটির রেকর্ড রাখা চাই। তেপায়া ও স্পেয়ার ক্যামেরা ইকুইপমেন্ট নিয়ে হাজির হলো নাবু, অ্যাপ্রোচ টানেল আর সীল করা দরজার ফটো তুলল রানা। ফটো তোলার কাজ শেষ হতে দরজা ভাঙার টুলস নিয়ে আসার জন্যে নাবুকে অনুমতি দিল ও।

সিঙ্ক-হোল পর্যন্ত সরিয়ে আনা হয়েছে জেনারেটর, ফ্লাডলাইট জ্বেলে সিঁড়ির ওপরের ল্যান্ডিং আর দরজাটা আলোকিত করার ব্যবস্থা হলো। চৌকো আকৃতির প্লাস্টার যে-টুকু কাটা হবে তা চিহ্নিত করে নিয়েছে রানা, তার আগে টাইটার সতর্কবাণীর অনুবাদ শুনিয়ে দিয়েছে মারটিন, শাফি আর রুবিকে। কেউই ওর ব্যাপারটাকে হালকা ভাবে নেয়নি।

দরজার গা থেকে দুটো সীলই অক্ষত অবস্থায় তুলে আনার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

প্রথমে প্রোব হিসেবে বড় সূচ ব্যবহার করা হলো। প্লাস্টারের নিচে কি আছে সেটা জানাই উদ্দেশ্য। একটু পরই জানা গেল প্লাস্টারের নিচে রয়েছে নল-খাগড়ার ছিলকা দিয়ে নিখুঁতভাবে বোনা কয়েকটা স্তর। নিমা বলল, 'ওই বুননই প্লাস্টারকে খসে পড়তে দেয়নি।' লম্বা সূচটা গায়ের জোরে আরও ভেতরে ঢোকাল রানা, এক পর্যায়ে ওটা আর ঠেকল না কোথাও, অপর দিক বেরিয়ে গেছে ডগা। 'দরজার কবাট ছ'ইঞ্চি চওড়া,' জানাল রানা। চার কোণে চারটে খুদে ফুটো তৈরি করা হলো। সরে এসে নাবুকে জায়গা ছেড়ে দিল ও, ভুরপুন দিয়ে ফুটোগুলোকে বড় করার কাজে হাত দিল সে।

গর্তগুলো বড় হবার পর নাবুকে সরিয়ে দিয়ে ভেতরে তাকাল রানা। অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখার নেই। তবে প্রাচীন বদ্ধ বাতাস লাগল মুখে। গন্ধটা শুকনো আর উগ্র। 'আলোটা দাও!' মারটিনকে বলল ও। মারটিন ওর হাতে ল্যাম্পটা ধরিয়ে দিল।

'কি দেখছেন?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল নিমা। 'বলুন আমাকে!'

'রঙ!' ফিসফিস করল রানা। 'চোখ ধাঁধানো বিচিত্র সব রঙের বাহার!' সরে এসে কোমর ধরে নিমাকে উঁচু করল ও। ফাঁকটায় চোখ রাখল নিমা।

'কি সুন্দর!' চেঁচিয়ে উঠল নিমা। 'ও গড, কী সুন্দর!'

হেভী-ডিউটি ইলেকট্রিক ব্লোয়ার ফ্যান চালু করা হলো, প্যাকটের বাতাস চারদিকে ছড়িয়ে দেবে। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকার সময় নিমা ছাড়া আর কাউকে থাকতে দেবে না রানা, সবাইকে পাঠিয়ে দিল ভাসমান সেতুর কাছে। ওর হাতে একটা চেইন-স রয়েছে। দু'জনেই মাস্ক আর গগলস পরে নিল।

তুরপুন দিয়ে বড় করা ফুটো থেকে চেইন-স কাজ শুরু করল, প্লাস্টার ও নিচের ছিলকার বুনন নরম কেকের মত কেটে ফেলছে। চৌকো ফাঁকটা তৈরি হতে খুব বেশি সময় লাগল না। জোড়া সীল সহ প্লাস্টারের চারকোনা টুকরোটা সাবধানে কবাট থেকে আলাদা করে নিল ওরা। এবার ফাঁকের ভেতর ফ্লাডলাইটের আলো ফেলল রানা। ভেতরে এখন ধুলোর মেঘ তৈরি হয়েছে, কিছুই দেখা গেল না। হ্যাচ গলে ভেতরে ঢুকল রানা, তারপর নিমাকে ঢুকতে সাহায্য করল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল দু'জন, ব্লোয়ার ফ্যান ধুলোর মেঘ সরিয়ে দেয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। ধীরে ধীরে বাতাসে মিলিয়ে গেল ধুলো, তারপর প্রথমেই ওদের চোখ পড়ল পায়ের নিচে মেঝের ওপর। মেঝে এখানে পাথরের ফলক দিয়ে তৈরি নয়, হলুদ আকীক পাথরের টাইল দিয়ে মোড়া, পালিশ করা চকচকে, আর এমন কৌশলে জোড়া লাগানো যে জয়েন্টগুলো দেখা যায় না। স্বচ্ছ ও অবিচ্ছিন্ন কাচের একটা চাদর বলে মনে হয়, ম্লান দেখাচ্ছে শুধু যেখানে মিহি ধুলো জমেছে। ওদের পা লেগে ধুলো যেখানে সরে গেছে, ফ্লাডলাইটের আলো পড়ায় ঝলমল করছে আকীক। ওদেরকে ঘিরে থাকা ধুলো আরও পাতলা হয়ে এল, সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে ফুটছে বিচিত্র বর্ণ আর আকৃতি। মাস্ক খুলে আকীক মেঝেতে ফেলে দিল নিমা। রানাও তাই করল। প্রাচীন, অস্বাস্থ্যকর বাতাসে শ্বাস নিল ওরা। বাতাস এখানে কয়েক হাজার বছর আটকে আছে। ছাতা ধরা গন্ধ, লিনেন ব্যান্ডেজ আর সুবাসিত লাশের ঘ্রাণ পেল ওরা।

ধুলো পুরোপুরি সরে যেতে লম্বা ও সোজা একটা প্যাসেজওয়ে দেখতে পেল ওরা, শেষ প্রান্তটা ছায়া আর অন্ধকারে লুকিয়ে আছে। হ্যাচ দিয়ে গলিয়ে স্ট্যান্ড সহ ফ্লাডলাইটটা ভেতরে নিয়ে এল রানা। প্যাসেজটার পুরো দৈর্ঘ্য এবার আলোকিত হয়ে উঠল।

পাশাপাশি এগোচ্ছে ওরা, প্রাচীন দেবতাদের ছায়া ও মূর্তি চারদিক থেকে ঝুঁকে রয়েছে ওদের ওপর। দেয়াল থেকে চোখ রাঙাচ্ছেন তাঁরা, বিশাল চোখে আক্রোশ ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছেন সিলিং থেকে। নিমাকে নিয়ে ধীর পায়ে এগোচ্ছে রানা। আকীক টাইলের ওপর ধুলো জমে থাকায় পা ফেলায় কোন শব্দ হচ্ছে না। বাতাসে ভেসে থাকা ধুলো আলোকিত জালের মত লাগছে, পরিবেশে এনে দিয়েছে অলৌকিক স্বপ্নরাজ্যের ভাব। প্রতি ইঞ্চি দেয়ালে আর ছাদে লিপি বা নকশা দেখা যাচ্ছে—সবই দীর্ঘ উদ্ধৃতি, বুক অব ব্রিদিংস, বুক অব দা পাইলনস ও

বুক অব উইজডম থেকে নেয়া। অন্যান্য হায়ারোগ্লিফিক্স ফুটিয়ে তুলেছে মর্ত্যলোকে কারাও মামোসের অস্তিত্বের ইতিহাস, সদগুণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, যে-কারণে দেবতাদের ভালবাসা পেয়েছিলেন তিনি।

আরও খানিক সামনে লম্বা ফিউনারাল গ্যালারি দেখতে পেল ওরা, আটটা শ্রাইন-এর প্রথমটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। শ্রাইন হলো লাশের দেহাবশেষ বা জীবিতকালে তাঁর ব্যবহার করা জিনিস-পত্র স্মৃতি হিসেবে রাখার বাক্স। প্রথমটা অসিরিস-এর শ্রাইন। বৃত্তাকার একটা চেম্বার, দেয়ালে ঈশ্বরের প্রশংসা লিপিবদ্ধ করা, কুলুঙ্গিতে অসিরিস-এর খুদে মূর্তি, চোখগুলো আকীক মণি আর স্ফটিক পাথর দিয়ে তৈরি, এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন যে চোখাচোখি হতেই শিউরে উঠল নিমা। হাত বাড়িয়ে দেবতার গোড়ালি ছুঁলো রানা, একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল, 'সোনা।'

তারপর মুখ তুলে তাকাল টাওয়ারের মত উঁচু দেয়ালচিত্রের দিকে, শ্রাইনের চারদিকে ছড়িয়ে আছে, উঠে গেছে গম্বুজ আকৃতির ছাদে। পাতালরাজ্যের অধিপতি পিতা অসিরিস-এর আরেকটা দৈত্যাকার ফিগার, মুখটা সবুজ, নকল দাড়ি, বাহু জোড়া বুকে ভাঁজ করা, হাতে বাঁকা লাঠি, মাথায় লম্বা হেড-ড্রেস বা মুকুট, মুকুটের কপালে ফণা তোলা গোক্ষুর। সচল ধুলোর মধ্যে দেবতাকে জ্যান্ত মনে হলো, ওদের চোখের সামনে যেন নড়াচড়া করছেন।

প্রথম শ্রাইনের সামনে বেশিক্ষণ থামল না ওরা। গ্যালারিটা তীরের মত লম্বা হয়ে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। পরবর্তী শ্রাইন দেবীর প্রতি উৎসর্গিত। কুলুঙ্গিতে বসে আছেন আইসিস, বসে আছেন সিংহাসনে, এই সিংহাসনই তাঁর প্রতীক চিহ্ন। শিশু হোরাস স্তন পান করছেন। দেবীর চোখ আইভরি আর নীল ল্যাপিস ল্যাজুলাই।

কুলুঙ্গির চারপাশ দখল করে আছে দেয়ালচিত্র, শিল্পীর আঁকা তাঁরই ছবি। এখানে জননী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে তাঁকে, সুর্মা টানা কালো রাত্রির মত চোখ, মাথায় সান ডিস্ক আর পবিত্র গরুর শিং। তাঁর চারপাশের দেয়াল হায়ারোগ্লিফিক্স সঙ্কেত, এত উজ্জ্বল যে জোনাকি পোকার মত জ্বলছে। একশো নাম তাঁর, কখনও অ্যাসট তিনি, কখনও নেট বা বাস্ট। পটাহ, সেকের, রেনাট নামেও ডাকা হয় তাঁকে। প্রতিটি নাম একেকটা শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে।

পরবর্তী শ্রাইনে রয়েছে হোরাস-এর মূর্তি, এ-ও সোনার তৈরি, মাথাটা বাজপাখির। ডান হাতে ধনুক, বাঁ হাতে ইংরেজি হরফ টি আকৃতির ক্রস। জীবন-মৃত্যুর দেবতা তিনি। তাঁর চোখ লাল রত্ন। মূর্তির চারপাশে তাঁরই বিভিন্ন বয়েসের দেয়ালচিত্র। শিশু হোরাস আইসিস-এর স্তন পান করছেন। তরুণ হোরাস ঋজু ও গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। তারপর, বাজপাখির মুখ নিয়ে অন্য এক রূপে হোরাস, শরীরটা কখনও সিংহের, আবার কখনও বীরযোদ্ধার, মাথায় মুকুট। তাঁর নিচে হায়ারোগ্লিফিক্স—'মহান দেবতা এবং স্বর্গের প্রভু, বহু গুণের অধিকারী, সমস্ত দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তিধর, যে শক্তি তাঁর স্বর্গীয় পিতা অসিরিস-এর শত্রুকে পরাভূত করেছিল।'

চার নম্বর শ্রাইনে দাঁড়িয়ে আছেন সেথ, শয়তান, ধ্বংস আর যুদ্ধের দেবতা।

তাঁরও শরীর সোনার তৈরি, তবে মাথাটা কালো হায়েনার।

পঞ্চম শ্রাইনে রয়েছেন লাশ আর কবরের দেবতা, আনুবিস, মাথাটা শিয়ালের। লাশের দেখাশোনা করেন তিনি, বিশাল দাঁড়ি-পাল্লায় হৃৎপিণ্ড ওজন করার সময় নিক্তির কাঁটা পরীক্ষা করেন। পাল্লা দুটো যদি সমান সমান হয়, মৃত ব্যক্তির গুরুত্ব ও মূল্য আছে বলে ঘোষণা দেয়া হয়, কিন্তু যদি একদিকের পাল্লা তার বিরুদ্ধে এক চুলও নিচে নেমে থাকে, আনুবিস তার হৃদয় দৈত্যাকার কুমীরকে খেতে দেন।

তারপর থোত-এর শ্রাইন। ইনি ভাষা বা লিখন-এর দেবতা, মাথাটা পবিত্র সারসজাতীয় পাখির, হাতে কলম। সপ্তম শ্রাইনে চার পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন পবিত্র গাভী হাথোর, গায়ের রঙ সাদা ও কালো, মুখটা মানুষের মত, তবে কান দুটো ট্রাম্পেট আকৃতির। অষ্টম শ্রাইন আকারে সবচেয়ে বড়, দেখতেও সবগুলোর চেয়ে সুন্দর। এটা আমোন-রা-র শ্রাইন, তিনি সমস্ত সৃষ্টির জনক। তিনি সূর্য: প্রকাণ্ড সোনার বৃত্ত, সোনালি রশ্মি ছড়াচ্ছেন।

এখানে দাঁড়িয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। আটটা পবিত্র শ্রাইন ট্রেজার হিসেবে এত গুরুত্বপূর্ণ, এরকম মূল্যবান প্রত্ন নিদর্শন এর আগে আবিষ্কার হয়েছে কিনা সন্দেহ। টাকার অঙ্কে এগুলোর কি দাম হতে পারে ভাবতে গিয়ে চিন্তাশক্তি লোপ পাবার অবস্থা হলো ওর। ওজন দরে সোনা বিক্রি করলে কি দাম পাওয়া যাবে সেটা বের করা সহজ কাজ, কিন্তু প্রাচীন এই শিল্পকর্মের মূল্য তার চেয়ে শত বা সহস্র গুণ বেশি হবে। তাছাড়া, সবে মাত্র শুরু, ট্রেজারের কয়েকটা মাত্র নমুনা দেখতে পেয়েছে ওরা। না জানি সামনে আর কত কি আছে!

চিন্তাটা মাথা থেকে বের করে দিয়ে প্যাসেজের শেষ মাথায় বিশাল চেম্বারের দিকে ঘুরল রানা।

'সমাধি,' ফিসফিস করল নিমা।

ওরা সামনে বাড়ছে, সেই সঙ্গে পিছিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার। এখন ওরা সমাধির ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে। ওটার দেয়ালও চিত্রশোভিত, প্রতিটি বিচিত্র বর্ণ থেকে যেন আগুনের মত আভা ফুটে বেরুচ্ছে। দীর্ঘ এক মানুষের ছবি দেয়াল ধরে সিলিং পর্যন্ত পৌঁচেছে। ওটা দেবী নাট-এর নমনীয়, সর্পিল দেহ, সূর্যের জন্ম দিচ্ছেন। তাঁর খোলা জরায়ু থেকে সোনালি কিরণ বেরুচ্ছে, ফারাও-এর অলঙ্কৃত পাথুরে শবাধারকে আলোকিত করেছে, মৃত রাজাকে দান করছে নতুন জীবন।

চেম্বারের ঠিক মাঝখানে রাখা হয়েছে রাজকীয় শবাধার, বিশাল এক কফিন, প্রকাণ্ড এক নিরেট গ্র্যানিট থেকে কেটে বের করা। এত বড় আর অসম্ভব ভারী কফিনটা জলমগ্ন টানেল দিয়ে বয়ে আনতে কতজন ক্রীতদাস লেগেছে, ভাবতে গিয়ে তাজ্জব বনে গেল রানা।

তারপর কফিনের ভেতর তাকাল ও, আর তাকিয়েই হতভম্ব হয়ে গেল: শবাধারটা খালি। প্রকাণ্ড গ্র্যানিট ঢাকনি তুলে ফেলা হয়েছে, তুলে এমনভাবে এক পাশে ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে যে পুরোটা প্রস্থ জুড়ে ফাটল ধরেছে ওটায়, এই মুহূর্তে দু'ভাগ হয়ে পড়ে রয়েছে কফিনের পাশের মেঝেতে।

ধীর পায়ে সামনে বাড়ল ওরা, হতাশার তিক্ত স্বাদের সঙ্গে ধুলো মিশছে

জিভে। একেবারে কাছে এসে কফিনের ভেতর চারটে জার-এর ভাঙা টুকরো দেখল ওরা। পাত্রগুলো তৈলস্ফটিক দিয়ে তৈরি, রাজার নাড়িভুঁড়ি, লিভার ও শরীরের অন্যান্য ভেতরকার অঙ্গ রাখার জন্যে। ভাঙা ঢাকনিতে দেবতা আর অবাস্তব প্রাণীদের মাথা অলঙ্করণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

'ফাঁকা!' ফিসফিস করল নিমা। 'রাজার লাশ গায়েব হয়ে গেছে।'

দেয়ালচিত্রের ফটো তুলতে কয়েকটা দিন ব্যয় হলো। দেবতা ও দেবীদের স্ট্যাচুও বাক্স বন্দী করা হলো এই সময়। কাজের ফাঁকে খালি শবাধার নিয়ে আলোচনা করল রানা ও নিমা। নিমা বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে, সমাধির গেটের সীল তো ভাঙা হয়নি।

'ব্যাখ্যা একটা না থেকে পারে না,' বলল রানা। 'টাইটা নিজেই হয়তো লাশ আর ট্রেজার সরিয়ে ফেলে। ক্রোলে বারবার সে বলতে চেয়েছে বিপুল ধন-সম্পদ এভাবে লুকিয়ে রাখার কোনই মানে হয় না, ত্যরচেয়ে জাতি আর জনগণকে পুষ্টি যোগানোর কাজেই ব্যবহার করা উচিত।'

নিমার তর্ক হলো, নদীতে বাঁধ দিয়ে, পুলের নিচে টানেল তৈরি করে লাশ আর ট্রেজার এখানে এনেছে টাইটা. বিশাল এক সমাধি তৈরি করেছে, তারপর রাজার মমি সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নষ্ট করে ফেলে, এটা মেনে নেয়া যায় না। 'টাইটা সবসময় যুক্তিতে বিশ্বাসী। মিশরীয় দেবতাদের শ্রদ্ধা করত সে। তার সব লেখায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ধর্মীয় রীতি-পদ্ধতি বা ঐতিহ্যে বিশ্বাসী ছিল সে, কাজেই এ কাজ তার দ্বারা সম্ভব হতে পারে না। রাজকীয় মমির অন্তর্ধান আমার কাছে বিরাট একটা রহস্য, রানা। এখানে কি যেন একটা গোলমাল আছে। এমন কি পেইন্টিং আর দেয়ালের শিলালিপিও কেমন যেন বেমানান লাগছে।'

'কেন, অলঙ্করণ আপনার বেমানান লাগবে কেন?'

'প্রথমে পেইন্টিংগুলোর কথাই ধরুন,' বলল নিমা, হাত তুলে আইসিসের ছবি দেখাল। ছবিটায় আইসিস তাঁর একটা হাত নাড়ছেন। 'সুন্দর ছবি, যোগ্য কোন ক্লাসিক্যাল শিল্পীরই আঁকা। তবু গতানুগতিক ভাবটুকু স্পষ্ট, ফর্ম আর রঙের ব্যবহারে পুরানো একটা ধারা ব্যবহার করা হয়েছে। ফিগারগুলো আড়ষ্ট, তারা নাচছে না। মেধা আর প্রতিভার ছোঁয়া অনুপস্থিত, রানী লসট্রিস-এর সমাধিতে যা আমরা চাক্ষুষ করেছি, স্ফটিকের জারে মূল ক্রোল যেখানে লুকানো ছিল।'

দেয়ালচিত্রের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর নিমার সঙ্গে একমত হলো রানা। 'হ্যাঁ, ট্যানাস-এর সমাধিতে যে দেয়ালচিত্র দেখেছি, সেগুলোর সঙ্গে এগুলো মেলে না।'

'বুঝুন তাহলে! ওগুলো টাইটার নিজের আঁকা ছিল। এগুলো তা নয়। এগুলো তার অধস্তন কোনও শিল্পীর আঁকা।'

'শিলালিপি সম্পর্কে আপনার অভিযোগ কি শোনা যাক,' বলল রানা।

'এমন কোন সমাধির কথা শুনেছেন, যেটার দেয়ালে বুক অব দ্য ডেড-এর উদ্ধৃতি নেই? কিংবা খোদাই করা পাথরে ব্যাখ্যা করা হয়নি কিভাবে সাতটা তোরণ পেরিয়ে স্বর্গে পৌঁছুতে হয়?'

হতচকিত দেখাল রানাকে। এই ব্যাপারটা ভেবে দেখেনি ও। আপাতত আলোচনা থামিয়ে পবিত্র স্ট্যাচুগুলোর প্যাকিং করার কাজ কতটুকু এগোল দেখতে চলে এল গ্যালারির শেষ মাথায়। ইংল্যান্ড ত্যাগ করার আগেই একটা ব্যাপার নিশ্চিত করেছিল রানা, মূল্যবান ও ভঙ্গুর ইকুইপমেন্ট প্লেনে করে গিরিখাদে পৌঁছুনো হবে মেটাল অ্যামুনিশনের বাক্সে ভরে। এই বাক্স বা ক্রেট ওয়াটারপ্রুফ রাবার সীল দিয়ে মোড়া, ভেতরে নরম প্যাড লাগানো আছে। ওই ক্রেট সযত্নে রেখে দেয়া হয়েছিল, সমাধির ভেতর ট্রেজার পাওয়া গেলে কাজে লাগবে ভেবে। ছোট স্ট্যাচু ক্রেটে ভালভাবেই ঢুকল, কিন্তু শয়তান সেথ আর গাভী হাথোর-এর মূর্তি আকারে এত বড় যে ঢোকানো গেল না। তারপর রানা আবিষ্কার করল, এই মূর্তি দুটো কয়েক ভাগে বিভক্ত—মাথা আলাদা করা যায়, আলাদা করা যায় গাভীর চারটে পাও। এরপর আর ওগুলোকে ক্রেটে ভরতে কোন অসুবিধে হলো না।

টোরা নাবু প্যাকিং-এর দায়িত্বে রয়েছে। তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে নিমার কাছে আবার ফিরে এল রানা। ওকে দেখেই নিমা বলল, 'রানা, শিলালিপি নিয়ে কাজ করার জন্যে আমাকে আপনি কতটা সময় দিতে পারেন?'

'খুব বেশি হলে এক কি দু'হপ্তা,' বলল রানা। ইস্কান্দার গাউসের সঙ্গে কথা বলে দেখা করার একটা দিন-তারিখ ঠিক করে নেব আমি। সেই তারিখে জোজিরেস এয়ারস্ট্রিপে পৌঁছুবেন তিনি, ওখানে তখন আমাদেরকে থাকতেই হবে।'

'এখান থেকে আপনি ইস্কান্দারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন কিভাবে?'

'ডেবরা মারিয়ামে একটা পাবলিক টেলিফোন আছে, পোস্ট অফিসে,' বলল রানা। 'রুবি তো গোজামের যে-কোন জায়গায় অনায়াসে ঘোরাফেরা করতে পারে। একদল সন্ন্যাসী থাকবে এসকর্ট হিসেবে, এসকার্পমেন্টে উঠে ব্রিটিশ ধর্মযাজকের ব্যারি গরডনের সঙ্গে যোগাযোগ করবে রুবি, গরডন মেসেজটা পৌঁছে দেবে ইস্কান্দারের কাছে।'

'কবে যাবে রুবি?'

'শাফি বলেছে, কাল। মাল্টা থেকে প্লেন নিয়ে রওনা হবার জন্যে গাউসকে সময় দেয়া দরকার,' বলল রানা। 'টাইমিংটা এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা পৌঁছুলাম, কিন্তু প্লেন পৌঁছুতে দেরি হলো, কিংবা প্লেন পৌঁছুল, আমরা পৌঁছুতে দেরি করলাম—এরকম হলে বিপদ ঘটতে পারে।'

'পয়লা এপ্রিল ভোরবেলা,' রুবিকে মেসেজটা দিল রানা। 'ইস্কান্দারকে তুমি বলবে, এপ্রিল ফুলস' ডে-র ভোরবেলা ওঁকে পৌঁছুতে হবে রঁদেভোয়। তারিখটা মনে রাখতে সুবিধে হবে।'

সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তখুনি রওনা হয়ে গেল রুবি। বেশ খানিক দূর চলে গেছে সে, হঠাৎ নিমা বলল, 'ওকে একটা কথা জিজ্ঞেস করার আছে!' ছুটল ও। 'এই রুবি! রুবি, দাঁড়াও!'

আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘের ঘনঘটা দেখে গম্ভীর হয়ে উঠল রানা।

দাঁড়িয়ে পড়েছে রুবি, হাঁপাতে হাঁপাতে তার কাছে পৌঁছুল নিমা। ওরা দু'জন

কথা বলছে, আবার এসকার্পমেন্টের ওপর আকাশের দিকে তাকাল রানা, ভাবছে সময়ের আগেই না বর্ষা শুরু হয়ে যায়। তারপর আবার যখন ওদের দিকে তাকাল, দেখল রুবির হাতে কি যেন একটা গুঁজে দিল নিমা। শার্টের পকেটে সেটা গুঁজে মাথা ঝাঁকাল রুবি, তারপর আবার সন্ন্যাসীদের পিছু নিয়ে রওনা হয়ে গেল। নিমা ফিরে আসতে রানা জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার, নিমা?'

'মেয়েদের অনেক গোপন ব্যাপার থাকে,' জবাব দিল নিমা। 'সব কথা জিজ্ঞেস করতে হয় না।' তারপর হেসে উঠে বলল, 'পরডনের মাধ্যমে মামিকে একটা মেসেজ পাঠাতে বললাম রুবিকে, জানাতে চাই আমি ভাল আছি।'

উত্তরটা রানাকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। মায়ের ফোন নম্বর রুবিকে দেয়ার জন্যে আগেই একটা কাগজে লিখে রেখেছিল নিমা? তাহলে সবার সামনে কেন রুবিকে দিল না? ঠিক আছে, সিদ্ধান্ত নিল রানা, রুবি ফিরে এলে আসল ব্যাপার জেনে নেবে ও।

টানেলের ভেতর সিঁড়িটার গোড়ায় ওয়ার্কশপ তৈরি করেছে ওরা। টোরা নাম্র একটা টেবিল বানিয়ে দিয়েছে, তাতে নিমার ড্রইং, বই, ফটোগ্রাফ ইত্যাদি ছড়ানো। মারটিন একটা ফ্লাড-লাইটেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছে। পাশের দেয়ালে আটটা ক্রেটে রয়েছে দেব-দেবীদের মূর্তি। সিঙ্ক-হোলের ওপর ভাসমান সেতুতে কমান্ডার শাফির সশস্ত্র গেরিলারা চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিচ্ছে। টেবিলে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করতে হচ্ছে নিমাকে– ফটোগ্রাফ পরীক্ষা, দেয়ালচিত্রের মাপজোক, শিলালিপির অনুবাদ, কাজের কোন শেষ নেই। কোন কোন দিন একটানা পনেরো ঘণ্টাও কাজ করে। এক পর্যায়ে রেগে যায় রানা, হুকুমের সুরে ঘুমাতে যেতে বলে।

আজও ঠিক তাই ঘটল। ধমক খেয়ে টানেল থেকে বেরিয়ে চওড়া কার্নিসে চলে এল নিমা, এখানেই ওদের ক্যাম্প ফেলা হয়েছে। মশারি আগেই টাঙানো হয়েছে, ভেতরে ঢুকে স্লীপিং ব্যাগে আশ্রয় নিল। একটু দূরে রানাও শুলো।

মাত্র তিন ঘণ্টা পর সকাল হয়ে গেল। ঘুম ভাঙার পর নিমাকে ওর মশারির ভেতর দেখতে পেল না রানা। দ্রুত দাড়ি কামাল ও। মাখন, রুটি আর সেদ্ধ ডিম খেলো। হাতে দু'কাপ কফি নিয়ে টানেলে ঢুকল, সেতু পেরিয়ে সিঁড়ির মাথায় উঠে এল। গ্যালারিতে পৌঁছে দেখল অসিরিস-এর খালি শ্রাইনের সামনে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে কি যেন দেখছে নিমা। বাম হাতের গরম কাপটা ওর বাহুতে ঠেকাতে চমকে উঠল ও। রেগে গিয়ে বলল, 'আমাকে আপনি ভয় পাইয়ে দিয়েছেন!'

'কি দেখছেন?' জানতে চাইল রানা, নিমার বাড়ানো হাতে ধরিয়ে দিল কাপটা। 'কি আবিষ্কার করলেন?'

'বলতে হলে দেখাতে হবে,' জবাব দিল নিমা। 'আসুন আমার সঙ্গে।' রানাকে নিয়ে সিঁড়ির গোড়ায়, নিজের ওয়ার্কশপে নেমে এল ও। 'কয়েকদিন ধরে আমি শুধু ট্যানাস-এর সমাধিতে পাওয়া ফলকের এক পাশের লিপি অনুবাদ করেছি। সবই মূল বই থেকে নিয়ে খোদাইকরা, একটা লাইনও টাইটার নয়। সব আমি নোটবুকে লিখে রেখেছি।' নোটবুকটা রানাকে দেখাল ও, তারপর একপাশে সরিয়ে রাখল। দ্বিতীয় নোটবুকটা হাতে নিল। 'এটায় আছে ফলকের চতুর্থ পাশের

লিপির নকল। এগুলোর অর্থ আমি জানি না। শুধু সংখ্যার লম্বা তালিকা। সম্ভবত কোন ধরনের কোড বা সঙ্কেত। তবে এ-ব্যাপারে আমার একটা আইডিয়া আছে, সে-প্রসঙ্গে পরে আসছি।

'এবার এটা দেখুন,' বলে তৃতীয় একটা নোটবুক হাতে নিল নিমা। 'এখানে রয়েছে ফলকের তৃতীয় দিকটায় যে লিপি পাওয়া গেছে তার অনুবাদ। এগুলো উদ্ধৃতি হতে পারে না, কারণ প্রাচীন কোন ক্লাসিক্যাল বইতে এ-সব আমি পাইনি। এগুলোর বেশির-ভাগই, আমার ধারণা, টাইটার লেখা। সে যদি আরও কোন সূত্র রেখে গিয়ে থাকে, এই লিপির মধ্যেই পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।'

দুষ্ট ক্ষীণ হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'এটা সেই অংশ না, দেবীর লালচে আর ব্যক্তিগত পার্টসের বিশদ বর্ণনা দেখা হয়েছে?'

নোটবুক থেকে মুখ তুলতে পারল না নিমা। 'আপনি দেখছি ভোলাব বান্দা নন।' সামান্য একটু লালচে হলো ওর চেহারা। 'ফলকের তৃতীয় দিকের মাথায় কি লেখা ছিল দেখুন। টাইটা এদিকটার নামকরণ করেছে, স্বরং; সবচেয়ে আগে এটাই আমার চোখে পড়েছিল।'

সামনের দিকে ঝুঁকে হায়ারোগ্লিফিক্স পড়ল রানা, পড়ছি– 'ষাঁড় চতুষ্টয়ের প্রোটোকল মেনে নিয়ে মহান দেবতা অসিরিস প্রথম চাল দিলেন"। হ্যাঁ, এই অংশটুকু আগেও পড়েছি আমি। টাইটা নাও খেলার কথা বলছে এখানে, খেলাটা সে সাংঘাতিক ভালবাসত।'

'হ্যাঁ,' বলল নিমা। 'এবার বলুন, আমি যে স্বপ্নটার কথা বলেছিলাম, তা কি আপনার মনে আছে? যে স্বপ্নে হাসলান চাচাকে সমাধির একটা চেম্বারে দেখি আমি?'

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'মনে করিয়ে দিলে খুশি হই।'

'সেই স্বপ্নে চাচা আমাকে বলেন, "ষাঁড় চারটের আচরণ-বিধি মনে রাখবে–শুরু করবে প্রথম থেকে"।'

'খেলাটা সম্পর্কে আমি বিশেষজ্ঞ নই। স্বপ্নে তিনি আপনাকে ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছিলেন?'

'খেলাটার নিয়ম বা কৌশল এত হাজার বছর পর হারিয়ে গেছে; তবে আপনি জানেন, এগারো আর সতেরোতম সাম্রাজ্যের সমাধির ভেতর পাওয়া জিনিস-পত্রের সঙ্গে বাও রেকর্ডও ছিল, তা থেকে ধরে নেয়া চলে যে দাবা খেলারই অনুন্নত সংস্করণ ছিল সেটা।' নোটবুকের খালি একটা পাতায় স্কেচ আঁকল নিমা। 'কাঠের বোর্ড, মেলা হত দাবার বোর্ডের মত করে, ঘুঁটি হিসেবে থাকত আট সারি চওড়া কাপ, আট সারি গভীর কাপ। ওগুলো ছিল রঙিন পাথর, প্রত্যেকের আচরণ নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা। বিশদ ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না, তবে প্রথমেই চারটে ষাঁড়ের চাল দেয়া টাইটার মত প্রতিভাবান খেলোয়াড়দেরই শোভা পায়। এই চালের অর্থ হলো, কিছু ঘুঁটি বিসর্জন দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রথম সারির কাপগুলোকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, যাতে বোর্ডের মাঝখানটায় প্রভাব বিস্তার করা যায়।'

'বলে যান, শুনছি।'

'ছকের প্রথম সারির কাপ,' ইঙ্গিতে স্কেচটা দেখাল নিমা। 'চাচা বলেছেন,

প্রথম থেকে শুরু করবে।' আর টাইটা বলেছে, মহান অসিরিস প্রথম চাল দিলেন।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'আসুন আমার সঙ্গে,' বলে নোটবুক হাতে সাদা প্লাস্টার করা দরজার হ্যাচ দিয়ে ভেতরে ঢুকল নিমা, দাঁড়াল অসিরিস-এর শ্রাইন-এর কাছে। 'প্রথম চাল। শুরু।' গ্যালারির দিকে মুখ করল ও। 'এটা প্রথম শ্রাইন। সব মিলিয়ে ক'টা শ্রাইন?'

'আটটা।'

'বাহ্, মাসুদ রানা দেখছি গুনতেও জানেন!'

'আটটা ওপর-নিচে, আটটা আড়াআড়ি...' থেমে গেল রানা, নিমার দিকে তাকিয়ে আছে। 'তারমানে আপনি বলতে চাইছেন–'

জবাব না দিয়ে নোটবুকটা খুলল নিমা। 'এখানে যে সংখ্যা আর সঙ্কেত রয়েছে, অর্থবহ ভাষায় রূপান্তর করা সম্ভব নয়। একটার সঙ্গে আরেকটার কোন রকম সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। শুধু একটা ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি, তালিকায় এমন কোন সংখ্যা নেই যেটা আট-এর চেয়ে বড়।'

'কি যেন বুঝেও বুঝতে পারছি না।'

'আজ থেকে চার হাজার বছর আগে কেউ যদি দাবার চাল ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করত, সে কি এভাবে সংখ্যা সাজিয়ে রাখত না?'

'নারী হলনাময়ী! আপনি বলতে চাইছেন, টাইটা আমাদের সঙ্গে বাও খেলা খেলছে।'

'হ্যাঁ, আর প্রথম শ্রাইনটাই টাইটার প্রথম চাল।'

'কিন্তু খেলার নিয়ম যেখানে জানি না, টাইটার সঙ্গে এই খেলা আমরা খেলব কিভাবে?' জানতে চাইল রানা।

হেস ডুগার্ড ডেকে পাঠিয়েছেন, গর্বিত ভঙ্গিতে কনফারেন্স রুমে ঢুকলেন কর্নেল জুলিয়াস ঘুমা। পিছু নিয়ে ঢুকলেন কারিফ ফারুকীও, তিনিও নিজের গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে চেহারায় ভাবগাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলেছেন। ক্যান্ডি ক্যাম্পবেলের সঙ্গে কথা বলছিলেন ডুগার্ড, ওদেরকে দেখে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন, এগিয়ে এলেন দ্রুত। ফারুকীকে যেন দেখতেই পাননি, কর্নেলকে প্রশ্ন করলেন, 'কাল আমাকে রিপোর্ট দেয়ার কথা ছিল। খাদ থেকে আপনার ইনফরমার কোন মেসেজ পাঠায়নি?'

এক নিমেষে চুপসে গেলেন কর্নেল ঘুমা। জার্মান বিলিওনিয়ারকে খুব ভয় পান তিনি। 'দেরি হবার জন্যে দুঃখিত, হের ডুগার্ড। রানার ক্যাম্প থেকে মেয়েগুলো ফিরতে দেরি করে ফেলেছে।'

'বুঝলাম, কিন্তু খবর পেতে দেরি হলে আমার তো চলবে না,' কর্কশ সুরে বললেন ডুগার্ড। 'রিপোর্ট দিন।'

'রানা বাঁধের কাজ শেষ করেছেন সাতদিন আগে। ভাটির দিকে সরে গেছেন তিনি, ঝুলন্ত মাচা বানিয়ে নালায় নেমেছেন। আমার ইনফরমার জানিয়েছে, খালি পুলের তলায় একটা ফাঁক পরিষ্কার করছে ওরা।'

'একটা ফাঁক? কি ধরনের ফাঁক?' অসুস্থ দেখাল হেস ডুগার্ডকে।

'গর্ত বা ফাটল হবে...'

'ব্যাখ্যা করুন, বর্ণনা দিন!' ধৈর্য হারিয়ে চিৎকার করছেন ডুগার্ড।

'যে মেয়ে মেসেজটা নিয়ে এসেছে তার মাথায় খুব একটা বুদ্ধি নেই, হের ডুগার্ড,' বললেন ঘুমা। 'পানি সরে যাবার পর পুলের তলায় নাকি একটা ফাঁক বা গর্ত দেখা গেছে। আবর্জনায় ভরা ছিল।'

'ওটা একটা টানেল!' হিসহিস করে উঠলেন ডুগার্ড। 'সমাধির ভেতর ঢোকার পথ পেয়ে গেছেন ওঁরা। আর কি দেখেছে সে?'

'মেয়েটা বলছে, ফাঁকটার ভেতর একটা গুহা আছে। পাথরের কুলুঙ্গি আর দেয়ালচিত্র আছে...'

'ওহ্, গড! দেয়ালচিত্র মানে কি? ক্রিশ্চান সেইন্টদের ছবি?'

ফারুকী বললেন, 'তা সম্ভব নয়, হের ডুগার্ড। আমি আপনাকে বলছি, মাসুদ রানা ফারাও মামোসের সমাধি আবিষ্কার করেছেন।'

'আপনি চুপ থাকুন!' হুঙ্কার ছাড়লেন ডুগার্ড। কর্নেলের দিকে ফিরলেন তিনি। 'মেয়েটা কি বলেছে সব আমাকে জানান।'

'দেয়ালচিত্র আর স্ট্যাচুর কথাই শুধু বলেছে, হের ডুগার্ড। দুঃখিত।'

'স্ট্যাচু? স্ট্যাচুও?' উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ডুগার্ড। 'স্ট্যাচুগুলো কি সরিয়ে এনেছেন রানা?'

'বাক্সে ভরেছেন,' বললেন ঘুমা।

'রানা কি শ্রাইনে কোন মমি পাননি?'

'আমি জানি না, হের ডুগার্ড। মেয়েটা আর কিছু বলতে পারেনি।'

'কোথায় সে? আমার কাছে আনুন তাকে। আমি নিজে তাকে জেরা করতে চাই।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে গ্রাম্য এক তরুণীকে কনফারেন্স রুমে নিয়ে আসা হলো। তার মুখে লাল আর কালো কালি দিয়ে ডোরা কাটা দাগ, পরনে ঢোলা আলখেল্লা, কাঁকালে দুধের বাচ্চা। আলখেল্লা সরিয়ে স্তনের বোঁটাটা বাচ্চার মুখে পুরে দিল সে। শিশু ও মা ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডুগার্ডের দিকে।

'ওকে জিজ্ঞেস করুন কুলুঙ্গি বা শ্রাইনে কোন কফিন ছিল কিনা।'

এক মিনিট মেয়েটির সঙ্গে কথা বললেন কর্নেল। তারপর ডুগার্ডকে জানালেন, 'বোকা মেয়েলোক। বলছে, লাশ সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। তবে স্ট্যাচুগুলো বাক্সে ভরা হয়েছে। ওগুলো পাহারা দিচ্ছে একদল সৈনিক।'

'সৈনিক? সৈনিক মানে?'

'ও আসলে অ্যালান শাফির গেরিলাদের কথা বলতে চাইছে,' ব্যাখ্যা করলেন ঘুমা। 'কমান্ডার শাফি এখনও রানার সঙ্গে আছেন।'

'মোট ক'টা বাক্স? ক'টা স্ট্যাচু?' জানতে চাইলেন ডুগার্ড।

কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন মেয়েটিকে। তারপর ডুগার্ডকে বললেন, 'পাঁচটার কম নয়, দশটার বেশি নয়। ও ঠিক জানে না।'

'একেকটা কত বড়?'

কর্নেলের প্রশ্ন শুনে একটা হাত পুরোপুরি লম্বা করে দেখাল মেয়েটি।

ডুগার্ড বললেন, 'সংখ্যায় এত কম? আকারে এত ছোট?' জানালার সামনে এসে বাইরে তাকালেন তিনি। 'মেয়েটা যদি মিথ্যে কথা না বলে, রানা এখনও মামোসের ট্রেজার আবিষ্কার করতে পারেননি। আরও অনেক বেশি থাকার কথা।'

মেয়েটির সঙ্গে এখনও কথা বলছেন কর্নেল ঘুমা। ডুগার্ডের দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'ও বলছে, রুবি নামে একটা মেয়ে রানার ক্যাম্প থেকে ডেবরা মারিয়ামে গেছে, সঙ্গে আছে সন্ন্যাসীদের একটা দল। মেয়েটিকে আমি চিনি, হের ডুগার্ড। এক রাশিয়ান শিকারীকে বিয়ে করেছিল, এখন অবশ্য শাফির মনোরঞ্জন করছে।'

ছুটে মেয়েটির সামনে ফিরে এলেন ডুগার্ড। 'রুবি? ডেবরা মারিয়াম? কেন, ডেবরা মারিয়ামে কি করছে সে?'

প্রশ্ন শুনে মাথা নাড়ল মেয়েটি। তারপর অ্যামহ্যারিক ভাষায় কিছু বলল। কর্নেল জানালেন, 'ও বলছে, কি করছে তা ও জানে না, তবে এখনও সে ডেবরা মারিয়ামে আছে।'

'মেয়েতে দুধ মেশাচ্ছে! ভাগান ওকে, তাড়ান!' ঘৃণায় মুখ কোঁচকালেন ডুগার্ড। মেয়েটা চলে যেতে কর্নেলকে তিনি বললেন, 'এই রুবি সম্পর্কে আর কি জানেন বলুন আমাকে।'

'আদ্দিস আবাবার অভিজাত পরিবারের মেয়ে সে,' বললেন ঘুমা। 'ওদের পরিবারের সঙ্গে সম্রাট হাইলে সেলাসির রক্তের সম্পর্ক আছে বলে শোনা যায়।'

সে যদি গেরিলা কমান্ডার শাফির মেয়েমানুষ হয়, আর যদি রানার ক্যাম্প থেকে এসে থাকে, 'আমরা তার কাছ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারি,' বললেন ডুগার্ড। 'কাজেই তাকে আমি চাই।'

'প্রভাবশালী পরিবারের মেয়ে, কিডন্যাপ করে আনলে সমস্যা হতে পারে,' চিন্তিত দেখাল কর্নেলকে। 'তবে আমি তাকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার খাতিরে গ্রেফতার করে আনতে পারি। আর সে যদি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারে, তাকে আদ্দিস আবাবায় ফিরে যেতে দেয়া যাবে না। ওদের পরিবার আমাদের জন্যে বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে।'

'আপনার পরামর্শ কি?' জানতে চাইলেন ডুগার্ড।

'জেরা করার পর ছোট একটা অ্যাক্সিডেন্ট।'

'যা ভাল বোঝেন করবেন,' বললেন ডুগার্ড। 'তবে কোন কাজেই আমি খুঁত দেখতে চাই না।'

দুই

অসিরিস-এর শ্রাইন আরও একটা দিন পরীক্ষা করল ওরা। এখন এমনকি চোখ বুজেও শ্রাইনের ওপর দেয়ালচিত্রগুলো পরিষ্কার দেখতে পায় ওরা। এরপর

ট্যানাস-এর সমাধিতে পাওয়া ফলকের লিপিগুলো মুখস্থ করে ফেলল, নিমার নোটবুকে লেখা অনুবাদ পড়ে। একজন পড়ে, অপরজন দেয়ালচিত্রের দিকে তাকিয়ে মিল বা তাৎপর্য খোঁজার চেষ্টা করে।

'আমার প্রেম উত্তপ্ত মরুভূমিতে ফ্লাস্ক ভর্তি ঠাণ্ডা পানি। আমার প্রেম বাতাসে পতপত করা পতাকা। আমার প্রেম সদ্যোজাত শিশুর প্রথম ক্রন্দন।'

দেয়াল থেকে চোখ নামিয়ে হাসল নিমা। 'টাইটা মাঝে মধ্যে খুব রোমান্টিক হয়ে পড়ে।'

'কাজে মন লাগান। এখানে আমরা কাব্যচর্চা করতে আসিনি।'

'নীরস,' বিড়বিড় করল নিমা, তবে আবার চোখ তুলল দেয়ালে।

'আমি ভুগেছি আবার ভালবাসাও পেয়েছি; ঝড়-ঝাপটা আমাকে টলাতে পারেনি। তীর আমার মাংসভেদ করে গেছে, কিন্তু কোন ক্ষতি করতে পারেনি। সামনে পড়ে থাকা সরল অথচ ভুল পথ আমি এড়িয়ে গেছি। আমি গোপন সিঁড়ি ধরেছি, পৌঁছে গেছি দেবতাদের আসন পর্যন্ত।'

লম্বা গ্যালারি ধরে সামনে তাকাল নিমা। 'এই কথাগুলোর মধ্যে কিছু থাকতে পারে। "সামনে পড়ে থাকা সরল অথচ ভুল পথ...গোপন সিঁড়ি"?' কপাল থেকে চুল সরাল ও। 'নাহ, রানা, আমার আর ধৈর্যে কুলাচ্ছে না। কোত্থেকে শুরু করব তাই তো বুঝতে পারছি না।'

'ধৈর্য হারালে চলবে কেন,' বলল রানা, হাসল। 'আসুন, আপনার বন্ধুর মত প্রথম থেকে শুরু করি। পড়ছি আবার, কেমন? "প্রকাণ্ড ডানায় ভর দিয়ে শকুন আকাশে উড়ল সূর্যকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে"—'

রানার দিকে তাকিয়ে হাসতে যাবে নিমা, হঠাৎ সামনের দেয়ালে চোখ পড়তে স্থির হয়ে গেল। 'শকুন!' বলে হাত তুলে রানার পিছনের দেয়ালটা দেখাল। ঘুরে সেদিকে তাকাল রানা।

ওদিকে একটা শকুন রয়েছে, ছবিটা এত সুন্দর যে কোন তুলনা হয় না। সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে যেন আগুন ঝরছে, হলুদ ঠোঁট বাঁকা ও ছুঁচাল। ডানাগুলো পুরোপুরি মেলা, প্রতিটি পালকের কিনারা বহুমূল্য পাথরের আকৃতিতে রঙ করা। প্রায় রানার মতই লম্বা পাখিটা, তবে মেলে দেয়া ডানা অর্ধেক দেয়াল দখল করে রেখেছে। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সরাসরি মাথার ওপর সিলিঙে তাকাল নিমা, তারপর রানার বাহু ছুঁয়ে ওকেও তাকাবার তাগিদ দিল।

'সূর্য,' ফিসফিস করল নিমা। বাঁকা সোনালি সূর্য-চাকতি আঁকা হয়েছে গম্বুজ আকৃতির ছাদের সবচেয়ে উঁচু অংশে। সূর্যের আভা যেন ছায়াগুলোকে আলোকিত করে রেখেছে। রশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে সম্ভাব্য সবগুলো দিকে, তবে একটা রশ্মি দেয়ালের মোচড় খাওয়া অংশ অনুসরণ করে নেমে এসে আলোকিত করে রেখেছে শকুনটাকে। 'সূর্যকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে আকাশে উড়ল শকুন,' আবার বলল নিমা। 'টাইটা কি আক্ষরিক অর্থেই বলেছে কথাটা?'

সামনে এগিয়ে এসে দেয়ালচিত্রটা গভীর মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করল রানা, হাত বুলাল ডানা, পেট আর বাঁকা ঠোঁটের ওপর। প্লেইস্টের নিচে প্লাস্টার করা দেয়াল মসৃণ। হাতে কিছুই ঠেকে না।

'মাথাটা, রানা! মাথাটা দেখুন!' লাফ দিয়ে শকুনের মাথা ছুঁতে চাইল নিমা, কিন্তু নাগাল পেল না। 'আপনি চেষ্টা করুন।'

এবার রানাও শকুনের মাথার একপাশে সূক্ষ্ম একটা ছায়া দেখতে পেল, যেখানে ফ্লাডলাইটের আলো ক্ষীণ বাধা পেয়েছে। হাত তুলে স্পর্শ করার পর বুঝতে পারল দেয়ালের যে অংশে মাথাটা আঁকা হয়েছে সেটা দেয়ালের অন্যান্য অংশের চেয়ে চুল পরিমাণ ফুলে আছে। 'ফোলা একটু ভাব থাকলেও, কোন জয়েন্ট আছে বলে তো মনে হচ্ছে না,' নিমাকে বলল ও। 'একদম মসৃণ, একটা দেয়ালেরই অংশ মনে হচ্ছে।'

'চাপ দিন! চাপ দিন! শকুনের মাথাটা সূর্যের দিকে ঠেলুন!' তাগাদা দিল নিমা।

মাথায় তালু ঠেকিয়ে তাই করল রানা। 'কই, কিছুই তো ঘটছে না!'

'চার হাজার বছর ধরে এঁটে বসে আছে, জোর খাটান!'

জোর খাটাল রানা। হতাশ দেখাল ওকে। 'এ নিরেট দেয়াল, নড়বে না!'

'আমাকে তুলুন। আমাকে দেখতে দিন।' নিমার কথামত ওর কোমরে দু'হাত রেখে ওপরে তুলল রানা। আঙুলের ডগা দিয়ে পরীক্ষা করছে নিমা। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'রানা! কিছু একটা ঘটিয়ে ফেলেছেন আপনি! মাথার চারপাশের আউটলাইনের রঙে ফাটল ধরেছে। আঙুলে অনুভব করছি। আরও ওপরে তুলুন আমাকে।'

নিমাকে আরও একটু ওপরে তুলল রানা।

'হ্যাঁ, কোনই সন্দেহ নেই!' উল্লাসে কেঁপে গেল নিমার গলা। 'কিছু একটা নড়ে গেছে। মাথার উপর দেয়ালে সরু চুলের মত খাড়া ফাটলও দেখতে পাচ্ছি। আপনি নিজেই দেখুন!'

খালি অ্যামুনিশনের একটা ক্রেট এনে শকুনটার নিচে রাখল রানা, সেটার ওপর উঠে দাঁড়াতে শকুন আর ওর চোখ একই লেভেল থাকল। চেহারা বদলে গেল ওর। পকেট নাইফ বের করে মাথাটার আউটলাইনের ফাটলে ফলাটা ঢোকাল। রঙ আর প্লাস্টার খসে পড়ছে গ্যালারির মেঝেতে। 'মনে হচ্ছে মাথাটা আলাদা একটা অংশ,' স্বীকার করতে হলো ওকে। ওটার ওপর খাড়া একটা চিড়-ও এখন দেখতে পাচ্ছে রানা, তাতে ছুরির ফলা ঢুকিয়ে এদিক ওদিক চাপ দিতে তিন ফুট প্লাস্টার খসে পড়ল। টাইলের মেঝেতে পড়া মাত্র মিহি ধুলোয় পরিণত হলো সেটা। দেয়ালে একটা ফাটল তৈরি হয়েছে। 'একটা খাঁজ বলে মনে হচ্ছে। পুরোটা পরিষ্কার করলে বোঝা যাবে আসলে কি।'

নিচে আরও প্লাস্টার খসে পড়ল। হাঁচি দিচ্ছে নিমা। কিন্তু জায়গা ছেড়ে নড়ছে না।

'হ্যাঁ, খাড়া একটা খাঁজই বটে, ওপর দিকে উঠে গেছে,' বলল রানা। এরপর শকুনের মাথার আউটলাইন থেকে প্লাস্টার খসাতে শুরু করল ও। 'মাথাটা এখন মুক্ত,' কাজটা শেষ করে বলল। 'দেখে মনে হচ্ছে খাঁজ ধরে ওপর দিকে ওঠানো যাবে এটাকে। চাপ দিয়ে দেখব?'

'একশো বার! হাজার বার!' রুদ্ধশ্বাসে বলল নিমা।

শকুনের মাথার নিচে দুই হাতের তালু ঠেকিয়ে চাপ দিল রানা। চোখ-মুখ কুঁচকে উঠল ওর। সেই সঙ্গে নিমারও, যেন রানার সঙ্গে সে-ও চাপ দিচ্ছে।

নরম একটা ঘষা খাওয়ার আওয়াজ হলো, মৃদু ঝাঁকি খেতে খেতে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে মাথাটা। খাঁজের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল ওটা। লাফ দিয়ে বাক্স থেকে নেমে পড়ল রানা।

দু'জনেই ওরা বিচ্ছিন্ন মাথাটার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকল। দীর্ঘ রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষার পর ফিসফিস করল নিমা, 'কই, কিছুই তো ঘটছে না!'

'ফলকের বাকি লেখা কি বলে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তাই তো!' দেয়ালের চারদিকে চোখ বুলাল নিমা, তারপর মুখস্থ বলে গেল, 'আরও লেখা আছে–"শিয়াল ডেকে উঠে লেজের দিকে ঘুরে গেল"।' খুদে আনুবিস-এর ছবির দিকে কাঁপা একটা হাত তুলল ও, কবরস্থানের দেবতা আনুবিস-এর মাথাটা শিয়ালের। শকুনের ঠিক উল্টোদিকে রয়েছে তাঁর ছবিটা, অসিরিস-এর প্রকাণ্ড ছবির নিচে। সেদিকে ছুটল নিমা, শিয়ালের মাথায় তালু রেখে চাপ দিল। কিন্তু কোন লাভ হলো না।

'সরুন, আমি দেখছি,' বলে ছুরির ফলা দিয়ে শিয়ালের মাথার চারপাশ থেকে প্লাস্টার খসাল রানা। তারপর নতুন করে চাপ দিল। শুধু মাথা নয়, গোটা ছবিটা ঘুরে যেতে শুরু করল, যতক্ষণ না কালো হলুদ টাইলসের দিকে ফিরল।

দু'জনেই পিছিয়ে এসে তাকিয়ে থাকল, প্রত্যাশায় চকচক করছে দু'জোড়া চোখ। কিন্তু এবারও কিছু ঘটল না।

'ফলকে আরও একটা কথা লেখা আছে,' বিড়বিড় করল নিমা। 'মনে পড়ে? "নদী জমিনের দিকে গড়ায়। পবিত্র স্থানের অমর্যাদাকারীরা সাবধান, তোমাদের ওপর সমস্ত দেবতার অভিশাপ নেমে আসবে"।'

'নদী? আমি তো দেয়ালে কোন নদী দেখছি না!'

দেয়ালে তন্নতন্ন করে খুঁজছে নিমা। 'পেয়েছি! হাপি!' উত্তেজনায় সরু ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল কণ্ঠস্বর। 'নীলনদের দেবতা! নদী!'

মহান দেবতা অসিরিস-এর মাথার সঙ্গে একই লেভেলে রয়েছেন নদীর দেবতা। হাপি উভলিঙ্গ, বুকে স্তন আছে, ফোলা পেটের নিচে পুরুষের জননেন্দ্রিয়। মাথাটা জলহস্তীর, হাঁ করা, চোয়ালের ভেতর বিশাল গহ্বর দেখা যাচ্ছে।

কয়েকটা অ্যামুনিশন ক্রেটের ওপর দাঁড়িয়ে হাত লম্বা করল রানা, ছুঁতে পারল হাপিকে। পরীক্ষা করার পর বলল, 'এটাও আলাদা করা সম্ভব বলে মনে হচ্ছে।'

'নদী জমিনের দিকে গড়ায়, রানা। তারমানে নিচের দিকে নামবে ওটা। টানুন, রানা।'

'আগে কিনারাগুলো পরিষ্কার করতে দিন।' কাজটা শেষ করতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। ছুরিটা পকেটে রেখে দিয়ে রানা বলল, 'এবার কিছু একটা ঘটবে বলে মনে হচ্ছে। তৈরি থাকুন। আমার জন্যে একটু দোয়াও করতে পারেন।'

দেবতার ছবিতে দু'হাতের তালু রেখে নিচের দিকে চাপ দিল রানা, ধীরে

ধীরে শক্তি বাড়াচ্ছে। কিন্তু কিছুই নড়ল না। 'কাজ হচ্ছে না।'

'দাঁড়ান, আমি আসছি!' বাক্সের ওপর উঠে রানার পিছনে দাঁড়াল নিমা, ওর দুই কাঁধের ওপর দিয়ে সামান্য বাড়াল হাত দুটো, দেবতার ছবির ওপর তালু।

দু'জন মিলে চাপ দিচ্ছে। 'আরে, নড়ছে দেখছি!' হঠাৎ করে হাপির ছবি আলগা হয়ে গেল; ছুটে গেল ওদের হাত থেকে, তীক্ষ্ণ ঘষা খাওয়ার শব্দের সঙ্গে খাঁজ ধরে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নেমে এল।

ভারসাম্য হারিয়ে ফেলায় বাক্স সহ নিচে পড়ে গেল ওরা, রানার পিঠে বসে আছে নিমা। এক মুহূর্ত পর দু'জনেই লাফ দিয়ে সিধে হলো।

'কি ঘটল?' জিজ্ঞেস করল নিমা, তারপরই ঝট করে ছাদের দিকে তাকাল। ওপর থেকে গুরুগম্ভীর একটা আওয়াজ ভেসে আসছে। 'কি ঘটছে বলুন তো?' ওর গলায় আতঙ্ক। দু'জনেই মুখ তুলে ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখের ভুল, নাকি সত্যিসত্যি গোটা ছাদ নড়ছে?

'শব্দটা ভৌতিক লাগছে না?' ফিসফিস করল রানা, 'যেন ছাদের কোথাও বিশাল কোন প্রাণী নড়াচড়া করছে?'

আওয়াজটা ক্রমশ বাড়ছে। মেঘ ডাকার মত গড়গড় করছে গোটা ছাদ। পাহাড় ধসের সঙ্গে অনেকটা মেলে। তারপর কামান দাগার মত বিকট শব্দ হতে লাগল।

উঁচু সিলিঙে একটা ফাটল ধরল, গ্যালারির পুরো দৈর্ঘ্য জুড়ে; আঁকাবাঁকা ফাটলটা থেকে ধুলোর মেঘ নেমে আসছে। তারপর, ধীরগতি দুঃস্বপ্নের মত, ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সরাসরি তার ওপরের ছাদটা ধসে পড়তে শুরু করল।

'টাইটার সতর্কবাণী!' চেঁচিয়ে উঠল নিমা। 'দেবতাদের অভিশাপ!' স্তম্ভিত বিস্ময়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ও, নড়ার শক্তি নেই।

খপ করে ওর একটা হাত ধরে টান দিল রানা। 'ছুটুন! বাঁচতে চাইলে ছুটুন!' নিমাকে নিয়ে খেঁচে দৌড় দিল ও।

গ্যালারি ধরে ছুটছে ওরা সীল করা প্রবেশপথের ফাঁকটার দিকে। পাথর আর প্লাস্টারের টুকরো বৃষ্টির মত ঝরে পড়ছে প্যাসেজে, ধুলোয় চারদিক অন্ধকার। ওদের পিছনে অবিরত বজ্রপাতের শব্দ হচ্ছে, ধসে পড়ছে গোটা ছাদ। ওরা ছুটছে, ওদেরকে অনুসরণ করছে নিয়ন্ত্রণহীন পাথর ধস। পিছন দিকে তাকানোর সময় বা সাহস কোনটাই ওদের নেই, তবে পতনের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারছে ফাঁকটা গলে বাইরে বেরুবার সময় ওরা পাবে না।

প্লাস্টারের একটা টুকরো নিমার কাঁধে ঘষা খেয়ে বেরিয়ে গেল। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল ওর, রানা ধরে না ফেললে পড়ে যেত। না পড়লেও, আতঙ্কে হাঁটতে পারছে না। রানা ওকে টেনে নিয়ে আসছে। ধুলোর সামনেটা দেখা যাচ্ছে না, প্রবেশপথের ফাঁকটা কত দূরে বোঝা যাচ্ছে না। 'প্রায় পৌঁছে গেছি,' মিথ্যে আশ্বাস দিল রানা। ওর কথা শেষ হবার আগেই প্লাস্টারের একটা টুকরো ফ্লাডলাইটে আঘাত করল; পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেল গ্যালারি।

রানা এখন পুরোপুরি অন্ধ, বাঁচার আকুতি প্রথমেই ওকে দিশা খুঁজে পাবার তাগাদা দিল। কিন্তু চারদিকেই ধসে পড়ছে ছাদ, প্রতি মুহূর্তে পতনের মাত্র

আরও বাড়ছে। বুঝতে পারল, যে-কোন মুহূর্তে গোটা ছাদ নেমে আসবে ওদের ওপর। কোথাও না থেমে ছুটছে ও, ভারী বোঝার মত টেনে আনছে নিমাকে। কিছুই না দেখে দেয়ালের শেষ মাথায় পৌঁছুল, ধাক্কা খেয়ে সব বাতাস বেরিয়ে গেল ফুসফুস থেকে। ধুলোর মেঘের ভেতর প্লাস্টার করা দরজার গায়ে চৌকো ফাঁকটা অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে, সিঁড়ির মাথা থেকে আসা ল্যাম্পের আলোয় শুধু আভাসটুকু পাওয়া যায়। হ্যাঁচকা টানে নিমাকে বুকে তুলে নিল রানা, তারপর ফাঁকের ভেতর ছুঁড়ে দিল। ওপারে পড়ল নিমা, কাতর শব্দ ভেসে এল এপারে। আবর্জনার আরেকটা টুকরো লাগল রানার মাথার পিছনে, ব্যথায় জ্ঞান হারাবার অবস্থা হলো। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেছে, দাঁড়াতে চেষ্টা করেও পারছে না। শুনতে পেল নিমা ওর নাম ধরে চেঁচাচ্ছে।

ক্রল করে এগোল রানা। হাত তুলে ফাঁকটার নাগাল পেতে চাইছে। ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে একটা হাত ওর কব্জি চেপে ধরল। সিধে হলো রানা, ফাঁক গলে ভেতরে ঢুকল। আর ঠিক এক সেকেন্ড পরই গ্যালারির সম্পূর্ণ ছাদ ধসে পড়ল নিচে।

ল্যাম্পলাইটের আলোয় রানার হাত ধরে পথ দেখাল নিমা। 'কোথায় লেগেছে?' হাঁপাচ্ছে ও। কপালের ওপর চুলের ভেতর থেকে রক্তের একটা ধারা গালে নেমে আসছে, ধুলো মাখা মুখে লাল নদীর মত লাগছে দেখতে।

'তাড়াতাড়ি পা চালান,' বলল রানা। খকখক করে কাশছে ও। 'গোটা টানেল ধসে পড়তে পারে। পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে ছুটল ওরা। তারপর ধুলোর ভেতর সামনে একটা ছায়ামূর্তি দেখা গেল। মারটিন।

'ওহ্ গড! আপনারা বেঁচে আছেন!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। 'কি ঘটছে ওদিকে?'

রানা আর নিমা থামল না। 'পালিয়ে এসো!' কর্কশ সুরে বলল রানা।

ভাসমান সেতুর ওপর উঠে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থামল ওরা।

সন্ন্যাসীদের বাইরে রেখে পোস্ট অফিসে ঢুকল রুবি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আদ্দিস আবাবার লাইন পাওয়া গেল, ব্রিটিশ দূতাবাস থেকে ভেসে এল ব্যারি গরডনের কণ্ঠস্বর। 'হ্যালো?'

নিজের পরিচয় দিল রুবি।

'আমি আপনার কলের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম,' বলল গরডন। 'আপনারা সবাই কেমন আছেন, রুবি?'

রানার মেসেজটা মুখস্থ বলে গেল রুবি।

'আমার বন্ধুকে বলবেন ওর কথামত সব করা হবে,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল গরডন।

'এবার আমি,' পোস্ট মাস্টারকে বলল রুবি, 'আদ্দিস আবাবায় আরেকটা ফোন করতে চাই—মিশরীয় দূতাবাসে।'

দ্বিতীয় কলের লাইন পেতে একটু দেরি হলো। বিকেল পাঁচটার সময় মিশরীয় দূতাবাসের কালচারাল অ্যাটাশে আল মাসুদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হলো

রুবির। ভদ্রলোককে আগে থেকেই চেনে সে, কূটনীতিকদের কয়েকটা পার্টিতে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। ভদ্রলোক এক সময় রুবির প্রতি খানিকটা আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, তবে রুবি তাঁকে ফোন করবে বলে আশা করেননি। তিনি জানতে চাইলেন, 'মীটিঙে যেতে হবে। বলুন আপনার জন্যে কি করতে পারি।'

এই ভদ্রলোকের মাধ্যমে কায়রোর যাঁকে মেসেজটা দিতে হবে তাঁর নাম-ঠিকানা ও পদমর্যাদা একটা কাগজে লিখে দিয়েছে নিমা। নামটা শুনে কালচারাল অ্যাটাশে ভদ্রলোক রুবিকে খুশি করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নাম ও পদমর্যাদা ভুল শুনেছেন কিনা নিশ্চিত হবার জন্যে দু'বার রিপিট করতে বললেন। সবশেষে লিখে নেয়া মেসেজটা পড়ে শোনালেন রুবিকে। 'ঠিক আছে তো?'

রাত হতে আর বেশি দেরি নেই, কাজেই আজ আর এসকার্পমেন্ট বেয়ে নিচে নামা সম্ভব নয়। কোথায় রাত কাটানো যায় ভাবছে রুবি, এই সময় গ্রামের সর্দার তার কিশোরী মেয়েকে পাঠিয়ে দিলেন। রাতটা তাঁর বাড়িতে মেহমান হিসেবে কাটাবার অনুরোধ করেছেন তিনি। স্বস্তিবোধ করল রুবি, কিশোরীর সঙ্গে সর্দারের বাড়িতে চলে এল। অভিজাত পরিবারের মেয়ে সে, তার সম্মানে রাতে বড়সড় একটা ভোজ দিলেন সর্দার। গ্রামে তাঁর বাড়িটাই সবচেয়ে বড়। সন্ন্যাসীদের থাকার ব্যবস্থা হলো বাড়ির উঠানে, তাঁবুর ভেতর। বাড়ির পিছনের একটা গেস্টরুম খুলে দেয়া হলো রুবিকে। ভোজন পর্ব শেষ হতে রাত গভীর হয়ে গেল। গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল রুবি।

ওর ঘুম ভাঙল ভোরের দিকে, দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে। কিছুই সন্দেহ করেনি রুবি, গায়ের কাপড় ঠিকঠাক করে দরজা খুলে দিল।

হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল ইউনিফর্ম পরা ইথিওপিয়ান সৈনিকরা, ধাক্কা খেয়ে ছিটকে বিছানায় পড়ল রুবি। তাকে ঘিরে দাঁড়াল ওরা, পিস্তল আর অটোমেটিক রাইফেল তাক করে আছে। এগিয়ে এসে রুবির চুলের গোছা ধরে টান দিল একজন, ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল রুবি। লোকটা চড় মারতে যাবে, সৈনিকদের ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন একজন অফিসার। 'কি করছ! কাকে মারছ?' লোকটাকে চোখ রাঙালেন তিনি। 'ওনাকে তোমরা ক্রিমিন্যাল ভেবেছ নাকি? রাজধানীর অত্যন্ত অভিজাত পরিবারের মেয়ে উনি।' রুবির দিকে ফিরে ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বললেন, 'ডিস্ট্রিক্ট কমান্ডার কর্নেল জুলিয়াস ঘুমার নির্দেশে আপনাকে একবার আমাদের আর্মি হেডকোয়ার্টারে যেতে হবে, মিস রুবি।'

'কেন, কি করেছি আমি?' ঢোক গিলে জানতে চাইল রুবি।

'গোজামে গুরুতা, দুষ্কৃতকারীদের তৎপরতা সম্পর্কে কর্নেল আপনাকে প্রশ্ন করতে চান।'

তর্ক করে বা বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই, অফিসারের সঙ্গে বেরিয়ে এসে একটা সামরিক ট্রাকে চড়ল রুবি। ট্রাকের সামনে অফিসারের সঙ্গে বসেছে ও, ড্রাইভার একজন সৈনিক। কিছুক্ষণ কোন কথা হলো না। তারপর অফিসার বললেন, 'ড্রাইভার ইংরেজি বোঝে না। আপনাকে বলতে চাই, আপনার বাবাকে আমি চিনতাম। তাঁর প্রতি আমি ঋণী ও কৃতজ্ঞ। আজ রাতে যা ঘটছে তার জন্যে

সত্যি আমি দুঃখিত, কিন্তু একজন লেফটেন্যান্ট হিসেবে কতটুকুই বা আমার ক্ষমতা। ওপর থেকে নির্দেশ এলে আমাকে তা মেনে চলতে হয়।'

'আমি কোন অভিযোগ করছি না,' বলল রুবি।

'আমার নাম আহমেদ। যদি সম্ভব হয়, আপনাকে আমি সাহায্য করব,' কথা দিলেন লেফটেন্যান্ট আহমেদ।

'ধন্যবাদ, ভাই।'

ধুলো সরার জন্যে সময় দিতে হলো। তারপরও বেশ কিছুক্ষণ গ্যালারি থেকে আলগা পাথর খসে পড়ার আওয়াজ ভেসে এল ওদের কানে। সিঙ্ক-হোলের ওপর ভাসমান সেতুর ওপর রয়েছে ওরা, ইতিমধ্যে নিমার মাথায় অ্যান্টিসেপটিক মলম লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে রানা। দু'জনের কারও আঘাতই তেমন গুরুতর নয়।

দু'ঘণ্টা পর টানেলে ঢোকার জন্যে তৈরি হলো রানা। মারটিন আর নিমাকে সেতুর ওপর থাকতে বলল ও, রওনা হলো একাই, সঙ্গে নিয়েছে লম্বা একটা বাঁশ আর জেনারেটরের সঙ্গে সংযুক্ত হ্যান্ড ল্যাম্প।

খুব সাবধানে এগোচ্ছে রানা, এগোবার আগে বাঁশ দিয়ে টানেলের ছাদে খোঁচা মারছে। ল্যান্ডিঙে পৌঁছেই দেখতে পেল সমাধির প্রবেশপথটাকে সীল করে রেখেছিল যে প্লাস্টার করা দরজা, সেটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। অ্যামুনিশন ক্রেটগুলো, আটটাই, ছিটকে পড়েছে এদিক সেদিক, কোন কোনটা আবর্জনায় ডুবে আছে। মূর্তিগুলোর কথা ভেবে মাথাটা ঘুরে উঠল রানার। একেকটা অক্ষত মূর্তির জন্যে বিলিওনিয়ার কালেক্টররা বস্তা বস্তা ডলার দিতেও দ্বিধা করবেন না, জানে ও। এত কষ্টকর আর ঝুঁকিবহুল অভিযান থেকে এই আটটা স্ট্যাচুই হয়তো সর্বমোট প্রাপ্তি ওদের, তা-ও যদি ভেঙে গিয়ে থাকে, দুঃখের কোন সীমা থাকবে না।

আবর্জনা থেকে বাক্সগুলো উদ্ধার করল রানা। প্রত্যেকটা খুলে ভেতরে তাকাল, পরীক্ষা করল স্ট্যাচুগুলো। নেহাতই ওদের ভাগ্য বলতে হবে, সবগুলোই অক্ষত আছে। আর কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নয় ও, প্রতিবার একটা করে বয়ে নিয়ে এল সেতু পর্যন্ত।

সমাধির বাইরের ল্যান্ডিঙে ফিরে এসেছে রানা, ওর পিছনে এসে দাঁড়াল নিমা। কোন যুক্তিই মানল না, রানার সঙ্গে সে-ও টানেলে ঢুকল।

গ্যালারিতে ঢোকার মুখে স্থির হয়ে গেল নিমা। শোকে কাতর, ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। 'এ আমি বিশ্বাস করি না!' ধরা গলায় বলল ও। 'টাইটা নিশ্চয়ই চায়নি এত সুন্দর শিল্পকর্ম এভাবে ধ্বংস হয়ে যাক।'

'মানে? কি বলতে চান?'

'পরে ব্যাখ্যা করব, কারণ নিজেই এখনও বুঝতে পারছি না,' বলল নিমা। 'শুধু জানি, টাইটাকে আমি যতটুকু চিনেছি, তার মধ্যে ধ্বংস করার প্রবণতা একেবারেই ছিল না। আপনি লোকজন ডেকে গ্যালারিটা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করুন।'

মারটিনকে ডেকে নিয়ে এল রানা। গ্যালারির অবস্থা দেখে হাঁ হয়ে গেল সে। কি করতে হবে শোনার পর বলল, 'সবচেয়ে বড় সমস্যা ধুলো। আবর্জনায় হাত দিলেই মেঘের মত উড়তে শুরু করবে।'

'কাজেই পানি দরকার,' বলল রানা। 'টানেল থেকে সিঙ্ক-হোল পর্যন্ত দুই লাইনে দাঁড় করিয়ে দাও লোকজনকে। একটা চেইন পানির বালতি আনবে, আরেকটা আবর্জনা সরাবে।'

'ঈশ্বরই জানে ক'দিন লাগবে!' হতাশ দেখাল মারটিনকে, তবে নাবুকে ডেকে এনে কাজটা বুঝিয়ে দিল সে।

সন্ন্যাসী বা গ্রামবাসী যুবকদের মধ্যে কোন দ্বিধা নেই, কারণ এখনও তারা বিশ্বাস করে এটা একটা ধর্মীয় কাজ, অংশগ্রহণ করতে পারায় নরকের আজাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। টোরা নাবুর নেতৃত্বে বাঘেরা কাজ শুরু করে দিল।

ভাঙা পাথর আর আবর্জনা বয়ে নিয়ে ফেলা হচ্ছে সিঙ্ক-হোলে। ওটা এত গভীর, পানির লেভেল উঁচু হলো না, সব গ্রাস করে নিচ্ছে। অল্প জায়গার ভেতর একশোর ওপর লোক কাজ করছে, পরিবেশটা গুমোট হয়ে উঠল। তাজা বাতাসের জন্যে টাইটার পুলে বেরিয়ে এল রানা। পুলটাকে ঘিরে থাকা পাঁচিলে এসে দাঁড়াতেই, দেখল ওর জন্যে ওখানে অপেক্ষা করছে শাফি।

'রানা,' জিজ্ঞেস করল সে, 'ডেবরা মারিয়াম থেকে এখনও ফেরেনি রুবি? কালই না ওর ফিরে আসার কথা ছিল?'

'ওকে তো দেখিনি আমি। ভাবছিলাম ও বোধহয় তোমার সঙ্গে আছে।'

'ওর খোঁজে লোক পাঠাব, তাই ফিরেছে কিনা নিশ্চিত হতে এলাম,' বলল শাফি, চেহারায় শুধু উদ্বেগ নয়, অপরাধী অপরাধী ভাবও ফুটে আছে। ডেবরা মারিয়ামে রুবিকে পাঠানোর প্রস্তাবটা তারই ছিল।

রানারও খারাপ লাগছে। 'দুঃখিত, শাফি। ওকে এসকার্পমেন্টের ওপর পাঠানোটা বিপজ্জনক হতে পারে বলে আমিও ভাবিনি।'

'গোজামের সবাই ওকে চেনে,' বলল শাফি। 'বিপদ হবার তো কথা নয়। তবু, খোঁজ নিচ্ছি আমি।' চলে গেল সে।

পরবর্তী কয়েকটা দিন রুবিকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকতে হলো ওদেরকে। এদিকে গ্যালারি পরিষ্কার করার কাজও খুব ঢিমে তালে এগোচ্ছে। গ্যালারির মুখে রানার সঙ্গেই বেশিরভাগ সময় কাটাচ্ছে নিমা। দেয়ালচিত্রের প্রতিটি ভাঙা টুকরো দেখা মাত্র কান্না পাচ্ছে ওর, কাতর হয়ে পড়ছে শোকে। ছবির কোন অক্ষত অংশ দেখতে পেলেই নিজের দখলে রেখে দিচ্ছে। এক টুকরো প্লাস্টারে আইসিস-এর মাথাটা অক্ষত অবস্থায় পেল। আরেকটায় পেল থোত-এর পুরো ছবি।

লম্বা গ্যালারির ভেতর সময়ের কোন হিসাব পাওয়া সম্ভব নয়, এখানে রাত ও দিন সমান। একেবারে ক্লান্ত ও বিরক্ত না হওয়া পর্যন্ত টানেল ছেড়ে বেরোয় না ওরা। তারপর যখন বেরোয়, টাইটার পুলের ওপর সরু আকাশে তারার মেলা দেখে সময় কাটায়, ক্লান্তি সত্ত্বেও চোখে ঘুম আসে না।

পাশাপাশি, কাছাকাছি থাকছে দু'জন, কতভাবেই না ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নিজের অস্ত্রে ঠিকই রক্ষা করে চলেছে নিমা। অজান্তে যা-ই ঘটে যাক,

সচেতনভাবে এমন কিছু করে না যাতে নিজে বা রানা উত্তেজিত হয়ে উঠবে। ইতিমধ্যে মেয়েটার প্রকৃতি চিনে ফেলেছে রানা, নিমার সম্ভ্রম রক্ষার এই প্রবণতার প্রতি ওর শ্রদ্ধা জাগে, তবু রূপ-লাবণ্যে ভরপুর এই রমণীর ভালবাসা পাবার জন্যে মাঝে মধ্যেই অস্থির হয়ে ওঠে শরীর ও মন দুটোই। দু'তিন বার আকৃষ্ট করার চেষ্টাও করেছিল রানা, নরম সুরে সবিনয়ে এড়িয়ে গেছে নিমা, কখনও বুঝেও না বোঝার ভান করেছে।

পুলের পাশে ক্যাম্পে কয়েক ঘণ্টা ঘুমাবার পর টানেলে ঢুকতে যাচ্ছে ওরা, অসমান সেতু পেরুচ্ছে, এই সময় গ্যালারির দিক থেকে তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার ভেসে এল। তারপর শোনা গেল বহু লোকের হৈ-চৈ। 'টোরা নাবু কিছু একটা পেয়েছে,' বলল নিমা। 'ধ্যেত, ওখানে আমাদের থাকা উচিত ছিল–' দৌড় দিল ও, পিছু নিয়ে রানাও।

গ্যালারির সামনে ল্যান্ডিঙে পৌঁছুল ওরা, দেখল অর্ধনগ্ন শ্রমিকরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে সবাই একসঙ্গে কথা বলছে, ইঙ্গিতে ও হাত নেড়ে পরস্পরকে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে। ভিড় ঠেলে সামনে এগোল রানা ও নিমা, দেখতে পেল যেখানে অসিরিস-এর শ্রাইন ছিল সেই পর্যন্ত গ্যালারিটা পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। ওদের ওপর ছাদ ভাঙাচোরা আর এবড়োখেবড়ো, নিচে টাইলসের বিধ্বস্ত মেঝেতে পড়ে রয়েছে বিশাল আকারের একটা পাথুরে চাকা। এটা টাইটার মেকানিজম বা তার অবশিষ্ট, প্রাচীন ক্রীতদাস ছাদে ফিট করেছিল। ওরা, রানা ও নিমা, ডিভাইসটা অ্যাকটিভেট করায় ছাদটা ধসে পড়ে। বিশাল চাকাটাই মেকানিজমের মূল অংশ, দেখতে অনেকটা মিল হুইলের মত, ওজন হবে কয়েক টন। জিনিসটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল রানা।

'রিভার গড পড়ার সময় নিশ্চয়ই আপনি খেয়াল করেছেন চাকার প্রতি বিশেষ দুর্বলতা ছিল টাইটার,' নিমাকে বলল ও। 'রথের চাকা, পানি তোলার চাকা, আর এটা নিশ্চয়ই ব্যালেন্স হুইল–বুবি ট্র্যাপের জন্যে। আমরা লিভার নাড়তেই গোঁজ সরে যায়। ওই গোঁজই চাকাটাকে জায়গামত আটকে রেখেছিল। চাকা যে-ই ঘুরতে শুরু করল, গ্যালারির ওপর সিলিঙে সাজিয়ে রাখা প্রকাণ্ড পাথরগুলো খসে পড়ল ছাদে, ভেঙে পড়ল ছাদ।'

'এখন নয়, রানা!' ধৈর্য হারিয়ে বলল নিমা। 'পরে আপনার লেকচার শোনা যাবে। টাইটার ডেথ-ট্র্যাপ নাবুকে উত্তেজিত করেনি। সে অন্য কিছু আবিষ্কার করেছে। আসুন!'

ভিড় ঠেলে আরও সামনে এগোল ওরা, দাঁড়াল দীর্ঘদেহী নাবুর মুখোমুখি। 'কি ঘটেছে?' জিজ্ঞেস করল নিমা। 'কি পেয়েছ তুমি?'

পাল্টা চিৎকার করল নাবু, 'এদিকে, ম্যাডাম! জলদি আসুন!'

আরও কিছুটা এগিয়ে পাথর ধসে বন্ধ গ্যালারির সামনে থামল। 'ওই দেখুন!' হাত তুলল নাবু।

ভাঙা শ্রাইনের ভেতর একটা হাঁটু গাড়ল রানা। ফাটল ধরা পাথুরে দেয়ালে এখনও রঙ করা প্লাস্টারের টুকরো দেখা যাচ্ছে। ধসে পড়া দেয়ালের মুখ থেকে বড় একটা টুকরো সরাল নাবু, তারপর সদ্য তৈরি ফাঁকটার দিকে আঙুল তাক

করল। চোখের পলকে পালস রেট বেড়ে গেল রানার। গ্যালারির এক পাশে একটা পথ দেখা যাচ্ছে, সম্ভবত আরেকটা টানেলের মুখ। মহান দেবতার প্লাস্টার মোড়া ছবির পিছনে লুকিয়ে ছিল। রানা তাকিয়ে আছে, বাহুতে নিমার স্পর্শ আর মুখের পাশে গরম নিঃশ্বাস অনুভব করল। 'এটাই, রানা! এই টানেলটাই! ফারাও মামোসের আসল সমাধিতে ঢোকার পথ। এই গ্যালারি, যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি, এটা স্রেফ একটা ধাপ্পা। আসল সমাধি আছে দ্বিতীয় টানেলের ভেতর।'

'নাবু!' আবেগে রুদ্ধ গলায় নির্দেশ দিল রানা, 'তোমার লোকদের বলো পথটা পরিষ্কার করুক।'

সঙ্গে সঙ্গে পাথর আর আবর্জনা সরাবার কাজ শুরু হয়ে গেল। ফাঁকটার ভেতর ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল একটা দরজা। এটাও চৌকো, তিন মিটার চওড়া, দুই মিটার লম্বা। লিনটেল আর চৌকাঠের বাজু নিখুঁতভাবে কাটা, পালিশ করা পাথর। দরজাটা ভেঙে পড়েছে, ভেতরে উঠে গেছে পাথুরে সিঁড়ির ধাপ।

তার টেনে নতুন দরজার মুখে আলোর ব্যবস্থা করা হলো। সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রাখল রানা, দেখল ওর পাশে চলে এসেছে নিমা। 'আমিও আপনার সঙ্গে যাব,' জেদের সুরে বলল ও।

'এখানে কোন ফাঁদ থাকতে পারে,' সাবধান করল রানা। 'হয়তো প্রথম বাঁকেই টাইটা আপনার জন্যে ওত পেতে আছে।'

'এ-সব বলে কোন কাজ হবে না, আমি যাবই।'

ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে ওরা, প্রতি ধাপে থেমে দেয়াল আর সামনের দিকটা পরীক্ষা করে নিচ্ছে। বিশ ধাপ ওঠার পর আরেকটা ল্যান্ডিঙে পৌঁছুল ওরা, দু'দিকে দুটো দরজা দেখা যাচ্ছে। তবে সিঁড়িটা সোজা আরও ওপরে উঠে গেছে।

'কোনদিকে?' জানতে চাইল রানা।

'চলুন ওপরে উঠি,' বলল নিমা। 'সাইড প্যাসেজ দুটোয় পরে ঘুরে আসব।'

সাবধানে আবার ওপরে উঠতে শুরু করল ওরা। আরও বিশ ধাপ পেরুবার পর হুবহু একই রকম আরেকটা ল্যান্ডিং দেখা গেল, দু'দিকে দুটো দরজা। সিঁড়িটা এরপরও ওপরে উঠে গেছে।

রানাকে প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে নিমা বলল, 'ওপরেই উঠব।'

আরও বিশ ধাপের মাথায় আরেকটা ল্যান্ডিং, এটারও দু'দিকে একটা করে দরজা। সিঁড়িটাও উঠে গেছে নাক বরাবর। 'ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না,' অভিযোগের সুরে বলল রানা।

কনুই দিয়ে ওর পিঠে খোঁচা মারল নিমা। 'কোন বাধা না পাওয়া পর্যন্ত ওঠা উচিত,' বলল ও। আবার উঠতে শুরু করে একই ধরনের আরও দুটো ল্যান্ডিং পেল ওরা।

'অবশেষে!' শেষ ল্যান্ডিঙে উঠে এসে বিস্ময় প্রকাশ করল রানা। আশা করেছিল এটারও দু'দিকে দরজা দেখতে পাবে, পেলও দেখতে, কিন্তু সামনে আর কোন ধাপ নেই, তার বদলে নিরেট দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে। 'এবার কি করবেন?'

'সব মিলিয়ে ক'টা ল্যান্ডিং?' জানতে চাইল নিমা।

'আটটা,' বলল রানা।

'আটটা,' পুনরাবৃত্তি করল নিমা। 'কথাটা খুব পরিচিত লাগছে না?'

ল্যাম্প লাইটের আলোয় নিমার মুখটা ভাল করে দেখল রানা। 'আপনি বলতে চাইছেন...'

'বলতে চাইছি গ্যালারিতে আটটা শ্রাইন রয়েছে বা ছিল, এখানে রয়েছে আটটা ল্যান্ডিং, বাও বোর্ডেও আটটা খুঁটি থাকে।'

টপ ল্যান্ডিঙে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, চারপাশে চোখ বুলাচ্ছে।

অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা, 'ঠিক আছে, এবার বলুন কোনদিকে যাবেন।'

'একটায় গেলেই হয়,' বলল নিমা। 'ডানদিকে চলুন।'

ডান দিকের দরজা দিয়ে একটা প্যাসেজে ঢুকল ওরা। খানিক দূর যাবার পর একটা টি-জাংশনে পৌঁছুল—সামনে নিরেট দেয়াল, দু'দিকে দুটো দরজা। 'আবার ডান দিকের প্যাসেজে ঢুকি আসুন,' বলল নিমা। তাই ঢুকল রানা। কিন্তু খানিক দূর যাবার পর আরেকটা টি-জাংশন পড়ল সামনে।

নিমার দিকে তাকাল রানা। 'কি ঘটছে বুঝতে পারছেন তো?' জিজ্ঞেস করল। 'টাইটার আরেকটা চালাকি। সে আমাদেরকে একটা গোলকধাঁধায় নিয়ে এসেছে। সঙ্গে লম্বা তার না থাকলে এতক্ষণে হারিয়ে যেতাম।'

ফেলে আসা পথের দিকে তাকাল নিমা, তারপর দৃষ্টি ফেলল ডান ও বাম দিকের প্যাসেজে। শিউরে উঠে রানার বাহু খামচে ধরল ও। 'আমার ভয় করছে! চলুন ফিরে যাই। কেন যেন মনে হচ্ছে বিপদের মধ্যে আছি আমরা। এভাবে প্রস্তুতি না নিয়ে চলে আসা উচিত হয়নি।'

বাঁকের পর বাঁক পেরিয়ে প্যাসেজ ধরে ফেরার পথে ইলেকট্রিক তার গুটিয়ে নিচ্ছে রানা, ইচ্ছে হচ্ছে বিপদ এড়াবার জন্যে দৌড় দেয়। রানার গায়ে প্রায় সেঁটে আছে নিমা। দু'জনেরই মনে হচ্ছে অন্ধকার থেকে কে যেন লক্ষ রাখছে ওদের ওপর, পিছু নিয়েছে, অপেক্ষা করছে ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে।

আর্মি হেডকোয়ার্টারে নয়, রুবিকে নিয়ে আসা হলো এসকার্পমেন্টের নিচে ফরেন প্রসপেক্টিং কোম্পানী প্রজির বেস ক্যাম্পে। রুবি অভিযোগ করায় লেফটেন্যান্ট আহমেদ কোন সদুত্তর দিতে পারলেন না, বললেন, 'আমি শুধু কর্নেল ঘুমার নির্দেশ পালন করছি।'

বিশাল কনফারেন্স রুমে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন কর্নেল ঘুমা। ইউনিফর্ম পরে আছেন, চোখে মেটাল-ফ্রেমের চশমা, তবে মাথায় কিছু নেই। টেবিলের এক ধারে জ্যাক রাফেলও বসে আছে, হাত দুটো বুকে ভাঁজ করা। একটা চুরুট চিবাচ্ছে সে, আগুনটা নিভে গেছে।

'লেফটেন্যান্ট আহমেদ,' অ্যামহ্যারিক ভাষায় বললেন কর্নেল ঘুমা। 'আপনি বাইরে অপেক্ষা করুন। প্রয়োজন হলে আপনাকে ডাকা হবে।'

লেফটেন্যান্ট চলে যাবার পর রুবি বলল, 'আমাকে অ্যারেস্ট করা হলো কেন, কর্নেল ঘুমা?'

দু'জনের কেউই জবাব দিল না, নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল রুবির দিকে।

file.com/groups/BoiLoversPolapain

'আমি কি এখন উঠতে পারি?' আবার জিজ্ঞেস করল রুবি।

এবার কথা বললেন কর্নেল, 'কুখ্যাত একদল টেরোরিস্টের সঙ্গে মেলামেশা করছেন আপনি। এর মানে হলো, ওদের মত আপনিও একজন শুফতা।'

'এ আপনার মিথ্যে অভিযোগ।'

'অ্যাবে উপত্যকার একটা মিনারেল কনসেশনে অনধিকার প্রবেশ করেছেন আপনি,' বলল রাফেল। 'কুখ্যাত টেরোরিস্টদের নিয়ে এই কোম্পানীর নিজস্ব এলাকায় মাইনিং অপারেশন শুরু করেছেন।'

'কোথাও কোন মাইনিং অপারেশন শুরু হয়নি,' প্রতিবাদ করল রুবি।

'আমাদের কাছে আরও তথ্য আছে। আপনারা ডানডেরা নদীতে একটা বাঁধ দিয়েছেন।'

'তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।'

'তাহলে আপনি অস্বীকার করছেন না যে একটা বাঁধ তৈরি করা হয়েছে?'

'বললামই তো, এ-সবের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই,' বলল রুবি। 'আমি কোন টেরোরিস্ট গ্রুপের মেম্বার নই। কোন মাইনিং অপারেশনেও অংশ নিইনি।'

নোটবুকে কি যেন লিখলেন কর্নেল। চেয়ার ছেড়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রাফেল। ঘরের ভেতর নিস্তব্ধতা দীর্ঘতর হচ্ছে। আবার চুপ মেরে গেছে ওরা।

রুবি বলল, 'ছয়-সাত ঘণ্টা একটানা ট্রাকে ছিলাম। আমি ক্লান্ত। আমাকে টয়লেটে যেতে হবে।'

'টয়লেটের কাজ আপনি এখানেই সারতে পারেন। আমি বা মি. রাফেল খারাপ বোধ করব না।' হাসলেন কর্নেল, তবে নোটবুক থেকে চোখ তুললেন না।

ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকাল রুবি। জানালার কাছ থেকে সরে এসে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল রাফেল। রুবি ভাবল, এদেরকে বুঝতে দেয়া যাবে না যে সে ভয় পেয়েছে। খুবই ক্লান্ত সে, তলপেট ব্যথা করছে, তবু চেহারায় মর্যাদার ভাব ফুটিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল।

মুখ তুলে ভুরু কোঁচকালেন কর্নেল। রুবির কাছ থেকে এ-ধরনের আচরণ তিনি আশা করেননি। 'শুফতা ডাকাত অ্যালান শাফির সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা আপনি অস্বীকার করতে পারেন না!' হঠাৎ অভিযোগ করলেন তিনি।

'অ্যালান শাফি ডাকাত নন,' বলল রুবি। 'তিনি সত্যিকার দেশপ্রেমিক এবং গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী একজন শ্রদ্ধেয় নেতা।'

'আপনি তার উপপত্নী। বেশ্যাও বলা চলে।'

ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল রুবি।

হঠাৎ গর্জে উঠলেন কর্নেল ঘুমা, 'অ্যালান শাফি কোথায়? তার সঙ্গে ডাকাতরা মোট ক'জন?' রুবির দৃঢ় মনোভাব অস্থির করে তুলেছে তাঁকে।

রুবি জবাব দিল না।

'কথা বলুন! মুখ খুলুন!' গর্জে উঠলেন কর্নেল। 'তা না হলে আপনাকে টরচার করা হবে।'

মুখ ঘুরিয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকল রুবি।

দ্রুত পায়ে হেঁটে কর্নেলের পিছনে চলে এল রাফেল, পিছনের একটা দরজা খুলে বেরিয়ে গেল কনফারেন্স রুম থেকে। বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল সে। খানিক পর আবার ফিরে এল, কর্নেলের সঙ্গে চোখাচোখি হতে মাথা ঝাঁকাল।

সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছাড়লেন কর্নেল ঘুমা। তারপর দু'জনই রুবির সামনে চলে এল।

'ঝামেলা যত তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলা যায় ততই ভাল,' বলল রাফেল। 'আমাকেও ব্রেকফাস্টে বসতে হবে, আপনাকেও টয়লেটে যেতে হবে। কর্নেল সরকারী কর্মচারী, তাঁকে অনেক নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। আমার ও-সব বালাই নেই। উনি যে প্রশ্নগুলো করেছেন, আমিও সেগুলো করব। তবে এবার আপনাকে উত্তর দিতে হবে।' কথা শেষ করে চুরুটে আগুন ধরাল সে। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'অ্যালান শাফি কোথায়?'

কাঁধ ঝাঁকাল রুবি, ঘাড় ফিরিয়ে আবার জানালার বাইরে তাকাল।

আগে থেকে কিছু বুঝতে না দিয়ে দুম করে রুবির মুখে ঘুসি মারল রাফেল। একটা মেয়েকে এভাবে কেউ ঘুসি মারতে পারে, ভাবা যায় না। ছিটকে চেয়ার সহ মেঝেতে পড়ে গেল রুবি। এগিয়ে এসে তার পেটে সবুট লাথি মারল রাফেল। 'বেশ্যা মাগী, কথা বলিস না কেন?'

এরপর এগিয়ে এলেন কর্নেল ঘুমা। রুবির বুকের মাঝখানে একটা পা রাখলেন তিনি, তারপর ঝুঁকে চুলের গোছা ধরে টান দিলেন। 'নতুন করে শুরু করা যাক। অ্যালান শাফি এখন কোথায়?'

ঘুসি আর লাথি খেয়ে জ্ঞান হারাবার অবস্থা হয়েছে রুবির। এবার তার ওপর ঝুঁকল রাফেল, ট্রাউজারের বেল্টটা খুলে নিল। 'এখনও সময় আছে, কথা না বললে ন্যাংটো করে চুরুটের ছ্যাঁকা দেয়া হবে গায়ে। কোথায় সে? কি করছে অ্যালান শাফি? তোর সঙ্গী-সাথীরা ডানডেরা নদীতে বাঁধ দিয়েছে কেন?'

মুখের ভেতর থুথু জমিয়ে রাফেলের চোখে ছুঁড়ে দিল রুবি। ছিটকে দূরে সরে গেল রাফেল, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুছল।

'ধরে রাখুন শালীকে!' কর্নেলকে বলল সে। রুবির বুক থেকে পা নামিয়ে বসে পড়লেন কর্নেল, তারপর শক্ত করে হাত দুটো ধরলেন।

পা ছুঁড়ছে রুবি, কিন্তু দু'জন শক্তসমর্থ পুরুষের সঙ্গে সে পারবে কেন। তার ট্রাউজার খুলে ফেলল রাফেল। তারপর শার্টটাও ছিঁড়ে ফেলল। 'কোথায় সে? কি করছে অ্যালান শাফি?' জিজ্ঞেস করল রাফেল, রুবির স্তনের বোঁটার কাছে জ্বলন্ত চুরুট সরিয়ে আনল।

মরিয়া হয়ে ধস্তাধস্তি শুরু করল রুবি, কিন্তু কর্নেল তার হাত দুটো পিছমোড়া করে ধরে রেখেছেন। আর্তনাদ করে উঠল রুবি, চুরুটের লালচে ডগা তার স্তনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

তিন

'শীতকাল,' বলল নিমা, টানুসের সমাধিতে পাওয়া ফলকের চতুর্থ দিকটার এনলার্জ করা ফটোগ্রাফ ফ্লাডলাইটের আলোয় মেলে ধরল। 'এদিকটাতেই টাইটার নোটেশন রয়েছে, যেটাকে আমি বাও বোর্ড বলে মেনে নিয়েছি। সংখ্যা ও সঙ্কেত সবগুলো আমি বুঝি না, তবে বাদ দেয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে প্রথম সঙ্কেতটা চারটে দিকের একটাকে চিহ্নিত করে। এই চারটে দিককে বোর্ডের একেকটা দুর্গ হিসেবে বর্ণনা করেছে সে।' নোটবুকের পাতাগুলো দেখাল রানাকে, ওগুলোয় হিসাব করেছে ও।

'এদিকে দেখুন, উত্তর দুর্গে বসে আছে বেবুন, দক্ষিণ দুর্গে মৌমাছি, পশ্চিমে পাখি আর পুবে কাঁকড়া বিছে। ফলকের ফটোগ্রাফেও চিহ্নগুলো রয়েছে,' আঙুল দিয়ে দেখাল রানাকে। 'তারপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিগার, এগুলো সংখ্যা–আমার ধারণা, এগুলো কাইল আর কাপ-এর প্রতিনিধিত্ব করে। এগুলোর সাহায্যে আমরা তার কাল্পনিক লাল পাথরের চাল অনুসরণ করতে পারব। লাল হলো বোর্ডের হাইয়েস্ট-র‍্যাংকিং কালার।'

'প্রতি সেট নোটেশনের মাঝখানে স্তবকগুলো কি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'যেমন এখানে লেখা রয়েছে উত্তরে বাতাস আর ঝড় সম্পর্কে।'

'আমি জানি না, স্মোকস্ক্রীন হতে পারে। কোন কাজই সে আমাদের জন্যে সহজ করে রাখেনি। ওগুলোর কোন তাৎপর্য থাকতেও পারে, তবে সেটা ধরা পড়বে আমরা যখন আমাদের পাথর দিয়ে চাল দিতে দিতে খেলাটায় অনেক দূর এগিয়ে যাব।' নিমা এবার মুখ তুলে পাথুরে সিঁড়ির দিকে তাকাল, যে সিঁড়ি টাইটার গোলকধাঁধার দিকে উঠে গেছে। 'এবার দেখতে হবে আমার থিওরির সঙ্গে টাইটার আর্কিটেকচারের কঠিন পাথর আর দেয়াল মেলে কিনা। প্রশ্ন হলো, আমরা শুরু করব কোত্থেকে?'

'প্রথম থেকে,' বলল রানা। 'দেবতা প্রথম চাল দিলেন। টাইটা তো তাই জানিয়েছে। আমরা যদি অসিরিস-এর শ্রাইন থেকে শুরু করি, সিঁড়ির গোড়া থেকে, তাহলে আমরা হয়তো তার কাল্পনিক বাও বোর্ডের অ্যালাইনমেন্ট পেয়ে যাব।'

'আমারও তাই ধারণা,' বলল নিমা। 'আসুন ধরে নিই এটা টাইটার বোর্ডের উত্তর দুর্গ। এখান থেকে আমরা ষাঁড় চতুষ্টয়ের প্রটোকল আবিষ্কার করব।'

কঠিন ও একঘেয়ে কাজ, এগোল শম্বুকগতিতে। প্যাসেজ আর টানেলের ভেতর বারবার ঢুকে প্রাচীন লেখকের মন ও মস্তিষ্কের ভাব আর চিন্তাধারা চার হাজার বছর পর আঁচ করতে চাওয়া। গোলকধাঁধায় এখন ওরা ঢুকেছে চক নিয়ে, প্রতিটি টানেলের শাখা ও মোড়ের দেয়াল চিহ্নিত করছে রানা, লিখে রাখছে

শীতকাল শিয়োনামে কলকের দিকটায় পাওয়া নোটেশন।

ওরা বুঝতে পারল ওদের প্রথম ধারণাটা সঠিক হয়েছে, অসিরিস-এর শ্রাইন হলো বোর্ডের উত্তর দুর্গ। কাজেই খুশি হয়ে উঠল মন, জানে এটাকে সূত্র ধরে খেলার চাল আবিষ্কার করা খুব একটা কঠিন কাজ হবে না। কিন্তু আবার হতাশ হতে হলো যখন বুঝল প্রচলিত বোর্ডের সহজ দুই ডাইমেনশন-এর কথা ভাবেনি টাইটা। সমীকরণে তৃতীয় একটা ডাইমেনশন যোগ করেছে-সে।

অসিরিস-এর শ্রাইন থেকে উঠে যাওয়া সিঁড়িটাই আটটা ল্যান্ডিঙের মাঝখানে একমাত্র লিঙ্ক নয়। সিঁড়ি থেকে শুরু হওয়া প্রতিটি প্যাসেজ অতি সূক্ষ্মভাবে হয় ওপরে উঠে গেছে, নয়তো নিচে নেমেছে। এ-ধরনের একটা টানেল অনুসরণ করতে গিয়ে অনেক মোচড় আর বাঁক ঘুরতে হলো ওদেরকে, অথচ টেরই পেল না যে ওদের লেভেল বদলে যাচ্ছে। তারপর হঠাৎ ওরা সেন্ট্রাল ল্যান্ডিঙে বেরিয়ে এল, তবে যেটা ধরে ঢুকেছিল তারচেয়ে এক ল্যান্ডিং ওপরে।

ওখানে দাঁড়িয়ে স্তম্ভিত বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। নিস্তব্ধতা ভাঙল নিমা। 'একবারও মনে হয়নি যে ওপরে উঠছি। আমাদের ধারণার চেয়ে গোটা ব্যাপারটা আরও অনেক বেশি জটিল, রানা।'

'ভীতিকর,' মন্তব্য করল রানা।

'তবে কিছু প্রতীকের অর্থ এখন আমার কাছে পরিষ্কার,' বলল নিমা। 'ওগুলো লেভেল-এর প্রতিনিধিত্ব করে। গোটা ছকটা আবার নতুন করে সাজাতে হবে।'

'থ্রী-ডাইমেনশনাল বাও, ধাঁধা মেলানোর নিয়মে খেলতে হবে,' বলল রানা। 'আমাদের আসলে একটা কমপিউটর দরকার। বুড়ো ক্রীতদাস সত্যিই জিনিয়াস ছিল। জানা সত্ত্বেও বোঝার উপায় নেই যে টানেলের মেঝে ওপরে উঠেছে নাকি নিচে নেমেছে, অথচ তার কাছে একটা পাইড রুল পর্যন্ত ছিল না। এই গোলকধাঁধা আশ্চর্য এক এঞ্জিনিয়ারিং বিস্ময়।'

'তার প্রশংসা পরে করলেও চলবে,' বলল নিমা। 'এখন আসুন সংখ্যাগুলো নতুন করে সাজাই।'

'তার আগে এই সেন্ট্রাল ল্যান্ডিঙে আলো আর ডেস্ক নিয়ে আসি,' বলল রানা। 'বোর্ডের মাঝখান থেকে কাজ শুরু করা উচিত বলে মনে করি। চাক্ষুষ বা আন্দাজ করা সহজ হতে পারে।'

কামরার ভেতর শুধু নরম একটা গোঙানির শব্দ হচ্ছে। নিজের রক্ত আর প্রস্রাবের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে মেয়েটা। কর্নেল ঘুমা কনফারেন্স টেবিলে বসে একটা চুরুট ধরালেন। হাত সামান্য একটু কাঁপল, দেখে মনে হলো অসুস্থ। তিনি একজন সৈনিক, মানুষের নিষ্ঠুরতা দেখে অভ্যস্ত, তিনি নিজেও একজন নিষ্ঠুর মানুষ। কিন্তু আজ যা চাক্ষুষ করলেন, তাঁর বুকটা রীতিমত কেঁপে গেছে। এখন তিনি জানেন হেস ডুগার্ড কেন এত ভরসা করেন রাফেলের ওপর। লোকটা আসলে মানুষ নয়, জানোয়ার।

কামরার আরেক প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছোট একটা বেসিনে হাত ধুচ্ছে রাফেল। সময় নিয়ে তোয়ালে দিয়ে হাত দুটো মুছল সে, কাপড়ে লাগা রক্তের দাগও মুছল,

তারপর হেঁটে এসে দাঁড়াল রুবির সামনে। 'আর বোধহয় কিছু বলার নেই ওর,' শান্ত সুরে বলল সে। 'কিছু গোপন করেছে বলে মনে হয় না।'

রুবির দিকে তাকালেন কর্নেল। গোটা বুক আর মুখ জুড়ে পোড়া দাগগুলো দগদগে ঘায়ের মত লাগছে। উপুড় করলে নিতম্বেও এই দাগ দেখা যাবে। চোখ বুজে পড়ে রয়েছে রুবি, চোখের পাপড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত মুখ খোলেনি মেয়েটা। শুধু রাফেল যখন তার চোখের পাতায় জ্বলন্ত চুরুট ছোঁয়াল, নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেনি, গড়গড় করে সব বলে ফেলেছে।

খানিকটা স্বস্তিবোধ করছেন কর্নেল ঘুমা। রাফেল তাঁকে রুবির চোখের পাতা খুলে রাখতে বলেছিল। কিন্তু তার প্রয়োজন হয়নি।

'ওর ওপর নজর রাখুন,' নির্দেশের সুরে বলল রাফেল, শার্টের গুটানো আস্তিন কব্জিতে নামাল। কর্নেলকে পাশ কাটিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে। দরজাটা খোলা রেখে গেল, ফলে জার্মান ভাষার দু'একটা শব্দ শুনতে পেলেন কর্নেল। এখন তিনি জানেন পাশের ঘরেই রয়েছেন হেস ডুগার্ড। রাফেলের কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে জানেন ভদ্রলোক, সেজন্যেই কনফারেন্স রুমে ঢোকেননি।

ফিরে এসে কর্নেলের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল রাফেল। 'ওকে আর দরকার নেই আমাদের। কি করতে হবে আপনি জানেন।'

নার্ভাস ভঙ্গিতে চেয়ার ছাড়লেন কর্নেল, হোলস্টারে হাত রাখলেন। 'এখানে? এখুনি?'

'বোকার মত কথা বলবেন না,' ধমক দিল রাফেল। 'অন্য কোথাও পাঠান। দূরে কোথাও। তারপর কাউকে ডেকে জায়গাটা পরিষ্কার করতে বলুন।' আবার পাশের ঘরে চলে গেল সে।

দরজার কাছে গিয়ে চিৎকার করলেন কর্নেল, 'লেফটেন্যান্ট আহমেদ!'

দু'জন মিলে রুবিকে কাপড় পরাল ওরা। তার ট্রাউজার আর শার্টও অনেক জায়গায় পুড়ে গেছে। কাপড় পরাবার সময় আহমেদ রুবির দিকে না তাকাবার চেষ্টা করলেন। 'ট্রাকে একটা চাদর আছে, নিয়ে আসি,' বলে বেরিয়ে গেলেন তিনি। ফিরে এলেন একটু পরই। রুবির ট্রাউজার আর শার্টের ওপর চাদরটা জড়িয়ে দেয়া হলো, তারপর দু'জন মিলে দাঁড়াতে সাহায্য করল তাকে। কর্নেল কনফারেন্স রুম থেকে বেরুলেন না, আহমেদ একাই রুবিকে নিয়ে ট্রাকের দিকে এগোলেন। প্যাসেঞ্জার সীটে বসানো হলো রুবিকে। দু'হাতে পোড়া মুখটা ঢেকে রেখেছে সে।

মাথা ঝাঁকিয়ে আহমেদকে আবার ডাকলেন কর্নেল। শান্ত সুরে নির্দেশ দিলেন তিনি। নির্দেশ শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন আহমেদ। এক পর্যায়ে প্রতিবাদ করতে গেলেন তিনি, খেঁকিয়ে উঠে তাঁকে থামিয়ে দিলেন কর্নেল। তারপর বললেন, 'মনে রাখবেন, জায়গাটা কোন গ্রামের কাছাকাছি হওয়া চলবে না। নিশ্চিত হয়ে নেবেন, কোন সাক্ষী যেন না থাকে। কাজ শেষ করেই রিপোর্ট করবেন আমাকে।'

স্যালুট করে ট্রাকে ফিরে এলেন লেফটেন্যান্ট, ক্যাবে রুবির পাশে উঠে বসলেন। নির্দেশ পেয়ে ট্রাক ছেড়ে দিল ড্রাইভার।

ব্যথায় দিশেহারা বোধ করছে রুবি, সময় সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। উঁচু পথ ধরে ছুটছে ট্রাক, প্রায় অচেতন রুবির মাথা ঘন ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে। মুখটা এত ফুলে আছে, চোখ খুলতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তার। খোলার পর মনে হলো অন্ধ হয়ে গেছে সে। তারপর বুঝতে পারল—না, সূর্য ডুবে গেছে, দ্রুত অন্ধকার হয়ে আসছে চারদিক। তারমানে রাফেল তাকে প্রায় সারাটা দিন কনফারেন্স রুমে আটকে রেখেছিল।

চোখ খুলে উইন্ডস্ক্রীনে তাকিয়ে আছে রুবি, হেডলাইটের আলোয় সামনের পথটা চিনতে পারল না। 'আমাকে আপনারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?' বিড়বিড় করল সে। 'এটা তো গ্রামে ফেরার পথ নয়।'

নিজের সীটে লেফটেন্যান্ট আহমেদ যেন আরও কুঁজো হয়ে গেলেন, কোন কথা বললেন না। ব্যথায় আর ক্লান্তিতে রুবিও আর কোন প্রশ্ন করল না। চোখ বুজে সীটের ওপর নেতিয়ে পড়ল সে।

হঠাৎ ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রাক, ঝাঁকি খেয়ে ঘুম ভাঙল রুবির। কর্কশ কয়েক জোড়া হাত ক্যাব থেকে নামিয়ে হেডলাইটের আলোয় দাঁড় করাল তাকে। হ্যাঁচকা টান দিয়ে হাত দুটো পিছনে আনা হলো, বাঁধা হলো চামড়ার বেল্ট দিয়ে। 'আপনারা আমাকে ব্যথা দিচ্ছেন,' ফুঁপিয়ে উঠল বেচারি।

বাঁধা কব্জি ধরে টান দিল একজন সৈনিক, রাস্তা থেকে সরিয়ে নিয়ে এল রুবিকে। আরও দু'জন সৈনিক পিছু নিল ওদের, হাতে কোদাল। রাস্তা থেকে একশো মিটার দূরে ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর থামল ওরা। একটা গাছের গোড়ায় বসানো হলো তাকে, পাতার ফাঁক দিয়ে গায়ে চাঁদের আলো পড়ছে। ওই আলোতেই রুবি দেখতে পেল তার জন্যে কবর খোঁড়া হচ্ছে। কবর খুঁড়ছে দু'জন লোক, অপর লোকটা তার দিকে রাইফেল তাক করে দাঁড়িয়ে আছে নাগালের ঠিক বাইরে।

'প্লীজ,' ফিসফিস করল রুবি। 'আমাকে মারবেন না!'

কথার জবাব না দিয়ে সৈনিক এক পা এগোল, সবুট লাথি মারল রুবির পাঁজরে। 'একদম চুপ!'

ব্যথার চেয়ে মৃত্যু ভয় বেশি কাহিল করে ফেলল রুবিকে।

কবর খোঁড়া হয়ে গেল। গর্ত থেকে উঠে এল সৈনিক দু'জন। ট্রাক থেকে নেমে এলেন লেফটেন্যান্ট আহমেদ, হাতে একটা টর্চ। টর্চের আলোয় কবরের গভীরতা দেখলেন তিনি। 'গুড। যথেষ্ট গভীর হয়েছে।' টর্চটা নিভিয়ে দিলেন। 'তোমরা সবাই ট্রাকের কাছে চলে যাও। কর্নেল বলে দিয়েছেন, কোন সাক্ষী থাকা চলবে না। গুলির আওয়াজ হলে ফিরে আসবে, কবরে মাটি ফেলতে সাহায্য করবে আমাকে।'

সৈনিকরা ফিরে গেল।

এগিয়ে এসে রুবিকে ধরে দাঁড় করালেন আহমেদ, টেনে আনলেন কবরের কাছে। 'আপনার চাদরটা দিন আমাকে,' বলে নিজেই রুবির গা থেকে খুলে নিলেন সেটা। তারপর লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন কবরের ভেতর। রুবি শুনতে পেল হাত দিয়ে কবরের তলার মাটি নাড়াচাড়া করছেন লেফটেন্যান্ট। তারপর

তার নিচু গলা শুনতে পেল, 'কবরের ভেতর কিছু একটা দেখাতে হবে ওদেরকে। দেখে যাতে মনে হয় লাশ...'

গর্ত থেকে উঠে এসে রুবির পিছনে দাঁড়ালেন আহমেদ। চামড়ার বেল্টটা কব্জি থেকে খুলে ফেলে দিলেন কবরের ভেতর। দিশেহারা রুবি ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'কি করছেন আপনি?' কবরের ভেতর তাকিয়ে দেখল চাদরের ওপর এমন ভাবে মাটি ফেলা হয়েছে, দেখে মনে হবে ভেতরে একটা লাশ আছে।

'প্লীজ, কথা বলবেন না!' চাপা গলায় সতর্ক করে দিলেন আহমেদ। রুবিকে নিয়ে চলে এলেন ঘন একটা ঝোপের ভেতর, বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'এখানে শুয়ে পড়ুন। পালাবার চেষ্টা করবেন না। আমরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত নড়বেন না বা কথা বলবেন না।'

কবরের কাছে ফিরে এসে পিস্তলের ফাঁকা দুটো আওয়াজ করলেন আহমেদ। তারপর তাঁর চিৎকার শুনতে পেল রুবি, 'চলে এসো তোমরা, কাজটা শেষ করি।'

সৈনিকরা কবরের কাছে ফিরে এল। ঝোপের ভেতর থেকে মাটিতে কোদালের কোপ মারার আওয়াজ পেল রুবি, গর্তটা ভরা হচ্ছে। একজন সৈনিক বলল, 'লেফটেন্যান্ট, আপনার টর্চটা জ্বালছেন না কেন? কবরের ভেতরটা তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'মাটি ভরার জন্যে আলো লাগবে কেন?' ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন আহমেদ। 'তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করো। আলগা মাটি সমান করে দেবে, আমি চাই না এখানে এসে কেউ হোঁচট খাক।'

কিছুক্ষণ পর মাটি ভরার কাজ শেষ হলো, ট্রাক নিয়ে ফিরে গেল সৈনিকরা। স্বস্তি, ব্যথা ও ক্লান্তিতে ঝোপের ভেতর শুয়ে কাঁদছে রুবি। আরও কিছুক্ষণ পর হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল সে, একটা গাছ ধরে দাঁড়াল, টলছে।

এতক্ষণে অপরাধবোধটা গ্রাস করল তাকে। ভাবল, শাফির সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, শত্রুপক্ষকে বলে দিয়েছি সব কথা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে গিয়ে তাকে আমার সাবধান করা উচিত।

টলতে টলতে রাস্তার দিকে এগোল রুবি।

টাইটার কোড ভাঙা গেছে কিনা বোঝার একমাত্র উপায় হলো তার তৈরি তালিকায় পাওয়া চাল অনুসারে খেলাটা চালিয়ে যাওয়া। কর্টিল ছকে তৈরি টানেলের শাখা-প্রশাখার ভেতর দিয়ে সাবধানে এগোল [illegible], টাইটার চাল ধরে এগোচ্ছে, সেগুলো সাদা চক দিয়ে এঁকে রাখছে দেয়ালের গায়ে।

ফলকের শীতকাল শিরোনামে আঠারোটা চাল রয়েছে। নিমা যেটাকে প্রথম চাল ধরে নিয়েছে সেখান থেকে বারোটা চাল পর্যন্ত এগোনো সম্ভব হলো। কিন্তু তারপর সামনে পড়ল নিরেট দেয়াল, পরবর্তী চালে পা ফেলার কোন সুযোগ নেই।

'ধ্যেত, এত পরিশ্রম সব বৃথা গেল,' দেয়ালটায় লাথি মেরে বলল রানা।

'দুঃখিত,' চোখ থেকে চুল সরাল নিমা। 'আমারই কোথাও ভুল হয়েছে। দ্বিতীয় কলামের ফিগার উল্টো করে ধরে এগোতে হবে।'

'তারমানে নতুন করে শুরু করো আবার!'

'হ্যাঁ, প্রথম থেকে।'

'খেলাটা যদি ঠিকমত খেলতেও পারি, জানব কিভাবে খেলতে পেরেছি?' জানতে চাইল রানা।

'সূত্র অনুসরণ করে আমরা যদি একটা উইনিং কম্বিনেশনে পৌঁছুতে পারি, সেটা হবে চালমাত, ঠিক আঠারো চালের মাথায়। এরপর আর যুক্তিসঙ্গত কোন চাল থাকবে না, তখন ধরে নিতে হবে খেলাটা আমরা শেষ করতে পেরেছি।'

'ওই পজিশনে পৌঁছে কি পাব আমরা?'

'ওখানে পৌঁছুনোর পর বলতে পারব।' মিষ্টি করে হাসল নিমা। 'হাসিখুশি থাকুন, রানা। কষ্টের মাত্র শুরু হয়েছে।'

টাইটার নোটেশনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির সংখ্যাগুলোর মূল্যমান নতুন করে নির্ধারণ করল নিমা, প্রথমগুলোকে ধরল কাপ মূল্যমানে, দ্বিতীয়গুলোকে ফাইল মূল্যমানে। কিন্তু এভাবে মাত্র পাঁচটা চাল এগোনো গেল, তারপর আর সামনে বাড়ার পথ নেই।

'তৃতীয় সারির প্রতীকগুলোকে আমরা লেভেল পরিবর্তনের চিহ্ন হিসেবে ধরেছি, হয়তো এখানে ভুল হচ্ছে,' বলল রানা। 'আসুন আবার শুরু করি, এবার ওগুলোকে দ্বিতীয় মূল্যমান দিই।'

'তাতে প্রচুর সময় লাগবে,' প্রতিবাদ করল নিমা। 'তারচেয়ে আসুন, নোটেশনের মাঝখানে টাইটা যে-সব উক্তি করেছে সেগুলো আরেকবার পড়ি। দেখা যাক কোন সূত্র বেরোয় কিনা।'

'বেশ।'

'প্রথম কোটেশন,' হায়ারোগ্লিফিক্সে আঙুল রাখল নিমা। পড়ছি–''নাম থাকলে জিনিসটাকে চেনা যায়। নামবিহীন জিনিস শুধু অনুভব করা যায়। পিছনে জোয়ার আর মুখে বাতাস নিয়ে জলপথে ভ্রমণ করেছি আমি। হে, ভালবাসা আমার, তোমার স্বাদ আমার ঠোঁটে মিষ্টি-মধুর''।'

'ব্যস?'

'হ্যাঁ, তারপর পরবর্তী নোটেশন। কাঁকড়া বিছে, দুই আর তিন সংখ্যা, তারপর আবার...'

'জলপথে ভ্রমণ আর ভালবাসা আমার মানে কি?'

এভাবে ফলকের ধাঁধা নিয়ে গবেষণা চলল। রাতদিনের হিসাব ভুলে গেল ওরা, ঘুম আর খিদে গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না। তারপর একদিন বাস্তব জগতে ফিরে এল সিঁড়ির গোড়া থেকে মারটিনের আওয়াজ ভেসে আসায়। ডেস্ক ছেড়ে দাঁড়াল রানা, আড়মোড়া ভেঙে হাতঘড়ি দেখল। 'আটটা বাজে। কিন্তু রাত নাকি দিন জানি না।' ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে দেখতে পেল সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে মারটিন, তার কাপড়চোপড় ভেজা। 'তোমার এ অবস্থা কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'সিঙ্ক-হোলে পড়ে গিয়েছিলে?'

হাতের তালু দিয়ে মুখ মুছল মারটিন। 'কেউ তোমাকে বলেনি? বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে।'

নিমা আর রানা পরস্পরের দিকে আতঙ্ক ভরা দৃষ্টিতে তাকাল। 'এত তাড়াতাড়ি?' ফিসফিস করল নিমা। 'আমাদের হিসেবে তো বর্ষা শুরু হতে আরও এক হপ্তা দেরি আছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল মারটিন। 'ঋতুর পরিবর্তন হয় না?'

'অকাল বর্ষণ নয় তো?' জানতে চাইল রানা। 'নদীর কি অবস্থা? লেভেল উঠতে শুরু করেছে?'

'সে-কথা বলার জন্যেই তো এলাম। বাঁধের ওপর উঠতে যাচ্ছি আমি, বাঘ গ্রুপটাকে নিয়ে। ওটার ওপর নজর রাখা দরকার। যদি দেখি বাঁধ ভেঙে পড়তে যাচ্ছে, একজন রানারকে পাঠাব। তখন কোন তর্ক বা সময় নষ্ট করো না, সেই মুহূর্তে বেরিয়ে যাবে এখান থেকে। আমার লোক পাঠানোর মানে হবে যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরিত হবে বাঁধ।'

'টোরা নাবুকে সঙ্গে নিয়ো না,' নির্দেশ দিল রানা। 'ওকে এখানে আমার দরকার।'

টানেল থেকে বেশিরভাগ শ্রমিককে নিয়ে চলে গেল মারটিন। রানা ও নিমা পরস্পরের দিকে তাকাল, দু'জনেই গম্ভীর।

'আমাদের সময় ফুরিয়ে আসছে, অথচ টাইটার ধাঁধার সমাধান করতে পারছি না,' বলল রানা। 'একটা ব্যাপার নিশ্চিত জানবেন, নদীর লেভেল বাড়তে শুরু করলে...'

কথাটা নিমা শেষ করতে দিল না। 'নদী!' চেঁচিয়ে উঠল। 'সাগর নয়! অনুবাদে ভুল করেছি আমি। শব্দটার অনুবাদ করেছি– "জোয়ার"। ধরে নিয়েছিলাম টাইটা সাগরের কথা বলতে চাইছে। কিন্তু আসলে হবে স্রোত বা প্রবাহ। মিশরীয়রা দুটোর মধ্যে কোন পার্থক্য করে না।'

দু'জনেই ওরা ডেস্কে পড়ে থাকা নোটবুকের কাছে ছুটে এল। 'পড়ছি আবার–"পিছনে স্রোত আর মুখে বাতাস নিয়ে জলপথে ভ্রমণ করেছি..."।' মুখ তুলে নিমার দিকে তাকাল রানা।

'নীলনদে, জলপথে মানে নীলনদে,' বলল নিমা। 'জোরাল বাতাস সব সময় উত্তরদিক থেকে আসছে, আর স্রোত সব সময় দক্ষিণ দিক থেকে বয়। টাইটা উত্তর দিকে মুখ করে ছিল। উত্তর দুর্গ।'

'কিন্তু আমরা ধরে নিয়েছিলাম উত্তরের প্রতীক বেবুন,' ওকে মনে করিয়ে দিল রানা।

'না! আমার ভুল হয়েছে!' অনুপ্রেরণায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে নিমার চেহারা। 'শুনুন–"হে, ভালবাসা আমার, তোমার স্বাদ আমার ঠোঁটে মিষ্টি-মধুর"। মধু! মৌমাছি! উত্তর আর দক্ষিণের প্রতীকচিহ্ন আমি উল্টোপাল্টা করে ফেলেছিলাম।'

'আর পুব ও পশ্চিম? ওখানে কি পাচ্ছি আমরা?' নতুন উদ্যমে অনুবাদে মনোযোগ দিল রানা। 'পড়ছি–"আমার পাপ গোলাপের মতই টকটকে লাল। ওগুলো আমাকে বেঁধে রেখেছে ব্রোঞ্জের মত শেকল দিয়ে। ওগুলো আমার হৃদয়ে জ্বালাময়ী খোঁচা দেয়, এবং আমি চোখ ফেরাই সন্ধ্যা তারার দিকে"।'

'এখানে কি ভুল করলাম বুঝতে পারছি না...'

'খোঁচা শব্দটা ভুল অনুবাদ,' বলল রানা। 'হওয়া উচিত বিদ্ধ করে বা কামড় দেয়। কাঁকড়া বিছে কামড় দেয়। কাঁকড়া বিছে তাকিয়ে আছে সন্ধ্যা তারার দিকে। সন্ধ্যা তারা সব সময় পশ্চিমে দেখা যায়। কাঁকড়া বিছে হলো পশ্চিম দুর্গ, পুবদিকের দুর্গ নয়।'

'বোর্ডটাকে উল্টো করে দেখতে হবে!' উত্তেজনায় লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল নিমা। 'চলুন নতুন নিয়মে খেলি।'

'লেভেল সম্পর্কে এখনও কোন সিদ্ধান্তে আসিনি আমরা,' প্রতিবাদ করল রানা। 'সিস্ট্রাম কি আপার লেভেল, নাকি তিন তলোয়ার?'

'ব্রেকথ্রু যখন ঘটেছে, এটা ধরেই এগোতে হবে আমাদের। সিস্ট্রামকে আপার লেভেল ধরে খেলব আমরা, তাতে কাজ না হলে আরেক ভাবে চেষ্টা করা যাবে।'

কাজটা আগের চেয়ে সহজ লাগল। বহুবার আসা-যাওয়া করায় পরিচিত হয়ে উঠেছে, এখন আর আগের মত গা ছমছমও করে না। টানেলের প্রতিটি কোণে, মোচড়ে, বাঁকে আর টি-জাংশনে রানার হাতের চক দিয়ে লেখা চিহ্ন রয়েছে। জটিল বাঁক আর মোচড় ঘুরে দ্রুত এগোতে পারছে ওরা। প্রতিটি নোটেশন অনুসরণ করে এগোতে পারছে দেখে উৎসাহ আর উত্তেজনা বেড়ে গেল, সামনে কোন বাধা পাচ্ছে না।

'আঠারোতম চাল,' কেঁপে গেল নিমার গলা। 'এটা যদি আমাদেরকে খোলা ফাইলগুলোর একটায় নিয়ে যেতে পারে, যেটা প্রতিপক্ষের দক্ষিণ দুর্গের জন্যে হুমকি, তাহলে সেটা হবে চেক কু।' বড় করে শ্বাস টানল ও। 'পাখি। তিন আর পাঁচ নম্বর। সঙ্গে লোয়ার লেভেলের প্রতীক তিন তলোয়ার।'

গুনে গুনে পা ফেলে পাঁচটা জাংশন পেরিয়ে এল ওরা, নেমে এল গোলকধাঁধার সবচেয়ে নিচের লেভেলে, প্রতিটি মোড়ের পাথরের ব্লকে চক দিয়ে আঁকা চিহ্নগুলো পড়ে নিজেদের পজিশন সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে।

'এটাই!' নিমাকে বলল রানা, দাঁড়িয়ে পড়ল দু'জনে, নিজেদের চারদিকে তাকাল।

'অসাধারণ কিছুই এখানে নেই,' নিমার গলায় হতাশার সুর। 'এর আগে অন্তত পঞ্চাশবার এখান দিয়ে আসা-যাওয়া করেছি আমরা। এটাও আর সব বাঁকের মত।'

'টাইটা চেয়েছেও তাই, আমরা যাতে পার্থক্যটা বুঝতে না পারি।'

'এখন তাহলে কি করব আমরা?' এই প্রথম দিশেহারা দেখাল নিমাকে।

'ফলকের শেষ লেখাটা পড়ুন তো।'

হাতের নোটবুক খুলল নিমা। পড়ছি–"মিশরের এই পবিত্র আর কালো মাটিতে ফসলের কোন কমতি নেই। আমি আমার গাধার পাঁজরে চাবুক মারলাম, লাঙলের কাঠের ফলা নতুন জমিন গুঁড়ো করল। আমি বীজ বপন করলাম, ঘরে তুললাম আঙুর আর শস্যদানা। সময় মত আমি মদ্য পান করলাম আর রুটি খেলাম। মরুভূমের ছন্দ মেনে চলি আমি, জমিনের যত্ন নিই"।'

মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল নিমা। 'মরুভূমের ছন্দ? টাইটা কি ফলকের

চারটে মুখের কথা বলছে? জমিন?' প্রশ্ন করে পায়ের সামনে পাথরের দিকে তাকাল। 'জমিন কি পায়ের নিচে নয়, রানা?'

পাথরের ফলকে পা ঠুকল রানা, কিন্তু আওয়াজটা হলো ভোঁতা আর নিরেট। 'জানার একটাই উপায় আছে।' তারপর গলা চড়িয়ে হাঁক ছাড়ল, 'নাবু! এদিকে এসো!'

বৃষ্টির মধ্যে হলুদ ফ্রন্ট এন্ড লোডার-এর উঁচু সীটে বসে বাঘ গ্রুপটাকে গালিগালাজ করছে মারটিন, আবার হাসছেও, কারণ জানে তার গালাগালির একটা শব্দও ওরা বুঝতে পারছে না। ইতিমধ্যে বৃষ্টির মাত্রা কমে গেছে, তবে পাহাড় চূড়ার মাথায় বিশাল এলাকা জুড়ে কালো আর ভারী হয়ে আছে মেঘ। সত্যিকার অর্থে বর্ষা মরশুম শুরু হয়নি; প্রবল বাতাস বইছে, মেঘগুলো সরে গেলেও যেতে পারে।

তবে নদী ওপরে উঠছে। বাতাস থেমে গেলে তুমুল বৃষ্টি শুরু হবে। তখনকার বিপদের কথা ভেবেই বাঁধের ওপর গ্যাবিয়ন ফেলে আরও উঁচু করা হচ্ছে ওটা। জালে পাথর ভরা হচ্ছে, বাঘের বাচ্চারা সেগুলো বয়ে এনে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখছে, মারটিন সেগুলো তার ট্র্যাক্টরের ক্রেনে তুলে নিয়ে বাঁধের মাথায় নামাচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই, নদীর পানিকে কোনভাবেই বাঁধের মাথায় উঠতে দেয়া যাবে না। তা যদি একবার উঠতে পারে, এই বাঁধ খড় কুটোর মত ভেসে যাবে, কারও সাধ্য নেই ঠেকিয়ে রাখে। আর বৃষ্টি যদি একবার শুরু হয়, নদীকে বশে রাখাও সম্ভব হবে না।

মারটিন জানে বিপদ ঘটতে শুরু করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা চলবে না, কারণ তখন রানাকে খবর পাঠিয়েও কোন লাভ নেই। বাঁধ ভাঙা পানির সঙ্গে দৌড়ে রানার কাছে আগে পৌঁছুতে পারবে না কোন রানার। ব্যাপারটা এখন সূক্ষ্ম বিবেচনার। ওর সতর্ক মন বলছে, রানাকে সাবধান করার এখনই সময়। টানেল থেকে এখুনি ওদের বেরিয়ে আসা উচিত।

তবে এ-ও মারটিন জানে যে টানেলের ভেতর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে ওরা, সময়ের আগে টানেল থেকে ডেকে নিলে ক্ষতি তো হবেই, তার ওপর রেগেও যাবে রানা।

মারটিন সিদ্ধান্ত নিল, নদীর ওপর নজর রেখে আরও এক ঘণ্টা অপেক্ষা করবে সে। নদীর কিনারা ধরে ট্র্যাক্টর নিয়ে এগোল, আরেকটা গ্যাবিয়ন নামাবে বাঁধের মাথায়।

টোরা নাবু আর তার কয়েকজন লোকের সঙ্গে রানাও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। গোলকধাঁধার এটা সবচেয়ে নিচের লেভেল, মেঝে থেকে একটা একটা করে তুলে ফেলা হচ্ছে প্যাব বা ফলক। ওগুলোর মাঝখানের জয়েন্ট এত আঁটসাঁট যে এমন কি ক্রেন-বার দিয়ে আলাদা করতেও হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ওরা। সময় বাঁচানোর জন্যে নিজেদের তৈরি পেজ-হ্যামার দিয়ে ফলকগুলো ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিতে হলো রানাকে।

শ্রমিকরা অক্লান্ত পরিশ্রম করলেও, সবারই চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ লেগে আছে, কারণ তারা জানে পিরিখাদের মাথায় নদীর লেভেল ওপরে উঠতে শুরু করেছে। রানার জন্যে খারাপ খবর হলো, টোরা নাবুর ষোলোজন শ্রমিক ডিউটিতে আসেনি। সন্দেহ নেই, পালিয়েছে তারা।

টানেলের বাঁক থেকে ফলক ভাঙতে শুরু করেছে ওরা। ভাঙা হচ্ছে বাঁকের দু'দিকের মেঝেই। একটা করে ফলক ভাঙা হয়, নিচে কোন দরজা বা ধাপ দেখার আশায় দম ধরে রাখে রানা। কিন্তু হতাশ হতে হয়, নিচে নিরেট পাথর ছাড়া আর কিছু নেই।

কাজ থামিয়ে পানি খেতে এসে নিমাকে বলল ও, 'আশা করার মত কিছু দেখছি না।'

নিমা উত্তরে কিছু বলার আগেই নাবুর চিৎকার ভেসে এল, 'স্যার, দেখে যান!'

হাত থেকে পানির ফ্লাস্কটা ফেলে দিয়ে ছুটল নিমা, খেয়ালই করল না যে ওটা ভেঙে গিয়ে ওর পা ভিজিয়ে দিল। নাবুর পাশে এসে দাঁড়াল সে। হ্যামার ওপর তুলে আরেকটা আঘাত করার জন্যে তৈরি নাবু। 'কি...কি...,' থেমে গেল নিমা, ইতিমধ্যে ওর পাশে চলে এসেছে রানাও। দু'জনেই দেখল, সদ্য ভাঙা একটা ফলকের নিচে সাধারণ কোন পাথর নয়, ড্রেস করা আরেকটা ফলক রয়েছে।

তারপর দেখা গেল সাজানো ফলকের আরও একটা স্তর রয়েছে মেঝের নিচে, টানেলের এক দেয়াল থেকে আরেক দেয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত। ফলকগুলো চারপাশের পাথরের সঙ্গে জোড়া লাগানো, জয়েন্টগুলো এত সরু যে প্রায় চোখেই পড়ে না। কিনারাগুলো মসৃণ ও সমান, কোন রকম খোদাই বা চিহ্ন নেই। 'কি ব্যাপার, রানা?' জিজ্ঞেস করল নিমা।

'বোঝাই যাচ্ছে, আরেকটা স্তর, নিচে হয়তো কোন ফাঁক আছে। না তোলা পর্যন্ত বোঝা যাবে না।'

দ্বিতীয় স্তরের ফলক এত চওড়া আর শক্ত যে ওদের হাতুড়ি দিয়ে ভাঙা সম্ভব হলো না। অগত্যা বাধ্য হয়ে প্রথম ফলকের চারধারে জয়েন্ট বরাবর গভীর খাল কেটে আলাদা করতে হলো প্রথমে, তারপর তুলে ফেলা হলো। ভিত থেকে একটা প্রান্ত তুলতে পাঁচজন লোককে হাত লাগাতে হলো।

'ফলকটার নিচে একটা ফাঁক আছে।' হাঁটু গেড়ে উঁকি দিল নিমা। 'খোলা শ্যাফটের মত।'

একটা ফলক তোলার পর বাকিগুলো তোলার কাজ সহজ হয়ে গেল। অবশেষে চৌকো ফাঁকটার সবটুকু উন্মোচিত হলো। অন্ধকার শ্যাফটের ভেতর ল্যাম্পের আলো ফেলল রানা। ভেতরের ফাঁক টানেলের এক দেয়াল থেকে আরেক দেয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত, নিচের প্রথম ধাপে পা রাখার পর সিধে হয়ে দাঁড়াতে রানার কোন অসুবিধে হলো না, বাকি ধাপগুলো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী বাঁক নিয়ে নেমে গেছে। 'আরেকটা সিঁড়ি,' বলল ও। 'বোধহয় এটাই সেটা। ভুল পথ দেখাতে দেখাতে এমন কি টাইটারও এতক্ষণে ক্লান্ত হয়ে পড়ার কথা।'

শ্রমিকরা সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, তবে জানে বোনাস হিসেবে অতিরিক্ত

সিলভার ডলার পাবে তারা।

'আমরা কি এখুনি নিচে নামছি?' জানতে চাইল নিমা। 'জানি ফাঁদ থাকতে পারে, সাবধান হওয়া দরকার; কিন্তু সময় তো ফুরিয়ে যাচ্ছে।'

'ফাঁদ থাকুক আর নাই থাকুক, আজ আমাদের ঝুঁকি নেয়ার দিন,' বলল রানা।

পাশাপাশি নামছে ওরা। প্রতিবার সাবধানে একটা করে পা ফেলছে। হাতের ল্যাম্প মাথার ওপর উঁচু করে ধরেছে রানা। নিমা বলল, 'নিচে একটা চেম্বার দেখা যাচ্ছে।'

'মনে হচ্ছে স্টোররুম,' ফিসফিস করল রানা। 'দেয়াল ঘেঁষে সাজানো কি ওগুলো?' সংখ্যায় কয়েকশো হবে। 'ককিন, সারকফাগাস?' গাঢ় আকৃতিগুলো প্রায় মানুষেরই আদল, কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একের পর এক অনেকগুলো সারি। চেম্বারটা চৌকো।

'না,' বলল নিমা। 'একদিকে ওগুলো শস্য রাখার বাস্কেট, আমি চিনতে পারছি। আরেকদিকে দুই হাতলঅলা জার, মদ রাখার জন্যে। সম্ভবত মৃত লোককে দান করা হয়েছে।'

'এটা যদি ফিউনারাল স্টোররুম হয়ে থাকে,' উত্তেজনায় খাঁটসাঁট গলায় বলল রানা, 'ধরে নিতে হয় সমাধির খুব কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা।'

'হ্যাঁ!' চেঁচিয়ে উঠল নিমা। 'দেখুন–স্টোররুমের শেষ মাথায় একটা দরজা। ওদিকে আলো ফেলুন!'

চেম্বারের এক প্রান্তে ফাঁকটা দেখা গেল, যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওদের। শেষ ধাপ ক'টা ছুটে পার হলো ওরা। কিন্তু স্টোররুমের লেভেল ফ্লোরে পৌঁছুতেই অদৃশ্য একটা বাধা থামিয়ে দিল ওদেরকে। ছিটকে পিছন দিকে পড়ল দু'জনেই।

'ও আল্লাহ!' নিজের গলা খামচে ধরেছে রানা, কর্কশ শোনাল আওয়াজটা। 'পিছিয়ে আসুন! পিছিয়ে আসুন!'

হাঁটু গেড়ে প্রায় ঢলে পড়ার অবস্থা হলো নিমার, বাতাসের অভাবে সে-ও ভুগছে। 'রানা!' চিৎকার দিতে চাইছে, কিন্তু সমস্ত বাতাস আটকে গেছে ফুসফুসে। বুকে প্রচণ্ড একটা চাপ অনুভব করছে ও। 'রানা! আমাকে বাঁচান!' দম বন্ধ হয়ে মারা যাবার অবস্থা হয়েছে ওর, ডাঙার তোলা মাছের মত খাবি খাচ্ছে।

নিমার ওপর ঝুঁকল রানা, দু'হাতে ধরে তুলতে চেষ্টা করল। পারছে না, সাংঘাতিক কাহিল লাগছে নিজেকে। পা দুটো হাঁটুর কাছে ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে, নিজের ওজনই বইতে পারছে না। ও জানে, দম আটকে মারা যাচ্ছে ওরা। চার মিনিট, ভাবল ও। চার মিনিটের মধ্যে তাজা বাতাস না পেলে মৃত্যু ঘটবে মস্তিষ্কের।

নিমার পিছনে দাঁড়াল রানা, ওর বগলের তলা দিয়ে গলিয়ে হাত দুটো এক করল, তারপর আবার ওকে তুলতে চেষ্টা করল। কিন্তু ওর সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। পিছন দিকে ঢলে পড়ছে ও, ধাপের ওপর। সমস্ত মনোবল এক করে নিজেকে স্থির রাখতে চাইছে। আবার নিমাকে তুলতে চেষ্টা করল। কিভাবে পারল বলতে পারবে না, শুধু খেয়াল করল ধাপ বেয়ে পিছু হটছে ও, বুকের সঙ্গে

লেপ্টে রয়েছে নিমা। প্রতিটি পা ফেলতে অবশিষ্ট সবটুকু শক্তি লাগছে। আগেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে নিমা, রানার বৃত্তাকার বাহুবন্ধনে ঝুলছে, অসাড় পা দুটো পাথুরে ধাপের ওপর ঘষা খাচ্ছে।

চিৎকার করতে চাইছে রানা, নাবুকে বলতে চাইছে সাহায্য করো। কিন্তু গলা থেকে কোন আওয়াজই বের করতে পারল না। আরও পাঁচ ধাপ উঠে এল। বুঝতে পারছে, নিমার ভার বহন করা ওর পক্ষে আর সম্ভব নয়। সেই সঙ্গে এ-ও জানে, ওকে যদি এখানে ফেলে যায়, কিছুতেই বাঁচবে না। আরও পাঁচ ধাপ উঠল। তারপর পড়ে গেল রানা। ধাপের ওপর আড়ষ্টভঙ্গিতে শুয়ে আছে, বুকের ওপর নিমা। 'শ্বাস নিতে দাও, আল্লাহ শ্বাস নিতে দাও!' গলায় আওয়াজ নেই, শুধু ঠোঁট দুটো নড়ছে। প্লীজ, গড...'

যেন ওর প্রার্থনা শুনেই ছুটে এল তাজা বাতাস, নাক-মুখ গলে ফুসফুসে পৌঁছে গেল। সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা শক্তি ফিরে এল। নিমাকে আবার জড়িয়ে ধরল রানা, সিধে হলো টলতে টলতে। এবার সিঁড়ির মাথার দিকে মুখ করে উঠছে রানা, ফাঁকটার মাথায় পৌঁছে গেল, টোরা নাবুর পায়ের কাছে।

'কি ব্যাপার, স্যার? কি হয়েছে আপনাদের?' উদ্বিগ্ন নাবু জানতে চাইল।

টানেলের মেঝেতে নিমাকে শুইয়ে দিল রানা, জবাব দেয়ার শক্তি নেই। নিমার গালে চাপড় মারল ও। 'কথা বলুন, নিমা! কথা বলুন!'

নিমা সাড়া দিচ্ছে না। কাজেই ওর ওপর ঝুঁকল রানা, মুখটা নিজের মুখ দিয়ে চেপে ধরল, ফুঁ দিল ভেতরে। চোখের কোণ দিয়ে দেখল, নিমার বুক ফুলছে।

মাথা তুলল রানা, তিন পর্যন্ত গুনল। 'প্লীজ, ডার্লিং, প্লীজ! শ্বাস নিন!' মড়ার মত চেহারায় কোন রঙ ফুটছে না। আবার ঝুঁকল ও, মুখে মুখ চেপে ফুঁ দিল। নিমার ফুসফুস ভরে গেল আবার, এবার রানার নিচে নড়ে উঠল ও। 'গুড গার্ল! লক্ষ্মী মেয়ে!'

তৃতীয় বার ফুঁ দেয়ার পর রানাকে ঠেলে নিজের ওপর থেকে সরিয়ে দিল নিমা, আড়ষ্টভঙ্গিতে উঠে বসল, বোকার মত তাকাল চারদিকে. রানার ওপর চোখ পড়তে অবাক হয়ে জানতে চাইল, 'রানা, কি ঘটেছে?'

'ঠিক জানি না। তবে দু'জনেই মারা যাচ্ছিলাম। এখন কেমন লাগছে আপনার?'

'মনে হচ্ছিল অদৃশ্য একটা হাত আমার গলা চেপে ধরেছে। শ্বাস নিতে পারছিলাম না, তারপর জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।'

'প্যাসেজের লোয়ার লেভেলে কোন ধরনের গ্যাস আছে। আপনি অজ্ঞান ছিলেন মিনিট দুয়েক।'

কপালে হাত দিল নিমা। 'ব্যথা করছে। শুনতে পাচ্ছিলাম আপনি আমার নাম ধরে ডাকছেন। আপনি আমাকে ডার্লিং বলেছেন...নাকি ভুল শুনলাম?'

'সামান্য লিপ অভ টাং,' হাত ধরে নিমাকে দাঁড় করাল রানা। তারপরও টলছে ও, হেলান দিল রানার গায়ে।

'ধন্যবাদ, রানা। ঋণের বোঝা শুধু বাড়ছেই। জানি না কোনদিন শোধ করতে পারব কিনা।'

'সে দেখা যাবে।' স্মিত হাসি লেগে রয়েছে রানার ঠোঁটে।

হঠাৎ নিমা খেয়াল করল, চারপাশের লোকজন ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। রানার গা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ও। 'কি ধরনের গ্যাস, রানা? গ্যাস ওখানে এলোই বা কোত্থেকে? আপনার কি ধারণা, এটাও টাইটার আরেকটা চালাকি?'

'সম্ভবত কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেনও হতে পারে। মিথেনও তো বাতাসের চেয়ে ভারী, তাই না?'

'এল কোত্থেকে?'

'পচা লাশ থেকে তৈরি হতে পারে,' বলল রানা। 'তবে ওই বাস্কেট আর জারগুলোকে সন্দেহ হচ্ছে আমার। ওগুলোর ভেতরে কি আছে জানার পর বুঝতে পারব। কেমন লাগছে এখন? মাথার ব্যথাটা কমেছে?'

'আমি ভাল আছি। এখন আমরা কি করব, রানা?'

'চেম্বার থেকে গ্যাস পরিষ্কার করতে হবে,' বলল রানা। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

শ্যাফটের গ্যাস লেভেল পরীক্ষা করার জন্যে মোমবাতি ব্যবহার করল রানা। ডান হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নামছে। নামার সময় হাতের বাতিটা মেঝের দিকে নিচু করল, প্রতিবার এক ধাপ করে নামছে। ভালই জ্বলছে বাতি, নাচানাচি করছে শিখাটা। তারপর চেম্বারের মেঝে থেকে ছ'টা ধাপ ওপরে থাকতে, শিখাটা হলুদ হয়ে গেল, নিভে গেল দপ করে। দেয়ালে চক দিয়ে দাগ কাটল রানা। 'না, মিথেন নয়,' বলল ও। 'কার্বন ডাইঅক্সাইডই।'

শ্যাফটের মাথা থেকে নিমা বলল, 'মিথেন হলে বুঝি বিস্ফোরণ ঘটত?' হেসে উঠল ও।

'নাবু, ব্লোয়ার ফ্যানটা নিয়ে এসো,' বলল রানা।

হাতে ফ্যানটা নিয়ে দম আটকাল রানা, নিচের ধাপটায় নেমে এসে চেম্বারের মেঝেতে রাখল ওটা। ফ্যান চালু করেই ছুটে ফিরে এল দেয়ালে দাগ কাটা জায়গাটার ওপরে। নিমার প্রশ্নের উত্তরে জানাল, 'পনেরো মিনিট পর পর টেস্ট করতে হবে।'

গ্যাস সরাতে এক ঘণ্টা লেগে গেল। চেম্বারে নেমে এখন ওরা শ্বাস নিতে পারছে। রানার নির্দেশে কিছু জ্বালানি কাঠ নিয়ে এল নাবু, চেম্বারের মাঝখানে আগুন জ্বালা হলো। আঁচ পেয়ে বাতাস আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। এরপর নিমাকে নিয়ে বাস্কেটগুলো পরীক্ষা করল রানা।

'ব্যাটা অতি চালাক!' বলল রানা। 'নানা জিনিস মিশিয়ে সার তৈরি করে রেখে গেছে।'

চেম্বারের আরেক দিকে চলে এল ওরা, মাটির একটা জার কাত করে খানিকটা পাউডার ঢালল মেঝেতে। আঙুলে নিয়ে ঘষা দিল রানা, তারপর শুঁকল। 'লাইমস্টোনের গুঁড়ো। অনেক আগে শুকিয়ে যাওয়ায় গন্ধ হারিয়ে ফেলেছে, তবে টাইটা সম্ভবত কোন ধরনের অ্যাসিডে ভিজিয়ে রেখেছিল। সম্ভবত ভিনিগার, আবার প্রস্রাবও হতে পারে। এ থেকেই কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়েছে।'

'তারমানে এটাও তাহলে একটা ফাঁদ ছিল,' বলল নিমা।

'এত হাজার বছর আগেও টাইটা পচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানত। ওই মিশ্রণ থেকে কি ধরনের গ্যাস তৈরি হবে জানা ছিল তার। ব্যাটাকে বিরাট কেমিস্ট বলতে আমার আপত্তি নেই।'

'আর বাতাস যেহেতু এখানে স্থির, এ-ও জানত যে চেম্বারের মেঝেতে ভেসে থাকবে গ্যাস, ওপরে উঠবে না। আমি ধরে নিচ্ছি এই শ্যাফটের ডিজাইন করা হয়েছে একটা ইউ-ট্র্যাপ-এর আদলে। বাজি ধরে বলতে পারি, ওই প্যাসেজও ক্রমশ ওপর দিকে উঠে গেছে...,' হাত তুলে আরেক প্রান্তের দরজা বা ফাঁকটা রানাকে দেখাল নিমা। 'প্রথম ধাপটা এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি আমি।'

চার

নদীর কিনারায় পাথরের উঁচু স্তূপ তৈরি করেছে মারটিন, লেভেল মনিটর করার জন্যে। ওগুলোর ওপর কড়া নজর আছে তার।

বৃষ্টি বন্ধ হবার পর ছ'ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। পাহাড় চূড়ায় মেঘ সরে গেছে, তবে উত্তর দিগন্তে নতুন করে জমা হচ্ছে আবার। ওদিকে, হাইল্যান্ডে, যে-কোন মুহূর্তে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হবে। তা যদি হয়, মারটিন ভাবছে, এখানে অ্যাবে গিরিখাদে বন্যার পানি পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে কে জানে।

ট্র্যাক্টর থেকে নেমে নদীর পাড় ধরে নিচে নামল সে, স্টোন মার্কার পরীক্ষা করবে। গত এক ঘণ্টায় পানির লেভেল এক ফুটের মত নেমেছে। তবে নিজেকে খুশি হতে নিষেধ করল সে–কারণ, নদীর লেভেল এক ফুট উঁচু হতে মাত্র পনেরো মিনিট লেগেছিল। চূড়ান্ত বর্ষণ আসন্ন। অমোঘ নিয়তির মত, এড়াবার উপায় নেই। নদী ফুলে-ফেঁপে উঠবে। বিস্ফোরিত হবে বাঁধ। ভাটির দিকে ফিরে বাঁধটা দেখল সে। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে।

চরম মুহূর্তটা পিছিয়ে দেয়ার জন্যে যতটুকু তার পক্ষে সম্ভব, করেছে মারটিন। বাঁধের পাঁচিল প্রায় চার ফুট উঁচু করেছে সে। পাঁচিলের পিছনে আরেক প্রস্থ অবলম্বন তৈরি করেছে, বাঁধটাকে আরও খানিক পোক্ত করার জন্যে। আর কিছু করার নেই তার। এখন শুধু অপেক্ষা করতে পারে।

পাড় বেয়ে উঠে এসে হলুদ ট্র্যাক্টরের গায়ে হেলান দিল মারটিন, শ্রমিকদের দিকে তাকাল। রণক্লান্ত সৈনিকদের মত লাগছে ওদেরকে। নদীকে ঠেকিয়ে রাখতে আজ দু'দিন ধরে খাটছে ওরা, প্রত্যেকেই ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। ওদেরকে আবার কাজ করতে বলাটা হবে অমানবিক। এরপর নদী হামলা করলে পরাজয় মেনে নিতে হবে।

কয়েকজন শ্রমিক আড়ষ্ট ভঙ্গিতে উঠে বসে উজানের দিকে তাকাল। বাতাসে অস্পষ্টভাবে ভেসে এল তাদের গলা। কিছু একটা কৌতূহলী ও উত্তেজিত করে তুলেছে তাদেরকে। ট্র্যাক্টরের ওপর উঠে কপালে হাত রেখে রোদ ঠেকাল মারটিন। এসকার্পমেন্টের দিক থেকে ট্রেইল ধরে এগিয়ে আসছে পরিচিত একজন

মানুষ। ক্যামো ফেটিগ পরা, হাঁটার ভঙ্গিতে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস। অ্যালান শাফি। তার সঙ্গে দু'জন কোম্পানী কামান্ডারও রয়েছে।

কাছাকাছি এসে শাফি জানতে চাইল, 'মারটিন, তোমার বাঁধের খবর কি? পাহাড়ে বৃষ্টি শুরু হতে যাচ্ছে। নদীটাকে বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে বলে তো মনে হয় না।'

ট্র্যাক্টর থেকে লাফ দিয়ে নেমে শাফির সঙ্গে করমর্দন করল মারটিন। 'তুমি যেমন রানার বন্ধু, আমিও তেমনি। বন্ধুর জন্যে যতটুকু পারা যায় করছি। তবে তোমার কথাই ঠিক, ডানডেরাকে বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারব না।'

'আমি শুধু নদীকে নিয়ে চিন্তিত নই,' বলল শাফি। 'খবর পেয়েছি সরকারী বাহিনী হামলা করার জন্যে পজিশনে চলে আসছে। আমার কাছে তথ্য আছে, ডেবরা মারিয়াম থেকে পুরো একটা ব্যাটালিয়ন রওনা হয়েছে। আরেকটা ফোর্স আসছে সেন্ট ফ্রুমেনটিয়াস মঠের নিচে থেকে, উঠে আসছে অ্যাবে রিভার ধরে।'

'সাঁড়াশি আক্রমণ, তাই না?'

'আমরা সংখ্যায় কম,' বলল শাফি। 'আক্রমণ শুরু হলে কতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারব জানি না। আমার লোকেরা গেরিলা, সেট-পিস ব্যাটলে অভ্যস্ত নয়। আমাদের কৌশল হলো হিট অ্যান্ড রান। আমি তোমাকে বলতে এসেছি, নোটিশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত পালাবার জন্যে তৈরি থাকতে হবে।'

'আমার জন্যে তোমাকে বেশি চিন্তা করতে হবে না, ছুটে পালাতে ওস্তাদ আমি। রানা আর মিস নিমাকে নিয়ে চিন্তা করো, টানেলের ভেতর না আটকা পড়ে।'

'ওদের কাছেই যাচ্ছি,' বলল শাফি। 'একটা ফল-ব্যাক পজিশনের ব্যবস্থা করতে চাই। যুদ্ধ শুরুর পর আমরা যদি পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি, আবার আমাদের দেখা হবে মঠে লুকানো বোটের কাছে।'

'ঠিক আছে, শাফি–' হঠাৎ থেমে গেল মারটিন, চারজনই ওরা মুখ তুলে ট্রেইলের দিকে তাকাল। পাড়ের কাছে লোকজনকে উত্তেজিত দেখাচ্ছে। 'কি ব্যাপার?'

'আমার একটা পেট্রল ফিরে আসছে।' চোখ সরু করল শাফি। 'নিশ্চয়ই নতুন কিছু ঘটেছে।' তারপরই তার চেহারা বদলে গেল। গেরিলারা একটা স্ট্রেচার বয়ে আনছে। স্ট্রেচারে কাত হয়ে রয়েছে ছোট ও হালকা একটা দেহ।

শাফিকে ছুটে আসতে দেখে স্ট্রেচারের ওপর উঠে বসল রুবি। স্ট্রেচারটা মাটিতে নামিয়ে রাখল গেরিলারা। সেটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল শাফি, দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল রুবিকে। কথা না বলে পরস্পরকে অনেকক্ষণ ধরে থাকল ওরা। তারপর রুবির মুখটা দু'হাতের তালুতে ভরে ক্ষতগুলো খুঁটিয়ে দেখল শাফি। গোটা মুখ ফুলে উঠেছে, এরইমধ্যে পুঁজ জমেছে কয়েকটা ক্ষতের মুখে। চোখের পাতায় ফোস্কা পড়েছে। 'কে করল? কার কাজ?' নরম সুরে জানতে চাইল সে।

পোড়া ঠোঁট নাড়ল রুবি, আবেগে আর অভিমানে আহত পশুর মত দুর্বোধ্য আওয়াজ বেরুল শুধু। তারপর বলতে পারল, 'ওরা আমাকে সব কথা…'

'না, কথা বলো না,' বাধা দিল শাফি, দেখল রুবির নিচের ঠোঁট কেটে গিয়ে তাজা রক্ত বেরিয়ে আসছে। 'তোমার দোষ নেই।'

'বাধা দিয়ো না, আমাকে বলতে হবে,' ফিসফিস করল রুবি। 'ওরা আমাকে কথা বলতে বাধ্য করেছে। তোমার গেরিলাদের সংখ্যা, এখানে রানার সঙ্গে তুমি কি করছ, সব কথা বলে ফেলেছি। দুঃখিত, শাফি। আমি তোমার সঙ্গে বেঈমানী করেছি...'

'কে দায়ী? কে তোমার এই অবস্থা করল?'

'কর্নেল ঘুমা আর প্রক্সির আমেরিকান লোকটা, রাফেল।'

আলতো আলিঙ্গনে আবার রুবিকে জড়াল শাফি, তবে তার চোখ দুটো থেকে আগুন ঝরছে।

টানেলের লোয়ার চেম্বার পুরোপুরি গ্যাসমুক্ত হয়েছে। মেঝের মাঝখানে এখনও জ্বলছে আগুনটা, উত্তপ্ত বাতাস সিঁড়ি হয়ে ওপরের টানেলে বেরিয়ে গেছে, অক্সিজেন-সমৃদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে মিশে গ্যাস তার ক্ষতি করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছে নিমা, রানার পিছু নিয়ে আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠছে ও।

চল্লিশটা ধাপ বেয়ে চেম্বারটায় নেমেছিল ওরা, হুবহু একই রকম আরেক প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে। ওদের মাথা চল্লিশতম ধাপের সঙ্গে একই লেভেলে আসার পর হাতের ল্যাম্পটা উঁচু করে সামনে কি আছে দেখার চেষ্টা করল রানা। সুবিশাল এক তোরণের ভেতর ছড়িয়ে পড়ল আলো, রঙিন সব বিচিত্র আকৃতি আর নকশায় ধাঁধিয়ে গেল ওদের চোখ, যেন বৃষ্টির পর মরুভূমির একটা মাঠে অপরূপ সব ফুল ফুটেছে। গম্বুজ আকৃতির জায়গাটার চারদিকের দেয়ালে বিচিত্র সব পেইন্টিং, এত সুন্দর আর নিখুঁত যে দম বন্ধ হয়ে এল।

'টাইটা!' ভাঙা ও কাঁপা আওয়াজ বেরুল নিমার গলা থেকে। 'এগুলো তার আঁকা। টাইটার বৈশিষ্ট্যই আলাদা, চিনতে আমি ভুল করি না। তার কাজ যেখানেই দেখি, চিনতে পারব।'

ওপরের ধাপটায় দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে তিনদিকে তাকাচ্ছে ওরা। এগুলোর তুলনায় লম্বা গ্যালারির দেয়ালচিত্র ম্লান তো বটেই, অনুকরণ দোষেও দূষিত। এগুলো মহান এক শিল্পীর কাজ, কালজয়ী প্রতিভার, যার শিল্পকর্ম চার হাজার বছর পরও মানুষকে মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিতে পারে।

ওরা খুব ধীর পায়ে সামনে এগোল, প্রায় একটা ঘোরের মধ্যে। তোরণ পেরিয়ে আসার পর দেখল দু'দিকের দেয়াল ঘেঁষে সারি সারি খুদে চেম্বার রয়েছে, প্রাচ্যের বাজারগুলোয় যেমন ছোট দোকান-ঘর দেখা যায়। প্রতিটি দোকানের প্রবেশমুখে পাহারা দিচ্ছে লম্বা স্তম্ভ, উঁচু হয়ে ছাদ ছুঁয়েছে। প্রতিটি স্তম্ভ দেবতাদের একেকটা স্ট্যাচু। স্ট্যাচুগুলোই আসলে গম্বুজ আকৃতির সিলিংটাকে মাথায় করে রেখেছে।

প্রথম দুটো দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, চাপ দিল নিমার বাহুতে। ফিসফিস করে বলল, 'ফারাও-এর ট্রেজার চেম্বার।' চেম্বার বা

দোকানগুলো মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত অদ্ভুত সুন্দর সব জিনিসে ঠাসা।

'এগুলো ফার্নিচার স্টোর,' বিড়বিড় করল নিমা। চেয়ার, টুল, খাট আর ডিভানের আকৃতি স্পষ্ট চিনতে পারছে ও। কাছের স্টলের সামনে চলে এল, হাত বাড়িয়ে রাজকীয় একটা সিংহাসন ছুঁলো। একেকটা বাহু পরস্পরকে পেঁচিয়ে থাকা একজোড়া করে সরীসৃপ, ব্রোঞ্জ আর ল্যাপিস ল্যাজুলাই দিয়ে তৈরি। পায়াগুলো সোনা দিয়ে তৈরি সিংহের থাবা। সীট আর পিঠে শিকার ধাওয়া করার দৃশ্য আঁকা হয়েছে। পিঠের মাথায় সোনার তৈরি একজোড়া ডানা।

সিংহাসনের পিছনে সাজানো রয়েছে অসংখ্য ফার্নিচার। জালি দিয়ে ঢাকা একটা ডিভান চিনতে পারল ওরা, জালিটা আবলুস কাঠ আর আইভরি দিয়ে তৈরি। তবে ডজন ডজন আরও বহু জিনিস রয়েছে, বেশিরভাগই বিভিন্ন অংশ খুলে আলাদা করা, ফলে কোনটা যে কি চেনা গেল না। প্রতিটি অংশ দামী মেটাল আর রঙিন রত্নখচিত, তাকালেই দৃষ্টিবিভ্রম ঘটছে। তোরণের দু'পাশে সারি সারি ছোট আকৃতির কুলুঙ্গি দেখা গেল, সেগুলো আশ্চর্য সুন্দর কালেকশনে ভরা। প্রতি জোড়া কুলুঙ্গির মাঝখানে 'বুক অভ দ্য ডেড' থেকে নেয়া উদ্ধৃতি লেখা হয়েছে, লেখা হয়েছে তোরণসমূহ পেরিয়ে ফারাও-এর ভ্রমণ কাহিনীর বিবরণ, ট্রেইলে কত রকমের বিপদ ওত পেতে ছিল, দৈত্য আর দানবরা কিভাবে তাঁর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

'লম্বা গ্যালারির নকল সমাধিতে এই পেইন্টিং ছিল না,' রানাকে বলল নিমা। 'একবার শুধু রাজার মুখের দিকে তাকান। বুঝতে পারবেন উনি সত্যিকার একজন বাস্তব চরিত্র ছিলেন।'

ওদের পাশের দেয়ালচিত্রে দেখা যাচ্ছে মহান দেবতা অসিরিস ফারাও-এর হাত ধরে পথ দেখাচ্ছেন, কাছে সরে আসা দানবদের কবল থেকে রক্ষা করছেন তাঁকে।

'ফিগারগুলো দেখুন,' সায় দিয়ে বলল রানা। 'আড়ষ্ট কাঠের পুতুলের মত নয়, সব সময় ডান পা বাড়িয়ে রেখেছে। এগুলো বাস্তবে দেখা পুরুষ ও নারী। প্রতিটি ফিগার অ্যানাটমিক্যালি কারেক্ট। শিল্পী হিউম্যান বডি স্টাডি করেছেন, শারীরিক কাঠামো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ছিল তাঁর।'

পাশের দেয়ালের আরেক খুপরির সামনে থামল ওরা। ভেতরে অস্ত্র আর যুদ্ধের সরঞ্জাম দেখা গেল। রথের প্যানেলগুলো সোনার তৈরি পাতা দিয়ে ঢাকা, ফলে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সাইড প্যানেলে, প্রতিটি লম্বা চাকার পিছনে, সাজানো রয়েছে তীর আর বর্শা। রথের পাশে রয়েছে স্তূপ করা ছোরা আর আইভরির হাতলসহ তলোয়ার, ফলাগুলো চকচকে ব্রোঞ্জ। র‍্যাকে রাখা হয়েছে বল্লম। ঢালগুলো ব্রোঞ্জের তৈরি, ঢালের গায়ে যুদ্ধবিজয়ের দৃশ্য, সঙ্গে স্বর্গীয় মামোসের প্রতিকৃতি আঁকা। কুমীরের চামড়া দিয়ে তৈরি হেলমেট আর ব্রেস্টপ্লেট দেখল ওরা।

পাশাপাশি পাঁচটা খুদে চেম্বারে রয়েছে পাঁচটা যুদ্ধক্ষেত্রের মডেল। প্রতিটি দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে শত শত সৈন্য রথ নিয়ে আক্রমণের জন্যে তৈরি। সৈনিক, ঘোড়া, রথ, অস্ত্র সবই স্বর্ণের। প্রতিটি মূর্তি বা আকৃতির গায়ে ফারাও-এর নাম

খোদাই করা। এই পাঁচটা দোকান বা স্টোর দেখে এতই বিহ্বল হয়ে পড়ল নিমা, রানার গায়ে হেলান দিতে বাধ্য হলো, মনে হলো অসুস্থ হয়ে পড়বে। একটা স্টোরে সৈন্য সংখ্যা গুনতে শুরু করল রানা, কিছুক্ষণ পর হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, 'এভাবে সম্ভব নয়, বের করে গুনতে হবে–পরে।'

'কত ভরি ওজন একজন সৈনিকের?' বিড়বিড় করে জানতে চাইল নিমা।

একটা মূর্তি হাতে নিয়ে ওজন পরীক্ষা করল রানা। 'পনেরো থেকে বিশ ভরির কম নয়,' বলল ও।

'কয়েক হাজার সৈন্য, তাই না?' আবার ফিসফিস করল নিমা।

'সৈন্য, সেবিকা, ঘোড়া, রথ, অস্ত্র, ঢাল, পানপাত্র–সব মিলিয়ে আনুমানিক ত্রিশ হাজার পিস।'

'দাম…না, থাক!' হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল নিমা।

'সোনার দাম এখানে বিবেচ্য বিষয় নয়,' বলল রানা। 'প্রত্ন নিদর্শন হিসেবে মূল্য ধরতে হবে। প্রতিটি মূর্তিতে খোদাই করা রয়েছে ফারাও-এর নাম ও সীল। একটা মূর্তির জন্যে একজন কালেক্টর দশ লাখ ডলার দিতেও হয়তো আপত্তি করবেন না।'

রানার দিকে অবিশ্বাস ভরা চোখে তাকাল নিমা। 'যাহ্! এত?'

'এতই। কিংবা আরও বেশি। এগুলো আমরা, যুদ্ধ ক্ষেত্রের এই মডেল পাঁচটা, লম্বা ক্রেটে ভরব। আমার ধারণা দুটো ক্রেটেই সবগুলোর জায়গা হয়ে যাবে।'

চারদিকে চোখ বুলাচ্ছিল নিমা, হঠাৎ রানার হাত ধরে ঝাঁকাল। 'রানা, স্টোরের সারি একটা নয়! দেখুন, প্রথম সারির পিছনে আরও এক সারি স্টোর রয়েছে!'

একজোড়া স্টোরের মাঝখানে সরু প্যাসেজ দেখা গেল, তার ভেতর দিয়ে পিছনের সারির স্টোরগুলোর সামনে চলে এল ওরা। তারপর দেখা গেল, দুই সারি নয়, আসলে তিন সারি স্টোর রয়েছে। প্রতিজোড়া স্টোরের মাঝখানের দেয়ালে চোখ জুড়ানো সব ছবি আঁকা, সবগুলোতেই রাজার জীবনকাহিনীর দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কোন ছবিতে কন্যাদের সঙ্গে খেলছেন বা কৌতুক করছেন, কোন ছবিতে পুত্রসন্তানকে কোলে নিয়ে আদর করছেন। মন্ত্রী পরিষদের সঙ্গে মীটিং করছেন বা উপপত্নীদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন। ভোজনের দৃশ্যও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, পুরোহিতদের সঙ্গে বসে আছেন রাজা। প্রতিটি মানুষকে আঁকা হয়েছে চোখে দেখে, প্রতিটি চরিত্রই বাস্তব থেকে নেয়া।

বিশাল কামরাটার সেন্ট্রাল প্যানেলগুলোর সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। একটা প্যানেলের দিকে হাত তুলে নিমা বলল, 'এটা নিশ্চয়ই টাইটার আত্মপ্রতিকৃতি।' ওটা একজন খোজা ব্যক্তির প্রতিকৃতি। 'নিজের চেহারা আঁকতে গিয়ে টাইটা কি পোয়েটিক লাইসেন্স নিয়েছে? নাকি সত্যিসত্যি এত সুদর্শন ছিল সে? ক্রীতদাসের চেহারায় এতটা আভিজাত্য থাকতে পারে?'

সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি কাড়ে টাইটার বুদ্ধিদীপ্ত চোখ জোড়া। সেই চোখে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি। শিল্পীর হাত এত ভাল, ওরা যে তীব্র দৃষ্টিতে তাকে দেখছে,

সে-ও ওদেরকে একই দৃষ্টি ফিরিয়ে দিচ্ছে। ক্ষীণ, স্মিত হাসি লেগে রয়েছে টাইটার মুখে। পেইন্টিংটা বার্নিশ করা, ফলে সুরক্ষিত রয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে গতকাল আঁকা হয়েছে ছবিটা। টাইটার ঠোঁট একটু ভেজা ভেজা, চোখ দুটোয় চকচকে ভাব।

'গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামলা, শ্বেতাঙ্গ বলা যাবে না,' মন্তব্য করল রানা। 'চোখও তো কালো। তবে লাল চুল রঙ করা হয়েছে হেনা দিয়ে।'

'কে জানে কোথায় টাইটার জন্ম। ক্রোলের কোথাও এ-সম্পর্কে কিছু বলেনি টাইটা। গ্রীস বা ইটালি হতে পারে না। জলদস্যু হতে পারে? আসলে টাইটার রুটস কোন দিনই জানা যাবে না, সে নিজেও সম্ভবত জানত না।'

'পাশের প্যানেলেও দেখা যাচ্ছে তাকে,' বলল রানা।

এই প্যানেলে রাজা ও রানীর সামনে নতজানু হয়ে প্রণাম করছে টাইটা, রাজা ও রানী পাশাপাশি দুটো সিংহাসনে বসে আছেন। 'হিচককের মত,' বলল নিমা। 'নিজের সৃষ্টির মধ্যে উপস্থিত থাকতে ভালবাসত টাইটা।'

আরও এক সারি স্টোরের সামনে দিয়ে হেঁটে এল ওরা। এগুলোয় ঠাসা রয়েছে তৈজস-পত্র-রাসনকোসন, জার, গামলা, পানপাত্র, হাতা-চামচ। বেশিরভাগ সোনা বা রুপার তৈরি। পালিশ করা ব্রোঞ্জ আয়না দেখা গেল। মূল্যবান সিল্ক আর লিনেন-এর রোল রয়েছে, অনেক কাল আগেই পচে গিয়ে নরম ছাইয়ের স্তূপে পরিণত হয়েছে। তারপর, দু'সারি স্টোরের মাঝখানের দেয়ালে দেখা গেল হিকসস-এর সঙ্গে যুদ্ধের দৃশ্য, যে যুদ্ধে ফারাও আহত হয়েছিলেন। হিকসসের নিক্ষিপ্ত তীর রাজার বুকে বিঁধে রয়েছে। পরের দৃশ্যে টাইটা, সার্জেন, রাজার ওপর ঝুঁকে আছে, হাতে সার্জিকাল ইন্সট্রুমেন্ট, রাজার বুকের গভীর থেকে তীরটা বের করে আনছে।

এরপর ওরা সারি সারি কুলুঙ্গির সামনে এসে দাঁড়াল, ভেতরে কয়েক শো সিডার কাঠের বাক্স বা চেস্ট। বাক্সগুলোর গায়ে রাজার প্রতীক চিহ্ন আঁকা, আর ছবিগুলোয় দেখা যাচ্ছে রাজা টয়লেটে রয়েছেন, সুর্মা লাগাচ্ছেন চোখে, লাল রঙ দিয়ে রঙিন করছেন চেহারা, নাপিতরা তাঁর দাড়ি কামাচ্ছে, চাকরবাকরা পরাচ্ছে রাজকীয় পোশাক।

'কিছু বাক্সে রয়্যাল কসমেটিক্স আছে,' বলে উঠল নিমা। 'বাকিগুলোতে ফারাও-এর কাপড়চোপড়।'

পাশের দেয়ালের দৃশ্যগুলোয় দেখা যাচ্ছে রাজা বিয়ে করছেন। কুমারী লসট্রিস রানী হতে যাচ্ছেন। টাইটা ছিল রানী লসট্রিসের ক্রীতদাস। সে তার কর্ত্রীর অবয়ব আঁকার সময় সমস্ত মেধা ঢেলে দিয়েছে। রানীর চেহারার খুঁটিনাটি সূক্ষ্ম সব বৈশিষ্ট্য এত নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে, নিষ্পলক তাকিয়ে শুধু দেখতেই ইচ্ছে করে। কোন সন্দেহ নেই শিল্পী এখানে অতিরঞ্জনের স্বাধীনতা নিয়েছে। নগ্ন স্তন জোড়ার ওপর সযত্নে টানা ব্রাশ শুধু নিখুঁত আকৃতি দেয়ার কাজ করেনি, যৌন বিভ্রান্ততা ফুটিয়ে তোলারও চেষ্টা করেছে।

'টাইটা কতই না ভালবাসত রানীকে,' বলল নিমা, বলার সুরে ক্ষীণ ঈর্ষার ছোঁয়া থেকে গেল। 'প্রতিটি রেখায় তার প্রমাণ পাবেন আপনি।'

পরবর্তী সারির কুলুঙ্গিতে আরও কয়েকশো কাঠের বাক্স রয়েছে, ঢাকনির ওপর রাজার খুদে প্রতিকৃতি, সমস্ত অলঙ্কার পরে আছেন। তাঁর আঙুল আর গোড়ালিতে আঙটি ও ঘুঙুর, বুক সোনার মেডেলে মোড়া, বাহু আর কব্জিতে বালা পরানো। একটা প্রতিকৃতিতে দেখা গেল রাজা একত্রিত দুই মিশরীয় রাজ্যের জোড়া মুকুট পরে আছেন। একটা লাল, অপরটা সাদা–মুকুটের কপালে শকুন আর গোক্ষুরের মাথা। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের মুকুট ব্যবহার করতেন তিনি। সব মিলিয়ে বারোটা মুকুট দেখল ওরা।

'ঢাকনিতে যা দেখছি, বাক্সের ভেতরও কি তাই আছে?' ফিসফিস করে জানতে চাইল নিমা।

এমন কি রানাও চিন্তা করতে গিয়ে একটা ঢোক গিলল। নিমার প্রশ্নের উত্তর যদি ইতিবাচক হয়, এই বিপুল ঐশর্য কল্পনা করা সত্যি কঠিন। কোন বাক্স না খুলেই ইতিমধ্যে ওরা যা দেখেছে, তার মূল্য বুঝতে হলে কমপিউটার নিয়ে বসতে হবে। পরিমাণে এত বিপুল প্রত্ন সম্পদ এর আগে কোথাও পাওয়া যায়নি।

'আপনার মনে আছে, স্ক্রোলে কি লিখেছিল টাইটা? "এত বেশি গুপ্তধন কোন কালে কোথাও এক জায়গায় জড়ো করা হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি না"। দেখে মনে হচ্ছে কোন কিছুতেই হাত দেয়া হয়নি। ফারাও মামোসের ট্রেজার পুরোটাই আছে এখানে।'

পিছনের অর্থাৎ তৃতীয় সারির স্টোরগুলোয় রয়েছে চীনামাটি আর কাঠের মূর্তি। এমন কোন পেশা বা ব্যবসার লোক নেই যাদের মূর্তি এখানে পাওয়া যাবে না। পুরোহিত, লিপিকার, আইনবিশারদ, চিকিৎসক, কৃষক, মালী, রুটি আর মদ তৈরির কারিগর, নর্তকী, নাবিক, রজকিনী, সৈনিক, সাধারণ শ্রমিক, খোজা প্রহরী, রাজমিস্ত্রী, বাজনদার, মুসাফির, ভবঘুরে–সমাজের সর্ব স্তরের সবাই আছে, এমন কি বেশ্যাও। প্রত্যেকের হাতে নিজ নিজ পেশার যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম। এরা সবাই পরলোকে রাজার সঙ্গী হবে, সেবা করবে ফারাও-এর।

তোরণশোভিত বিশাল কামরার শেষ মাথায় এসে পৌঁছুল ওরা। সামনে এককালে ছিল কয়েক সারিতে টাঙানো সাদা লিনেন। ওগুলোর রঙ এখন আর সাদা নেই, পর্দাও আর পর্দা নেই। সব পচে গিয়ে রিবনের মত লম্বা হয়ে ঝুলে আছে, দেখে মনে হচ্ছে নোংরা মাকড়সার জাল অথচ তারপরও পর্দায় লাগানো রত্নগুলো রিবনের সঙ্গে ঝুলছে, জেলের জালে ধরা পড়া চকচকে মাছের মত। জালের ভেতর আরও একটা দরজা দেখতে পেল ওরা।

'ওটা নিশ্চয়ই মূল সমাধিতে ঢোকার পথ,' ফিস ফিস করল নিমা। 'রাজা আর আমাদের মাঝখানে এখন শুধু পচা খানিকটা জাল ছাড়া আর কিছু নেই।'

কিন্তু দু'জনই ওরা পা বাড়াতে দ্বিধায় ভুগছে। সামনে কোন বিপদ নেই তো? টাইটার তৈরি সবগুলো ফাঁদ কি ওরা পেরিয়ে এসেছে?

পাঁচ

গেরিলাদের মধ্যে কোন ডাক্তার নেই, কমান্ডার শাফিই আহত যোদ্ধাদের চিকিৎসা করে, তার হাতের কাছে সব সময় একটা মেডিকেল কিটও থাকে। কোয়ারির কাছাকাছি একটা কুঁড়েতে রুবিকে বয়ে নিয়ে এল গেরিলারা, কুঁড়েটা ঘাসের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ছেঁড়া ট্রাউজার আর শার্ট খুলে রুবির ক্ষতগুলো ডিসইনফেকট্যান্ট দিয়ে ধুলো শাফি, তারপর ফিল্ড ড্রেসিং দিয়ে প্রায় সবগুলো ঢেকে দিল। তারপর উপুড় করা হলো রুবিকে, অ্যান্টিবায়োটিক ইঞ্জেকশন দেয়ার জন্যে। ব্যথা পেয়ে উফ করে উঠল রুবি। শাফি নরম সুরে বলল, 'আমার হাত ডাক্তারদের মত ভাল নয়।'

'তবু আমার ভাগ্য যে তোমার হাতেই চিকিৎসা পাচ্ছি,' বলল রুবি। 'জানো, মৃত্যু ভয়ের চেয়ে বেশি ভুগেছি তোমাকে আর দেখতে পাব না ভেবে।'

নিজের প্যাক থেকে সোয়েটশার্ট আর ফেটিগ বের করে রুবিকে পরিয়ে দিল শাফি, কয়েক সাইজ বড় হয়েছে গায়ে। কালচে, ফোস্কা পড়া ঠোঁট নেড়ে রুবি বিড়বিড় করল, 'কুৎসিত লাগছে আমাকে, তাই না?'

সাবধানে তার গালে আঙুল বুলাল শাফি। 'আমার কাছে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে তুমি, চিরকাল তাই থাকবে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে গুলির আওয়াজ শুনল ওরা। অনেক দূর থেকে ভেসে এল, বয়ে নিয়ে এল উত্তরে বৃষ্টি ভেজা বাতাস। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল শাফি। 'শুরু হয়েছে। কর্নেল ঘুমা হামলা করেছেন।'

'আমার দোষ। আমিই তাঁকে...'

'না,' দৃঢ় সুরে বলল শাফি। 'তোমার কোন দোষ নেই। তুমি কথা না বললে ওরা তোমাকে মেরেই ফেলত। আর হামলা ওরা এমনিতেও করত।' ওয়েবিং বেল্ট তুলে কোমরে জড়াল সে। এবার দূর থেকে ভেসে এল মর্টার শেলের আওয়াজ। 'আমাকে এবার যেতে হবে, রুবি।'

'জানি। আমার জন্যে চিন্তা কোরো না।'

'তোমার চিন্তাই যুদ্ধ করতে উৎসাহ যোগাবে আমাকে। আমার লোকজন মঠে নামিয়ে নিয়ে যাবে তোমাকে। এক পর্যায়ে সবাই ওখানে জড়ো হব আমরা। যা-ই ঘটুক, ওখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে তুমি। কর্নেল ঘুমাকে বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারব না। তাঁর শক্তি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। খুব তাড়াতাড়ি আবার দেখা হবে আমাদের।'

'তোমাকে ভালবাসি,' ফিসফিস করল রুবি। 'তোমার জন্যে চিরকাল অপেক্ষা করব।'

দরজার কাছে মাথা নিচু করে কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে গেল শাফি।

পর্দার ফ্রেমে হাত ছোঁয়াতেই জালের মত রিবনগুলো টাইলের মেঝেতে খসে পড়ল। জালে আটকানো রত্নগুলো মেঝেতে পড়ে জলতরঙ্গের মত আওয়াজ তুলল। জালের গায়ে ভেতরে ঢোকার জন্যে যথেষ্ট বড় একটা ফাঁক তৈরি হয়েছে। নিমার হাত ধরে পা বাড়াল রানা, থামল ইনার ডোরওয়ের সামনে। দরজা বা ফাঁকটার এক পাশে পাহারায় রয়েছে মহান দেবতা অসিরিস-এর বিশাল এক স্ট্যাচু, হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করা, এক হাতে বাঁকা লাঠি। উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর স্ত্রী আইসিস, মাথায় লুনার ক্রাউন আর শিং। তাঁদের উদাস চোখের দৃষ্টি অনন্ত-অসীমের দিকে প্রসারিত, চেহারায় প্রশান্তির ভাব। বারো ফুট উঁচু জোড়া স্ট্যাচুর মাঝখান দিয়ে এগোল নিমা ও রানা, এবং অবশেষে ফারাও মামোসের আসল সমাধিতে পৌঁছে গেল।

ছাদটা গম্বুজ আকৃতির, গম্বুজ আর দেয়ালে আঁকা চিত্রগুলোর মধ্যে পার্থক্য আছে—ফরমাল ও ক্ল্যাসিকাল। রঙ এখানে আরও গাঢ়, প্যাটার্নগুলো জটিল। যতটা আশা করেছিল ওরা তারচেয়ে আকারে ছোট চেম্বারটা। স্বর্গীয় ফারাও মামোসের বিশাল গ্র্যানিট কফিনেরই শুধু জায়গা হয়েছে।

কফিনটা বুক সমান উঁচু। সাইড প্যানেলগুলো ভিত বা বেদীর সঙ্গে গাঁথা মনে হলো, ফারাও ও অন্যান্য দেবতাদের ছবি খোদাই করা। ঢাকনিতে একা শুধু রাজার চেহারা খোদাই করা হয়েছে, পুরো দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ জুড়ে। দেখেই ওরা বুঝতে পারল, ঢাকনিটা এখনও আদি অবস্থানে রয়েছে, পুরোহিতের মাটির সীল পুরোপুরি অক্ষত। এই সমাধিতে কখনও কারও অনুপ্রবেশ ঘটেনি। ফারাও মামোসের মমি চার হাজার বছর ধরে নির্বিঘ্নে শুয়ে আছে এখানে।

তবে ওদেরকে বিস্মিত করল অন্য দুটো জিনিস। কফিনের ওপর পড়ে রয়েছে অদ্ভুত সুন্দর একটা ধনুক। লম্বায় প্রায় রানার সমান, স্টক-এর পুরোটা দৈর্ঘ্য ইলেকট্রাম করেল দিয়ে জড়ানো—সোনা ও রূপোর এই মিশ্রণ পদ্ধতি কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে।

আরেকটা জিনিস, যা কখনই কোন রাজকীয় সমাধিতে থাকার কথা নয়, দাঁড়িয়ে আছে কফিনের গোড়ার কাছে। পুতুল আকৃতির মানুষের একটা মূর্তি। এক পলক তাকিয়েই জিনিসটার উন্নত মান ও পরিচয় বুঝতে পারল ওরা, খানিক আগে সমাধির বাইরে এই মূর্তির আঁকা মুখ দেখেছে ওরা তোরণশোভিত কামরাটায়।

টাইটার কথাগুলো, স্ক্রোলে ওরা পড়েছে, মনে হলো সমাধির ভেতর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এই মুহূর্তে, জোনাকির মত জ্বল জ্বল করছে কফিনের ওপর—

"রাজকীয় কফিনের পাশে আমি যখন শেষবারের মত দাঁড়ালাম, শ্রমিকদের সবাইকে পাঠিয়ে দিলাম বাইরে। আমি সবার শেষে সমাধি থেকে বেরুব, এবং আমি বেরুবার পর প্রবেশপথ সীল করে দেয়া হবে।

"একা হবার পর সঙ্গের বান্ডিলটা আমি খুললাম। ওটা থেকে লম্বা ধনুক, লানাটা, বের করলাম। আমার কর্ত্রীর নামানুসারে ওটার নাম রেখেছেন ট্যানাস, লানাটা ছিল আমার কর্ত্রীর ছোটবেলার নাম। আমি ট্যানাসের জন্যে

ধনুকটা তৈরি করি। ওটা ছিল আমাদের দু'জনের পক্ষ থেকে দেয়া শেষ উপহার। আমি ওটা তাঁর কফিনের সীল করা পাথুরে ঢাকনির ওপর রাখি।

"আমার বান্ডিলে আরও একটা জিনিস ছিল। আমার তৈরি ছোট একটা কাঠের মূর্তি। কফিনের গোড়ায় ওটা রাখি আমি। কাঠ খুদে ওটা যখন তৈরি করি, তিন দিকে তিনটে তামার আয়না রেখেছিলাম, যাতে করে প্রতিটি কোণ থেকে নিজের চেহারা দেখতে পাই, এবং হুবহু ফুটিয়ে তুলতে পারি নিজের বৈশিষ্ট্য। পুতুলটা আসলে খুদে টাইটা। পুতুলের গোড়ায় আমি লিখেছি..."

কফিনের গোড়ায় হাঁটু গেড়ে বসল নিমা, ছোট্ট পুতুলটা হাতে নিল। গোড়ায় খোদাই করা হায়ারোগ্লিফিক্স দেখছে। ওর পাশে হাঁটু গেড়ে রানা বলল, 'পড়ুন তো দেখি।'

নরম সুরে শুরু করল নিমা, 'ঠিক আছে। "আমার নাম টাইটা। আমি একজন চিকিৎসক ও একজন কবি। আমি একজন আর্কিটেক্ট ও একজন দার্শনিক। আমি আপনার বন্ধু। আমি আপনার হয়ে জবাবদিহি করব"।'

'তাহলে দেখা যাচ্ছে সবই সত্যি,' ফিসফিস করল রানা।

ঠিক যেখান থেকে তুলেছে সেখানেই মূর্তিটা নামিয়ে রাখল নিমা। তারপর মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল। 'এটা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত। আমি চাই এই মুহূর্ত যেন শেষ না হয়।'

ওদেরকে আসতে দেখছে শাফি। পাহাড়ের নিচের ঢালের কিনারা ঘেঁষে এগোচ্ছে দলটা। ঘন ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে আসছে, বুশ-ফাইটারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছাড়া দেখতে পাবার কথা নয়। প্রতিপক্ষ দলের শক্তি-সামর্থ্য উপলব্ধি করে হতাশ হলো শাফি। ওরা ক্র্যাক ট্রুপস, দীর্ঘ বহু বছর যুদ্ধ করে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। অত্যাচারী মেনজিসটুর বিরুদ্ধে লড়ার সময় এরাও তার দলে ছিল, ওদের অনেককেই সে ট্রেনিং দিয়েছে। পরিস্থিতি বদলে যাওয়ায় এখন ওরা তার সঙ্গে লড়তে আসছে। গোটা আফ্রিকা মহাদেশে এটাই হচ্ছে নিষ্ঠুর বাস্তবতা, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও সংগ্রামে পুষ্টি যোগায় প্রাচীন উপদলীয় কোন্দল, বর্তমান কালের রাজনীতিকদের লোভ আর দুর্নীতি।

তবে ক্ষোভ আর হতাশা প্রকাশ করার সময় এটা নয়। নিচের রণক্ষেত্রে কি কৌশল কাজে লাগবে সেটাই এখন তাকে খুঁজে বের করতে হবে। ওরা যারা আসছে তারা অবশ্যই দক্ষ সৈনিক। খুব অল্প লোককেই দেখা যাচ্ছে, বেশিরভাগই গা ঢাকা দিয়ে আছে। 'কোম্পানী স্ট্রেংথ,' ভাবল সে, তারপর নিজের ছোট্ট ফোর্সের দিকে তাকাল। পাথরের ভাঁজে লুকিয়ে আছে চোদ্দজন গেরিলা। চমকে দেয়ার সুযোগ নিয়ে প্রতিপক্ষের ওপর যতটা সম্ভব জোরাল আঘাত হেনে পিছু হটতে হবে ওদেরকে, কর্নেল ঘুমার মর্টার শেল ওদের শুয়ে থাকা জায়গায় ছুটে আসার আগেই।

আকাশের দিকে তাকিয়ে শাফি ভাবল কর্নেল ঘুমা বিমান হামলাও শুরু করবেন কিনা। আদ্দিসের এয়ার-বেস থেকে রুশ টুপোলেভ বম্বার এখানে আসতে সময় নেবে পঁয়ত্রিশ মিনিট। নাপামের গন্ধটা কল্পনা করল সে, মনের চোখ দিয়ে

দেখতে পেল আগুনের ঢেউ ওদের দিকে দ্রুত গড়িয়ে আসছে। তবে না, বিমান হামলার ঝুঁকি কর্নেল ঘুমা বা তাঁর পে-মাস্টার জার্মান হেস ডুগার্ড নেবেন না। গিরিখাদে রানা যা আবিষ্কার করেছে সে-সব দখল করাই ওঁদের উদ্দেশ্য, ধ্বংস করা নয়। লুঠের মাল আন্দিসের কাউকে ভাগ দিতেও ওঁরা রাজি হবেন না। অ্যাবে গিরিখাদে এটা তাঁদের ব্যক্তিগত অভিযান, সরকারকে জানাবার মত বোকামি তাঁরা করবেন না।

ঢালের গা বেয়ে আবার নিচে নেমে গেল শাফির দৃষ্টি। শত্রুপক্ষ পাহাড়ের কিনারা ঘেঁষে ডানডেরা নদীর দিকে এগোচ্ছে, উদ্দেশ্য নদীর পাশের ট্রেইলে অবস্থান গ্রহণ। খানিক পরই ওপরে, এদিকটায় একটা পেট্রল পাঠাবে ওরা, নিজেদের একটা পাশ সুরক্ষিত করার জন্যে, তারপরই সরাসরি ওপরে উঠবে। হ্যাঁ, ওই তো ওদেরকে দেখা যাচ্ছে। আট-না, দশজন লোক মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, সরাসরি তার নিচে থেকে উঠে আসছে ওপর দিকে।

শাফি সিদ্ধান্ত নিল, ওদেরকে যতটা সম্ভব কাছাকাছি পৌঁছুতে দেবে সে। সব ক'টাকে সাবাড় করতে পারলে ভাল হত, কিন্তু সেটা বেশি আশা করা হয়ে যায়। চার-পাঁচজনকে ঘায়েল করতে পারলেই খুশি সে, বাকিগুলো ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে পড়ে তারস্বরে চিৎকার করুক। যুদ্ধে আহত লোকদের চিৎকার দারুণ উপকারী, সঙ্গী যোদ্ধারা মাথা নিচু করে রাখে, গুলি করার জন্যে মাথা তুলতে ভয় পায়।

পাথর ছড়ানো ঢালে চোখ বুলাল শাফি। আরপিডি লাইট মেশিন গান প্রতিপক্ষের অ্যাডভান্স গ্রুপের দিকে তাক করা রয়েছে। আলিম, তার মেশিন গানার, একজন ওস্তাদ। বলা যায় না, আলিম পাঁচ-সাতজনকেও ফেলে দিতে পারে। তারপর শাফি দেখল, তার ঠিক নিচেই রিজে একটা ফাঁক রয়েছে। খোলা রিজ পেরুবার ঝুঁকি ওরা নেবে না, ভাবল সে। ওপরে উঠবে ওই ফাঁক গলে, একজন একজন করে। তার আগে ফাঁকটার কাছাকাছি জড়ো হবে ওরা। তখনই সুযোগ পাবে তার গেরিলারা।

আবার আরপিডি-র দিকে তাকাল শাফি। আলিম তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, অপেক্ষা করছে সঙ্কেত পাবার। ঢাল বেয়ে নিচে নেমে গেল শাফির দৃষ্টি। যা ভেবেছে, লাইনটা এক জায়গায় জড়ো হচ্ছে। বাম দিকের দীর্ঘদেহী লোকটা এরই মধ্যে পজিশন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। তার দু'পাশের দু'জন লোক তির্যক পথে এগোচ্ছে ফাঁকটার দিকে।

ঝোপ-ঝাড়ের সঙ্গে কর্নেল ঘুমার সৈনিকদের ক্যামোফ্লেজ হুবহু মিলে গেছে, তাদের অস্ত্রও ক্যামোফ্লেজ নেটিঙে ঢাকা, রোদ যাতে প্রতিফলিত না হয়। ঝোপের ভেতর প্রায় অদৃশ্যই তারা, শুধু নড়াচড়া আর গায়ের রঙ ধরা পড়ছে চোখে। তারা এখন এত কাছে, মাঝে মধ্যে দু'একজনের চোখের মণি দেখতে পাচ্ছে শাফি। কিন্তু এখনও তাদের মেশিন গানারকে সে দেখতে পাচ্ছে না।

প্রথম এক পশলা গুলিতেই প্রতিপক্ষের মেশিন গান স্তব্ধ করে দিতে হবে। আরে, ওই তো! ডান দিকের লাইনে দেখা যাচ্ছে গানারকে। লোকটা খাটো আর শক্ত-সমর্থ, কাঁধ দুটো ভারী, হাতগুলো লম্বা, লাইট মেশিন গানটাকে অনায়াসে বহন করছে নিতম্বের কাছে। অস্ত্রটা চিনতে পারল শাফি, রাশিয়ার তৈরি ৭·৬২

আরপিডি। অ্যামুনিশন বেল্ট কাঁধ থেকে ঝুলছে, পিতলের কার্ট্রিজ চকচক করায় ধরা পড়ে গেল লোকটা।

নিচে নামছে শাফি, বেসের চারদিকে ছড়িয়ে থাকা বোল্ডার আড়াল দিচ্ছে তাকে। নিজের একেএম-এর রেট-অব-ফায়ার সিলেক্টর র‍্যাপিড-এ ঠেলে দিল সে, মুখের একটা পাশ ঠেকাল কাঠের স্টকে। জিনিসটা অ্যাসল্ট রাইফেল, তবে কারিগরি ফলিয়ে নিখুঁত করা হয়েছে।

শাফি যেখানে শুয়ে আছে সেখান থেকে আরপিডি বহনকারী প্রতিপক্ষ লোকটা আর মাত্র পঞ্চাশ মিটার দূরে, উঠে আসছে ঢাল বেয়ে। ডান দিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল সে, আরও তিনজন লোক ফাঁকটা লক্ষ্য করে উঠছে–মাত্র এক পশলা গুলি করেই ওদের ব্যবস্থা করতে পারবে আলিম। এরপর আরপিডি মেশিন গানারের পেটে লক্ষ্যস্থির করল সে, ট্রিগার টানল তিনবার।

তিনটে বিস্ফোরণ তালা লাগিয়ে দিল কানে, তবে শাফি দেখতে পেল বুলেটগুলো টার্গেট মিস করেনি, পেট থেকে গলা পর্যন্ত তিনটে গর্ত তৈরি করেছে। নিচেরটা লেগেছে নাভির কাছে, ওপরেরটা গলায়।

শাফির চারদিক থেকে গেরিলারা গুলি করছে। সে ভাবছে, কে জানে প্রথম দফায় ক'জনকে ফেলতে পারল আলিম। না, দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। শত্রুপক্ষের সবাই ঝোপের নিচে। পাল্টা গুলিও হয়েছে, নীল ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে ঝোপের মাথায়। কয়েক সেকেন্ড পার হয়ে গেল, তারপর শোনা গেল বিকট চিৎকার, 'আমাকে লেগেছে! যীশুর দোহাই, আমাকে বাঁচাও!' তার চিৎকার পাহাড়ে লেগে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। শাফি তার একেএম-এ নতুন ক্লিপ পরাল। 'গা, শালা, গান গা!' বিড়বিড় করল সে।

রানা আর নিমা তো হাত লাগালই, কফিন থেকে ঢাকনিটা তুলতে টোরা নাবুর আরও আটজন লোকের সাহায্য নিতে হলো। তোলার পর সবার হাত-পায়ের পেশী থরথর করে কাঁপতে শুরু করল, খুব সাবধানে তারা সেটাকে সমাধির দেয়াল ঘেঁষে নামিয়ে রাখল। এরপর কফিনের পাশে এসে ভেতরে তাকাল রানা ও নিমা।

পাথরের তৈরি কফিনের ভেতর আরও একটা কফিন রয়েছে, এটা কাঠের। এটার ঢাকনিতেও খোদাই করা হয়েছে ফারাও-এর আকৃতি। এখানে দেখানো হয়েছে তাঁর লাশের ছবি, হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করা, এক হাতে বাঁকা লাঠি। চেহারায় ফুটে আছে সুখময় প্রশান্তি।

দ্বিতীয় কফিনটা বের করল ওরা, পাথুরে ঢাকনির চেয়ে এটার ওজন কম। সাবধানে গোল্ডেন সীল আর শুকনো রেজিনের শক্ত স্তরে ফাটল ধরাল রানা, তা না হলে ঢাকনিটা আলগা করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় ঢাকনি সরাবার পর দেখা গেল ভেতরে আরও একটা কফিন। সেটা খোলার পর আরও একটা। এভাবে সব মিলিয়ে সাতটা কফিন পাওয়া গেল, একটার চেয়ে অপরটা আকারে একটু ছোট, তবে অলঙ্করণের মাত্রা ক্রমশ বাড়ল। সপ্তম কফিনটা পূর্ণ দৈর্ঘ্য একজন মানুষের চেয়ে আকারে সামান্য বড়, এটা তৈরি করা হয়েছে সোনা দিয়ে। পালিশ করা

সোনায় ল্যাম্পের আলো পড়তে মনে হলো এক হাজার আয়না ঝলমল করে উঠল, সমাধির প্রতিটি কোণ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সোনালি আভায়।

অবশেষে সপ্তম কফিন খোলার পর দেখা গেল ভেতরে ফুল রয়েছে। কুঁড়ি আর পাপড়িগুলো শুকিয়ে গেছে, অদৃশ্য হয়েছে রঙও। সুগন্ধও কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে, রয়েছে শুধু পচা একটা ঝাঁঝ। পাপড়িগুলোর এমন অবস্থা, ছুঁতে না ছুঁতেই গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ছে। ফুলের নিচে রয়েছে মিহি লিনেন। এক সময় নিশ্চয়ই বকের পালকের মত সাদা ছিল, এখন খয়েরি দেখাচ্ছে—পচা ফুলের রস ঝরে পড়ায়। নরম ভাঁজের ভেতর সোনার চকচকে ভাব দেখতে পেল ওরা।

কফিনের দু'পাশে দাঁড়িয়ে রানা ও নিমা লিনেনের জাল ছাড়াল। ওদের আঙুলের চাপে টিস্যু পেপারের মত ছিঁড়ে গেল ওগুলো। দু'জনেই নিজের অজান্তে বিস্ময়সূচক আওয়াজ করল ফারাও-এর ডেথ-মাস্ক উন্মোচিত হয়ে পড়ায়। মানুষের মাথার চেয়ে সামান্য একটু বড় ওটা আকারে, তবে সংশ্লিষ্ট মানুষটির হুবহু প্রতিচ্ছবি বলতে হবে মুখোশটিকে। শিল্পীর কাজ এত নিখুঁত, চেহারার বৈশিষ্ট্যগুলো এতকাল পরও অটুট রয়েছে। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল ওরা, স্ফটিকের চোখ দিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছেন ফারাও-ও, সেই চোখে বিষণ্ণ দৃষ্টি, মনে হলো যেন অভিযোগও আছে।

মমির মাথা থেকে মুখোশটা তুলতে সাহস সঞ্চয়ের জন্যে সময় নিতে হলো ওদেরকে। তারপর যখন তুলল, আরও প্রমাণ পেল যে প্রাচীন কালে রাজা ও তাঁর জেনারেল ট্যানাস-এর দেহ অদলবদল করা হয়েছে। ওদের চোখের সামনে যে মমিটা পড়ে রয়েছে সেটা পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে কফিনের তুলনায় বেশ বড়। আংশিক আচ্ছাদন মুক্ত অবস্থায় রাখা, অনেকটা গুঁজে ভরা হয়েছে।

'রাজকীয় মমির সঙ্গে কয়েকশো তাবিজ আর মন্ত্রঃপূত কবচ থাকবে, আবরণের নিচে,' ফিসফিস করে জানাল নিমা। 'এটা বিখ্যাত বা অভিজাত কোন ব্যক্তির মমি, কোনমতেই একজন রাজার হতে পারে না।'

লাশের মাথা থেকে ব্যান্ডেজের ভেতরের স্তর খুব সাবধানে খুলল রানা, ফলে মোটা দাড়ির কুণ্ডলী পাকানো জট বেরিয়ে পড়ল। 'তোরণের ভেতর কামরাটায় ফারাও মামোসের যে প্রতিকৃতি আমরা দেখেছি, তাতে তাঁর দাড়ি ছিল হেনায় রাঙানো,' বিড়বিড় করল ও। 'এটা দেখুন।' এখানে মমির দাড়ি শুকনো ঘাসের মত, সোনালি আর রূপার মত। 'আর কোন সন্দেহ নেই,' আবার বলল ও। 'এটা ট্যানাস-এর মমি। ট্যানাস টাইটার বন্ধু ছিলেন, আর রানীর ছিলেন প্রেমিক।'

নিমার চোখে জল। 'হ্যাঁ,' বলল ও। 'লসট্রিসের পুত্রসন্তানের আসল বাবা তিনিই, পরে যিনি ফারাও টামোস হয়েছিলেন, হয়েছিলেন বহু রাজার পূর্ব-পুরুষ। কাজেই ইনিই সেই ব্যক্তি, যার রক্ত প্রাচীন মিশরের ইতিহাস জুড়ে বইছে।'

'সেই অর্থে যে-কোন ফারাও-এর মতই মহান ছিলেন তিনি,' শান্ত সুরে বলল রানা।

কথাটা প্রথমে খেয়াল হলো নিমার। 'নদী!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, গলায় ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ ধার। 'নদী ফুলে উঠলে সব আবার হারিয়ে যাবে!'

আরপিডি। অ্যামুনিশন বেল্ট কাঁধ থেকে ঝুলছে, পিতলের কার্ট্রিজ চকচক করায় ধরা পড়ে গেল লোকটা।

নিচে নামছে শাফি, বেসের চারদিকে ছড়িয়ে থাকা বোল্ডার আড়াল দিচ্ছে তাকে। নিজের একেএম-এর রেট-অব-ফায়ার সিলেক্টর র‍্যাপিড-এ ঠেলে দিল সে, মুখের একটা পাশ ঠেকাল কাঠের স্টকে। জিনিসটা অ্যাসল্ট রাইফেল, তবে কারিগরি ফলিয়ে নিখুঁত করা হয়েছে।

শাফি যেখানে শুয়ে আছে সেখান থেকে আরপিডি বহনকারী প্রতিপক্ষ লোকটা আর মাত্র পঞ্চাশ মিটার দূরে, উঠে আসছে ঢাল বেয়ে। ডান দিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল সে, আরও তিনজন লোক ফাঁকটা লক্ষ্য করে উঠছে—মাত্র এক পশলা গুলি করেই ওদের ব্যবস্থা করতে পারবে আলিম। এরপর আরপিডি মেশিন গানারের পেটে লক্ষ্যস্থির করল সে, ট্রিগার টানল তিনবার।

তিনটে বিস্ফোরণ তালা লাগিয়ে দিল কানে, তবে শাফি দেখতে পেল বুলেটগুলো টার্গেট মিস করেনি, পেট থেকে গলা পর্যন্ত তিনটে গর্ত তৈরি করেছে। নিচেরটা লেগেছে নাভির কাছে, ওপরেরটা গলায়।

শাফির চারদিক থেকে গেরিলারা গুলি করছে। সে ভাবছে, কে জানে প্রথম দফায় ক'জনকে ফেলতে পারল আলিম। না, দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। শত্রুপক্ষের সবাই ঝোপের নিচে। পাল্টা গুলিও হয়েছে, নীল ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে ঝোপের মাথায়। কয়েক সেকেন্ড পার হয়ে গেল, তারপর শোনা গেল বিকট চিৎকার, 'আমাকে লেগেছে! যীশুর দোহাই, আমাকে বাঁচাও!' তার চিৎকার পাহাড়ে লেগে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। শাফি তার একেএম-এ নতুন ক্লিপ পরাল। 'গা, শালা, গান গা!' বিড়বিড় করল সে।

রানা আর নিমা তো হাত লাগালই, কফিন থেকে ঢাকনিটা তুলতে টোরা নাবুর আরও আটজন লোকের সাহায্য নিতে হলো। তোলার পর সবার হাত-পায়ের পেশী থরথর করে কাঁপতে শুরু করল, খুব সাবধানে তারা সেটাকে সমাধির দেয়াল ঘেঁষে নামিয়ে রাখল। এরপর কফিনের পাশে এসে ভেতরে তাকাল রানা ও নিমা।

পাথরের তৈরি কফিনের ভেতর আরও একটা কফিন রয়েছে, এটা কাঠের। এটার ঢাকনিতেও খোদাই করা হয়েছে ফারাও-এর আকৃতি। এখানে দেখানো হয়েছে তাঁর লাশের ছবি, হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করা, এক হাতে বাঁকা লাঠি। চেহারায় ফুটে আছে সুখময় প্রশান্তি।

দ্বিতীয় কফিনটা বের করল ওরা, পাথুরে ঢাকনির চেয়ে এটার ওজন কম। সাবধানে গোল্ডেন সীল আর শুকনো রেজিনের শক্ত স্তরে ফাটল ধরাল রানা, তা না হলে ঢাকনিটা আলগা করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় ঢাকনি সরাবার পর দেখা গেল ভেতরে আরও একটা কফিন। সেটা খোলার পর আরও একটা। এভাবে সব মিলিয়ে সাতটা কফিন পাওয়া গেল, একটার চেয়ে অপরটা আকারে একটু ছোট, তবে অলঙ্করণের মাত্রা ক্রমশ বাড়ল। সপ্তম কফিনটা পূর্ণ দৈর্ঘ্য একজন মানুষের চেয়ে আকারে সামান্য বড়, এটা তৈরি করা হয়েছে সোনা দিয়ে। পালিশ করা

সোনার ল্যাম্পের আলো পড়তে মনে হলো এক হাজার আয়না ঝলমল করে উঠল, সমাধির লাইটি কোণ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সোনালি আভায়।

অবশেষে সপ্তম কফিন খোলার পর দেখা গেল ভেতরে ফুল রয়েছে। কুঁড়ি আর পাপড়িগুলো শুকিয়ে গেছে, অদৃশ্য হয়েছে রঙও। সুগন্ধও কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে, রয়েছে শুধু পচা একটা ঝাঁঝ। পাপড়িগুলোর এমন অবস্থা, ছুঁতে না ছুঁতেই গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ছে। ফুলের নিচে রয়েছে মিহি লিনেন। এক সময় নিশ্চয়ই বকের পালকের মত সাদা ছিল, এখন খয়েরি দেখাচ্ছে—পচা ফুলের রস ঝরে পড়ায়। নরম ভাঁজের ভেতর সোনার চকচকে ভাব দেখতে পেল ওরা।

কফিনের দু'পাশে দাঁড়িয়ে রানা ও নিমা লিনেনের জাল ছাড়াল। ওদের আঙুলের চাপে টিস্যু পেপারের মত ছিঁড়ে গেল ওগুলো। দু'জনেই নিজের অজান্তে বিস্ময়সূচক আওয়াজ করল ফারাও-এর ডেথ-মাস্ক উন্মোচিত হয়ে পড়ায়। মানুষের মাথার চেয়ে সামান্য একটু বড় ওটা আকারে, তবে সংশ্লিষ্ট মানুষটির জীবন্ত প্রতিচ্ছবি বলতে হবে মুখোশটিকে। শিল্পীর কাজ এত নিখুঁত, চেহারার বৈশিষ্ট্যগুলো এতকাল পরও অটুট রয়েছে। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল ওরা, স্ফটিকের চোখ দিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছেন ফারাও-ও, সেই চোখে বিষণ্ণ দৃষ্টি, মনে হলো যেন অভিযোগও আছে।

মমির মাথা থেকে মুখোশটা তুলতে সাহস সঞ্চয়ের জন্যে সময় নিতে হলো ওদেরকে। তারপর যখন তুলল, আরও প্রমাণ পেল যে প্রাচীন কালে রাজা ও তাঁর জেনারেল ট্যানাস-এর দেহ অদলবদল করা হয়েছে। ওদের চোখের সামনে যে মমিটা পড়ে রয়েছে সেটা পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে কফিনের তুলনায় বেশ বড়। আংশিক আচ্ছাদন মুক্ত অবস্থায় রাখা, অনেকটা গুঁজে ভরা হয়েছে।

'রাজকীয় মমির সঙ্গে কয়েকশো তাবিজ আর মন্ত্রঃপূত কবচ থাকবে, আবরণের নিচে,' ফিসফিস করে জানাল নিমা। 'এটা বিখ্যাত বা অভিজাত কোন ব্যক্তির মমি, কোনমতেই একজন রাজার হতে পারে না।'

লাশের মাথা থেকে ব্যান্ডেজের ভেতরের স্তর খুব সাবধানে খুলল রানা, ফলে মোটা দাড়ির কুণ্ডলী পাকানো জট বেরিয়ে পড়ল। 'তোরণের ভেতর কামরাটায় ফারাও মামোসের যে প্রতিকৃতি আমরা দেখেছি, তাতে তাঁর দাড়ি ছিল হেনার রাঙানো,' বিড়বিড় করল ও। 'এটা দেখুন।' এখানে মমির দাড়ি শুকনো ঘাসের মত, সোনালি আর রূপার মত। 'আর কোন সন্দেহ নেই,' আবার বলল ও। 'এটা ট্যানাস-এর মমি। ট্যানাস টাইটার বন্ধু ছিলেন, আর রানীর ছিলেন প্রেমিক।'

নিমার চোখে জল। 'হ্যাঁ,' বলল ও। 'লসট্রিসের পুত্রসন্তানের আসল বাবা তিনিই, পরে যিনি ফারাও টামোস হয়েছিলেন, হয়েছিলেন বহু রাজার পূর্ব-পুরুষ। কাজেই ইনিই সেই ব্যক্তি, যার রক্ত প্রাচীন মিশরের ইতিহাস জুড়ে বইছে।'

'সেই অর্থে যে-কোন ফারাও-এর মতই মহান ছিলেন তিনি,' শান্ত সুরে বলল রানা।

কথাটা প্রথমে খেয়াল হলো নিমার। 'নদী!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, গলায় ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ ধার। 'নদী ফুলে উঠলে সব আবার হারিয়ে যাবে!'

'তবে সবই যে আমরা উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারব, তা ভাববেন না। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না এক জায়গায় এত সম্পদ থাকতে পারে। এদিকে আমাদের সময় প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, নিমা।'

'তাহলে?' চেহারা দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবে নিমা।

'সবচেয়ে সুন্দর আর গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো ক্রেটে ভরব আমরা,' বলল রানা। 'আল্লাই জানে সে-সময়ও পাব কিনা।'

কাজেই চরম ব্যস্ততার সঙ্গে কাজ শুরু করল ওরা। পাঁচটা রণক্ষেত্রের সমস্ত স্বর্ণমূর্তি প্রথমে বাক্স বন্দী করা হলো। পাঁচটা লম্বা বাক্স লাগল ওগুলোর জন্যে। 'বাংলাদেশী টাকায় কত হবে এই বাক্সগুলোর দাম?' কাজ থেকে হাত না সরিয়েই রানাকে প্রশ্ন করল নিমা। 'আমি আন্দাজ করতে বলছি।'

'কম করেও হাজার কোটি,' বলল রানা। 'আসলে আন্দাজ করাটা নেহাতই বোকামি হয়ে যাচ্ছে। এগুলোর প্রত্নমূল্য পাঁচ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেলেও আমি আশ্চর্য হব না।'

স্ট্যাচু, দেয়ালচিত্র, ফার্নিচার আর অস্ত্রগুলো নেয়ার কথা ভাবতেই পারা গেল না। পড়ে থাকবে তৈজস-পত্র, কাপড়-চোপড় আর কসমেটিক্সও। সোনার তৈরি বিশাল একটা রথও চার হাজার বছর ধরে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই রেখে যাবে ওরা।

ট্যানাসের মাথা থেকে সোনার ডেথ-মাস্ক তুলে নিল ওরা, তবে মমিটা কফিনের ভেতর থেকে গেল। তারপর নতুন প্রধান পুরোহিত ময়সি মাতুবাকে খবর পাঠাল রানা। তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল প্রাচীন সেইন্টের মরদেহ পুরস্কার হিসেবে দেয়া হবে, সেটা গ্রহণ করার জন্যে বিশজন সন্ন্যাসীকে নিয়ে চলে এলেন তিনি। ধর্মীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে ট্যানাস-এর কফিন বয়ে নিয়ে গেলেন তাঁরা, মঠের মাকডাস-এ স্থাপন করা হবে।

ইতিমধ্যে পাঁচটা রণক্ষেত্রের সমস্ত মূর্তি বাক্সে ভরার কাজ শেষ হয়েছে। তবে এগুলোর চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করে ডেথ-মাস্ক। একটা ক্রেটের ভেতর অনায়াসে ভরা গেল ওটাকে, পাশে শোয়ানো হলো টাইটার খুদে মূর্তিটাকে। ক্রেটে ফোম ভরা হয়েছে, ঢাকনির ওপর ওয়াটারপ্রুফ ওয়াক্স ক্রেয়ন দিয়ে লেখা হলো—মাস্ক ও টাইটার কাঠের মূর্তি।

বেশিরভাগ গুপ্তধনই ফেলে যেতে হবে, কারণ হাতে সময় নেই। গায়ে ছবি আঁকা কাঠের চেস্টগুলো আর্টিফ্যাক্টস হিসেবে অমূল্য, ভেতরের জিনিস-পত্র বাদেই। কিন্তু অসংখ্য চেস্টের মধ্যে থেকে কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা নেবে ওরা? শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো, চেস্টের ঢাকনি ও গায়ে আঁকা ছবি দেখে বাছাই করা হবে। তার আগে কয়েকটা ঢাকনি খুলে দেখে নিতে হলো ছবির সঙ্গে ভেতরের জিনিস-পত্র মেলে কিনা। একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে ফারাও তাঁর ব্লু ওঅর ক্রাউন পরে আছেন, সেই মুকুট ভেতরেও পাওয়া গেল। শুধু যে ব্লু ক্রাউন তাই নয়, লাল আর সাদা মুকুট জোড়াও অন্য একটা চেস্টে পেল ওরা। সবগুলোই অক্ষত ও অটুট অবস্থায় রয়েছে।

এরপর শুধু ছোটখাট আর্টিফ্যাক্ট ভরা হলো অ্যামুনিশন ক্রেটে। আকারে

যেগুলো বড়, যতই ঐতিহাসিক মূল্য থাকুক, বাদ দিতে হলো। ভাগ্য ভালই বলতে হবে, রাজকীয় অলঙ্কার আর মূল্যবান পাথর ভরা চেস্টগুলো ক্রেটের ভেতর জায়গা করে নিতে পারছে, ফলে শুধু পাথর আর অলঙ্কারই নয়, চেস্টগুলোও অবিশ্বাস্য দামে বিক্রি করা যাবে। তারপর বড় আইটেমগুলো, তিনটে মুকুট আর রত্নখচিত কয়েকটা বক্ষাবরণ সহ, সদ্য তৈরি বড় কয়েকটা বাক্সে ভরা হলো।

প্রতিটি অ্যামুনিশন ক্রেট ভরা হয়ে গেছে, তারপরও মাত্র পাঁচ শতাংশ প্রত্ন-সম্পদ নিতে পারছে ওরা। ক্রেটগুলো বয়ে আনা হলো সীল করা ডোরওয়ের বাইরে। লম্বা গ্যালারির আটটা স্ট্যাচুও নিচ্ছে ওরা। ওগুলো বাক্সে ভরার কাজ শেষ হয়েছে, এই সময় সিঁড়ি বেয়ে প্রায় উড়ে আসতে দেখা গেল মারটিনকে। 'তুমি কি মরতে চাও, রানা? আর এক মিনিট সময়ও পাচ্ছ না। নদী ফুঁসছে, কর গড'স সেক! বাঁধটা যে-কোন মুহূর্তে চুরমার হয়ে যাবে।'

তোরণের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল মারটিন, স্তম্ভিত বিস্ময়ে চারদিকে তাকাল। তবে বিস্ময়ের ঘোরটা কয়েক মুহূর্ত পরই সামলে নিল সে। 'মিনিট, রানা, ঘণ্টা নয়! যীশুর কিরে, বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে। তাছাড়া, গিরিখাদের মাথায় যুদ্ধে হেরে যাচ্ছে কমান্ডার শাকি। টাইটার পুল থেকে তুমি গুলির আওয়াজও শুনতে পাবে। মিস নিমাকে নিয়ে এখুনি আমার সঙ্গে বেরুতে হবে তোমার।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' বলল রানা। 'ওদিকের সিঁড়ির নিচে, চেম্বারে, ক্রেটগুলো দেখেছ তো?' মাথা ঝাঁকাল মারটিন। 'গুড। ওগুলো মঠে নামিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো। তুমিই কাজটা সুপারভাইজ করবে, ঠিক আছে? বাকি সবাইকে নিয়ে ট্রেইলে তোমাকে আমরা অনুসরণ করব।

'রানা, দোহাই লাগে, সময় নষ্ট করো না। বিপদ এলে বলতে পারবে না আমি তোমাকে সাবধান করিনি।'

'তুমি যাও, আমরা আসছি,' বলল রানা। 'বোটগুলো কোথায় আছে, জানো তো? মঠে পৌঁছেই ওগুলোয় বাতাস ভরার ব্যবস্থা করবে।'

মারটিন চলে যেতেই ছুটে তোরণের ভেতর ঢুকল রানা, নিমা যেখানে এখনও ট্রেজার ভরছে ক্রেটে। 'যথেষ্ট হয়েছে, এবার চলুন!'

'কিন্তু রানা, এ-সব আমরা ফেলে যেতে পারি না...'

'বেরোন, এখুনি বেরোন!' কঠিন সুরে ধমক দিল রানা। 'বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে! কি বলছি, শুনতে পাচ্ছেন, বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে!'

'আমি কি শুধু...'

'না, আর কিছুই নিতে পারবেন না। উঠুন!' ঝুঁকে নিমার বাহু ধরে টান দিল রানা।

ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল নিমা, ওর হাতে চেস্ট থেকে তোলা এক গাদা সোনার অলঙ্কার। 'এগুলো ফেলে যাই কি করে!' ওগুলো ট্রাউজারের পকেটে ভরতে শুরু করল।

ঝুঁকল রানা, দু'হাতে ধরে নিমাকে তুলে নিল বুকে, তারপর তোরণ পেরিয়ে এসে ছুটল।

চেম্বারের দূর প্রান্তের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে টোরা নাবুর কয়েকজন লোক,

প্রত্যেকের মাথায় একটা করে ক্রেট। এখানে পৌঁছে নিমাকে নামাল রানা, বলল, 'কোন রকম পাগলামি করবেন না!'

মাথা নাড়ল নিমা, মনে হলো কেঁদে ফেলবে। সিঁড়ি বেয়ে রানার আগে ছুটল সে। মাথায় বোঝা থাকলেও, পোর্টাররা শৃঙ্খলা বজায় রেখে দ্রুতই এগোচ্ছে। তাদের দীর্ঘ এক লাইনের মিছিলের সঙ্গে মিশে গেল রানা ও নিমা, আঁকাবাঁকা গোলকধাঁধার ভেতর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে। প্রতিটি বাঁকে চক দিয়ে আঁকা চিহ্ন থাকায় পথ চিনতে কোন অসুবিধে হলো না। অবশেষে বিধ্বস্ত লম্বা গ্যালারিতে পৌঁছুল ওরা। সীল করা ডোরওয়েটা ভেঙে গেছে, ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে মারটিন। ওদেরকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল সে।

'তোমাকে না মঠে গিয়ে বোটগুলো রেডি করতে বললাম?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার একটা দায়িত্ব বোধ আছে,' গম্ভীর সুরে বলল মারটিন। 'তোমাদের না নিয়ে যাই কিভাবে?'

কথা না বলে তার কাঁধে হালকা একটা ঘুসি মারল রানা, তারপর ছুটে অ্যাপ্রোচ টানেল পেরুল, উঠে এল সিঙ্ক-হোল-এর ওপর ভাসমান সেতুতে। ঘাড় ফিরিয়ে মারটিনের দিকে তাকাল ও, হাঁপাচ্ছে; চিৎকার করে জানতে চাইল, 'শাফি কোথায়? রুবিকে তুমি দেখছ?'

'রুবি ফিরে এসেছেন, তবে তাঁর অবস্থা খুবই করুণ।'

'কেন, কি হয়েছে তার?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কোথায় সে?'

'হেস ডুগার্ডের গরিলাটা ধরেছিল তাকে, মারধর করেছে। শাফির লোকজন মঠে নিয়ে গেছে তাঁকে। কথা হয়েছে বোটের কাছে অপেক্ষা করবে।'

'গুড। আর শাফি?'

'কর্নেল ঘুমার আক্রমণ ঠেকাবার চেষ্টা করছে। সেই সকাল থেকে রাইফেল, গ্রেনেড আর মর্টারের আওয়াজ পাচ্ছি। শাফিও পিছু হটে মঠে পৌঁছুবে, বোটের কাছে অপেক্ষা করবে আমাদের জন্যে।'

টানেলের শেষ কয়েক গজ পানির ওপর দিয়ে ছুটল ওরা। বাইরে বেরিয়ে এসে ত্রস করে টাইটার পুলকে ঘিরে থাকা নিচু পাঁচিলে উঠে পড়ল। ওখান থেকে চলে এল পাহাড়ের গোড়ায় সরু কার্নিসে। মুখ তুলে রানা দেখল টোরা নাবুর লোকজন দোলনার মত দেখতে চওড়া কপিকলে তুলে পাহাড় প্রাচীরের চূড়ায় ক্রেটগুলো ওঠাচ্ছে। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা শব্দ ঢুকল কানে, সঙ্গে সঙ্গে চিনতেও পারল। 'গান ফায়ার!' নিমাকে বলল ও। 'শাফি লড়ছে এখনও, তবে পিছু হটে খুব কাছাকাছি চলে এসেছে।'

ঝুলন্ত মাচায় উঠে পড়ল ওরা। পাহাড় প্রাচীরের চূড়ায় পৌঁছে চারদিকে তাকাল। মাথার ওপর সূর্য, তেতে আগুন হয়ে আছে। সব ক'টা ক্রেট নিয়ে পোর্টাররা ওপরে উঠেছে কিনা চেক করল রানা। ঝোপ-ঝাড় ঢাকা ট্রেইল ধরে রওনা হয়ে গেল তারা, কলামের মাথায় থাকল মারটিন, গোড়ায় রানা ও নিমা। যুদ্ধের আওয়াজ এত কাছে চলে এসেছে, ভয়ে কাঁপ ধরে যাচ্ছে বুকে। মনে হলো গিরিখাদের ভেতর মাত্র আধ মাইল দূরে লড়াই করছে ওরা। অটোমেটিক

রাইফেলের আওয়াজ পোর্টারদের ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল, ঝোপ-ঝাড়ের জঙ্গল পার হয়ে মেইন ট্রেইলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছুতে চাইছে ওরা, কর্নেল ঘুমার সৈনিকরা পথটা দখল করে নেয়ার আগেই।

পথের জাংশনে পৌঁছুবার আগেই স্ট্রেচার সহ একদল গেরিলাকে দেখতে পেল ওরা। তারাও মঠের দিকে যাচ্ছে। কাছাকাছি এসে রানা দেখল স্ট্রেচারে শুয়ে রয়েছে রুবি। তার মুখে ব্যান্ডেজ আর করুণ চেহারা দেখে মোচড় দিয়ে উঠল বুকটা। 'রুবি! কে আপনার এই অবস্থা করল?'

অভিমানী শিশুর দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল রুবি। থেমে থেমে, কোঁপাতে কোঁপাতে দু'একটা মাত্র শব্দ বলতে পারল।

'রাফেল!' চাপা গলায় গর্জে উঠল রানা। 'বেজন্মাটাকে ধরতে পারলে হয়!' ওর পাশে এসে দাঁড়াল নিমা, রুবিকে দেখে বিকৃত হয়ে উঠল ওর চেহারা।

রানাকে ঠেলে সরিয়ে দিল নিমা, বলল, 'আপনি অন্য দিকে যান, আমি ওর পাশে থাকি।'

রানা এক পাশে সরে এসে স্ট্রেচার বহনকারীদের একজনকে জিজ্ঞেস করল, 'সাবুর, কি ঘটছে ওদিকে?'

'গিরিখাদের পুব দিক থেকে একটা ফোর্স নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছেন কর্নেল ঘুমা,' বলল সাবুর। 'পাশ দিয়ে এগিয়ে এসেছে ওরা, তাই আমরা পিছু হটছি। এই যুদ্ধে আমরা অভ্যস্ত নই।'

'জানি,' মন্তব্য করল রানা। 'গেরিলারা সব সময় জায়গা বদল করবে। শাফি কোথায়?'

'গহ্বরের পুব পাড় ধরে পিছু হটছেন তিনি,' সাবুর যখন উত্তর দিচ্ছে, ওদের পিছন থেকে গোলাগুলির নতুন আরেক দফা আওয়াজ ভেসে এল। 'ওই ওখানে উনি!' মাথা ঝাঁকাল সাবুর। 'কর্নেল ঘুমা তাঁকে তাড়া করছেন।'

ছয়

অ্যাবে গিরিখাদের মাথায় জমাট বাঁধছে ঘন কালো মেঘ। প্রক্সি কোম্পানীর জেট রেঞ্জার হেলিকপ্টার সারি সারি পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে উড়ছে। রাফেল জানে অ্যালান শাফির কাছে আরপিজি, রকেট-লঞ্চার আছে, গিরিখাদের ভেতর পাহাড়-শ্রেণীর আড়াল না নিয়ে উপায় নেই তাদের। ডান দিকের সীটে বসেছে সে, পাইলটের পাশে। পিছনের প্যাসেঞ্জার সীটে বসেছেন হেস ডুগার্ড আর কারিফ ফারুকী, দু'জনেই পিছন দিকে ছুটন্ত উপত্যকার দিকে তাকিয়ে আছেন।

কয়েক মিনিট পরপর জ্যান্ত হয়ে উঠছে রেডিও, গ্রাউন্ডে কর্নেল ঘুমার লোকজন মর্টার সাপোর্ট চাইছে কিংবা লক্ষ্য অর্জনের রিপোর্ট দিচ্ছে।

'ওরা কি গহ্বরের সেই জায়গায় পৌঁছেছে,' জানতে চাইলেন ডুগার্ড, মাসুদ রানা যেখানে কাজ করছে?'

উত্তর পেতে আরও খানিকটা সময় লাগল। রেডিও থেকে সরাসরি কর্নেল ঘুমার আওয়াজ ভেসে এল। 'আমরা সফল হয়েছি, হের ডুগার্ড। সমস্ত পজিশন দখল করে নিয়েছি। কপিকলে চড়ছে আমার লোকজন, গহ্বরের নিচে নামতে যাচ্ছে ওরা।'

ডুগার্ড পাইলটকে প্রশ্ন করলেন, 'ওখানে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে?'

'মিনিট পাঁচেক, স্যার।'

'পৌঁছুবার পর জায়গাটাকে ঘিরে চক্কর মারবেন, সঙ্গে সঙ্গে ল্যান্ড করবেন না।'

ট্রেইলের জাংশনে অপেক্ষা করছিল মারটিন। নদী এখানে নতুন পথ ধরে সগর্জনে উপত্যকা বেয়ে নেমে যাচ্ছে, নামার পথে আদি ট্রেইলের কিছুটা অংশ ডুবিয়ে দিয়েছে। মাথায় ক্রেট নিয়ে পোর্টাররা উঠে যাচ্ছে উঁচু জমিনে। 'নাবু কোথায়?' মারটিনকে জিজ্ঞেস করল রানা। পোর্টারদের দীর্ঘ লাইনে তরুণ টোরা নাবুকে দেখেনি ও।

'আমি তো জানতাম সে তোমার সঙ্গে আছে,' জবাব দিল মারটিন।

ফেলে আসা পথের দিকে তাকাল রানা, ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা ট্রেইলে আর কেউ নেই। 'কে এখন খুঁজতে যায়! মঠে তাকে একাই ফিরতে হবে।' ও থামতেই দূর থেকে হেলিকপ্টারের আওয়াজ ভেসে এল। প্রক্সির 'কপ্টার, ভাবল রানা। আওয়াজ শুনে বোঝা যাচ্ছে সরাসরি টাইটার পুলের দিকে যাচ্ছেন ডুগার্ড। তারমানে ওরা কোথায় কাজ করছিল, জার্মান ধনকুবের আগে থেকেই তা জানে।

আওয়াজটার দিকে মুখ তুলে রয়েছে নিমাও, আশা ঘন কালো মেঘের গায়ে কোথাও হেলিকপ্টারটাকে দেখতে পাবে। 'ভয়োরের দলটা আমাদের সমাধিতে ঢুকলে পবিত্র একটা জায়গার মর্যাদা নষ্ট হবে,' বলল ও, গলায় রাগ।

হঠাৎ এগিয়ে এসে স্ট্রেচারের পাশে দাঁড়ানো নিমার একটা হাত চেপে ধরল রানা। 'ঠিক বলেছেন আপনি! রুবিকে নিয়ে মঠে চলে যান আপনি। আমি একটু পরে আসছি।' নিমা প্রতিবাদ করার আগেই ছুটে মারটিনের সামনে চলে এল ও। 'মারটিন, মেয়ে দুটোর দায়িত্ব তোমার ওপর থাকল।'

রানার পিছনে চলে এল নিমা। 'কি করতে চাইছেন, বলবেন আমাকে?'

'ছোট্ট একটা কাজ আছে। খুব বেশি দেরি করব না।'

'নিশ্চয়ই আপনি ওখানে আবার ফিরে যেতে চাইছেন না?' আতঙ্কিত দেখাল নিমাকে। 'ধরতে পারলে ওরা আপনাকে স্রেফ খুন করবে...'

'চিন্তা করবেন না,' বলে হেসে উঠল রানা, তারপর নিমা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওর ঠোঁটে হালকা একটা চুমো খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল, ফিরতি পথে ছুটছে। 'রুবির দিকে খেয়াল রাখবেন।'

বাঁধের ওপর দিয়ে উড়ে এল জেট রেঞ্জার। বাঁধ পিছিয়ে পড়তে গিরিখাদের আরও গভীরে নামল 'কপ্টার। দু'পাশে আকাশ ছোঁয়া পাহাড়-প্রাচীর, মাঝখানে সরু ফাঁক, তার ভেতর দিয়ে ছুটছে ওরা। গহ্বরটা প্রায় শুকনো এখন, জমে থাকা পানি

স্থির। 'ওই তো! ওই তো ওরা!' সরাসরি সামনে হাত তুলল রাফেল। ওদিকে একদল লোককে দেখা যাচ্ছে, গহ্বরের কিনারায়। 'কর্নেল ঘুমাকে আমি চিনতে পারছি! তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের স্পাই, টোরা নাবু।' এঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল তার গলা, পাইলটকে বলল, 'তুমি ল্যান্ড করতে পারো। ওই দেখো, কর্নেল ঘুমা হাত নাড়ছেন।'

হেলিকপ্টারের স্কিড জমিন স্পর্শ করতেই নাবুকে নিয়ে ছুটে এলেন কর্নেল ঘুমা। ডুগার্ডকে নিচে নামতে সাহায্য করল ওরা, ঘুরন্ত রোটরের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে আনল। 'আমার লোকেরা জায়গাটা দখল করে নিয়েছে। ডাকাতদের ধাওয়া করেছিলাম, উপত্যকার দিকে সরে যেতে বাধ্য করেছি।' তারপর টোরা নাবুর পরিচয় দিলেন ঘুমা। 'নাবু মাসুদ রানার সঙ্গে সমাধির ভেতর ছিল, টানেলের প্রতিটি ইঞ্চি চেনে।'

'ইংরেজি বোঝে?' জানতে চাইলেন ডুগার্ড।

'এক-আধটু।'

'গুড! গুড!' নাবুর দিকে তাকালেন ডুগার্ড। 'ওহে, সন্ন্যাসী, পথ দেখাও আমাকে; আসুন, ফারুকী, আপনিও আমার সঙ্গে আসুন। প্রচুর বেতন দেয়া হয়েছে আপনাকে, এবার কিছু কাজ দেখান।'

পথ দেখিয়ে ওদেরকে পাহাড়-প্রাচীরের কিনারায়, কপিকলের কাছে নিয়ে এল নাবু। কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে গহ্বরের নিচে তাকিয়ে শিউরে উঠলেন ডুগার্ড। কপিকলের বাঁশের কাঠামো ভঙ্গুর আর নড়বড়ে মনে হলো। পিছন থেকে নাবু বলল, 'স্যার, সমাধিতে নামার এটাই একমাত্র পথ।'

চোখ বুজে রশির দোলনায় বসলেন ডুগার্ড। একে একে নিচে নামল ওরা। 'টানেলটা কোথায়?' চারদিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন ডুগার্ড।

হাত তুলে পাহাড়-প্রাচীরের গোড়ার ফাঁকটা দেখাল নাবু। টাইটার পুলকে ঘিরে থাকা নিচু পাঁচিলের ওপর দিয়ে সরু কার্নিসে চলে এল সবাই। রাফেল আর কর্নেলের দিকে তাকালেন ডুগার্ড। 'রাফেলকে নিয়ে আপনি এখানে পাহারায় থাকুন, কর্নেল,' বললেন তিনি। 'নাবু আর ফারুকীকে নিয়ে ভেতরে ঢুকছি আমি।' রাফেলের দিকে তাকালেন। 'দরকার হলে তোমাদেরকে আমি ডেকে পাঠাব।'

'আমি আপনার সঙ্গে থাকতে পারলে খুশি হতাম,' বলল রাফেল। 'আপনার নিরাপত্তার দিকটা...'

ভুরু কুঁচকে ডুগার্ড বললেন, 'যা বলছি শোনো।' টানেলের মুখে ঢুকে পড়লেন তিনি। ফারুকী আর নাবু তাঁকে অনুসরণ করল। 'এত আলো আসছে কোত্থেকে?' জানতে চাইলেন ডুগার্ড।

নাবু বলল, 'একটা মেশিন আছে।' তারপর ওরা শুনতে পেল সামনে থেকে জেনারেটরের অস্পষ্ট যান্ত্রিক গুঞ্জন ভেসে আসছে। সিঙ্ক-হোলের ওপর ভাসমান সেতুতে না পৌঁছুনো পর্যন্ত ওদের মধ্যে আর কোন কথা হলো না।

'এখানে পানি কেন?' বিড়বিড় করলেন ফারুকী। 'মিশরীয় অন্য কোন প্রাচীন সমাধিতে পৌঁছুতে হলে এরকম পানি পেরুতে হয়েছে বলে তো শুনিনি।'

'আপনি বেশি কথা বলেন,' ধমক দিলেন ডুগার্ড। 'আগে দেখতে দিন এই

লোক আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যায়।'

সেতু পেরুবার সময় নাবুর কাঁধে ভর দিয়ে থাকলেন তিনি। এখান থেকে টানেল ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে। হাই-ওয়াটার মার্ক ছাড়িয়ে এল ওরা। টানেলের দেয়াল এদিকে পালিশ করা পাথর, লক্ষ করে ফারুকী মন্তব্য করলেন, 'নাহ্, আমারই ভুল হয়েছিল। টানেলের এদিকে তো দেখছি মিশরীয় প্রভাব স্পষ্ট।'

বিধ্বস্ত গ্যালারির বাইরে ল্যান্ডিঙে পৌঁছুল ওরা। এখানে জেনারেটর রয়েছে। ইতিমধ্যে হাঁপিয়ে গেছেন ডুগার্ড ও ফারুকী, দু'জনেই ঘামছেন–যতটা না ক্লান্তিতে, তারচেয়ে বেশি উত্তেজনায়।

'যত দেখছি ততই আশা জাগছে বুকে,' বললেন ফারুকী। 'এটা কোন রাজকীয় সমাধি হওয়া বিচিত্র নয়।'

এক পাশের দেয়াল ঘেঁষে স্তূপ করা রয়েছে প্লাস্টার সীল, হাত তুলে সেগুলো ফারুকীকে দেখালেন ডুগার্ড। ওগুলোর সামনে হাঁটু গাড়লেন ফারুকী, মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করলেন। 'ফারাও মামোসের সীল,' উত্তেজনায় কেঁপে গেল তাঁর গলা। 'সঙ্গে লিপিকার টাইটার সই!' চকচকে চোখ তুলে ডুগার্ডের দিকে তাকালেন। 'এখন আর কোন সন্দেহই নেই। আমি আপনাকে কথা দিয়েছিলাম সমাধিতে নিয়ে আসব, এনেছিও।'

কয়েক মুহূর্ত কথা বললেন না ডুগার্ড। তারপরই যেন বিস্ফোরিত হলেন। 'কিন্তু কি লাভ হলো? সবই তো ভেঙে নষ্ট করা হয়েছে!'

'না! না!' ব্যাকুল সুরে আশ্বস্ত করল নাবু। 'এদিকে আসুন। সামনে আরও একটা টানেল আছে।'

আবর্জনার ভেতর দিয়ে পথ করে এগোল ওরা, নাবু ব্যাখ্যা করছে গ্যালারির ছাদ কিভাবে ধসে পড়ে। ধ্বংসস্তূপের ভেতর আসল প্রবেশপথটা সেই আবিষ্কার করেছিল, এ-কথা জানাতেও ভুলল না। সবশেষে বলল, 'সামনে রাশি রাশি গুপ্তধন পড়ে আছে, দেখে আপনাদের মাথা ঘুরে যাবে।'

'ঠিক আছে,' বললেন ডুগার্ড। 'সরাসরি সমাধিতে নিয়ে চলো আমাকে। আমার হাতে সময় খুব কম।'

গোলকধাঁধা অর্থাৎ বাওবোর্ডের জটিল ছক ধরে পথ দেখাল নাবু, লুকানো সিঁড়ি বেয়ে ওদেরকে তুলে আনল, তারপর ক্রমশ নিচু টানেল ধরে এগোল।

অবশেষে তোরণশোভিত কামরার সামনে এসে থামল ওরা। কামরার ভেতর দেয়ালচিত্র দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলেন ফারুকী। 'এত সুন্দর দেয়ালচিত্র জীবনে কখনও দেখিনি আমি।'

'এরকম কিছু আমিও আশা করিনি,' ফিসফিস করলেন ডুগার্ড। 'আমি মুগ্ধ, আমি ধন্য!'

'কামরার প্রতিটি দিক অমূল্য ট্রেজারে ভর্তি,' বলল নাবু। 'ওখানে এমন সব জিনিস আছে, স্বপ্নেও আপনারা দেখেননি। মাসুদ রানা খুব অল্পই সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পেরেছেন, ছোট কয়েকটা বাক্সে ভরে। আর্টিফ্যাক্টের পাহাড় ফেলে রেখে গেছেন তিনি।'

'কফিনটা...কফিনটা কোথায়?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইলেন ডুগার্ড। 'মমি! মমি!'

'ওটা ছিল সোনালি একটা কফিনে। মাসুদ রানা সেটা প্রধান পুরোহিতকে দান করেছেন। সন্ন্যাসীরা ওটা মঠে নিয়ে গেছে।'

'কর্নেল ঘুমাকে দিয়ে ওটা আনিয়ে নেব আমরা,' বললেন ফারুকী। 'আপনি চিন্তা করবেন না, হের ডুগার্ড।'

তোরণ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলেন ওঁরা, তারপর ছুটলেন। প্রথম সারির একটা স্টোরের সামনে এসে দাঁড়ালেন ডুগার্ড, শিশুর মত অবিরাম হাসছেন। 'অবিশ্বাস্য! অবিশ্বাস্য!' একই কথা বারবার বলছেন। কাঠের একটা চেস্ট স্তূপ থেকে নামালেন তিনি, কাঁপা হাতে খুলে ফেললেন ঢাকনি। ভেতরের জিনিসগুলো দেখে বোবা হয়ে গেলেন। চেস্টের ওপর ঝুঁকে নরম সুরে কাঁদছেন।

মারটিনের হলুদ ফ্রন্ট-এন্ড ট্র্যাক্টরের ড্রাইভিং সীটে উঠে বসেছে রানা। হাইড্রলিক কন্ট্রোল অপারেট করছে গভীর মনোযোগের সঙ্গে, ক্রেনটাকে খাড়া করল যতটুকু পারা যায়। নদী আক্ষরিক অর্থেই ফুঁসছে, বাঁধের মাথা ছুঁতে আর বেশি সময় নেবে না। বাঁধ ভাঙবেই, তবে সময়টা আরও খানিক এগিয়ে আনতে চেষ্টা করছে ও। ক্রেনের যান্ত্রিক হাত কাজ শুরু করল, বাঁধের মাথা থেকে জালে আটকানো পাথর একটা একটা করে তুলে ফেলে দিচ্ছে পানিতে।

উন্মাদের মত আচরণ করছেন ডুগার্ড। চেস্ট খুলে রাজকীয় অলঙ্কার শূন্যে ছুঁড়ছেন, ছড়িয়ে দিচ্ছেন চারদিকে, ছুটে এসে এমন জায়গায় দাঁড়াচ্ছেন, ওগুলো যাতে তাঁর মুখ আর মাথায় পড়ে। সেই সঙ্গে অট্টহাসি হাসছেন, পাক খাচ্ছেন লাটিমের মত, আবার কখনও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছেন। ফারুকীও আবেগে আপ্লুত, তবে তিনি ডুগার্ডের আচরণ হাঁ করে গিলছেন।

খানিক পর কিছুটা ধাতস্থ হয়ে ডুগার্ড ফিসফিস করলেন, 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আর্কিওলজিকাল ডিসকভারি।' এখনও তিনি কাঁপছেন, রুমাল বের করে মুখ মুছলেন।

'আমাদের সামনে কয়েক বছরের কাজ,' ভাবাবেগের লাগাম টেনে গম্ভীর হবার চেষ্টা করলেন ফারুকী। 'এই অবিশ্বাস্য কালেকশনের ক্যাটালগ তৈরি করতে হবে, তারপর মূল্যায়নের পালা। আবিষ্কারক হিসেবে আপনার নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। একেই বলে মিশরীয় অমরত্ব, আপনার নাম কেউ কোনদিন ভুলবে না, হের ডুগার্ড।'

নিষ্পলক দৃষ্টিতে ফারুকীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন ডুগার্ড। এই চিন্তাটা আগে তাঁর মাথায় ঢোকেনি। অমরত্ব লাভের এই সুবর্ণসুযোগ কেন তিনি হাতছাড়া করবেন? প্রথমে ভেবেছিলেন মামোসের ট্রেজার সবই একা দখল করবেন তিনি, কাউকে কোন ভাগ দেবেন না। ফারুকীর কথা শুনে এখন ভাবছেন, ফারাওদের মত অমর হতে বাধা কোথায়? মামোসের ট্রেজার সাধারণ লোকের দ্রষ্টব্য বস্তুতে পরিণত হোক, এটা তিনি চান না, অন্তত তাঁর মৃত্যুর আগে নয়। 'না!' ফারুকীর

দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠলেন তিনি। 'এই গুপ্তধন আমার, একা শুধু আমার! আমি মারা গেলে সব আমার সঙ্গে যাবে। আমি একটা উইল তৈরি করব। আমি মারা যাবার পর কি করতে হবে আমার ছেলেরা তা জানবে। আমার সমাধিতে থাকবে সব। ওটা হবে আধুনিক কালের ফারাও হেস ডুগার্ডের রাজকীয় সমাধি।'

মানুষটা যে সত্যিকার অর্থে পাগল, আজই প্রথম উপলব্ধি করছেন ফারুকী। তবে তিনি জানেন যে তর্ক করে কোন লাভ নেই। যা করার পরে মাথা খাটিয়ে বের করতে হবে। এই বিপুল প্রত্ন নিদর্শন আরেকটা সমাধিতে হারিয়ে যাবে, তা তিনি হতে দেবেন না। মাথা নত করে আনুগত্য প্রকাশ করলেন তিনি, 'আপনি যা বলেন, হের ডুগার্ড। তবে এই মুহূর্তে আমাদের প্রথম চিন্তা, নিরাপদে সব বাইরে বের করে নিয়ে যাওয়া। রাফেল আমাদেরকে নদীর কথা বলে সাবধান করে দিয়েছেন। তাঁকে আর কর্নেলকে এখানে ডাকা দরকার, সমাধি খালি করতে হবে। সমস্ত ট্রেজার আমরা কন্টারে তুলে প্রস্তি ক্যাম্পে নিয়ে যাব। প্যাক করে ওখান থেকে পাঠিয়ে দেব জার্মানীতে।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে। রাফেল আর কর্নেলকে ডেকে পাঠান।' রাজি হলেন ডুগার্ড।

'নাবু, কোথায় তুমি?' চিৎকার করলেন ফারুকী।

খালি কফিনের সামনে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করছে তরুণ সন্ন্যাসী। উঠে এসে ফারুকীর সামনে দাঁড়াল। 'যাও, ওদেরকে ডেকে আনো...,' হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি, কান পাতলেন। 'ও কিসের শব্দ?'

মাথা নাড়ল নাবু, ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ থাকার ইঙ্গিত দিল। 'শুনুন! শুনুন!'

হঠাৎ আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেল ফারুকীর চোখ। আওয়াজটা বহুদূর থেকে আসছে, খুবই নরম, বাতাসের দীর্ঘশ্বাস ফেলার মত।

'কিসের শব্দ?' জিজ্ঞেস করলেন ডুগার্ড।

'পানি!' ফিসফিস করলেন ফারুকী। 'ছুটন্ত পানির আওয়াজ!'

'নদী!' কর্কশ শোনাল নাবুর গলা। 'টানেলে ঢুকে পড়ছে নদী!' ঘুরল সে, তোরণ হয়ে কামরা থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

'আমরা এখানে আটকা পড়ব!' চেঁচিয়ে উঠে তার পিছু নিলেন ফারুকী।

'দাঁড়ান! অপেক্ষা করুন!' গলা ফাটালেন ডুগার্ডও, পিছু নিলেন ওদের। কিন্তু ফারুকী ও নাবু তাঁর চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট, স্বভাবতই পিছিয়ে পড়ছেন তিনি।

তবে ফারুকীর চেয়ে দ্রুত ছুটছে নাবু, গ্যাসট্র্যাপ-এর সিঁড়ি বেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

'নাবু! ফিরে এসো! আমি তোমাকে হুকুম করছি!' ছুটতে ছুটতে হাঁক ছাড়ছেন ফারুকী, কিন্তু নাবু থামল না। টানেলের জটিল গোলকধাঁধায় হারিয়ে গেল।

'ফারুকী, কোথায় আপনি?' পাথুরে করিডরে ডুগার্ডের কাঁপা কাঁপা গলা প্রতিধ্বনি তুলছে। ফারুকী শুনতে পেলেও সাড়া দিলেন না। ছুটছেন তিনি, তাঁর ধারণা নাবুকে ঠিকমতই অনুসরণ করছেন এখনও। খানিক পর মনে হলো সামনে থেকে নাবুর পায়ের আওয়াজ ভেসে আসছে।

আরও তিনটে বাঁক ঘোরার পর ফারুকী উপলব্ধি করলেন, গোলকধাঁধার

ভেতর হারিয়ে গেছেন তিনি। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা মনে হলো বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে পড়লেন, চিৎকার করে ডাকলেন, 'নাবু! কোথায় তুমি?'

উত্তরে পিছন থেকে ডুগার্ডের আতঙ্কিত গলা ভেসে এল, 'ফারুকী! ফারুকী! এখানে আমাকে ফেলে যাবেন না!' তাঁর ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ ক্রমশ কাছে সরে আসছে।

'শাট আপ!' ধমক দিলেন ফারুকী। 'বোকার মত চেঁচাবেন না!' হাঁপাচ্ছেন তিনি, নাবুর পায়ের আওয়াজ শোনার আশায় আবার কান পাতলেন। কিন্তু পানির কলকল ছলছল হাসি ছাড়া আর কিছু শুনতে পেলেন না। আওয়াজটা মনে হলো তাঁর চারদিক থেকে ভেসে আসছে। 'না! নাবু, আমাকে ফেলে যেয়ো না!' আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে ছুটলেন আবার, কোত্থেকে কোথায় যাচ্ছেন নিজেও জানেন না।

আঁকাবাঁকা টানেলের প্রতিটি মোচড় দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে নাবু, মৃত্যুভয় তার পায়ে বিপুল গতি এনে দিয়েছে। কিন্তু মাঝখানের সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে হোঁচট খেলো সে, বাঁকা হয়ে গেল গোড়ালি, ধপাস করে পড়ে গেল সিঁড়ির ধাপে। গড়াতে গড়াতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল শরীরটা, লম্বা গ্যালারির নিচে এসে স্থির হলো।

অনেক কষ্টে, ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে সিধে হলো সে। যদিও ছুটতে গিয়ে আবার পড়ে গেল, মচকানো গোড়ালি বিপদের সময় সাহায্য করতে রাজি নয়। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, ক্রল করে এগোল নাবু। দরজা পেরিয়ে এসে ল্যান্ডিঙে পৌঁছুল, জেনারেটরের পাশে। টানেল থেকে সচল পানির আওয়াজ ভেসে আসছে। আওয়াজটা এখন আর নরম নয়, চাপা গর্জনের মত শোনাচ্ছে, জেনারেটরের যান্ত্রিক গুঞ্জন প্রায় শোনাই যাচ্ছে না। 'ও যীশু, ও মেরী, আমাকে বাঁচাও গো!' দেয়াল ধরে সিধে হলো আবার, এক পায়ে লাফাতে লাফাতে হাঁটছে। লোয়ার লেভেলে পৌঁছুনোর আগে আরও দু'বার হোঁচট খেয়ে পড়ল।

হাঁটুর ওপর সিধে হয়ে সামনে তাকাল নাবু। টানেলের ছাদে ইলেকট্রিক আলো সাজানো রয়েছে, তার আলোয় নিচের সিঙ্ক-হোলটা দেখতে পেল সে। দেখেও প্রথমে চিনতে পারল না, কারণ আগের সেই চেহারা আর নেই। পানির লেভেল পালিশ করা মেঝের নিচে নয় এখন। পানিতে বিপুল একটা আলোড়ন উঠেছে। ভাসমান সেতু ভেঙে গেছে, এরইমধ্যে ডুবে গেছে অর্ধেকটা।

সিঙ্ক-হোলের ওপারের টানেলে, টাইটার পুল হয়ে, ঢুকে পড়েছে পাগলা নদী। সিঙ্ক-হোল ভরাট হয়ে গেছে, এপারের টানেলে উঠে আসছে পানি সগর্জনে। কিন্তু নাবু জানে, বাইরে বেরুবার এটাই একমাত্র পথ।

এক পায়ে লাফ দিয়ে ভাসমান একটা পন্টুনে পড়ল নাবু, কিন্তু সেটা এত দ্রুত ঘুরপাক খাচ্ছে যে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। হামাগুড়ি দিয়ে বসল সে, ওই অবস্থায় এক পন্টুন থেকে আরেক পন্টুনে চলে যাচ্ছে। এভাবে সিঙ্ক-হোলের ওপারে পৌঁছুল, টানেলের দেয়াল ধরে সিধে হলো আবার, একটা গর্তের ভেতর হাত গলিয়ে ঝুলে থাকল। কিন্তু নদীর পানি শ্যাফটের ভেতর এখন তুমুল বেগে ঢুকছে, নাবুর শরীরের নিচের অংশ টানা স্রোতের মধ্যে পড়ে গেল। পানি ঠেলে সামনে এগোতে পারছে না সে, গর্ত থেকে বেরিয়ে আসছে হাতটা।

মাথার ওপর টানেলের ছাদে এখনও ইলেকট্রিক বালব জ্বলছে, টানেলের শেষ মাথায় টাইটার পুলে বেরুনোর চৌকো ফাঁকটা অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে নাবু। ওখানে একবার পৌঁছুতে পারলে কপিকলে চড়ে পাহাড়-প্রাচীরের মাথায় উঠে যাওয়া সম্ভব। শরীরের সব শক্তি এক করে স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করল সে, এক গর্ত থেকে আরেক গর্তে হাত ঢোকাচ্ছে। আঙুলের নখ উপড়ে এল, তবু এগোচ্ছে নাবু।

অবশেষে দিনের আলো দেখতে পেল সে, টাইটার পুল থেকে ভেতরে ঢুকছে। আর মাত্র চল্লিশ ফুট এগোতে হবে। এভাবে এগোতে পারলে এ-যাত্রা বেঁচে যাবে বলে মনে হলো। কিন্তু তারপরই নতুন একটা শব্দ ঢুকল কানে। টানেলের বাইরে গহ্বরের ভেতর যেন প্রলয়কাণ্ড শুরু হলো। কি ঘটছে বুঝতে পারল নাবু। বাঁধটা এবার পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে, বিপুল জলরাশি জলপ্রপাতের মত নেমে আসছে টাইটার পুলে। টানেলের বিশাল ঢেউ গ্রাস করে ফেলল, টানেল ভরাট হয়ে উঠল ছাদ পর্যন্ত।

বিপুল জলরাশির ধাক্কাটা পাথর ধসের মত লাগল নাবুকে, খড়কুটোর মত ভেসে গেল সে। সিঙ্ক-হোল নিজের গভীরে টেনে নিল তাকে, পানির প্রচণ্ড চাপ হাড়-গোড় সব গুঁড়ো করে দিচ্ছে। কানের একটা ড্রাম বিস্ফোরিত হলো, হাঁ করা মুখ দিয়ে ঢুকে ফুসফুস ভরাট করে তুলল পানি। পানির নিচের গোপন শ্যাফট দিয়ে তীরবেগে ছুটল তার লাশ, পাহাড়ের দূর প্রান্তে প্রজাপতি ফোয়ারায় বেরিয়ে যাবে।

কামানের বিস্ফোরিত গোলার মত আওয়াজ তুলে বাঁধের চূড়া ভেঙে পড়ল। মুক্ত পানি উথলে উঠল আকাশে, দেখতে পেয়েই লাফ দিয়ে ফ্রন্ট-এন্ডের সীট থেকে নিচে নামল রানা, পাড় ধরে ছুটছে। কিন্তু মাত্র কয়েক পা এগোতে পারল ও, আলোড়িত পানি নাগাল পেয়ে গেল ওর। খড়কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জলপ্রপাত হয়ে নিচে পড়ছে, গহ্বরের খোলা মুখ গ্রাস করে নিচ্ছে ওকে।

তীব্র স্রোত ট্র্যাক্টরটাকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জলপ্রপাতের মাথা থেকে খসে পড়ল ওটা, ওর নিচে শূন্যে ওটাকে এক পলকের জন্যে দেখতে পেল রানা। খসে গহ্বরের নিচে পড়ছে, উপলব্ধি করল ট্র্যাক্টরের সীটে থাকলে ওটার নিচে চাপা পড়ত ও। বিশাল মেশিনটা পুলের সারফেসে পড়ল, সাদা পানি ছিটিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল গভীরে।

একটু পর পুলে পড়ল রানা, নিচে পা দিয়ে। তীব্র স্রোত আবার ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পানির ওপর মাথা তুলল পঞ্চাশ গজ ভাটির দিকে। চোখ থেকে চুল সরিয়ে দ্রুত চারদিকে দৃষ্টি বুলাল ও।

ওর সামনে, নদীর মাঝখানে, পাথরের ছোট একটা দ্বীপ রয়েছে। অল্প একটু সাঁতরে ওটার ওপর উঠল, ওখান থেকে গহ্বরের দু'পাশের খাড়া পাঁচিলগুলোর দিকে তাকাল। শেষবার যখন এখানে আটকা পড়েছিল, তখনকার কথা মনে পড়ে গেল ওর। বাঁধ ভেঙে দিয়ে ফারাও-এর সমাধি ডুবিয়ে দেয়ার উল্লাস কর্পূরের মত উবে গেল।

ওই পিচ্ছিল পাঁচিল বেয়ে ওঠা সম্ভব নয়, জানে রানা। ধরার মত কোন গর্ত নেই পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে। গোটা প্রাচীর জুড়েই ফুলে আছে পাঁচিলের গা, পেরুনো অসম্ভব। সাঁতরে পিছন দিকে, জলপ্রপাতের গোড়ায় পৌঁছুনোও সম্ভব নয়।

তারপর লক্ষ করল, জলপ্রপাতের মাথা থেকে যতটা আশা করেছিল তত বেশি পানি নামছে না। তারমানে বাঁধটা পুরোপুরি এখনও ভেঙে পড়েনি, শুধু চূড়ার দিকটা ভেঙে গেছে। তবে চূড়া যখন ভেঙেছে, বাকিটা ভাঙতেও খুব বেশি সময় লাগবে না। তা যখন ভাঙবে, এই নদীতে সাঁতার কাটা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই, যা করার এখুনি করা দরকার। বুট খুলে দ্বীপ থেকে ডাইভ দিয়ে নদীতে পড়ল রানা। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বিকট আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল, অবশিষ্ট বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে।

দুনিয়া কাঁপানো গর্জন শুরু হলো, পানির নিরেট পাঁচিল জলপ্রপাতের মাথা থেকে লাফ দিচ্ছে নিচে। গায়ের সবটুকু শক্তি দিয়ে সাঁতরাচ্ছে রানা, দ্রুতগতি বন্যার আগে থাকার ইচ্ছা। ধেয়ে আসা ঢেউ-এর গর্জন শুনে কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাল। গহ্বরটা ডুবিয়ে দিয়ে ছুটে আসছে পানির তোড়, পনেরো ফুট উঁচু, চূড়ার দিকটা সাপের মত ফণা তুলে আছে। ওই চূড়ায় উঠতে হবে ওকে, তলিয়ে যাওয়া চলবে না, সিদ্ধান্ত নিল রানা। পানিতে থাবা মেরে ঢেউ-এর ঢাল বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা চালাল। অনুভব করল স্রোতটা ওর নাগাল পেয়ে গেছে, তুলে নিচ্ছে মাথায়। চূড়ায় ওঠার পর পিঠটা ধনুকের মত বাঁকা করল রানা, হাত দুটো গুঁজে দিল নিজের পিছনে—ক্লাসিক বডিসার্ফার পজিশন, ঝুলে আছে ঢেউ-এর মুখে, মাথাটা সামান্য নত, শরীরের সামনের অর্ধেক অংশ পানির ওপর তোলা, ভেসে থাকছে শুধু পা ছুঁড়ে। আতঙ্কিত কয়েকটা সেকেন্ড পেরিয়ে যাবার পর উপলব্ধি করল, ঢেউ-এর মাথায় থাকতে পারছে ও, নিজের ওপর খানিকটা নিয়ন্ত্রণ আছে; আতঙ্ক কমে এল, রোমাঞ্চকর একটা শিহরণ বয়ে গেল শিরায় শিরায়।

'বিশ নট!' স্রোত আর নিজের গতি আন্দাজ করল রানা, দু'পাশের পাহাড়-প্রাচীর এত দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছে যে ঝাপসা লাগল চোখে। ঢেউটার মাঝখানে থাকতে চেষ্টা করছে ও, পাঁচিলের কাছ থেকে দূরে। নিজেকে প্রায় কিছুই করতে হচ্ছে না, ঢেউই ওকে বয়ে নিয়ে চলেছে। তীব্র গতি আর বিপদের আশঙ্কা উপভোগ করছে রানা।

গহ্বরের গভীরতা বেড়ে যাওয়ায় বোল্ডারগুলো ডুবে গেছে, ফলে ধাক্কা খাবার ভয়টা এখন আর নেই। প্রথম এক মাইল পেরিয়ে আসার পর ঢেউ তার আকৃতি বদলাল, কারণ গিরিখাদ এদিকে চওড়া হয়ে গেছে। আরও খানিক পর দেখা গেল ঢেউটা ওকে মাথায় তুলে রাখতে পারছে না। দ্রুত চারদিকে চোখ বুলাল রানা। কাছেই বিশাল এক গাছের কাণ্ড ভাসছে, ছুটে চলেছে ঢেউয়ের সঙ্গে একই গতিতে। ভাঙা বাঁধের একটা অংশ এটা, কোন একটা ফাঁকে গুঁজে রেখেছিল মারটিন। কাণ্ড বা লগটা প্রায় ত্রিশ ফুট লম্বা, পিঠ দেখে মনে হচ্ছে তিমি বুঝি। কাঠুরেরা করাত দিয়ে কাটার সময় কাণ্ডের সব শাখা ছেঁটে ফেলেনি, ফলে ওটার

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ধমকের সুরে জানতে চাইলেন, 'নাবু কোথায়? আমাকে ফেলে আপনি ছুটছিলেন কেন? ইডিয়েট, বিপদটা বুঝতে পারছেন না? টানেল থেকে বেরুবার উপায় কি?'

'আমি কি করে জানব...' রেগেমেগে শুরু করলেও, ডুগার্ডের পিছনের দেয়ালে চক মার্ক দেখে থেমে গেলেন ফারুকী। আগেও এগুলো লক্ষ্য করেছেন, তবে তাৎপর্যটুকু ধরতে পারেননি। 'চিন্তা করবেন না, মাসুদ রানা আমাদের জন্যে চিহ্ন রেখে গেছে। আসুন!' টানেল ধরে দ্রুত পায়ে এগোলেন তিনি। প্রতিটি বাঁকে পৌঁছে চক মার্ক দেখে নিচ্ছেন।

এভাবে মাঝখানের সিঁড়িতে পৌঁছুলেন ওঁরা, তবে নাবু ওঁদেরকে ছেড়ে যাবার পর ইতিমধ্যে এক ঘন্টা পার হয়ে গেছে। সিঁড়ি বেয়ে লম্বা গ্যালারিতে নেমে এলেন দু'জন, নামার সময় শুনতে পেলেন নদীর হিসহিস আওয়াজটা ক্রমশ বাড়ছে—মনে হচ্ছে ঘুমন্ত একটা ড্রাগন নিঃশ্বাস ফেলছে।

ফারুকী ছুটলেন। হোঁচট খেতে খেতে তাঁর পিছু নিলেন ডুগার্ড, প্রাচীন পা দুটো ভয়ে দুর্বল হয়ে গেছে। 'দাঁড়ান! প্লীজ, দাঁড়ান!' সুরটা এখন আর ধমকের নয়, করুণা ভিক্ষার; কিন্তু শুনেও শুনছেন না ফারুকী। প্লাস্টার-সীলড ডোরওয়ের কাছে পৌঁছে মাথা নিচু করলেন তিনি, দেখলেন ল্যান্ডিঙের ওপর জেনারেটরটা এখনও চলছে, সারি সারি বালবও জ্বলছে ছাদের ওপর।

ছুটে বাঁক ঘুরলেন ফারুকী, তাঁর নিচে টানেলটা ডুবে গেছে বুঝতে পেরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সিল্ক-হোল বা ভাসমান সেতুর কোন চিহ্নমাত্র নেই কোথাও, পন্টুনগুলো কম করেও পঞ্চাশ ফুট পানির নিচে ডুবে গেছে। ডানডেরা নদী, সহস্র বছরের প্রহরী, আবার তার দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে। গাঢ় ও দুর্ভেদ্য, সমাধির প্রবেশপথ সীল করে দিয়েছে, ঠিক যেভাবে চার হাজার বছর আগে দিয়েছিল। 'হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! আমাদের ওপর রহম করো!' ফিসফিস করছেন ফারুকী।

বাঁক ঘুরে এগিয়ে এলেন ডুগার্ড, ফারুকীর পাশে দাঁড়ালেন। জলমগ্ন শ্যাফটের দিকে আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে আছেন দু'জনেই। তারপর পাশের দেয়ালে হেলান দিলেন ডুগার্ড। 'আমরা আটকা পড়েছি,' বিড়বিড় করলেন তিনি, শুনে দেয়ালে ঘষা খেয়ে বসে পড়লেন ফারুকী। নাকি সুরে প্রার্থনা করছেন, অভিমানী শিশুর কান্নার মত লাগল শুনতে।

'থামুন!' হিসহিস করলেন ডুগার্ড। 'প্রার্থনায় কোন কাজ হবে না।' বাঁকা লাঠিটা দিয়ে ফারুকীর পিঠে সজোরে আঘাত করলেন। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলেন ফারুকী, ক্রল করে পিছিয়ে যাচ্ছেন। 'বেরুবার কোন না কোন রাস্তা নিশ্চয়ই আছে,' বললেন ডুগার্ড। 'আসুন, খুঁজে বের করি। কোথাও ফাঁক থাকলে নিশ্চয়ই ভেতরে বাতাস ঢুকছে।' আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছেন ধীরে ধীরে। 'ব্লোয়ার ফ্যানটা বন্ধ করুন, বাতাস নিজে থেকে নড়ে কিনা বুঝতে হবে।'

ডুগার্ডের নির্দেশ পেয়ে ছুটলেন ফারুকী, ফ্যানটা বন্ধ করলেন।

'আপনার কাছে সিগারেট লাইটার আছে,' বললেন ডুগার্ড, তারপর রানার ফেলে যাওয়া কাগজ আর ফটোগ্রাফগুলো দেখালেন। 'আগুন জ্বালুন। ধোঁয়া দেখে

বুঝতে চেষ্টা করি বাতাস কোন দিকে বইছে।'

পরবর্তী দু'ঘণ্টা ধরে সমাধির সবগুলো লেভেলে ঘুরে বেড়ালেন ওঁরা, উঁচু করা হাতে ধরে আছেন জ্বলন্ত কাগজ, ধোঁয়ার গতিপথের ওপর নজর রাখছেন। কিন্তু টানেলের কোথাও বাতাসের কোন নড়াচড়া নেই। ক্লান্ত হয়ে আবার ওঁরা ফিরে এলেন জলমগ্ন শ্যাফটের কিনারায়।

শান্ত পানির ওপারে তাকিয়ে থেকে ডুগার্ড বিড়বিড় করলেন, 'ওটাই একমাত্র পথ।'

'নাবু হয়তো ওইপথেই বেরিয়ে গেছে,' সায় দেয়ার সুরে বললেন ফারুকী।

কিছুক্ষণ আর কোন কথা হলো না। সমাধির ভেতর সময় বোঝা যাচ্ছে না। নদী নিজের লেভেলে স্থির হয়ে আছে, টানেলের ভেতর সারফেসে কোন আলোড়ন নেই। শুধু সিঙ্ক-হোলের নিচে স্রোত বইছে, তারই কোমল হিসহিস আওয়াজ ভেসে আসছে কানে। অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙলেন ফারুকী, 'জেনারেটরের ফুয়েল ফুরিয়ে আসছে।'

খানিক পর অন্ধকার হয়ে যাবে টানেলগুলো।

আবার কয়েক মুহূর্ত কেউ কোন কথা বললেন না। তারপর অকস্মাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন ডুগার্ড। 'আপনাকে সাঁতরাতে হবে। যেভাবেই হোক শ্যাফটের বাইরে বেরিয়ে লোকজনের সাহায্য চাইতে হবে। আমি আপনাকে অর্ডার করছি!'

চোখে অবিশ্বাস, ডুগার্ডের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ফারুকী। 'দূরত্বটা আন্দাজ করতে পারছেন? টানেলের মুখ একশো গজ দূরে। একশো গজ যদি পেরুতেও পারি, বাইরে বেরিয়ে বাতাস পাব না—বন্যায় ভরাট হয়ে গেছে নদী।'

লাফ দিয়ে সিধে হলেন ডুগার্ড, হুমকি দেয়ার ভঙ্গিতে ফারুকীর দিকে ঝুঁকলেন। 'নাবু ওই পথে বেরিয়ে গেছে। আপনাকেও তাই করতে হবে। সাঁতার কেটে টানেল থেকে বেরিয়ে যাওয়া এমন কোন কঠিন কাজ নয়। কর্নেল ঘুমা আর রাফেলকে নদীর পাশেই কোথাও পাবেন। রাফেল জানে কি করতে হবে। আমাকে এখান থেকে বের করার ব্যবস্থা করবে সে।'

'আপনি একটা উন্মাদ!' পিছু হটছেন ফারুকী।

ডুগার্ডও সামনে বাড়ছেন। 'আমি আপনাকে হুকুম করছি, ফারুকী! আপনি আমার বেতন ভোগী কর্মচারী, ভুলে যাবেন না। আমি যা বলব আপনাকে তাই করতে হবে। আমি আপনার মনিব! নামুন, লাফ দিন পানিতে!'

'শালা বুড়ো, বলে কি!' টানেলের মেঝেতে ঘষা খেয়ে এখনও পিছু হটছেন ফারুকী।

সোনার বাঁকা লাঠিটা অত্যন্ত ভারী, সেটা দিয়ে ফারুকীর কাঁধে বাড়ি মারলেন ডুগার্ড। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন ফারুকী। দ্বিতীয় বাড়িটা লাগল তাঁর নাকে, নরম হাড় ভেঙে গেল, ফুটো দিয়ে হড়হড় করে রক্ত বেরুচ্ছে। চিৎকার করছেন ডুগার্ড। 'মেরে ফেলব। মেরে ফেলব। এখনও কথা শোন, তা না হলে মেরে ছাতু বানিয়ে ফেলব।' আক্ষরিক অর্থে বানাচ্ছেনও তাই, একের পর এক আঘাত করে রক্তাক্ত করছেন ফারুকীকে।

'থামুন!' আহত ঘোড়ার মত চিঁচিঁ করছেন ফারুকী। 'না, প্লীজ, থামুন! শুনব,

যা বলেন শুনব! দয়া করে আর মারবেন না!' মেঝেতে ঘষা খেতে খেতে ডুগার্ডের কাছ থেকে সরে যাচ্ছেন, কোমর সমান পানিতে পৌঁছে থামলেন। 'আমাকে তৈরি হবার সময় দিন, হের ডুগার্ড, প্লীজ।'

লাঠিটা আবার মাথার ওপর তুলে এগিয়ে এলেন ডুগার্ড। 'এখুনি! আমার হুকুম, এখুনি যান। আমি জানি চেষ্টা করলে টানেলের খোলা মুখ আপনি খুঁজে পাবেন। আমার ধারণা ওখানে কিছু বাতাস আটকা পড়েছে, শ্বাস নিতে পারবেন। তারপর বেরিয়ে যাবেন বাইরে। গো! গো!'

আঁজলা ভরা পানি তুলে মুখের রক্ত ধুলেন ফারুকী। 'একটু সময় দিন,' কাতর অনুনয় করলেন তিনি। 'জুতো আর কাপড়চোপড় খুলতে হবে।' আসলে সময় নিতে চাইছেন তিনি।

কিন্তু পানি থেকে তাঁকে উঠতে দেবেন না ডুগার্ড। 'যা করার ওখানে দাঁড়িয়েই করুন,' নির্দেশ দিলেন, মারমুখো ভঙ্গিতে আবার লাঠিটা তুললেন মাথার ওপর।

ফারুকী বুঝতে পারলেন সোনার লাঠিটা মাথায় নেমে এলে খুলিটা গুঁড়ো হয়ে যাবে। পানির কিনারায় হাঁটু ডুবে গেছে তাঁর, এক পায়ে দাঁড়িয়ে অপর পায়ের জুতো খুলছেন। তারপর, অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধীরে ধীরে শুধু আন্ডারপ্যান্ট ছাড়া সমস্ত কাপড় গা থেকে খুলে ফেললেন। তাঁর কাঁধের চামড়া থেঁতলে গেছে লাঠির আঘাতে, পিঠ বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। বুড়ো শয়তান বলে মনে মনে গাল দিচ্ছেন ডুগার্ডকে। বুঝতে পারছেন, অন্তত নির্দেশ পালনের ভান না করে কোন উপায় নেই। পানির নিচে ডুব দেবেন, টানেল ধরে কিছু দূর এগোবেন, পাশের দেয়াল ধরে অপেক্ষা করবেন কিছুক্ষণ, তারপর মাথা তুলে আবার ফিরে আসবেন।

'গো!' হুঙ্কার ছাড়লেন ডুগার্ড। 'আপনি আমার সঙ্গে চালাকি করছেন! সময় নষ্ট করে কোনই লাভ নেই। ভুলেও ভাববেন না পানি থেকে আপনাকে আমি উঠতে দেব।'

পানির আরও নিচে নেমে এলেন ফারুকী, এবার তাঁর বুক ডুবে গেল। বড় করে নিঃশ্বাস ফেললেন কয়েকবার। তারপর দম আটকে ডুব দিলেন সারফেসের নিচে। পুলের কিনারায় অপেক্ষা করছেন ডুগার্ড, গাঢ় পানির নিচে ফারুকীকে দেখতে পাচ্ছেন না। শুধু লক্ষ করলেন ফারুকীর রক্ত সারফেসের রঙ বদলে দিচ্ছে।

এক মিনিট পার হলো। তারপর হঠাৎ পানির নিচে একটা তীব্র আলোড়ন উঠল। গাঢ় সারফেসের ওপর খাড়া হলো একটা ফর্সা বাহু, হাত ও আঙুল আবেদনের ভঙ্গিতে নড়ছে। তারপর আবার ধীরে ধীরে ডুবে গেল পানির নিচে।

গলা লম্বা করে সামনে এক পা বাড়লেন ডুগার্ড। 'ফারুকী!' রাগে কাঁপছেন তিনি। 'আবার চালাকি শুরু করেছেন?'

পানির নিচে আরেকটা জোরাল আলোড়ন উঠল। সারফেসের নিচে আয়নার মত কি যেন ঝিক করে উঠল।

'ফারুকী!' গলা ফাটালেন ডুগার্ড।

যেন তাঁর হাঁক-ডাকে সাড়া দিয়েই পানির ওপর মাথাচাড়া দিলেন ফারুকী।

তাঁর ত্বক মোমের মত হলদেটে দেখাচ্ছে, সমস্ত রক্ত যেন শরীর থেকে বেরিয়ে গেছে, মুখটা চিৎকার করার ভঙ্গিতে পুরোপুরি খোলা, অথচ কোন আওয়াজ বের হচ্ছে না। তার চারপাশের পানি টগবগ করে ফুটছে, যেন বড় আকৃতির মাছের একটা ঝাঁক পানির নিচে ভোজনে মত্ত। ডুগার্ড হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছেন, ফারুকীর মাথার চারপাশ থেকে গাঢ় একটা ঢেউ জাগল পানিতে, সেই সঙ্গে লাল গোলাপ পাপড়ির রঙ পেল সারফেস। প্রথম এক মুহূর্ত ডুগার্ড বুঝতেই পারলেন না যে ওটা আসলে ফারুকীর রক্ত।

তারপর তিনি দেখতে পেলেন সরীসৃপ আকৃতির লম্বাটে প্রাণীগুলো ছুটোছুটি করছে পানির তলায়, মোচড় খাচ্ছে, পেঁচিয়ে ধরছে ফারুকীকে, কামড় দিয়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলছে তার মাংস। একটা হাত আবার উঁচু করলেন ফারুকী, এবার সেটা ডুগার্ডের দিকে লম্বা করলেন, যেন সাহায্যের আশায়। হাতটা অক্ষত নয়, কয়েক জায়গায় অর্ধচন্দ্র আকৃতির ক্ষত দেখা গেল–মাংস তুলে নেয়া হয়েছে।

আতঙ্কে চেঁচাচ্ছেন ডুগার্ড, পুল থেকে পিছিয়ে আসছেন। ফারুকীর চোখ দুটো বিশাল দেখাচ্ছে, দৃষ্টিতে অভিযোগ। ডুগার্ডের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি, গলা থেকে উন্মত্ত যে চিৎকারটা বেরুচ্ছে সেটাকে মানুষের বলে চেনার উপায় নেই।

বিশাল এক ট্রপিক্যাল ঈল সারফেসের নিচ থেকে মাথা তুলল, হাঁ করে আছে, ভাঙা কাচের মত দাঁতগুলো চকচক করছে। খোলা চোয়ালে পুরে নিল ফারুকীর গলা। কুৎসিত প্রাণীটাকে গলা থেকে ছাড়াবার কোন চেষ্টাই করলেন না ফারুকী। প্রকাণ্ড ঈল মোচড় খাচ্ছে, ঘন ঘন কুণ্ডলী পাকাচ্ছে, দাঁত দিয়ে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছে গলার মাংস, আর ফারুকীর চোখ জোড়া কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে, তাকিয়ে আছেন ডুগার্ডের দিকে।

ধীরে ধীরে ফারুকীর মাথা আবার পানির নিচে তলিয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ সারফেসের তলায় আলোড়িত হলো পানি, মাঝে মধ্যে দু'একটা ঈলের চকচকে ও পিচ্ছিল গা ভেসে উঠল পানির ওপর। তারপর ক্রমশ শান্ত হয়ে এল পানি, এক সময় আয়নার মত স্থির ও মসৃণ দেখাল আবার।

ঘুরে দৌড় দিলেন ডুগার্ড। টানেল বেয়ে উঠে এলেন ল্যাভিঙে, ওখানে জেনারেটরটা এখনও সচল রয়েছে। কোথায় যাচ্ছেন জানেন না তিনি, শুধু জানেন সিঙ্ক-হোলের কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে পালাতে হবে তাঁকে। সামনে খোলা কোন প্যাসেজ পেলেই হলো, ছুটছেন সেটা ধরে। মাঝখানের সিঁড়িটার গোড়ায় পৌঁছে টানেলের এক কোণে ধাক্কা খেলেন, ছিটকে পড়লেন মেঝের ওপর। কপালটা আলুর মত ফুলে উঠল।

কিছুক্ষণ পর সিধে হলেন তিনি, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছেন। দিশেহারা ও বিভ্রান্ত, কল্পনার চোখে অবাস্তব সব দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন। নিজেই বুঝতে পারছেন, পাগল হতে আর বেশি দেরি নেই তার। বারবার হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছেন, এক সময় আর উঠে দাঁড়াবার শক্তি পেলেন না। তবু থামছেন না, হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছেন।

খাড়া শ্যাফট বেয়ে টাইটার গ্যাস ট্র্যাপে নামার সময় হড়কে গেল শরীরটা।

ধাপ বেয়ে গড়িয়ে নিচে নামলেন। তারপর অনেক কষ্টে দাঁড়ালেন। টলতে টলতে কিভাবে তোরণটার কাছে পৌঁছুলেন, নিজেও বলতে পারবেন না। তোরণ পেরিয়ে ফারাও মামোসের সমাধিতে ঢুকলেন তিনি।

তারপরই ম্লান হয়ে গেল বালবের আলো। হলুদ আভা ছড়াচ্ছে শুধু। অবেছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেললেন ডুগার্ড। এরপর কি ঘটবে জানেন। খানিক পর ঘটলও তাই, নিভে গেল বালব, পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেল সমাধি। আবার তিনি ছুটলেন, তবে কয়েক পা এগোবার পরই ধাক্কা খেলেন কিছু একটার সঙ্গে, ছিটকে পড়লেন।

খুলি ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে। পড়ার পর আর নড়ছেন না তিনি। কতক্ষণ পর মৃত্যু আসবে? ভাবছেন তিনি। কয়েক দিন লাগতে পারে, এমন কি কয়েক হপ্তা লাগাও বিচিত্র নয়। কিসের সঙ্গে ধাক্কা খেলেন বোঝার জন্যে অন্ধকারে হাতড়াচ্ছেন। গাঢ় অন্ধকার, কাজেই হাত দিয়ে ছোঁয়ার পরও কফিনটা চিনতে পারলেন না। নিরাপদ মনে করে হোক বা অন্য কিছু ভেবে, কফিনটার ভেতর ঢুকলেন ডুগার্ড। চুপচাপ শুয়ে থাকলেন তিনি, তাঁর চারদিকে একজন প্রাচীন সম্রাটের ফিউনারাল ট্রেজারের অসংখ্য স্তূপ।

সাত

সেন্ট ফ্রুমেনটিয়াসের মঠ খালি হয়ে গেছে। গিরিখাদের নিচে তুমুল যুদ্ধের আওয়াজ শুনে সন্ন্যাসীরা নিজেদের জিনিস-পত্র নিয়ে পালিয়েছেন।

তোরণশোভিত খালি উদ্যান ধরে ছুটল রানা, দম নেয়ার জন্যে থামল সিঁড়ির মাথায় এসে। এই সিঁড়ি নীলনদের লেভেল পর্যন্ত নেমে গেছে, ওখানেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে বোটগুলো। হাঁপাচ্ছে রানা, ওর নিচের গভীর বেসিনে চোখ বুলাচ্ছে, যেখানে সূর্যকিরণ প্রায় সময় পৌঁছুতেই পারে না। জোড়া জলপ্রপাত থেকে ছড়িয়ে পড়া রূপোলি জলকণা সচল মেঘের মত খাদের গভীরতা ঢেকে রেখেছে, জানার কোন উপায় নেই নিমা আর মারটিন ওর জন্যে ওখানে অপেক্ষা করছে কিনা, নাকি ট্রেইল ধরে মঠে পৌঁছুবার সময় তারা কোন বিপদে পড়েছে।

তারপর হঠাৎ নিমার গলা ভেসে এল নিচে থেকে, ওর নাম ধরে ডাকছে। ঘন কুয়াশার মত সচল জলকণার নিচ থেকে আসছে ডাকটা। 'রানা, ওহ্, রানা!' তারপর সিঁড়ির ধাপে দেখা গেল ওকে, দ্রুত উঠে আসছে। 'থ্যাঙ্ক গড! ধরেই নিয়েছিলাম আপনাকে আর পাব না!' ছুটে এসে রানার গায়ে আছাড় খেলো ও। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল ওরা, নিমা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

'বাকি সবাই কোথায়?' খানিক পর নরম সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

রানার হাত ধরে সিঁড়ির ধাপে পা রাখল নিমা। 'নিচে আসুন। সবাই ওরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে। মারটিন আর শাকি বোটে বাতাস ভরেছেন।

ক্রেটগুলো তোলা হচ্ছে এখন।'

'রুবি?'

'ভাল আছে।'

সিঁড়ির শেষ ক'টা ধাপ টপকে এল এরা। শেষবার যখন দেখেছিল রানা, তারচেয়ে দশ ফুট উঁচু হয়েছে এখানে নীলনদ। নদী এখন উন্মত্ত, গতিও তীব্র। সচল জলকণার ভেতর দিয়ে কোনরকমে পাহাড়-প্রাচীরের গা দেখা যায়।

সাতটা রাবার বোট কিনারায় টেনে আনা হয়েছে। এরইমধ্যে চারটেতে বাতাস ভরা হয়েছে, কমপ্রেসড এয়ার সিলিন্ডারের সাহায্যে বাকিগুলোতেও বাতাস ভরার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বাতাস ভরা চারটে বোটে ক্রেটগুলো তোলার পর এই মুহূর্তে সেগুলো নাইলন কার্গো নেট দিয়ে সুরক্ষিত করা হচ্ছে। এগিয়ে এসে শাফির কাঁধে হাত রাখল রানা, বলল, 'ধন্যবাদ, বন্ধু। তোমার গেরিলারা বীরের মত লড়েছে। তুমি আমার জন্যে অপেক্ষাও করেছ।' পাহাড়-প্রাচীরের সরু কার্নিসে শুয়ে-বসে থাকা গেরিলাদের দিকে তাকাল ও। 'ক'জনকে হারিয়েছ তুমি, শাফি?'

'তিনজন মারা গেছে, ছ'জন আহত হয়েছে,' বলল শাফি। 'আরও বেশি ক্ষতি হতে পারত, কর্নেল ঘুমা যদি আরও জোরে ধাওয়া করতেন।'

'তবু, এ-ও অপূরণীয় ক্ষতি,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, কোন মৃত্যুরই ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়,' সায় দিল শাফি।

'যারা মারা গেছে,' বলল রানা, 'তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা এক লাখ ডলার করে পাবে। আর যারা আহত হয়েছে, সবাইকে দেয়া হবে পঞ্চাশ হাজার ডলার। ত্রিশ হাজার করে পাবে বাকিরা। শাফি, তোমার বাকি লোকজন কোথায়?'

'সীমান্তের দিকে রওনা হয়ে গেছে। শুধু বোটগুলো হ্যান্ডেল করার জন্যে কয়েকজনকে রেখে দিয়েছি।' রানার হাত ধরে কয়েক পা হেঁটে এল শাফি, গলা খাদে নামিয়ে বলল, 'বিপদ এখনও কাটেনি, রানা।'

'জানি,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কর্নেল ঘুমা এখনও বেঁচে আছে।'

'শুধু তাই নয়,' বলল শাফি। 'অন্তত পুরো একটা কোম্পানী নিয়ে নদীর ভাটি পাহারা দিচ্ছে। আমার স্কাউটরা রিপোর্ট করেছে, দুই পাড়ের ট্রেইলের পজিশন নিয়ে আছে তারা।'

'আমাদের বোটের কথা কর্নেল জানে না, জানে কি?' রানার চোখে কঠিন দৃষ্টি।

'জানার তো কথা নয়,' বলল শাফি। 'কিন্তু আমাদের গতিবিধি সম্পর্কে অনেক কথাই তার জানার কথা ছিল না, অথচ জেনে ফেলেছে। আমাদের শ্রমিকদের মধ্যে তার হয়তো কোন ইনফর্মার ছিল।' কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল সে, তারপর আবার বলল, 'কর্নেলের কাছে এখনও হেলিকপ্টার আছে, রানা। মেঘ কেটে গেলেই নদীতে আমাদেরকে দেখতে পাবে।'

'নদীই আমাদের একমাত্র এস্কেপ রুট। আশা করা যাক আবহাওয়ার কোন পরিবর্তন ঘটবে না।'

সবগুলো বোটে বাতাস ভরার কাজ শেষ হলো। একটা বোটে তোলা হলো

রুবিকে, স্ট্রেচার সহ। তারপর ধরাধরি করে বোটের কাছে নিয়ে আসা হলো আহত দু'জন গেরিলাকে, বাকি সবাই হাঁটতে পারছে। কাজটা শেষ হতে আবার রানার কাছে ফিরে এল শাফি। 'তোমার রেডিও দেখছি ফিরে পেয়েছ,' ক্যারিয়ার স্ট্র্যাপের সঙ্গে ফাইবার গ্লাস কেসটা রানার কাঁধে ঝুলতে দেখে বলল সে।

'এটা ছাড়া বিপদ এড়ানো যাবে না,' জবাব দিল রানা। 'শাফি, তুমি রুবির বোটে থাকো। সামনের বোটে আমি নিমাকে নিয়ে থাকব।'

'আমাকে সামনে থাকতে দিলে ভাল হত,' বলল শাফি।

'নদী সম্পর্কে কি জানো তুমি?' রানা হাসছে না। 'এই নদী পথে একমাত্র আমিই আসা-যাওয়া করেছি।'

'সে তো বহু বছর আগের কথা,' বলল শাফি।

'তখন আরও অনভিজ্ঞ ছিলাম। শাফি, তর্ক করো না। আমার পিছনে থাকবে তুমি, তোমার পিছনে মারটিন। তোমার গেরিলাদের মধ্যে আর কেউ আছে, এই নদী সম্পর্কে ধারণা রাখে?'

'আমার সব লোকই ধারণা রাখে,' বলে নিজের লোকদের উদ্দেশে হাঁক-ডাক শুরু করল শাফি। চারজন গেরিলা ছুটে এসে বাকি চারটে বোটে উঠে পড়ল। সবাই যার যার বোটে চড়েছে কিনা দেখে নিয়ে, সবার শেষে নিজের বোটে উঠল রানা। ওর নির্দেশে প্রত্যেকে বৈঠা হাতে নিল, রুবি আর আহত গেরিলা দু'জন বাদে।

শাফি মিছে গর্ব করেনি, গেরিলারা সত্যি সত্যি দক্ষ হাতে বৈঠা চালাচ্ছে। দেখতে না দেখতে নীলনদের মূল স্রোতে গিয়ে পড়ল সাত বোটের ছোট্ট বহরটা।

প্রতিটি বোটে ষোলোজন লোকের জায়গা হবার কথা, সে তুলনায় লোক বা কার্গো কমই তোলা হয়েছে। কোন বোটেই নয়জনের বেশি লোক নেই। তবে গুপ্তধন ভর্তি ক্রেটগুলো কম ভারী নয়।

'সামনে বিপজ্জনক পানি,' নিমাকে গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'সেই সুদান সীমান্ত পর্যন্ত।' বোটের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে ও, হাতে হাল, সামনেটা ভাল করে দেখে নিচ্ছে। ওর পায়ের কাছে গুড়ি মেরে বসে রয়েছে নিমা, ঝুলে আছে একটা সেফটি স্ট্র্যাপ ধরে।

জলপ্রপাতের নিচে জোরাল স্রোতটাকে আড়াআড়িভাবে পেরিয়ে এল ওরা, সরু একটা ফাঁক বরাবর বহরটাকে এক লাইনে নিয়ে এল, ওই পথে পশ্চিম দিকে ছুটছে নদী। আকাশের দিকে তাকাল ও, দেখল পানি ভর্তি কালো মেঘ খুব নিচে নেমে এসেছে, যেন পাহাড়-প্রাচীরের চূড়াগুলোকে ছুঁয়ে দেবে।

'ভাগ্য বোধহয় আমাদেরকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে,' নিমাকে বলল ও। 'এই আবহাওয়ায় হেলিকপ্টার নিয়ে বেরুলেও ওরা আমাদেরকে খুঁজে পাবে না।'

হাতে বাঁধা রোলেক্সের দিকে তাকাল রানা, পানির ছিটা লেগে ঝাপসা হয়ে আছে কাঁচ। 'সন্ধে হতে আরও দু'ঘণ্টা।' পিছন দিকে তাকাল ও। বাকি বোটগুলো ডুবু ডুবু হয়ে অনুসরণ করছে ওদেরকে। বোটগুলো হলুদ রঙের, গিরিখাদের গাঢ় ছায়া আর কুয়াশার ভেতরও পরিষ্কার দেখা যায়। একটা হাত তুলে নাড়ল রানা,

উত্তরে দ্বিতীয় বোট থেকে শাফিও তাই করল। দাড়ির ভেতর তার হাসি দেখতে পেল রানা।

নদী এরপর এঁকেবেঁকে, মোচড় খেয়ে এগিয়েছে। কোথাও কোথাও বোল্ডারের মাঝখান দিয়ে সরু পথ ধরে এগোতে হলো ওদেরকে। স্রোত এত তীব্র, বৈঠা না চালালেও বোট ছুটছে। গিরিখাদের ভেতর বর্ষার পানি ঢোকায় নদীর ওপর জেগে থাকা অনেক খুদে দ্বীপ বা বড় আকারের বোল্ডার ডুবে গেছে, তবে সারকেসের ঠিক নিচেই রয়েছে ওগুলো, বোঝা যাচ্ছে স্রোত বাধা পেয়ে ফেনা তৈরি হতে দেখে। বন্যার পানি দু'দিকের পাড় ধরেই অনেক ওপরে উঠে গেছে, উপ-খাদের প্রাচীর ছুঁই-ছুঁই করছে। একটা বোট যদি উল্টে যায়, বা বোট থেকে কেউ যদি পড়ে যায়, পিছিয়ে গিয়ে বোট বা আরোহীকে উদ্ধার করা অন্তত এই নদীতে সম্ভব নয়।

বোটের পিছনে দাঁড়িয়ে সামনে তাকিয়ে আছে রানা। মনে মনে শিউরে উঠল, কারণ খানিক দূর থেকে শুরু হয়েছে নদীর উন্মত্ততা। ওর গোটা জগৎ উপ-খাদের আকাশ ছোঁয়া প্রাচীরের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ল। মুখে পানির ছিটা লাগছে, নাকি বৃষ্টি শুরু হয়েছে, খেয়াল থাকল না। নদীর নিচে প্রায় খাড়া ঢাল রয়েছে, ফলে তীব্র স্রোত বোটগুলোকে উল্টে দিতে চাইছে। ঢালের নিচে সমতল সারকেসে নামার সময় একটা বোট থেকে দু'জন ছিটকে পড়ল। একজন লোককে দ্রুত ধরে ফেলায় বেঁচে গেল সে, কিন্তু দ্বিতীয় লোকটার মাথা ঠুকে গেল একটা বোল্ডারের সঙ্গে, কেটে চৌচির হয়ে গেল খুলি। ডুব দেয়ার পর আর সে উঠল না। কেউ কথা বলল না বা শোক প্রকাশ করল না। সবাই যে যার প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত।

নদীর গর্জনে কান পাতা দায়। সেই শব্দকে ছাপিয়ে উঠল নিমার চিৎকার, 'রানা, হেলিকপ্টার!'

পাহাড়-প্রাচীরের মাথায় নেমে আসা কালো মেঘের দিকে তাকাল রানা, দেখতে না পেলেও এঞ্জিনের আওয়াজ ঢুকল কানে। 'মেঘের আড়ালে!' পাল্টা চিৎকার করল ও, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে পানির ছিটা আর বৃষ্টির ফোঁটা মুছল চোখ থেকে। 'এই মেঘ-বৃষ্টির মধ্যে ওরা আমাদেরকে দেখতে পাবে না।'

আকাশ মেঘে ঢাকা পড়ে যাওয়ায় ওদের ওপর দ্রুত নেমে এল আফ্রিকান রাত্রি। ঘনায়মান সন্ধ্যায় কোন রকম সতর্ক হবার সুযোগ না দিয়ে আরেকটা বিপদ লাফ দিয়ে পড়ল ওদের ওপর। এক মুহূর্ত আগে নদীর মসৃণ বিস্তৃতি ধরে দ্রুতগতিতে ছুটছিল বোট, পরমুহূর্তে ওদের সামনে উন্মুক্ত হলো পানি, নদী ওদেরকে শূন্যে ছুঁড়ে দিল। তারপর মনে হলো অনন্তকাল ধরে খসে পড়ছে ওরা, অথচ পতনটা ত্রিশ ফুটের বেশি নয়। জলপ্রপাতের নিচে পড়ে ডুবে গেল ওরা: বোট, কার্গো আর আরোহী জট পাকিয়ে একাকার। নদী এখানে স্রোতবিহীন, বিরাট-একটা জায়গা জুড়ে ফুঁসছে, আবার বিপুল বেগে ধাবিত হবার জন্যে এক করছে যেন সমস্ত শক্তি।

একটা বোট উল্টো হয়ে ভাসছে। বাকি বোটগুলোর আরোহীরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়ে দ্রুত বৈঠা চালিয়ে ছুটে গেল সেদিকে। পানি থেকে তুলে নিল ডুবন্ত আরোহীদের, উদ্ধার করল ভাসমান বৈঠা আর ইকুইপমেন্ট। সবার মিলিত

চেষ্টায় বোটটাকেও সিধে করা সম্ভব হলো। ইতিমধ্যে গিরিখাদ পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেছে।

'ক্রেটগুলো গুনতে হয়,' নির্দেশ দিল রানা। 'ক'টা হারালাম?'

খানিকপর মারটিনের চিৎকার শুনে নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে হলো রানার। 'সব মিলিয়ে তেরোটা ক্রেট!' কোন বাক্সই পানিতে পড়েনি, কৃতিত্বটা আসলে কার্গো নেটের। তবে সবাই ওরা সাংঘাতিক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ভেজা শরীরে কাঁপছে। এই অন্ধকারে এগোনোর চেষ্টা আত্মহত্যা করতে চাওয়ার নামান্তর। কাছাকাছি বোটের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে শাফির চোখে তাকাল রানা।

শাফি বলল, 'পাহাড়ের ওদিকটার একটা ভাঁজে পানি খানিকটা শান্ত।' পুলের লেজের দিকটা হাত তুলে দেখাল সে। 'রাত কাটানোর জন্যে কার্নিস পাওয়া যেতে পারে।'

ঠিক ভাঁজ নয়, পাহাড়ের গায়ে সরু একটা ফাটল দেখল ওরা। ফাটলটার মুখেই অ্যাবস্ট্রাক্ট শিল্পকর্মের মত উদ্ভট আকৃতির একটা গাছ, বেশ অনেকগুলো শাখা, তবে একটাতেও কোন পাতা নেই। ওটায় বোটের রশি বাঁধল ওরা। রশির দৈর্ঘ্য কমবেশি রাখা হলো, ফলে বোটগুলো পাশাপাশি ভেসে থাকছে। গরম খাবার বা পানীয় কল্পনাও করা যায় না, বেয়নেটের ডগা দিয়ে টিনের কৌটা খুলে শুকনো কিছু খাবার মুখে দিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হলো।

নিজের বোট থেকে লাফ দিয়ে রানার বোটে চলে এল শাফি, বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে কথা বলল কানে কানে। 'এই মাত্র রোল কল করলাম। জলপ্রপাত থেকে পড়ার সময় আরও একজনকে হারিয়েছি আমরা। এখন আর তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'লীডার হিসেবে আমি বোধহয় ভাল করছি না,' বলল রানা। 'কাল সকাল থেকে তুমি সামনে থাকবে।'

'তুমি দায়ী নও।' রানার কাঁধে চাপ দিল শাফি। 'এরচেয়ে ভাল করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। দায়ী আসলে শেষ ওয়াটারফলটা...' থেমে গেল সে, দু'জনই ওরা অন্ধকারে কান পেতে জলপ্রপাতের গর্জন শুনছে।

'কতদূর এলাম আমরা?' জানতে চাইল রানা। 'আর কতদূর যেতে হবে?'

'বলা প্রায় অসম্ভব, তবে আমার ধারণা অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এসেছি। কাল দুপুরের মধ্যে সীমান্তে পৌঁছে যাব।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর শাফি জিজ্ঞেস করল, 'ক'তারিখ আজ?'

'ভুলে গেছি।' রোলেক্সটা চোখের সামনে তুলে আলোকিত ডায়ালে তাকাল রানা। 'গুড গড! আজ ত্রিশ তারিখ!'

'তোমার পিক-আপ এয়ারক্রাফট পরশু রোজিরেস এয়ারস্ট্রিপে পৌঁছুবে,' মনে করিয়ে দিল শাফি।

'হ্যাঁ, পয়লা এপ্রিলে,' বলল রানা। 'আমরা সময় মত পৌঁছুতে পারব তো?'

'উত্তরটা তোমার কাছ থেকে চাই আমি,' বলল শাফি, কিন্তু হাসছে না। 'তোমার পাইলট কতটুকু বিশ্বস্ত? পৌঁছুতে দেরি করার আশঙ্কা কতটুকু?'

'ইস্কান্দার প্রফেশন্যাল, পৌঁছুতে কখনোই দেরি করেন না,' জোর দিয়ে বলল

রানা। আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল। খানিক পর জিজ্ঞেস করল, 'রোজিরেস পৌঁছে তোমাকে যদি ট্রেজারের ভাগ দিয়ে দিই, ওগুলো নিয়ে কি করবে তুমি?' একটা ক্রেটে জুতোর ডগা ঠেকাল রানা। 'সঙ্গে করে নিয়ে যাবে?'

'তোমাদেরকে প্লেনে তুলে দেয়ার পর কর্নেল ঘুমাকে পিছনে ফেলার জন্যে আরও কিছুদূর ছুটতে হবে আমাদের, কাজেই অতিরিক্ত বোঝা বইতে রাজি নই। আমার ভাগ তোমার সঙ্গে থাকবে। বিক্রিও করবে তুমি—এখানে যুদ্ধ চালাবার জন্যে নগদ টাকা দরকার আমার।'

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করো?'

'বিশ্বাস না করলে বন্ধু কিসের!'

'বন্ধুদের ঠকানো সবচেয়ে সহজ—ওরা বেঈমানী আশা করে না,' বলল রানা, শুনে ওর কাঁধে হালকা ঘুসি মারল শাকি।

'খানিকটা ঘুমিয়ে নাও। কাল হয়তো বিকেল পর্যন্ত একটানা বৈঠা চালাতে হবে।' বোটের ওপর দাঁড়াল শাকি। লাফ দিয়ে পাশের বোটে চলে গেল। রুবি তার জন্যে অপেক্ষা করছে ওখানে।

নিমার দিকে ঝুঁকে হাত বাড়াল রানা। টেনে এনে ওর দুই হাঁটুর মাঝখানে বসাল, নিমা বাধা না দিয়ে হেলান দিল ওর বুকে, ভেজা কাপড়ে একটু একটু কাঁপছে। খানিক পর কাঁপুনিটা বন্ধ হয়ে গেল। নিমা ফিসফিস করে বলল, 'দেখা যাচ্ছে আপনি একটা হটওয়াটার-বটল।'

'আমাকে খুব কাছে থাকতে দেয়ার এটা একটা মস্ত সুবিধে,' নিঃশব্দে হাসছে রানা, নিমার মাথায় আদর করে হাত বুলাচ্ছে। জবাবে নিমা আর কিছু বলল না, তবে নিতম্ব ঘষে আরও একটু কাছে সরে এল। আরও খানিক পর ঢিল পড়ল ওর পেশীতে, ঘুমিয়ে পড়ল রানার বুকে মাথা রেখে।

রানাও সাংঘাতিক ক্লান্ত, ঘন্টার পর ঘন্টা হাল ধরে থাকার তালুতে ফোস্কা পড়ে গেছে, তবু নিমার মত এত সহজে ঘুমিয়ে পড়তে পারল না। রোজিরেস এয়ারস্ট্রিপে পৌঁছুতে পারার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, কাজেই নদীর সঙ্গে যুদ্ধ করে এগোনো আর কর্নেল ঘুমাকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়াও অন্যান্য সমস্যা উঁকি দিচ্ছে ওর মনে। নদী আর কর্নেল ঘুমা পরিচিত শত্রু, কাজেই কিভাবে লড়তে হবে জানে। কিন্তু পরিচিত শত্রু ছাড়াও অন্য অনেক কিছু বিপদ হয়ে দাঁড়াতে পারে, অচিরেই সে-সবের মুখোমুখি হতে হবে ওকে।

ওর বাহুবন্ধনে বিড়বিড় করে কি যেন বলল নিমা, বুঝতে পারল না রানা। স্বপ্ন দেখছে মেয়েটা, ঘুমের মধ্যে কথা বলছে। আদর করে আবার ওর মাথায় হাত বুলাল রানা, স্থির হয়ে গেল নিমা। কিন্তু খানিক পর আবার কথা বলল ও, এবার কথাগুলো পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। 'সত্যি আমি দুঃখিত, রানা। আমি চাই আপনি আমাকে ঘৃণা করবেন না। কিভাবে আপনাকে আমি এ-সব...' শেষ দিকে কথাগুলো জড়িয়ে গেল, কি বলতে চায় বোঝা গেল না।

রানার স্নায়ু টানটান হয়ে উঠেছে, নিমার কথাগুলো মনের সন্দেহ আর আশঙ্কা বাড়িয়ে দিয়েছে শতগুণ। বাকি রাতটুকু প্রায় জেগেই কাটিয়ে দিল ও, ঘুম এলেও খানিক পরপর ভেঙে যাচ্ছে।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে আবার নদীর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হলো। মাথার ওপর মেঘ এখনও নিচে নেমে আছে, কোথাও এতটুকু ভাঙনও ধরেনি; খানিক পর পর এক পশলা করে বৃষ্টিও হচ্ছে। সারাটা সকাল ধরে বিরতিহীন ছুটল বোট, ধীরে ধীরে নদীর মেজাজ শান্ত হয়ে আসছে। স্রোত এখন আর আগের মত তীব্র নয়, পাড়গুলো নয় দুর্গম বা খাড়া।

দুপুরের দিকেও মাথার ওপর মেঘ জমাট বেঁধে থাকল। নদীর এমন একটা বিস্তৃতিতে পৌঁছুল ওরা, পানি এখানে প্রবাহিত হচ্ছে অসংখ্য ব্লাফ আর হেডল্যান্ডের ভেতর দিয়ে। ইতিমধ্যে নিরাপদ পথ চিনতে দক্ষ হয়ে উঠেছে রানা, বোধহয় সেজন্যেই কোন রকম বিপদের মধ্যে না পড়ে বিস্তৃতিটুকু পার হয়ে এল বোটগুলো। 'সম্ভবত সুদানের সমতল প্রান্তরে পৌঁছুতে যাচ্ছি আমরা, নদী তাই চওড়া হয়ে যাচ্ছে,' নিমাকে বলল রানা।

'রোজারিস আর কত দূরে?' জানতে চাইল নিমা।

'তা বলতে পারব না, তবে সীমান্তের খুব কাছাকাছি চলে এসেছি।'

নদী শান্ত হওয়ায় রানা আর শাফির বোট এখন পাশাপাশি চলে এসেছে। একটা বাঁক ঘুরল ওরা, সামনে আরও চওড়া দেখাল নদীকে, কোথাও কোন আলোড়ন নেই। তবে পরবর্তী বাঁক ঘুরতেই নাক বরাবর সামনে নদীর মাঝখান থেকে উথলে উঠতে দেখল একটা ফোয়ারাকে। সচল ফোয়ারা, ওদের দিকে ছুটে আসছে। পরমুহূর্তে অটোমেটিক ফায়ারের আওয়াজ ভেসে এল, একটা রুশ আরপিডি থেকে আসছে।

লাফ দিয়ে নিমার গায়ে পড়ল রানা, নিজের শরীর দিয়ে ঢেকে ফেলল ওকে, শুনতে পেল পাশের বোট থেকে গেরিলাদের উদ্দেশে চিৎকার করছে শাফি। 'রিটার্ন ফায়ার! মাথা নিচু রাখতে বাধ্য করো ওদের!'

গেরিলারা বৈঠা ফেলে দিয়ে অস্ত্র তুলে নিল হাতে। নদীর পাড় সামান্য মোচড় খেয়েছে, সেই মোচড়ের ভেতরের কোণ থেকে হামলা করা হয়েছে, গেরিলারা পাল্টা গুলি করছে সেদিকে।

শত্রুপক্ষ পাথর আর ঝোপের আড়ালে রয়েছে, গেরিলাদের সামনে নির্দিষ্ট কোন টার্গেট নেই। তবে এ-ধরনের অ্যামবুশে পড়লে বিরতিহীন পাল্টা গুলি করার কোন বিকল্প নেই, আক্রমণকারীরা যাতে মাথা নিচু রাখতে বাধ্য হয়, যাতে লক্ষ্যস্থির করতে না পারে।

নিমার মাথার কাছে বোটের নাইলন স্কিন ভেদ করল একটা বুলেট, মেটাল অ্যামুনিশন ক্রেটে লাগল। বৃষ্টির মত বুলেট ছুটে আসছে, বোটগুলোর ফুটো হওয়া ঠেকানোর উপায় নেই। একজন গেরিলার মাথায় লাগল একটা বুলেট, খুলির ওপর একটা গভীর খাল কেটে বেরিয়ে গেল, ছিটকে পানিতে পড়ে গেল লোকটা। যতটা না ভয়ে, তারচেয়ে বীভৎস দৃশ্যটা অসুস্থ করে তুলল নিমাকে। নিহত লোকটার রাইফেল ছোঁ দিয়ে তুলে নিল রানা, পাড় লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে খালি করে ফেলল ম্যাগাজিন।

বোটগুলো এখনও স্রোতের সঙ্গে ভাটির দিকে ছুটছে, কেউ হাল ধরে না

থাকায় অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে। অ্যামবুশকে পাশ কাটিয়ে পরবর্তী বাঁক ঘুরতে এক মিনিটের বেশি লাগল না। খালি রাইফেল ফেলে দিয়ে শাফির দিকে তাকাল রানা। 'রিপোর্ট করো, শাফি!'

'আমার বোটে একজন মারা গেছে,' বলল শাফি।

প্রতিটি বোট থেকে রিপোর্ট চাইল রানা। মারা গেছে ওই একজনই, আহত হয়েছে তিনজন। তবে আহত কারও অবস্থা গুরুতর নয়। তিনটে বোট ফুটো হয়েছে, তবে প্রতিটি খোল আলাদা আলাদা ওয়াটারপ্রুফ কমপার্টমেন্ট জোড়া লাগিয়ে তৈরি হওয়ায় এখনও ভেসে আছে পানির ওপর।

বোট নিয়ে রানার পাশে চলে এল শাফি। 'অথচ আমি ভাবছিলাম কর্নেল ঘুমাকে ফাঁকি দিতে পেরেছি।'

'প্রথম হামলাটা হালকার ওপর দিয়ে গেছে,' বলল রানা। 'নদীতে ওরা আমাদেরকে আশা করেনি, ফলে দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, কর্নেল ঘুমাকে আর চমকে দেয়া যাবে না। বাজি ধরতে পারো, রেডিওতে কথা বলছে ওরা। ঘুমা এখন জানে কোথায় রয়েছি আমরা, যাচ্ছিই বা কোনদিকে।' মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল শাফি। 'মেঘ কেটে গেলে বিপদ হবে।'

'সুদান সীমান্ত আর কত দূরে?'

'আর বোধহয় দু'ঘণ্টার পথ।'

'বর্ডার ক্রসিঙে গার্ড থাকে?' জানতে চাইল রানা।

'না। দু'দিকেই ফাঁকা ঝোপ।'

'ফাঁকা থাকলেই হয়,' বিড়বিড় করল রানা।

গোলাগুলি থেমে যাবার ত্রিশ মিনিট পর আবার ওরা হেলিকপ্টারের আওয়াজ পেল। মেঘের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, যাচ্ছে ভাটির দিকে। বিশ মিনিট পর আবার শোনা গেল রোটরের আওয়াজ, তবে এবারও মেঘের আড়ালে থাকায় দেখা গেল না। উজানের দিক থেকে এল, খানিক পর আবার ভাটির দিকে গেল। 'ঘুমার মতবলটা কি বলো তো?' গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল শাফি। 'আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে নদীর ওপর টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু মেঘের নিচে আমাদেরকে তো দেখতে পাচ্ছে না।'

'নিজের লোকজনকে ভাটির দিকে নিয়ে যাচ্ছে,' বলল রানা। 'আমাদের সঙ্গে বোট আছে, কোনদিকে যাচ্ছি আন্দাজ করে নিয়েছে। হয়তো রোজারিস এয়ারস্ট্রিপ সম্পর্কেও তার জানা আছে। নদীর কাছাকাছি ওটাই একমাত্র পরিত্যক্ত এয়ারস্ট্রিপ। পৌঁছে হয়তো দেখব ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।'

নিজের বোট আরও কাছে সরিয়ে আনল শাফি, তারপর বলল, 'আমার ভাল ঠেকছে না, রানা। সরাসরি ওদের ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছি। কিছু একটা পরামর্শ দাও।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করল রানা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'নদীর এই অংশটা তুমি চিনতে পারছ না? এখনও বুঝতে পারছ না ঠিক কোথায় আমরা রয়েছি?'

মাথা নাড়ল শাফি। 'সীমান্ত পেরুবার সময় নদীর কাছ থেকে দূরে সরে থাকি

আমরা। তবে পুরানো সুগার মিলটা চিনতে পারব, ওখানে পৌঁছুবার পর। এয়ারস্ট্রিপ থেকে তিন মাইল উজানে ওটা।'

'পরিত্যক্ত?'

'হ্যাঁ,' বলল শাফি। 'বিশ বছর আগে যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকেই খালি।'

'আকাশে মেঘ থাকায় এক ঘন্টার মধ্যে সন্ধে হয়ে যাবে,' বলল রানা। 'নদী শান্ত, কাজেই রাতেও আমরা বোট চালাতে পারি। ঘুমা হয়তো তা আশা করছে না। অন্ধকারে তাকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব হতে পারে।'

'এই তোমার পরামর্শ?' শাফির গলায় ক্ষোভ। 'এ যেন চোখ বুজে নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেয়া।'

'আরও ভাল প্ল্যান পেতে হলে তথ্য দাও আমাকে,' বলল রানা। 'ইস্কান্দার কাল কখন পৌঁছুবেন জানাও। এখন ঠিক কোথায় রয়েছি বলো।'

শাফি কথা বলল না।

ওদের মত গেরিলারাও খুব টেনশনে ভুগছে। সন্ধে হয়ে এলেও, হাতের অস্ত্র দুই পারের দিকে তাক করে রেখেছে তারা। আরও অনেকক্ষণ পর শাফি বলল, 'আমরা সম্ভবত এক ঘন্টা আগেই সীমান্ত পেরিয়ে এসেছি। সুগার মিলটা আর বেশি দূরে হতে পারে না।'

'অন্ধকারে ওটাকে তুমি খুঁজে পাবে কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'নদীর পারে পাথরের তৈরি একটা জেটি আছে,' বলল শাফি। 'ওখান থেকে কার্গো বোটগুলো খার্তুমে চিনি নিয়ে যেত।'

ঝপ করে রাত নেমে এসে অন্ধকারে ঢেকে দিল ওদের জগৎ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা, পাড় থেকে এখন আর ওদেরকে দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকার আরও একটু গাঢ় হতে বোটগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে নাইলন রশি দিয়ে বেঁধে নিল ওরা, কোনটা যাতে আলাদা হয়ে না যায়। বৈঠা চালাতে নিষেধ করল রানা, কোন রকম শব্দ না করাই ভাল। স্রোতের টানে নিঃশব্দে ছুটে চলছে বোটগুলো। ডানদিকের তীর ঘেঁষে যাচ্ছে ওরা, মাঝে-মধ্যেই নদীর তলায় ঘষা খেয়ে আটকে যাচ্ছে বোট, তখন পানিতে নেমে ঠেলে গভীর জলে আনতে হচ্ছে।

অকস্মাৎ রোজিরেস-এর পাথুরে জেটি ওদের সামনে যেন লাফ দিয়ে উদয় হলো, সময় মত দেখতে না পাওয়ায় রানার বোট ধাক্কা খেলো ওটার সঙ্গে। বোট থেকে কয়েকজন আরোহী ছিটকে পড়লেও, কেউ আহত হলো না। পানি এখানে কোমর সমান, বোট টেনে পাড়ে তুলতে কোন অসুবিধে হলো না। বিশজন গেরিলাকে আখ খেতের ভেতর ছড়িয়ে দিল শাফি, কর্নেল ঘুমার আকস্মিক হামলা যাতে ঠেকানো সহজ হয়।

নিমাকে বোট থেকে নামতে সাহায্য করল রানা, তারপর রুবিকে নিতে এল। হেসে উঠে রানার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করল রুবি, জানাল নিজেই নামতে পারবে। দীর্ঘ বিশ্রামে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে সে। তবে রানাকে ধন্যবাদ জানাতে ভুলল না।

রুবি তীরে নামতেই রানা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'একটা কথা, রুবি। জিজ্ঞেস করার সময় পাইনি। ডেবরা মারিয়াম থেকে নিমা আপনাকে যে মেসেজটা পাঠাতে

বলেছিলেন, সেটার কি হলো?'

'ও, হ্যাঁ,' বলল রুবি। 'মিশরীয় দূতাবাসের কালচারাল অ্যাটাশে আল মাসুদকে মেসেজটা আমি জানিয়ে দিয়েছি। ফিরে এসে আপনার বান্ধবীকে বলেওছি কথাটা, উনি আপনাকে বলেননি?'

'ওঁর হয়তো মনে নেই,' বলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল রানা। 'তাছাড়া, ব্যাপারটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবু, ধন্যবাদ, রুবি।'

অ্যামুনিশন ক্রেটগুলো বোট থেকে দ্রুত নামানো হলো। খালি বোট পানি থেকে তুলে লুকিয়ে রাখা হলো আখ খেতের ভেতর। অন্ধকারে কাজ চলছে, আলো জ্বালতে নিষেধ করে দিয়েছে রানা। গেরিলাদের মধ্যে ক্রেটগুলো ভাগ করে দেয়া হলো। নিজের কাঁধে মারটিনও একটা বাক্স তুলল। রানার এক কাঁধে রেডিও, অপর কাঁধে ইমার্জেন্সী প্যাক ঝুলছে, মাথায় নিয়েছে একটা ক্রেট–ফারাও-এর সোনার ডেথ-মাস্ক আর টাইটার কাঠের মূর্তি আছে ওটায়।

প্রথমেই স্কাউটদের ছোট একটা দলকে এয়ারস্ট্রিপে পাঠিয়ে দিল শাফি, ওরা যাতে অ্যামবুশের মধ্যে না পড়ে। তারপর আগাছায় ঢাকা ট্রেইল ধরে এক লাইনে রওনা হলো মূল দল। এক মাইলও এগোয়নি, মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দিল কাস্তে আকৃতির চাঁদ। তারপর একটা দুটো করে তারাও দেখা গেল। রাতের কালো আকাশের গায়ে সুগার মিলের চিমনিটা চিনতে পারল ওরা।

কোন অঘটন ছাড়াই রাত তিনটের দিকে এয়ারস্ট্রিপে পৌঁছুল ওরা। ইতিমধ্যে চাঁদ ডুবে গেছে। ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর অ্যামুনিশন ক্রেটগুলো সাজিয়ে রাখা হলো, পাহারায় থাকল কয়েকজন গেরিলা। নিমা আর রুবি আহত গেরিলাদের দেখাশোনা করছে। শাফির মেডিকেল কিটটা সাংঘাতিক কাজে লাগল। ছোট্ট একটা আগুন জ্বালা হয়েছে, পর্দার ভেতর, তারই আভায় আহতদের সেবা করছে ওরা। এক পাশে সরে এসে রেডিওর এরিয়াল লম্বা করল রানা, রেডিও নাইরোবি ধরে চাকা-চাকার গান শুনল কিছুক্ষণ। আগেও শুনেছে, মেয়েটার গলা ওর ভালই লাগে। তবে একটু পরই রেডিও বন্ধ করে দিল, ব্যাটারি অপচয় করতে চায় না। গাছের গায়ে হেলান দিয়ে চোখ বুজল রানা, ভোর হবার আগে একটু ঘুমিয়ে নিতে চায়। কিন্তু ঘুম এল না–বেঈমানীর আভাস পেয়ে বড় বেশি রেগে আছে ও।

আট

'ক্রীতদাস টাইটা! সাড়া দাও, ক্রীতদাস টাইটা! আমি ফারাও তোমাকে ডাকছি। আমার কথা তুমি শুনতে পাচ্ছ?' সূর্য ওঠার এক ঘণ্টা আগে রেডিওর সাহায্যে ডাকাডাকি শুরু করেছে রানা।

তারপর শাফিকে বলল, 'ইক্কান্দারকে আমি চিনি, সময়ের হিসেব করেই

রওনা হবেন, যাতে খুব ভোরে ল্যান্ড করতে পারেন এখানে।'

'যদি আদৌ রওনা হন আর কি,' শাকির গলায় সংশয়।

'ইস্কান্দার? ওঁকে তুমি চেনো না, তাই এ-কথা বলছ। বহু বছর আগের কথা, ইস্কান্দার একটা উপকার করেছিলেন আমার। অনেক বার ভেবেছি ঋণটা শোধ করতে হবে, কিন্তু সুযোগ পাইনি। এভাবে তিন বছর পার হয়ে যায়। তারপর হঠাৎ এক বন্ধুর কাছ থেকে পুরানো একটা হারকিউলিস কার্গো প্লেন খুব সস্তায় কেনার প্রস্তাব পাই আমি, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় ইস্কান্দার একজন পাইলট। প্লেনটা উপহার হিসেবে পেয়ে বাপ-বেটা দু'জনেই সাংঘাতিক খুশি হয়েছিল। ওই প্লেন ওরা যে চোরাচালানের কাজে ব্যবহার করবে, অবশ্য সেটা আমার জানা ছিল না, অবশ্য তাতে আমার কিছু আসে যায়ও না।'

কাঁধ ঝাঁকাল শাকি। 'তাহলে হয়তো আসবেন।'

'অবশ্যই আসবেন! ইস্কান্দার কখনোই হতাশ করেননি আমাকে।' মাইক্রোফোনের বোতামে চাপ দিয়ে আবার ডাকল রানা, 'ক্রীতদাস টাইটা! ক্রীতদাস টাইটা। সাড়া দাও!'

হঠাৎ দাঁড়াতে শুরু করল নিমা, বলল, 'এঞ্জিনের আওয়াজ পাচ্ছি আমি! শুনুন!'

রানা ও শাকি ঝোপের আড়াল থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে উত্তর আকাশের দিকে তাকাল।

'ওটা হারকিউলিস নয়,' হঠাৎ বলল রানা, বিস্মিত দেখাল ওকে। ঘুরে দক্ষিণে তাকাল, নদীর দিকে। 'তাছাড়া, শব্দটা আসছে উল্টোদিক থেকে।'

'ঠিক,' সায় দিল শাকি। 'সিঙ্গেল এঞ্জিনের আওয়াজ। রোটরের শব্দও পাচ্ছি আমি।'

'প্রক্সির হেলিকপ্টার!' বলল রানা। 'হামলা করতে আসছে।'

তবে না, আওয়াজটা ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল। ঢিল পড়ল রানার পেশীতে। 'ওরা আমাদের দেখতে পায়নি। বোটগুলো লুকিয়ে রাখায় লাভ হয়েছে।'

ঝোপের আড়ালে ফিরে এল ওরা। রেডিওটা আবার অন করল রানা। কিন্তু ইস্কান্দারের কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

বিশ মিনিট পর জেট রেঞ্জারের ফিরে আসার আওয়াজ পেল ওরা। খানিকক্ষণ কান পেতে শোনার পর রানা বলল, 'ফিরে যাচ্ছে আবার।' কিন্তু দশ মিনিট পর আবার ভেসে এল রোটরের শব্দ।

'ঘুমা কিছু একটা করছে ওদিকে,' বলল শাকি, চেহারায় অস্বস্তি।

'কি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হয়তো বোটগুলো দেখতে পেয়েছে,' বলল শাকি। 'হামলা করার আগে আরও লোকজন এনে জড়ো করছে।' ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে কান পাতল সে। খানিক পর ফিরে এল রানার পাশে। রানা রেডিওতে কথা বলছে। 'তুমি ডাকতে থাকো। আমি যাই, গেরিলাদের সাবধান করে দিই।'

পরবর্তী তিন ঘণ্টা নীলনদের ওপর দিয়ে বারবার আসা-যাওয়া করল প্রক্সির জেট রেঞ্জার হেলিকপ্টার। তবে নতুন কিছু ঘটছে না। রোটরের আওয়াজে অভ্যস্ত

হয়ে উঠেছে ওরা, শব্দটা হলে রেডিও থেকে এক-আধবার শুধু মুখ তুলছে রানা। তারপর হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠল রেডিও, ইস্কান্দারের গলা ভেসে এল। 'ফারাও! ক্রীতদাস টাইটা বলছি। আমার কথা তুমি শুনতে পাচ্ছ?'

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল রানা, 'আমি ফারাও। মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনাও, টাইটা।'

'পৌঁছুতে আরও এক ঘণ্টা ত্রিশ মিনিট লাগবে,' ইস্কান্দারেরই গলা, কোন সন্দেহ নেই।

মাইক্রোফোন রেখে দিয়ে নিমা আর রুবির দিকে তাকাল রানা। 'ইস্কান্দার রওনা হয়ে গেছেন, ওঁ...'

মুখের হাসি দপ করে নিভে গেল, নদীর দিক থেকে ভেসে এল একে-ফরটিসেভেনের বিরতিহীন গর্জন। কয়েক সেকেন্ড পর দুটো গ্রেনেডও বিস্ফোরিত হলো। গুঙিয়ে উঠল রানা, 'সর্বনাশ! ঘুমা হামলা করেছে!'

ছোঁ দিয়ে আবার মাইক্রোফোনটা তুলল রানা। 'ইস্কান্দার! প্রতিপক্ষ এখানে পৌঁছে গেছে। ল্যান্ড আপনাকে করতেই হবে, তবে বুঝে-শুনে।'

'কোন চিন্তা করবেন না,' জবাব দিল ইস্কান্দার। 'আপনি মুকুট পরে থাকুন, স্যার। আমি ঠিকই পৌঁছুব, আগুন থেকে তুলেও নেব আপনাদের।'

পরবর্তী আধ ঘণ্টা নদীর কিনারা বরাবর গোলাগুলির আওয়াজ ক্রমশ বাড়ল, একে-ফরটিসেভেনের শব্দ মুহূর্তের জন্যেও থামছে না। ধীরে ধীরে কাছে সরে আসছে যুদ্ধটা। পরিষ্কার বোঝা গেল, ছড়িয়ে থাকা গেরিলারা পিছু হটছে। বিশ মিনিট পরপর রোটরের আওয়াজও পেল ওরা, প্রতিবার আরও সৈন্য এনে নিজের শক্তি বাড়িয়ে নিচ্ছে কর্নেল ঘুমা।

এয়ারস্ট্রিপের কাছাকাছি ঝোপের ভেতর সুস্থ ও সমর্থ পুরুষ বলতে শুধু রানা আর মারটিন, বাকি সবাই যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেছে। ক্রেটগুলো গুরুত্ব অনুসারে নতুন করে সাজাল ওরা দু'জন, প্লেন ল্যান্ড করলে তাড়াহুড়ো করে লোড করা হবে। যুদ্ধক্ষেত্রের পাঁচটা মডেল প্রথমে তোলা হবে প্লেনে। তারপর ডেথ-মাস্ক আর টাইটার মূর্তি আছে যে ক্রেটে, সেটা। তৃতীয় দফায় তোলা হবে তিনটে মুকুট—লাল, সাদা আর নীল ক্রাউন। এই তিনটের দাম সম্ভবত বাকি সমস্ত ট্রেজারের চেয়েও বেশি। কাজটা শেষ করে আহত গেরিলাদের সঙ্গে কথা বলল রানা, প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদাভাবে। সাহায্য করার জন্যে ধন্যবাদ দিল, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল আত্মত্যাগের জন্যে। ওদেরকে প্লেনে ওঠার প্রস্তাব দিল রানা, এমন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে যেখানে ভাল চিকিৎসা পাওয়া যায়। সুস্থ হবার পর আবার ওদেরকে ইথিওপিয়ায় পৌঁছেও দেয়া হবে। সব খরচ রানার। নগদ পঞ্চাশ হাজার মার্কিন ডলার থেকে একটা পয়সাও কাটা হবে না।

আহতদের মধ্যে থেকে সাতজন ওর প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল, কমান্ডার শাফিকে ছেড়ে কোথাও তারা যাবে না। বাকি সবাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো, বিশেষ করে রুবির যুক্তি এড়াতে না পেরে। যারা প্লেনে উঠবে তাদেরকে এয়ারস্ট্রিপের আরও কাছাকাছি তুলে আনা হলো। ক্রেটগুলো আগেই সরিয়ে আনা হয়েছে।

'আপনি কি করবেন?' রুবিকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'আপনিও কি আমাদের সঙ্গে আসছেন? পুরোপুরি সুস্থ এখনও আপনাকে বলা যায় না।'

হেসে উঠল রুবি। 'যতক্ষণ দু'পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব, আপনারা আমাকে শাফির পাশেই দেখতে পাবেন।'

'আপনি কি জানেন, নিজের ভাগের শেয়ার শাফি আমাকে নিয়ে যেতে বলেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'অতিরিক্ত বোঝা সঙ্গে নিতে রাজি নয়?'

'জানব না কেন। শাফি আমার সঙ্গে আলোচনা করেছে। এখানে যুদ্ধ চালাতে হলে আমাদের টাকা দরকার।' নিজের অজান্তেই ঝট করে মাথাটা নিচু করে নিল রুবি, অকস্মাৎ একটা বিস্ফোরণ ঘটার পরপরই। ঝোপের কিনারা থেকে ধুলোর লম্বা একটা স্তম্ভ আকাশের দিকে খাড়া হলো। বাতাসে শিস কেটে ওদের মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেল শ্র্যাপনেল। 'সুইট মেরি! কি ওটা?' আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে রুবির চেহারা।

'দু'ইঞ্চি মর্টার,' বলল রানা। নড়েনি ও, আড়াল পাবারও চেষ্টা করেনি। 'যত গর্জে তত বর্ষে না। ঘুমা শেষবার 'কন্টারে করে ওগুলো এনেছে বলে মনে হয়।'

'হারকিউলিস এখানে পৌঁছুচ্ছে কখন?'

'ইস্কান্দারকে ডেকে জিজ্ঞেস করছি।' রেডিওর ওপর ঝুঁকল রানা।

নিমা আর রুবি পরস্পরের হাত ধরে ফিসফিস শুরু করল। রুবি বলল, 'আপনারা, বিদেশীরা, এত নির্লিপ্ত আর ঠাণ্ডা থাকেন কিভাবে, ভাই?'

'আমি আর রানা এক দেশের মানুষ নই,' জবাব দিল নিমা। 'রানা বাংলাদেশী, আর আমি মিশরীয়। আমাদের ধর্মও মেলে না।' বিষণ্ণ আর অন্যমনস্ক দেখাল ওকে। তবে এক সেকেন্ড পরই আবার হাসল। 'আপনাকে একটা কথা বলি, ভাই। আমার জীবনের ট্র্যাজেডি কি জানেন? যাকেই খুব বেশি ভাল লাগে, তাকেই আমার হারাতে হয়।'

'কেন, এ-কথা বলছেন কেন?' রুবির মুখ শুকিয়ে গেল।

'অভিজ্ঞতা থেকে বলছি,' জবাব দিল নিমা। 'হাসলান চাচা ছিল আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাঁকে হারিয়েছে। তার আগে পরম বন্ধু ছিলেন আমার বাবা, তিনিও অকালে মারা গেলেন। তারপর পরিচয় হলো রানার সঙ্গে, আপনার সঙ্গে, শাফির সঙ্গে। আপনাদের সবাইকে আমার হারাতে হবে, আমি জানি। আপনারা সবাই মারা যাবেন, সে-কথা বলছি না। বলতে চাইছি, সম্পর্কটা ধরে রাখতে পারব না।'

'কিন্তু কেন?' রুবি বিস্মিত। 'আবার আমাদের দেখা হতে পারে না?'

'আপনার সঙ্গে হয়তো দেখা হতে পারে, আপনি যদি কোনদিন মিশরে যান, কিংবা আমি যদি আবার কোন দিন ইথিওপিয়ায় আসি কিন্তু রানার সঙ্গে আর কোনদিন আমার দেখা হবে বলে মনে হয় না।'

'কেন?' রুবির কাছে এখনও ব্যাপারটা দুর্বোধ্য লাগছে।

'এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব নয়,' এড়িয়ে যেতে চাইছে নিমা। 'শুধু জানি, রানাকে আমি চিরকালের জন্যে হারাব।'

'আপনাদের বিয়ে হতে পারে না,' বলল রুবি। 'বাধাটা সম্ভবত ধর্ম। তবে

আমি যদি বলি, মাসুদ ভাইকে আপনি ভালবেসে ফেলেছেন, সেটা কি ভুল বলা হবে?'

'আপনি খুব বুদ্ধিমতী, রুবি।' ম্লান হাসি ফুটল নিমার ঠোঁটে। 'সব জেনে ফেলেন।'

মাইক্রোফোনে কথা বলছে রানা, 'ইস্কান্দার, দিস ইজ রানা। আপনার পজিশন জানান।'

'স্যার, আমরা বিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছাব। আপনারা কি চিনে বাদাম ভাজছেন, নাকি আমি মর্টারের আওয়াজ শুনছি?'

'এত যার রসবোধ, তার মঞ্চে থাকা উচিত ছিল,' বলল রানা। 'শত্রুরা এয়ারস্ট্রিপের দক্ষিণ প্রান্ত দখল করে নিয়েছে। আপনাকে উত্তর দিক থেকে আসতে হবে। বাতাস বইছে পশ্চিম দিক থেকে, গতি পাঁচ নট।'

'ধন্যবাদ, স্যার। প্যাসেঞ্জার আর কার্গো সম্পর্কে বলুন।'

'প্যাসেঞ্জার ছয় আর তিন নয়জন। ক্রেটের সংখ্যা বাহান্ন, প্রায় দেড় টন ওজন।'

'এত কম লোক আর কার্গোর জন্যে আসতে বলেছেন আমাকে?' ইস্কান্দার হেসে উঠল।

'টাইটা, সাবধান! এলাকায় আরেকটা এয়ারক্রাফট আছে। জেট রেঞ্জার হেলিকপ্টার। সবুজ আর লাল। মতিগতি সুবিধের নয়, তবে আন আর্মড।'

'রজার, ফারাও। শেষ একবার যোগাযোগ করব।'

রেডিও ছেড়ে আহত গেরিলাদের কাছে চলে এল রানা, এখানে নিমা আর রুবিও রয়েছে। 'প্লেন আসতে আর বেশি দেরি নেই,' গোলাগুলির আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল ওর গলা। 'শুধু এক কাপ চা খাওয়ার সময় আছে।'

বলতে হলো না, নিজেই চা বানাতে বসে গেল মারটিন।

হাতে চায়ের কাপ, নিমা হঠাৎ বলল, 'আপনার হারকিউলিস পৌঁছে গেছে, এঞ্জিনের আওয়াজ পাচ্ছি আমি।'

রানা কান পাতল। 'বোধহয় তাই।' রেডিওর কাছে চলে এল ও, মাইক্রোফোন তুলে কথা বলল ইস্কান্দারের সঙ্গে।

'পাঁচ মিনিট পর ল্যান্ড করতে যাচ্ছি, স্যার,' জবাব দিল ইস্কান্দার।

লম্বা এয়ারস্ট্রিপের দিকে তাকাল রানা। শাকির গেরিলারা পিছু হটছে এখনও, কাঁটাঝোপের ভেতর ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে, পিছু হটার সময়ও অনবরত গুলি করছে তারা। কর্নেল ঘুমা খুব জোরে তাড়া করেছে। 'তাড়াতাড়ি, ইস্কান্দার, তাড়াতাড়ি,' বিড়বিড় করছে রানা। তবে নিমা আর রুবির দিকে ফেরার আগে চেহারায় হাসি ফুটিয়ে তুলল। 'কাপে আস্তে ধীরে চুমুক দিন, ব্যস্ত হবার কিছু নেই।'

গোলাগুলির চেয়ে প্লেনের আওয়াজ বেড়ে গেছে। তারপর হঠাৎ ওটাকে দেখা গেল। এত নিচু দিয়ে আসছে, মনে হলো কাঁটাগাছগুলোয় ঘষা খাবে। দুই ডানা এত বড়, আগাছায় চাপা পড়ে সরু হয়ে থাকা এয়ারস্ট্রিপের দুই প্রান্ত ছুঁই ছুঁই করছে। জমিন স্পর্শ করল প্লেন, ধুলোর মেঘ পাক খেতে শুরু করল পিছনে,

এঞ্জিন রিভার্স করে দিল পাইলট।

ঝোপগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগোল হারকিউলিস, ককপিট থেকে ওদেরকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়ল ইস্কান্দার। স্পীড যথেষ্ট কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে ফুটব্রেক আর রাডার বার-এর ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছে সে। ঘুরে যাচ্ছে প্লেন, স্ট্রিপ ধরে ফিরে আসছে ওদের দিকে, কাছাকাছি আসার আগেই লোডিং র‍্যাম্প খুলে গেল।

খোলা হ্যাচওয়েতে দাঁড়িয়ে রয়েছে কালান্দার, ইস্কান্দারের ছেলে। লাফ দিয়ে নিচে নামল সে, আহত লোকগুলোকে স্ট্রেচারে তুলতে সাহায্য করল রানা আর মারটিনকে। র‍্যাম্প বেয়ে ওদেরকে তুলতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগল। তার পরই শুরু হয়ে গেল অ্যামুনিশন ক্রেট লোড করার কাজ। ওদের সঙ্গে নিমাও হাত লাগাল কাজে, হালকা ক্রেটগুলো একাই বয়ে নিয়ে এল। একটা ক্রেটও ফেলে যেতে রাজি নয় ও।

দাঁড়ানো হারকিউলিসের দেড় শো গজ দূরে বিস্ফোরিত হলো একটা মর্টার। দ্বিতীয় শেলটা পড়ল মাত্র একশো গজ দূরে।

ক্রেট কাঁধে ছুটছে রানা, চিৎকার করে বলল, 'রেঞ্জিং শট!'

'ওরা আমাদেরকে সাইটে পেয়ে গেছে,' কালান্দারও চেঁচাচ্ছে। 'এখুনি কেটে পড়তে হয়। বাকি কার্গো তোলার সময় নেই। লেট'স গো! গো··· গো··· গো···!'

আর মাত্র চারটে ক্রেট ঝোপের ভেতর পড়ে রয়েছে। কালান্দারের তাগাদায় কান না দিয়ে মারটিন আর রানা র‍্যাম্প বেয়ে ছুটল। ঝোপের ভেতর ঢুকে দুটো করে বাক্স মাথায় তুলল ওরা, ছুটে ফিরে আসছে আবার। র‍্যাম্প ইতিমধ্যে উঠতে শুরু করেছে, প্লেনের এঞ্জিন গর্জে উঠল, গড়াতে শুরু করেছে চাকা। টেইলবোর্ডের ওপর দিয়ে ক্রেটগুলো ছুঁড়ে দিল ওরা, তারপর লাফিয়ে ধরে ফেলল দরজার কিনারা। প্লেনের ভেতর ঢুকে মারটিনকে টেনে নিল রানা।

আবার যখন পিছনে তাকাল ও, ঝোপের পাশে নিঃসঙ্গ আর একা লাগল রুবিকে। 'শাফিকে আমার ধন্যবাদ আর শুভেচ্ছা জানাবেন!' চিৎকার করে বলল ও।

রুবিও চিৎকার করল, 'আমাদের সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ করতে হবে আপনি জানেন।'

'গুডবাই, রুবি;' নিমার চিৎকার এঞ্জিনের গর্জনে চাপা পড়ে গেল, ধুলোর সচল মেঘে ঢাকাও পড়ে গেল রুবি। হিসহিস শব্দ তুলে পুরোপুরি উঠে এল র‍্যাম্প।

নিমার কাঁধে হাত রেখে বিশাল গুহার মত কার্গো হোল্ড হয়ে ককপিটের কাছাকাছি একটা জাম্প সীটের পাশে এসে দাঁড়াল রানা। নিমাকে সীটে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'স্ট্র্যাপ বাঁধুন।' তারপর ছুটল ককপিটের দিকে।

'ভাব দেখে মনে হচ্ছিল আপনি বোধহয় থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন,' হেসে উঠে রানাকে বলল ইস্কান্দার, কন্ট্রোল থেকে চোখ না তুলেই। 'শক্ত হোন! আকাশে ডানা মেলছি!'

পাইলটের সীটের পিছনটা আঁকড়ে ধরল রানা, ইস্কান্দার আর কালান্দার

কন্ট্রোল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। থ্রটল লিভার ঠেলে দিয়ে ফুল পাওয়ার দিল ওরা, প্লেনের গতি ক্রমশ বাড়ছে।

ইস্কান্দারের কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে তাকাল রানা, রানওয়ের শেষ মাথায় ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর ক্যামোফ্লেজ ড্রেস পরা অস্পষ্ট ছায়া ছায়া আকৃতি দেখা যাচ্ছে। ওদিকেই ছুটছে প্লেন, ঝোপের ভেতর থেকে সৈনিকরা গুলি করছে এদিকে।

'এ-সব খুদে বুলেটে আমার হারকিউলিসের তেমন কোন ক্ষতি হবে না,' ইস্কান্দার বলল। 'হারকিউলিস খুব শক্ত বুড়ি।' তারপর প্লেনটাকে আকাশে তুলে ফেলল সে।

জমিনে ছড়িয়ে থাকা সরকারী সৈন্যদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে এল প্লেন, আকাশের দিকে নাক উঁচু করে আরও ওপরে উঠে যাচ্ছে। 'ওয়েলকাম অ্যাবোর্ড, ওয়েলকাম অ্যাবোর্ড। বাপ-বেটা, ইস্কান্দার ও কালান্দারের ওপর ভরসা রাখার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।' তারপর মাত্র পাঁচ সেকেন্ড পর বেলুনের মত চুপসে গেল ইস্কান্দার, প্রায় কাতরে উঠে, বলল, 'কি যন্ত্রণা! ওই ফড়িং আবার কোত্থেকে এল?'

নীলনদের পাড় ঘেঁষা ঝোপ থেকে সরাসরি প্লেনের সামনে আকাশে উঠে আসছে প্রক্সি কোম্পানীর জেট রেঞ্জার হেলিকপ্টার। এমন তির্যক একটা কোণ ধরে ওপরে উঠছে ওটা, বোঝাই যায় যে দ্রুতগতি হারকিউলিস এখনও পাইলটের দৃষ্টি পথের বাইরে রয়েছে, তা না হলে প্লেনের পথ থেকে সরে যাবার চেষ্টা করত।

'মাত্র পাঁচশো ফুট ওপরে উঠেছি আমরা, স্পীড একশো দশ নট,' ডান দিকের সীট থেকে চিৎকার করে বাপকে সাবধান করল কালান্দার। 'এই অবস্থায় দিক বদল সম্ভব নয়।'

জেট রেঞ্জার এত কাছে যে ফ্রন্ট সীটে বসা কর্নেল ঘুমাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রানা, তার চশমায় লেগে প্রতিফলিত হচ্ছে রোদ। পাইলটের আগে সেই প্রথম হারকিউলিসকে দেখতে পেল। রানা তার চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠতে দেখল। সম্ভাব্য শেষ মুহূর্তে কপ্টারটাকে ঘুড়ির মত গোত্তা খাওয়াতে চেষ্টা করল পাইলট, বিশাল হারকিউলিসের পথ থেকে সরে যাবার চেষ্টায়। সংঘর্ষ এড়ানো অসম্ভব বলে মনে হলো, তবে দক্ষতার সঙ্গেই কপ্টারটাকে পাক খাওয়াতে শুরু করল সে, ডিগবাজি খাওয়ানোর ভঙ্গিতে হারকিউলিসের পেটের নিচে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ওটা, প্লেনের আরোহীরা অনুভব করল দুটো আকাশযানের ফিউজিলাজ পরস্পরকে আলতো চুমো খেলো।

ছোঁয়াটুকু যতই সামান্য হোক, কপ্টারের নাক জমিনের দিকে ঘুরে গেল, সেটা মাত্র চারশো ফুট নিচে। হারকিউলিস ফুল স্পীডে ছুটছে, ওপরে উঠছে ক্রমশ, কিন্তু হেলিকপ্টারের পাইলট নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। কপ্টার যখন জমিন থেকে দুশো ফুট ওপরে, হারকিউলিস টার্বো-প্রপ এঞ্জিনগুলো, প্রতিটি চার হাজার নয়শো হর্সপাওয়ার, বাতাসে তীব্র আলোড়ন তুলল, সেই আলোড়ন প্রচণ্ড পাথরধসের মত আঘাত করল ওটাকে।

বাতাসে ভেসে থাকা ঝরা পাতার মত লাগছে এখন। কন্টারটাকে, ডিগবাজি খাচ্ছে বিরতিহীন। এঞ্জিন ফুল পাওয়ারে চালু, জমিনের ওপর পড়ল সেটা। ফিউজিলাজ অ্যালুমিনিয়াম ফুয়েলের মত দুমড়ে মুচড়ে গেল, কর্নেল ঘুমা মারা গেল এমন কি ফুয়েল ট্যাংক বিস্ফোরিত হবার আগেই। আগুনের বিশাল একটা কুণ্ডলী গ্রাস করল জেট রেঞ্জারকে।

উত্তরের কোর্স ধরে ছুটছে হারকিউলিস। নিচে সুদান। দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেইন কেবিনে ফিরে এল রানা।

'আহতদের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করা যাক,' মারটিনকে বলল ও। মারটিনের সঙ্গে নিমাও সেফটি বেল্ট খুলে হাত লাগাল কাজে। তাড়াহুড়োর মধ্যে স্ট্রেচারগুলো প্লেনের দরজার কাছাকাছি রাখা হয়েছিল, সেগুলো সরিয়ে আরও ভেতর দিকে আনা হলো। ইস্কান্দার কিছু ওষুধ-পত্র নিয়ে এসেছে, সঙ্গে অল্প কিছু খাবারও, সে-সব বিলি-বণ্টন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওরা। খানিক পর নিমা আর মারটিনকে ওখানে রেখে ফ্লাইট-ডেকের পিছনে, গ্যালিতে চলে এল রানা। ফ্রিজ খুলে টিনের কৌটা থেকে সুপ আর তাজা পাউরুটি বের করল ও, চুলোয় আগেই চায়ের পানি চড়িয়েছে।

চায়ের পানি ফুটছে, নিজের ইমার্জেন্সী প্যাক থেকে একটা নাইলন ওয়ালেট বের করল রানা, ভেতরে কিছু ওষুধ-পত্র আছে। একটা শিশি থেকে পাঁচটা ট্যাবলেট বের করল, গুঁড়ো করে ফেলে দিল দুটো মগে। মগ দুটোয় চা ঢেলে চিনি আর দুধ মেশাল, ভাল করে নাড়ল চামচ দিয়ে। আরব দেশের মেয়ে, গরম এক মগ চায়ের লোভ সামলাতে পারবে না।

আহত গেরিলাদের খাওয়ানো হয়ে গেছে, গ্যালি থেকে ফিরে এসে মারটিন আর নিমাকে মাখন লাগানো রুটি আর সুপ খেতে দিল রানা, সঙ্গে মগ ভর্তি চা। ওরা দু'জন চা খাচ্ছে, ফ্লাইট ডেকে ফিরে এল রানা, হেলান দিল ইস্কান্দারের সীটের পিঠে। 'মিশরীয় সীমান্তে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে আপনার?' জানতে চাইল ও।

'চার ঘণ্টা বিশ মিনিট,' বলল ইস্কান্দার।

'মিশরীয় এয়ার স্পেস এড়িয়ে যাবার কোন উপায় আছে?' আবার প্রশ্ন করল রানা।

সীটে ঘুরে গিয়ে রানার দিকে অবাক হয়ে তাকাল ইস্কান্দার। 'লিবিয়ার ওপর দিয়ে যাওয়া যেতে পারে, তবে গাদ্দাফীর এয়ারফোর্স বিনা নোটিশে গুলি করে ফেলে দিলে কিছু করার নেই। আরও সমস্যা আছে। ওদিকে গেলে সাত ঘণ্টা বেশি থাকতে হবে আকাশে, ফুয়েলে কুলাবে না—সাহারার কোথাও কোর্স ল্যান্ডিং করতে হবে।' একটা ভুরু কপালে তুলল সে। 'কি ব্যাপার, মি. রানা, এ-ধরনের প্রশ্ন করার অর্থ কি?'

'কোন অর্থ নেই, হঠাৎ উঁকি দিল মনে,' বলল রানা।

'এ-ধরনের প্রশ্ন আমাকে ঘাবড়ে দেয়,' জোর করে হাসল ইস্কান্দার।

তার কাঁধ চাপড়ে দিল রানা। 'ভুলে যান।'

মেইন হোল্ডে ফিরে এসে রানা দেখল দুটো ফোল্ড-ডাউন বাঙ্কে বসে রয়েছে নিমা ও মারটিন। নিমার খালি মগটা ওর পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে। পাশে বসল রানা, একটা হাত তুলে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল নিমা। 'ভাগ্য ভাল যে আপনার মাথার ক্ষতটা প্রায় শুকিয়ে গেছে,' ফিসফিস করে বলল রানাকে।

প্রথমে ঘুমিয়ে পড়ল মারটিন। শুয়ে পড়ল সে, চোখ বুজল, খানিক পরই নাক ডাকতে শুরু করল। কয়েক মিনিট পর রানার গায়ে ঢলে পড়ল নিমা, সাবধানে ওর পা দুটো বাঙ্কের ওপর তুলে ভাল করে শুইয়ে দিল রানা, একটা চাদর গলা পর্যন্ত টেনে দিল। তারপর ঝুঁকে আলতো একটা চুমো খেলো নিমার কপালে। 'যাই তুমি করে থাকো, তোমাকে কিভাবে আমি ঘৃণা করতে পারি!'

ল্যাভেটোরিতে ঢুকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল রানা। হাতে প্রচুর সময় আছে। অন্তত তিন-চার ঘণ্টার আগে নিমা আর মারটিনের ঘুম ভাঙবে না। আর ইস্কান্দার ও কালান্দারকে ককপিটে ব্যস্ত থাকতে হবে সারাক্ষণ, প্লেনের কোথায় কি ঘটছে জানার সুযোগ হবে না ওদের।

কাজটা শেষ হতে হাতঘড়ি দেখল রানা। দু'ঘণ্টা লেগেছে। টয়লেট সীট বন্ধ করে হাত ধুলো ও। খুদে কেবিনে আরেকবার চোখ বুলিয়ে দরজার তালা খুলল।

ফোল্ড-ডাউন বাঙ্কে এখনও অঘোরে ঘুমাচ্ছে নিমা আর মারটিন। মেইন হোল্ড থেকে আবার ফ্লাইট-ডেকে চলে এল রানা। কান থেকে এয়ারফোন খুলে ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল কালান্দার। 'সামনে নীলনদ।'

তার বাপের সীটের ওপর ঝুঁকে রানা জানতে চাইল, 'ঠিক কোথায় রয়েছি আমরা?'

উরুর ওপর মেলা চার্টটায় মোটা তর্জনী রাখল ইস্কান্দার। 'এখানে। দেড় ঘণ্টার মধ্যে মিশরীয় সীমান্তে পৌঁছে যাব।'

'তার আগে, এখুনি,' এমন ভারী সুরে শুরু করল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাতে বাধ্য হলো ইস্কান্দার, 'রেডিওতে কথা বলব আমি আবু সিমবেল এয়ারপোর্টের কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে।'

'সে তো আমি বলব,' প্রতিবাদের সুরে বলল ইস্কান্দার। 'পাইলট হিসেবে আমারই তো ওদেরকে জানাবার কথা যে আমরা আসছি, ল্যান্ড করার অনুমতি দাও।'

মাথা নাড়ল রানা। 'ওদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কথা আছে,' বলল ও। 'কন্ট্রোল টাওয়ারকে আপনি ডাকুন, অনুমতি চান, কিন্তু তারপর মাইক্রোফোনটা আমাকে দিতে হবে।'

'কেন?'

'আমি ওদের মাধ্যমে মিশরীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই।'

আবার একই প্রশ্ন করল ইস্কান্দার। 'কেন?'

রেগে গেল রানা। 'সব কথা ব্যাখ্যা করার সময় নেই। কেন, নিজেই জানতে পারবেন, শুধু একটু ধৈর্য ধরুন।'

রানার রাগ দেখে ঠাণ্ডা হয়ে গেল ইস্কান্দার, কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আপনিই বস্।'

'রেঞ্জের মধ্যে এসেছে আবু সিমবেল?' জানতে চাইল রানা।

জবাব না দিয়ে রেডিও সেট অন করল ইস্কান্দার, মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে মাউথপীসে কথা বলছে, 'হ্যালো, আবু সিমবেল। দিস ইজ জুলু হুইস্কি ইউনিফর্ম ফাইভ জিরো জিরো।'

তৃতীয়বার ডাকার পর আবু সিমবেল কন্ট্রোল সাড়া দিল। রুটিন অনুসারে নিজের পরিচয় ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করল ইস্কান্দার। পাঁচ মিনিট পর আবু সিমবেল কন্ট্রোল টাওয়ার উত্তরে গতি বজায় রাখার অনুমতি দিল তাকে। ইস্কান্দার এরপর টাওয়ারকে জানাল, 'আরোহীদের মধ্যে একজন ভিআইপি আছেন। এখন তিনি একটা মেসেজ দেবেন।' কাঁধের ওপর দিয়ে মাইক্রোফোনটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল সে।

মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে একটা কাগজে চোখ বুলাল রানা, আগেই লিখে রেখেছে। তারপর শান্ত সুরে বলল, 'আমি বাংলাদেশের নাগরিক, মাসুদ রানা। আমি যে মেসেজটা পড়ব সেটা ফোন বা ফ্যাক্স যোগে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিশরের প্রেসিডেন্টের কাছে সরাসরি পৌঁছুতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মানে, পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে। আপনাদের প্রেসিডেন্ট আমাকে চেনেন। তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কয়েকবার আমার আলাপ হয়েছে, কাজেই নাম বললেই আমাকে উনি চিনবেন। আবার বলছি, মেসেজটা পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে সরাসরি আপনাদের প্রেসিডেন্টের কাছে পৌঁছুতে হবে।'

'হোয়াট ইজ দিস?' টাওয়ার থেকে বিরক্তি প্রকাশ করা হলো। 'এরকম ঠাট্টা করার মানে কি?'

'দিস ইজ অ্যান ইমার্জেন্সী কল,' বলল রানা। 'ঠাট্টা নয়। আই রিপিট, দিস ইজ অ্যান ইমার্জেন্সী কল। আমার মেসেজ প্রেসিডেন্টের কানে না পৌঁছুলে, বা পৌঁছুতে দেরি হলে, মিশরের সাংঘাতিক ক্ষতি হয়ে যাবে। আর তার জন্যে দায়ী হবেন আপনারা।'

টাওয়ার কর্তৃপক্ষ এবার ব্যাপারটাকে গুরুত্বের সঙ্গে নিল। 'ঠিক আছে, মেসেজটা কি বলুন।'

ঝাড়া তিন মিনিট মাইক্রোফোনে কথা বলল রানা। কথাগুলো শুনে ছানাবড়া হয়ে গেল ইস্কান্দার আর কালান্দারের চোখ। তবে তারা কেউ কোন প্রশ্ন করল না।

নয়

আরও এক ঘণ্টা বিশ মিনিট নির্বিঘ্নে উড়ল ওরা, তবে প্রতি মিনিটে স্নায়ুর ওপর চাপ আরও বাড়ছে রানার।

অকস্মাৎ, কোন রকম আভাস না দিয়ে, একটা ফাইটার ইন্টারসেপটরের রূপালি ঝলক দেখা গেল সরাসরি সামনে। ওদের নিচ থেকে উঠে এল সেটা,

হারকিউলিসের বো-র সামনে। রাগে ও বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল ইস্কান্দার, পরমুহূর্তে দেখল রকেট বেগে আরও দুটো ফাইটার ওদের প্লেনের নিচ থেকে উঠে আসছে, এত কাছে মনে হলো যে-কোন মুহূর্তে সংঘর্ষ ঘটতে পারে।

সবাই ওরা ফাইটার প্লেনগুলোর টাইপ চিনতে পারল। মিগ টোয়েনটি ওয়ান, মিশরীয় এয়ারফোর্সের মূল শক্তি। ডানার নিচে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এয়ার-টু-এয়ার মিসাইল, পড থেকে ঝুলছে।

'আনআইডেনটিফায়েড এয়ারক্রাফট!' মাউথপীসে চিৎকার করছে ইস্কান্দার। 'স্টেট ইওর কল সাইন!'

ইতিমধ্যে দুটো ফাইটার হারকিউলিসের দু'পাশে চলে এসেছে, অপরটা উঠে এসেছে ওদের মাথার ওপর আকাশে।

জবাব এল, 'জেড-ডব্লিউ-ইউ ফাইভহানড্রেড, দিস ইজ রেড লীডার অভ দা ইজিপশিয়ান পিপল'স এয়ার ফোর্স। ইউ উইল কনফার্ম টু মাই অর্ডারস।'

ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল ইস্কান্দার। 'কোথাও কিছু একটা ঘটেছে। আপনার মেসেজ পাঠানোর ফল নয় তো?'

'হতে পারে,' বলল রানা। 'ঠিক কি ঘটছে আমিও বুঝতে পারছি না।'

'রেড লীডার যা বলছে শোনো, ড্যাড,' বাপকে পরামর্শ দিল কালান্দার। 'তা না হলে মিসাইল ছুঁড়ে উড়িয়ে দেবে আমাদের।'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ইস্কান্দার, তারপর মাইক্রোফোনে বলল, 'দিস ইজ জেডডব্লিউইউ ফাইভহানড্রেড। আমরা সহযোগিতা করব। প্লীজ আপনাদের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন।'

'আপনার নতুন হেডিং জিরোফাইভথ্রী। নির্দেশ এখুনি পালন করুন।'

প্লেনটাকে পুব দিকে ঘুরিয়ে নিল ইস্কান্দার, তারপর চার্টের দিকে তাকাল। 'আসওয়ান!' সবিস্ময়ে বলল। 'ওরা আমাদেরকে আসওয়ানে পাঠাচ্ছে! তাহলে তো এখুনি আসওয়ানকে জানাতে হয় যে আমাদের সঙ্গে আহত লোকজন আছে।'

মেইন হোল্ডে ফিরে এসে নিমার ঘুম ভাঙাল রানা, লক্ষ করল ল্যাভেটোরির দিকে যাবার সময় সামান্য একটু টলছে। তবে দশ মিনিট পর যখন ফিরে এল, পুরোপুরি তাজা ও সচেতন দেখাল ওকে, মুখ ধুয়ে চুল আঁচড়েছে।

ওদের সামনে এখন আবার নীলনদকে দেখা যাচ্ছে, দুই পাড়েই ছড়িয়ে পড়েছে আসওয়ান শহর। আসওয়ানের কন্ট্রোল টাওয়ার নির্দেশ দিতে ল্যান্ড করার জন্যে রানওয়ে বরাবর সিধে হলো হারকিউলিস। মরুভূমি থেকে ওদেরকে পথ দেখিয়ে এদিকে এনেছে মিশরীয় এয়ারফোর্সের ফাইটারগুলো, এখন আর ওগুলোকে দেখা যাচ্ছে না, তবে টাওয়ারের সঙ্গে তাদের রেড লীডারের কথাবার্তা শোনা গেল। বন্দী হারকিউলিসকে আসওয়ান টাওয়ারের হাতে তুলে দিয়ে ফিরে যাচ্ছে তিন ফাইটারের বহরটা।

পেরিমিটার বেড়া পেরিয়ে এসে রানওয়েতে ল্যান্ড করল হারকিউলিস। কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে নির্দেশ এল, 'টার্ন ফার্স্ট ট্যাক্সি-ওয়ে রাইট।' মেইন রানওয়ে থেকে বাঁক ঘুরতেই সামনে ছোট একটা ভেহিকেল দেখা গেল, ছাদের

সাইনবোর্ডে লেখা, ইংরেজি ও আরবীতে, 'আমাকে অনুসরণ করুন।'

ভেহিকেলটা ওদেরকে পথ দেখিয়ে একটা হ্যাঙ্গারের সামনে নিয়ে এল। প্লেন স্থির হতেই হ্যাঙ্গারের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল পাঁচটনী পাঁচটা ট্রাক, দ্রুত এগিয়ে এসে ঘিরে ফেলল হারকিউলিসকে, সাদা কাপড় পরা সশস্ত্র কিছু লোক লাফ দিয়ে নিচে নামল, হাতের অটোমেটিক রাইফেল প্লেনের দিকে তাক করা।

টাওয়ারের নির্দেশ পেয়ে এঞ্জিন বন্ধ করল ইস্কান্দার। 'কি ঘটছে কিছুই বুঝতে পারছি না,' বলে রানার দিকে তাকাল সে। 'আপনি পারছেন, স্যার?'

কথা না বলে মাথা নাড়ল রানা, খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছে ওকে। কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে আবার নির্দেশ এল। টেইল র‍্যাম্প নামাতে বলছে।

ককপিটে ওরা কেউ কথা বলছে না, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সবাই, চেহারায় বিস্ময় ও উদ্বেগ।

হঠাৎ পেরিমিটার গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল সাদা একটা ক্যাডিলাক, সরাসরি ছুটে এসে হারকিউলিসের কার্গো র‍্যাম্পের সামনে ব্রেক কষল। লাফ দিয়ে নিচে নেমে দরজা খুলল শোফার, শেষ বিকেলে রোদে বেরিয়ে এলেন বিশাল বপু আরোহী। চেহারায় বলে দেয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অভিজাত মানুষ, ধীর-স্থির ও দৃঢ়চেতা। হালকা রঙের ট্রপিক্যাল সুট পরে আছেন, জুতো জোড়া সাদা, মাথায় পানামা হ্যাট, চোখে গাঢ় চশমা। র‍্যাম্প বেয়ে প্লেনে চড়ছেন তিনি, সঙ্গে দু'জন পুরুষ সেক্রেটারি।

প্লেনের ভেতর ওরা পাঁচজন অপেক্ষা করছে।

কর্তা ব্যক্তি চোখ থেকে গাঢ় চশমা খুলে ব্রেস্ট পকেটে গুঁজলেন। নিমাকে চিনতে পেরে হ্যাটটা মাথা থেকে খুলে হাসলেন। 'আল নিমা! আপনি অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন! কংগ্রাচুলেশন্স।' নিমার হাতটা ধরে ঝাঁকালেন, রানার দিকে তাকাবার সময়ও সেটা ছাড়লেন না।

'আপনি নিশ্চয়ই মি. মাসুদ রানা। সত্যি কথা বলতে কি, আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছি। আল নিমা, আপনি আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবেন না?'

কথা বলার সময় রানার সরু চোখের দিকে তাকাতে পারল না নিমা, 'উনি আমাদের মাননীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী আতাহার আবু কাসিম।'

'সত্যি কথা বলতে কি,' রানার গলায় ক্ষীণ ব্যঙ্গ, 'আমিও আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে অপ্রত্যাশিত উল্লাস অনুভব করছি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়।'

'আমাদের প্রাচীন ও গৌরবময় অতীত ইতিহাস থেকে হারিয়ে যাওয়া বিপুল প্রত্ন সম্পদ মিশরে ফিরিয়ে আনার জন্যে সরকার ও মিশরীয় জনগণের তরফ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, মি. রানা।' সাজিয়ে রাখা অ্যামুনিশন ক্রেটগুলোর দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকালেন মন্ত্রী আতাহার আবু কাসিম।

'প্লীজ, এটাকে খুব বড় করে দেখবেন না,' বলল রানা, তবে নিমার ওপর থেকে পলকের জন্যেও চোখ সরাতে পারছে না। যদিও নিমা ওর দিকে ভুলেও তাকাচ্ছে না।

'কি যে বলেন, স্যার,' মন্ত্রী আবু কাসিম অমায়িক হাসি হাসলেন। 'এই

অভিযানে আপনার অনেক টাকা খরচ হয়েছে, সে-ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন। কাজেই আমরা চাই না আপনি খালি পকেটে ফিরে যান। ড. নিমা আমাকে জানিয়েছেন, আপনার পকেট থেকে প্রায় আড়াই লাখ স্টার্লিং বেরিয়ে গেছে।' কোটের ভেতরের পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করলেন তিনি, বাড়িয়ে দিলেন রানার দিকে। 'এতে সুইস ব্যাংকের একটা চেক আছে, দু'লাখ পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডের। চেকটা নিয়ে আপনি আমাদেরকে ঋণমুক্ত করুন, মি. রানা, প্লীজ।'

'আপনি সত্যি খুব উদার মানুষ, মিনিস্টার,' এনভেলাপটা পকেটে ভরার সময় বলল রানা, ভাব দেখে মনে হলো হাসি চেপে রেখেছে। 'এটাও বোধহয় ড. আল নিমার পরামর্শ?'

'অবশ্যই,' সহাস্যে বললেন আবু কাসিম। 'আপনার সম্পর্কে ড. নিমার খুব উঁচু ধারণা...'

'তাই কি?' বিড়বিড় করল রানা, এখনও নিমার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে।

অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন আবু কাসিম। 'আহত লোকজনকে একটা ট্রাকে তোলা যেতে পারে।' পিছন ফিরে কাকে যেন ইঙ্গিত দিলেন তিনি, প্লেনের ভেতর সশস্ত্র লোকজন ঢুকে পড়ল। তাদের মধ্যে পাঁচজন লোক পাহারায় থাকল, বাকি দশ-বারোজন হাত লাগাল ক্রেটগুলো নামানোর কাজে।

দশ মিনিটের মধ্যে খালি হয়ে গেল হারকিউলিস। বাহান্নটা ক্রেট চারটে পাঁচ টনী ট্রাকে তোলা হলো, ট্রাকগুলো ঢেকে দেয়া হলো তারপুলিন দিয়ে। সময় নষ্ট না করে কনভয়টা রওনা হয়ে গেল তখুনি। বাকি একটা ট্রাকে আহত গেরিলাদের তোলা হয়েছে, তবে এখনও সেটা দাঁড়িয়ে আছে।

'বিদায়, মি. রানা,' মিটিমিটি হেসে রানার দিকে ডান হাতটা বাড়ালেন আবু কাসিম। 'আবু সিমবেল থেকে এদিকে সরিয়ে আনার জন্যে সত্যি দুঃখিত। তবে কি জানেন, সব ভাল যার শেষ ভাল। আমি জানি, নিজের পথে রওনা হবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছেন আপনি। কাজেই আপনাকে আর আটকে রাখব না। বিদায়ের আগে আপনার জন্যে আর কিছু করতে পারি আমি? আপনাদের সঙ্গে যথেষ্ট ফুয়েল আছে তো?'

ইস্কান্দারের দিকে তাকাল রানা, ইস্কান্দার তিক্ত সুরে বলল, 'আছে।'

'গুড! গুড!' কোন কারণ নেই, তবু উল্লসিত দেখাচ্ছে আবু কাসিমকে।

'একটা প্রশ্ন, মাননীয় মন্ত্রী,' বলল রানা, সুরটা প্রায় কঠিনই। 'ফারাও মামোসের এই গুপ্তধন আপনি সম্ভবত নতুন কোন ভবনে রাখবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাই না? আমি বলতে চাইছি, পুরানো কোন মিউজিয়ামে তো ওগুলোর জায়গা হবে না, কি বলেন?'

হতচকিত দেখাল মন্ত্রী মহোদয়কে। তারপরই নিজেকে সামলে নিয়ে হাসলেন তিনি। 'আশ্চর্য! আপনি জানলেন কিভাবে? ঠিক তাই, মি. রানা, নতুন একটা ভবনে তোলা হবে সব, নতুন একটা মিউজিয়ামে...'

'কিন্তু আপনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন সবই কায়রো মিউজিয়ামে রাখা

হবে,' অবাক হয়ে বলল নিমা।

'কিছু কিছু, কিছু কিছু,' তাড়াতাড়ি বললেন আবু কাসিম। 'বাছাই করার পর। এ-সব বিষয়ে দীর্ঘ আলাপ হবে আপনার সঙ্গে আমার। ওহ-হো, আসল কথাটাই তো আপনাকে বলা হয়নি, ড. আল নিমা!' কপালে হালকা চাটি মারলেন মন্ত্রী মহোদয়। 'আপনাকে ডিপার্টমেন্ট অব অ্যান্টিকুইটিজ-এর নতুন ডিরেক্টর হিসেবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়েছে। কংগ্রাচুলেশন্স, আল নিমা। আপাতত গোপন জায়গায় তোলা হচ্ছে ফারাও মামোসের গুপ্তধন, তবে শেষ পর্যন্ত কোথায় রাখা হবে না হবে সে-ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।'

ঢিল পড়ল নিমার পেশীতে, হেসে উঠে বলল, 'ধন্যবাদ, স্যার।'

'আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন,' বলে র‍্যাম্প বেয়ে নামতে শুরু করলেন আবু কাসিম।

নিমা তাঁকে অনুসরণ করতে যাবে, পিছন থেকে নরম সুরে ডাক দিল রানা, 'নিমা।'

পাথর হয়ে গেল নিমা। তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধীরে ধীরে রানার দিকে ঘুরল, ওরা ল্যান্ড করার পর এই প্রথম ওর চোখের দিকে তাকাল।

'এ আমার পাওনা ছিল না,' বলল রানা, আর তারপরই আবেগের একটা ধাক্কা খেয়ে উপলব্ধি করল নিঃশব্দে কাঁদছে নিমা। ওর ঠোঁট জোড়া কাঁপছে, চোখের পানি গড়াচ্ছে গাল বেয়ে।

'আমি দুঃখিত, রানা,' ফিসফিস করে বলল নিমা। 'কিন্তু আপনার জানার কথা যে আমি চোর নই। মামোসের গুপ্তধন মিশরের প্রাপ্য, আমাদের নয়।'

'তাহলে আমাদের মধ্যে যে সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল, সেটা মিথ্যে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'চুক্তির কথাটা নাহয় আমি বাদই দিলাম।'

'না!' বলল নিমা। 'আমি...' ভাষা হারিয়ে ফেলে থরথর করে কেঁপে উঠল নিমা, ঝট করে ঘুরে ত্রস্তা হরিণীর মত ছুটে নেমে গেল র‍্যাম্প বেয়ে। ওখানে, রোদের মধ্যে, ক্যাডিলাকের দরজা খুলে অপেক্ষা করছে শোফার। মন্ত্রী আবু কাসিম আগেই গাড়িতে উঠে পড়েছেন। বাকি ট্রাকটায়ও সশস্ত্র লোকগুলো উঠে পড়ছে।

নিমাও গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে, এই সময় যেন আকাশ ফুঁড়ে তিনটে সামরিক হেলিকপ্টার ছুটে এল ওদের দিকে। রোটরের আওয়াজে সচকিত হয়ে উঠল সবাই। গাড়িতে উঠতে গিয়েও উঠল না নিমা, আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। কি ঘটছে দেখার জন্যে ক্যাডিলাক থেকে নেমে এলেন আবু কাসিম।

ক্যাডিলাকের তিন দিকে নামল কপ্টারগুলো। ইউনিফর্ম পরা মিশরীয় সামরিক বাহিনীর সৈন্যরা লাফ দিয়ে পড়ল টারমাকে। প্রতিটি কপ্টার থেকে নামলেন একজন করে সুট পরা বেসামরিক কর্মকর্তা–তিনজনই তাঁরা মন্ত্রী। সৈন্যরা এগিয়ে এল ক্যাডিলাকের দিকে। প্রথমেই ট্রাকে উঠে পড়া সশস্ত্র গার্ডদের নিরস্ত্র করা হলো। তারপর তিন মন্ত্রী মহোদয় এগিয়ে এলেন হারকিউলিসের দিকে। র‍্যাম্প বেয়ে উঠে সরাসরি রানার সামনে থামলেন তাঁরা।

ওদিকে, নিচে, একজন কর্নেল কথা বলছেন কালচারাল মিনিস্টার আতাহার

আবু কাসিমের সঙ্গে। রানা সহ সদ্য আগত তিন মন্ত্রীও সেদিকে তাকিয়ে আছেন। কর্নেলের ভারী গলা এখান থেকেও শুনতে পাচ্ছে সবাই।

'মি. কাসিম, স্যার, আপনার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কয়েকটা অভিযোগের প্রেক্ষিতে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আপনাকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছেন,' বললেন কর্নেল। 'আপনার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ, ডিপার্টমেন্ট অব অ্যান্টিকুইটিজ-এর ডিরেক্টর আল হাসলানকে খুন করার সঙ্গে আপনি সরাসরি জড়িত ছিলেন। গ্রেফতার এড়াবার জন্যে পালাবার সময় দু'জন খুনী আহত হয়, মারা যাবার আগে তারা আপনার আর আপনার আত্মীয় কারিফ ফারুকীর নাম বলে গেছে। আপনার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ, ড. আল নিমাকে ভুল বুঝিয়ে ফারাও মামোসের উদ্ধার করা গুপ্তধন আপনি সরকারী মিউজিয়ামে জমা দেয়ার ব্যবস্থা না করে নিজের গোপন আস্তানায় সরিয়ে ফেলার পাকা বন্দোবস্ত করেছেন। চারটে ট্রাক আটক করা হয়েছে, ড্রাইভার আর সশস্ত্র গার্ডরা আপনার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ স্বীকার করেছে। আপনাকে আমার আরও জানানো দরকার যে অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রেসিডেন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সাধারণ কোন কোর্টে নয়, আপনার বিচার করা হবে সামরিক ট্রাইবুনালে।'

হাতকড়া পরানো হলো আতাহার আবু কাসিমকে। কারও দিকে তাকালেন না তিনি, কোন কথা বললেন না, মাথা নিচু করে সামরিক হেলিকপ্টারের দিকে এগোলেন।

একে একে নিজেদের পরিচয় দিলেন তিন মন্ত্রী, রানার সঙ্গে উষ্ণ করমর্দন করলেন। তাদের মধ্যে পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও রয়েছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন, 'পৌঁছুতে কেন আমাদের দেরি হলো, আশা করি আপনি তা উপলব্ধি করতে পারছেন, মি. মাসুদ রানা।' পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'মি. প্রেসিডেন্ট এটা আপনাকে পাঠিয়েছেন।'

এনভেলাপটা খুলে চিঠিটা পড়ল রানা। মিশরের প্রেসিডেন্ট অকুণ্ঠচিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, তারপর অনুরোধ করেছেন রানা যেন তার দলবল নিয়ে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে এক হপ্তা মিশরে থেকে যায়। তাঁর খুব ইচ্ছে রানার সম্মানে রাষ্ট্রীয় ভোজ দেবেন। তারপর, শেষ লাইনে লিখেছেন, কোনও কারণে রানা যদি আপাতত তাঁর আতিথ্য গ্রহণে অপারগ হয়, আবার কবে মিশরে আসতে পারবে তা যেন জানিয়ে দিয়ে তাঁকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করে।

'প্রেসিডেন্টকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন,' পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলল রানা। 'বলবেন, খুব শিগগির আবার মিশরে আসছি আমি। এই মুহূর্তে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করতে পারছি না, সেজন্যে সত্যি আমরা দুঃখিত।'

কথা শেষ করে নিচে, নিমার দিকে তাকাল রানা। চোখাচোখি হতে প্লেনের দিকে এক পা এগোল নিমা, তারপর কি মনে করে দাঁড়িয়ে পড়ল, মাথাটা আপনা থেকেই নত হয়ে এল ওর।

রানা এবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দিকে তাকাল। 'ড. নিমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই তো?' জানতে চাইল ও। 'উনি কিন্তু সরল মনেই আতাহার আবু কাসিমকে বিশ্বাস করেছিলেন।'

'না, না,' তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই,' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাড়াতাড়ি বললেন। 'অভিযোগ থাকলে কি আর তাঁকে আমরা ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর নির্বাচিত করি?'

'কথাটা তাহলে সত্যি?' জানতে চাইল রানা। 'ড. নিমাকে ডিরেক্টর করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'এবার তাহলে আমাদেরকে বিদায় দিন,' বলে মন্ত্রী মহোদয়দের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল রানা।

আবার আকাশে ওঠার পর মেডিটারেনিয়ান কোর্স ধরে সেই উত্তর দিকেই রওনা হলো হারকিউলিস। রানা, মারটিন, ইস্কান্দার আর কালান্দার–চারজনই ককপিটে রয়েছে। দীর্ঘ সবুজ সাপের মত নীলনদ ওদের পাশাপাশি এঁকেবেঁকে পিছন দিকে ছুটছে।

দীর্ঘ যাত্রাপথে খুব কম কথা বলছে ওরা। তিক্ত প্রসঙ্গটা একবার শুধু ইস্কান্দার তুলল। 'এ যাত্রা ফি ছাড়াই কাজ করতে হলো, কি বলেন?'

'আমি ঠিক টাকার লোভে আসিনি,' মন্তব্য করল মারটিন। 'তবে পারিশ্রমিক পেলে ভাল লাগত। বাচ্চাকাচ্চাদের নতুন জুতো দরকার।'

'কেউ চা খাবে নাকি?' জিজ্ঞেস করল রানা, ওদের কথা যেন শুনতে পায়নি।

'মন্দ হয় না,' বলল ইস্কান্দার। 'আপনি যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন পাওনা ষাট হাজার ডলার এক কাপ চা খাইয়ে পরিশোধ করবেন, আমার বলার কিছু নেই।'

গ্যালিতে চলে এল রানা, সবার জন্যে চা বানাল। ককপিটে ফিরে এসে পরিবেশনও করল নিজ হাতে। সবাই আশা করছে কিছু না কিছু বলবে ও। কিন্তু মিশরীয় সীমান্ত পার না হওয়া পর্যন্ত মুখে কুলুপ এঁটে রাখল রানা।

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ খুলল, 'ঋণশোধ করিনি, এমন রেকর্ড কি আমার আছে? নেই। যার যা প্রাপ্য সবাই তা পাবে, বোনাস সহ।'

সবাই ওরা কঠিন দৃষ্টিতে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানার দিকে। সবার মনের সন্দেহ প্রকাশ পেল ইস্কান্দারের একটা মাত্র শব্দে। 'কিভাবে?'

'আমাকে একটু সাহায্য করো, মারটিন,' বলল রানা, তারপর সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল। কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে কন্ট্রোল কালান্দারের হাতে দিয়ে ওদেরকে অনুসরণ করল ইস্কান্দার। মেইন ডেকে বেরিয়ে এসে ল্যাভেটোরিতে ঢুকল ওরা।

ইস্কান্দার আর মারটিন দোরগোড়া থেকে দেখছে, পকেট থেকে একটা টুল বের করে কেমিকেল টয়লেটের ঢাকনি খুলে ফেলল রানা। স্ক্রুগুলো খুলছে রানা, পিছনে নিঃশব্দে হাসছে ইস্কান্দার। স্ক্রুগুলো গোপন প্যানেলটাকে জায়গা মত বসিয়ে রেখেছে। হারকিউলিস স্মাগলারদের প্লেন, কাজেই কারিগরি ফলিয়ে ভেতর দিকে অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে। ইস্কান্দার আর কালান্দার শুধু পরিশ্রম করেনি, বাপ-বেটাকে অনেক মাথা খাটিয়ে পরিবর্তনগুলো গোপন রাখারও ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এরকম গোপন হোল্ড শুধু ল্যাভেটোরিতেই নয়, এঞ্জিন

হাউজিং আর ফিউজিল্যাজের অন্যান্য অংশেও আছে।

প্যানেল খোলা হতে ভেতরে হাত গলিয়ে একটা জিনিস বের করল রানা। ওর হাতের দিকে তাকিয়ে প্রায় আঁতকে উঠল ইস্কান্দার। 'মাই গড়! কি ওটা?'

'প্রাচীন মিশরের ব্লু ওঅর ক্রাউন,' বলল রানা। মুকুটটা মারটিনের হাতে তুলে দিল ও। 'বাক্সের ওপর রাখো, তবে খুব সাবধানে।'

কমপার্টমেন্টের ভেতর আবার হাত গলাল রানা, আরেকটা মুকুট বের করে আনল। 'আর এটা হলো নেমেস ক্রাউন।' ইস্কান্দারের হাতে ধরিয়ে দিল।

'আর এটা কি? এটা হলো একত্রিত দুই রাজ্যের লাল আর সাদা ক্রাউন। আর এটা? ফারাও মামোসের ডেথ-মাস্ক। এটা? এটাই কিন্তু শেষ নয়—লিপিকার টাইটার মূর্তি।'

প্রত্ন নিদর্শনগুলো ফোল্ড-ডাউন বাক্সে রাখা হলো। ইস্কান্দার আর মারটিন হাঁ করে দেখছে। নিস্তব্ধতা ভাঙল ইস্কান্দার, 'আমি ভেবে ছিলাম ব্রোঞ্জের কয়েকটা মূর্তি আর কিছু শিলালিপি উদ্ধার করে আনবেন। এ-সব আমার কল্পনার মধ্যেও ছিল না।'

'আপনার কল্পনার মধ্যে আরও অনেক কিছু নেই,' সহাস্যে বলল রানা। 'হোল্ডের ভেতর লম্বা পাঁচটা ক্রেট আছে। তাতে কি আছে, জানেন?'

একটা ঢোক গিলল ইস্কান্দার। 'কি আছে?'

'প্রাচীন রণক্ষেত্রের পাঁচটা মডেল। সব মিলিয়ে প্রায় ত্রিশ হাজার খুদে মূর্তি, সবগুলোই সোনার তৈরি। একেকটার অ্যান্টিকস ভ্যালু...দুঃখিত, আমি জানি না।'

'কিন্তু,' হতভম্ব দেখাচ্ছে মারটিনকে, মাথা নাড়ছে এদিক ওদিক, 'আসওয়ানে ওরা যে ক্রেটগুলো নামিয়ে নিয়ে গেল, ড. নিমা গোনেননি?'

'শুনেছেন কিনা জানি না,' বলল রানা। 'তবে শুনলেও বাহান্নটা ক্রেট হত। যুদ্ধক্ষেত্রের মডেল পাঁচটা আমি চটের বস্তায় ভরে লুকিয়ে রেখেছি।'

'তাহলে তো অন্তত পাঁচটা লম্বা ক্রেট হালকা হয়ে গেছে, মাথায় করে নিয়ে যাবার সময় টের পায়নি ওরা যে ওগুলো খালি?'

'সব মিলিয়ে পাঁচটা নয়, দশটা বাক্স খালি করেছি আমি,' বলল রানা। 'তবে হালকা হতে দিইনি।'

'মানে?'

'টয়লেটের জন্যে এক গ্যালনের প্রচুর কেমিকেল বটল ছিল এখানে, আরও ছিল বিশ-পঁচিশটা স্পেয়ার অক্সিজেন সিলিন্ডার,' বলল রানা। 'ওজন ঠিক রাখার জন্যে ওগুলো ক্রেটে ভরে দিয়েছি।'

মারটিনের হাসি দেখে কে! তবে তার প্রশ্ন শেষ হয়নি এখনও। 'আপনি জানলেন কিভাবে ড. নিমা আমাদেরকে ধোঁকা দেবেন?'

'আমার জানা উচিত যে ও চোর নয়, ওর ওই কথাটা মিথ্যে ছিল না। নিমা সত্যি সৎ একটা মেয়ে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত, সর্ব অর্থে। আমি বলতে চাইছি, আমাদের ঠিক বিপরীত চরিত্র।'

'খোঁচা মেরে বলা হলেও, প্রশংসা করার জন্যে ধন্যবাদ, মি. রানা,' শুকনো

গলায় বলল ইস্কান্দার। 'কিন্তু আপনাকে সন্দিহান করে তোলার জন্যে নিশ্চয়ই আরও কারণ ছিল।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই ছিল,' তার দিকে ঘুরল রানা। 'প্রথম সন্দেহ জাগে আমরা যখন ইথিওপিয়া থেকে ফিরে আসি, এসেই মিশরে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠেন নিমা। বুঝতে পারি কিছু একটা করছেন। তবে পুরোপুরি নিশ্চিত হই নিমা যখন রুবির মাধ্যমে আদ্দিসের মিশরীয় দূতাবাসে একটা মেসেজ পাঠালেন। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, আমাদের রিটার্ন ফ্লাইট সম্পর্কে মিশরের কাউকে সতর্ক করে দিয়েছেন উনি। তারও অনেক আগে ওঁর কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারি আমি, ওর চাচার খুনী হিসেবে মন্ত্রী আতাহার আবু কাসিমকে দায়ী বলে মনে করতেন না।'

'কিন্তু আপনি করতেন?'

'ড. নিমার মুখ থেকে ঘটনাটা শোনার পর যে-কোন লোক আবু কাসিমকে সন্দেহ করবে,' বলল রানা। 'নিমা আসলে খুব সরল মেয়ে, প্রমাণ ছাড়া কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ বিশ্বাস করতে চান না। আবু কাসিম সম্পর্কে ওর মনোভাব জানতাম বলেই বুঝতে পারি, মেসেজ পাঠিয়ে ওই মন্ত্রীকেই সাবধান করে দিয়েছেন। সে যাই হোক, আমার মেসেজ পেয়ে ওদের প্রেসিডেন্ট অ্যাকশন নেয়ায় মামোসের গুপ্তধন রক্ষা পেল।'

'আংশিক,' ফোড়ন কাটল মারটিন।

'আমরা বেশি নিয়েছি, এ-কথা কেউ বলতে পারবে না,' হেসে উঠে বলল রানা। 'বাহান্নটা বাক্সের মধ্যে আমরা নিয়েছি মাত্র দশটা, বাকি বিয়াল্লিশটা মিশরের ভাগে পড়েছে।'

'আপনার বান্ধবী, ড. নিমা, এই যে আপনার সঙ্গে বেঈমানী করলেন, সেজন্যে আপনার রাগ হচ্ছে না?' জানতে চাইল ইস্কান্দার। 'তাঁর সম্পর্কে এই মুহূর্তে আপনার ধারণা কি? ডাইনী, রাক্ষসী ইত্যাদি বলে গাল দিতে ইচ্ছে করছে না?'

'সাবধান!' আড়ষ্ট হয়ে গেল রানা। 'নিমা মার্জিত, সৎ, দেশপ্রেমিক মেয়ে...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি দাঁত দিয়ে জিভ কাটল ইস্কান্দার, 'মুখ ফস্কে বলে ফেলেছি!' মারটিনের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকাল সে।

প্রাচীন মিশরের মাত্র দুটো মুকুট রাখা হয়েছে পালিশ করা ওয়ালনাট কনফারেন্স টেবিলে। কনফারেন্স রুমটা জুরিখের একটা ফাইভ স্টার হোটেলের দশতলায়। সবগুলো জানালার পর্দা টেনে দিয়েছে রানা, সিলিঙে লুকানো উৎস থেকে আলো পড়ছে মুকুট জোড়ার ওপর। হোটেলটার একটা স্যুইট ভাড়া নিয়েছে রানা, সেই সঙ্গে প্রাইভেট কনফারেন্স রুমটাও।

আমন্ত্রিত অতিথির জন্যে একা অপেক্ষা করার সময় চারদিকে তাকিয়ে প্রস্তুতিতে কোন খুঁত আছে কিনা দেখে নিল রানা, তারপর আয়নার সামনে হেঁটে এসে টাইয়ের নটটা অ্যাডজাস্ট করল। ওর পরনের ডোরাকাটা স্যুটটা সেভাইল রো থেকে অর্ডার দিয়ে তৈরি করা।

কোমল শব্দে ইন্টারকম বেজে উঠল। হ্যান্ডসেট তুলল রানা।

'ফ্রেড ম্যাকমোহন, আপনার অতিথি, নিচের লবিতে পৌঁছেছেন, মি. রানা।'

'প্লীজ, ভদ্রলোককে ওপরে পাঠিয়ে দিন,' বলল রানা।

কলিংবেল বাজতেই কনফারেন্স রুমের দরজা খুলে দিল ও। দরজার সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন ফ্রেড ম্যাকমোহন। 'মি. রানা,' বললেন তিনি, 'আশা করি আপনি আমার সময় নষ্ট করছেন না। আপনার মেসেজ পেয়ে ব্যক্তিগত প্লেন নিয়ে সেই টেক্সাস থেকে ছুটে আসতে হয়েছে আমাকে।' রানা তাঁকে টেলিফোন করেছিল ত্রিশ ঘণ্টা আগে। এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবার অর্থ হলো, ফোন পেয়েই প্লেনে চড়ে বসেন ভদ্রলোক।

'ভেতরে আসুন, মি. ম্যাকমোহন,' সহাস্যে বলল রানা। 'বলুন কি খাবেন।'

'এ-সব প্যাঁচাল বাদ দিন তো,' ভেতরে ঢুকে বললেন ম্যাকমোহন। 'আগে বলুন কি দেখাতে চান।' তাঁর পিছু নিয়ে আরও দুই ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকলেন, দু'জনকেই চেনে রানা।

দরজা বন্ধ করে কনফারেন্স টেবিলের দিকে তাকাল রানা। 'আসুন আমার সঙ্গে।'

ধনকুবের ফ্রেড ম্যাকমোহনের বয়েস সত্তর হলেও, দেখে মনে হয় পঞ্চাশ। পাকানো, তেল চকচকে খুঁটির মত কাঠামো। ফর্বস ম্যাগাজিন-এর ধনকুবেরদের তালিকায় সাত নম্বরে আছেন তিনি, বলা হয়েছে এক দশমিক সাত বিলিয়ন নগদ মার্কিন ডলারের মালিক ভদ্রলোক।

অ্যান্টিকুয়ারিয়ান জগৎটা খুব ছোটই বলতে হবে, এই জগতে অল্প কিছু লোক চলাফেরা করেন, কাজেই তাঁদের প্রায় সবাইকেই চেনে রানা। ম্যাকমোহনের একজন সঙ্গী ডালাস ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, প্রাচীন ইতিহাস পড়ান। ওই ভার্সিটিতে নিয়মিত চাঁদা দেন ম্যাকমোহন। অপর ব্যক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সব চেয়ে নাম করা ও শ্রদ্ধেয় আন্টিকস ডিলার।

ম্যাকমোহন অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন, ফলে পিছনের ওঁরা দু'জন তাঁর সঙ্গে ধাক্কা খেলেন, যদিও ম্যাকমোহন তা খেয়ালই করলেন না। 'এ আমি কি দেখছি?' বিড়বিড় করলেন তিনি, তারপর রানার দিকে চট করে একবার তাকিয়ে অভিযোগের সুরে বললেন, 'এগুলো কি নকল?'

প্রথমে কিছু না বলে হাসল রানা। তারপর বলল, 'পরীক্ষা প্রার্থনীয়।'

এরপর কনফারেন্স টেবিলের দিকে পা টিপে টিপে এগোলেন ম্যাকমোহন, যেন ভয় পাচ্ছেন দ্রুত হাঁটলে চোখের সামনে থেকে মুকুট দুটো গায়েব হয়ে যাবে। 'এগুলো একদম নতুন,' ফিসফিস করলেন তিনি। 'তা না হলে অন্তত অস্তিত্ব সম্পর্কে খবর পেতাম।'

'বলতে পারেন সদ্য মাটির নিচে থেকে তোলা হয়েছে,' বলল রানা। 'আপনিই প্রথম দেখছেন।'

'মামোস!' নেমেস ক্রাউনে খোদাই করা লিপির ওপর চোখ বুলালেন ম্যাকমোহন। 'গুজবটা তাহলে মিথ্যে নয়! আপনি নতুন একটা সমাধি খুলেছেন।'

'প্রায় চার হাজার বছরের পুরানো একটা সমাধিকে আপনি যদি নতুন বলেন,

আমার আপত্তি নেই'।'

ম্যাকমোহন আর তাঁর উপদেষ্টারা টেবিলটাকে ঘিরে দাঁড়ালেন। কারও মুখে কথা নেই, সবার চোখ চকচক করছে।

'শুধু আমরা নিজেরা এখানে থাকব–কিছুক্ষণ,' বললেন ম্যাকমোহন, রানাকে সরে যেতে বলছেন। 'কথা বলার সময় হলে আপনাকে ডাকব আমি। প্লীজ!'

এক ঘন্টা পর আবার কনফারেন্স রুমে ফিরে এল রানা। তিন ভদ্রলোক টেবিলের তিন দিকে এমন ভঙ্গিতে বসে আছেন, যেন মুকুট দুটোর অবিচ্ছেদ্য অংশ পরিণত হয়েছেন তাঁরা। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন ম্যাকমোহন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও কনফারেন্স রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তাঁরা।

দরজা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকমোহন কর্কশ সুরে জানতে চাইলেন, 'কত?'

'পনেরো মিলিয়ন মার্কিন ডলার,' জবাব দিল রানা।

'তার মানে প্রতিটি সাড়ে সাত মিলিয়ন।'

'না, প্রতিটি পনেরো মিলিয়ন। দুটো ত্রিশ মিলিয়ন।'

ম্যাকমোহন এমন ভাবে দুলে উঠলেন, মনে হলো চেয়ার থেকে সরে যাবেন। 'আপনি পাগল, না অন্য কিছু?'

জবাব না দিয়ে রোলেক্সের ওপর চোখ বুলাল রানা।

'আসুন পার্থক্য কমিয়ে আনি,' বললেন ম্যাকমোহন। 'সাড়ে বাইশ মিলিয়ন।'

মাথা নাড়ল রানা। 'এক দর।'

'এ আপনার সাংঘাতিক অন্যায়, মি. রানা! আপনি ডাকাতি করতে চাইছেন।'

এবারও উত্তর না দিয়ে হাতঘড়ি দেখল রানা। তারপর ছোট্ট করে বলল, 'দুঃখিত।'

চেয়ার ছাড়লেন ম্যাকমোহন। 'দুঃখিত আমিও। ঠিক আছে, আমি তাহলে গেলাম। পরে হয়তো আপনার সঙ্গে দরে বনবে, নতুন কিছু পেলে আমাকে খবর পাঠাবেন।'

পিছনে হাত বেঁধে দরজার দিকে এগোলেন তিনি। দরজাটা খুলছেন, পিছন থেকে ডাকল রানা, 'মি. ম্যাকমোহন!'

ব্যগ্রভঙ্গিতে ওর দিকে ঘুরলেন ম্যাকমোহন। 'ইয়েস?'

'পরের বার আপনি আমাকে শুধু রানা বলে ডাকবেন, আর আমি আপনাকে শুধু ফ্রেড বলে, ঠিক আছে? আমরা তো পুরানো বন্ধুই, তাই না?'

'শুধু এটুকুই বলার আছে আপনার?'

'হ্যাঁ। আর কি?' রানাকে হতভম্ব দেখাচ্ছে।

'আপনি আমাকে টরচার করছেন,' অভিযোগ করলেন ম্যাকমোহন, ফিরে এলেন টেবিলের কাছে। চেয়ারটায় ধপাস করে বসে পড়লেন। 'আপনি নরকে পচবেন।'

রানা কথা বলছে না।

'ঠিক আছে, টাকাটা আপনি কিভাবে চান?'

'দুটো ব্যাংক ড্রাফটে, প্রতিটি পনেরো মিলিয়ন ডলার।'

ইন্টারকমের দিকে হাত বাড়ালেন ম্যাকমোহন, নিজের অ্যাকাউন্ট্যান্টকে

ডাকবেন। বাধা দিয়ে রানা বলল, 'এক মিনিট, মি. ম্যাকমোহন। আপনাকে দেখাবার মত আরও দু'একটা জিনিস আছে এখানে।' টেবিল থেকে নিজের ব্রীফকেসটা টেনে নিল ও, তালা খুলে ভেতর থেকে খুদে কয়েকটা সোনার মূর্তি বের করল। মূর্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে সৈনিক, রথ, সেবিকা, ঘোড়সওয়ার ও প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র।

'এগুলো কি?' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন ম্যাকমোহন। 'এ-সব তো আমি জীবনে কখনও দেখিনি!'

'দেখেননি বলেই তো দেখাচ্ছি।' হাসছে রানা।

সৈনিকের মূর্তিটা হাতে নিলেন ম্যাকমোহন। নেড়েচেড়ে দেখছেন। হঠাৎ প্রায় আঁতকে উঠলেন ভদ্রলোক। মামোসের সীল! সীলের ওপর খোদাই করা ফারাও-এর প্রতিকৃতি! গুড্ গড! মি. রানা, জেনুইন তো?'

'ব্রোঞ্জের সীলই প্রমাণ করে,' বলল রানা। 'তাছাড়া, যাচাই না করে আপনি কিনবেন কেন? যদিও আমি ঠিক বুঝতে পারছি না এগুলো কেনার সামর্থ্য সত্যি আপনার হবে কিনা।'

'মানে? কি বলতে চান আপনি?'

'পরে কথা হবে,' বলল রানা। 'আগে আপনি আপনার উপদেষ্টাদের ডেকে দেখান। মনে সন্দেহ রেখে দর করা চলে না।'

আবার সঙ্গী ভদ্রলোক দু'জনকে কনফারেন্স রুমে ডেকে পাঠালেন ম্যাকমোহন। দীর্ঘ সময় নিয়ে মূর্তিগুলো পরীক্ষা করলেন তাঁরা। দু'জন প্রায় একযোগে মাথা ঝাঁকালেন, তাকিয়ে আছেন ম্যাকমোহনের দিকে। ম্যাকমোহন চোখ ইশারায় বিদায় করে দিলেন তাঁদের।

'কত?' দরজা বন্ধ হতেই রানাকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'এখানে আমি একটু ভূমিকা করতে চাই,' বলল রানা। 'আমাদের দেশে সাতশো বছরের পুরানো কষ্টিপাথরের শিবলিঙ্গ বিক্রি হয় ত্রিশ লাখ টাকায়। আর এই মূর্তিগুলো সোনার, প্রায় চার হাজার বছরের পুরানো। একেকটা মূর্তির দাম কি হতে পারে আমি তা শুধু আপনাকে আন্দাজ করতে বলছি।'

'আপনি আমাকে অপমান করেছেন,' গম্ভীর সুরে বললেন ম্যাকমোহন। 'আপনি আমাকে ভয় দেখিয়ে বলতে চাইছেন এগুলোর দাম এত বেশি হাঁকবেন যে আমার কেনার সামর্থ্য হবে না!'

রানা হাসল, তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'না, আমি সে অর্থে বলিনি। একটু পরে ব্যাখ্যা করছি। তার আগে প্রতিটি আইটেমের দাম আন্দাজ করুন, প্লীজ।'

'আমি কেন আন্দাজ করতে যাব!' রেগে উঠলেন ম্যাকমোহন। 'আপনার জিনিস আপনি দাম বলবেন।'

'এক দর,' বলল রানা। 'প্রতিটি এক লাখ মার্কিন ডলার। বলতে পারেন, পানির দর।'

'এই দরে অবশ্যই আমি কিনব না,' সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলেন ম্যাকমোহন। 'তবে আমার কেনার সামর্থ্য নেই, আপনার এই মনোভাবের ব্যাখ্যা চাই আমি।' চেয়ার ছাড়লেন তিনি।

'দিচ্ছি ব্যাখ্যা,' বলল রানা। 'তার আগে বলে রাখি, আপনার সামর্থ্যকে ছোট করে দেখার মত বোকা আমি নই। ব্যাখ্যাটা হলো, এগুলো একটা সাজানো যুদ্ধক্ষেত্রের মডেল থেকে তুলে আনা হয়েছে। মডেলের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, মি. ম্যাকমোহন।'

'মডেল? যুদ্ধক্ষেত্রের মডেল? ফারাও মামোসের যুদ্ধক্ষেত্র?' ম্যাকমোহন বিহ্বল হয়ে পড়েছেন।

'হ্যাঁ।'

'মডেলটায় এরকম আইটেম সব মিলিয়ে ক'টা?' রানার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন ম্যাকমোহন।

'ছয় হাজার,' বলে তৈরি হয়ে গেল রানা, ম্যাকমোহন পড়ে যাবার উপক্রম করলে ধরে ফেলবে।

'ছয় হাজার!' গলার স্বর শুনে মনে হলো ম্যাকমোহন শুধু পুনরাবৃত্তিই করলেন, শব্দ দুটোর অর্থ তাঁর বোধগম্য হয়নি। 'ছয় হাজার মানে?'

'মানে ছয় হাজার আইটেম।'

'ওহ্ গড! ওহ্ গড!'

'আপনার শরীর খারাপ লাগছে না তো, মি. ম্যাকমোহন?' দ্রুত জানতে চাইল রানা। 'কারণ, এখনও সব কথা আমি বলিনি।'

'এখনও সব কথা বলেননি! এখনও সব কথা বলেননি?'

'না। এরকম মডেল সব মিলিয়ে পাঁচটা।' এবার এগিয়ে এসে ম্যাকমোহনের কাঁধে হাত রাখল রানা, দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করছে।

'পানি...পানি...' বিড়বিড় করলেন ম্যাকমোহন। 'না... খানিকটা ব্র্যান্ডি হলে ভাল হয়...'

'আনিয়ে রেখেছি,' বলে টেবিল থেকে ব্র্যান্ডির বোতলটা তুলে নিয়ে একটা গ্লাসে খানিকটা ঢালল রানা, গ্লাসটা ধরিয়ে দিল অতিথির হাতে।

ব্র্যান্ডিটুকু এক ঢোকে গলাধঃকরণ করলেন ম্যাকমোহন। 'আমাকে একটু চিন্তা করতে দিন, প্লীজ।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে পিছিয়ে এল রানা, কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসল।

ঝাড়া বিশ মিনিট নড়লেন না ম্যাকমোহন। তাঁর মস্তিষ্কে হিসাব চলছে, ওটাকে সবাই কমপিউটর হিসেবেই জানে। তারপর তিনি মুখ তুলে রানার দিকে তাকালেন। 'আপনি ঠিকই বলেছেন, মি. রানা। এত টাকা খরচ করার সামর্থ্য সত্যি আমার নেই।' পরক্ষণে দ্রুতবেগে মাথা নাড়লেন। 'না, ভুল হলো। সামর্থ্য আমার আছে, কিন্তু এত টাকা আপনাকে আমি দেব না।' রানার চেহারায় আড়ষ্ট ভাব লক্ষ করে আবার বললেন, 'আমি কি প্রলাপ বকছি?'

'আমার মনে হয় আপনি মুকুট জোড়া নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলেই ভাল করবেন,' বলে হাতঘড়ি দেখল রানা। 'আমার আরও দু'জন খদ্দের আছেন, দেখি তাঁরা কি বলেন।'

'না!' প্রায় গর্জে উঠলেন ম্যাকমোহন। 'এ-সব আমি কাউকে ছুঁতে দেব না। না, অসম্ভব!'

'আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না,' সবিনয়ে বলল রানা। 'এ-সব মানে? আপনি কি একটা মডেলের সবগুলো আইটেম নিতে চাইছেন? পুরো ছয় হাজারই?'

'না!' হিসহিস করে বললেন ম্যাকমোহন। 'পাঁচটা মডেলই আমার চাই!'

'ওহ্ গড!' স্তম্ভিত দেখাল রানাকে। 'সে তো অনেক দাম, মি. ম্যাকমোহন!'

'আমি কি সর্বহারা?' কোন সাহসে আপনি আমাকে দামের ভয় দেখান?' ঠকঠক করে কাঁপছেন ম্যাকমোহন, রাগে না উত্তেজনায় বলা কঠিন। 'তবে আপনার এই ডাকাতি করার প্রবণতা আমি মেনে নেব না। দাম হয়, প্রতিটি আইটেম যদি পঞ্চাশ হাজার ডলার ধরি...'

'এক লাখ ডলার,' শুধরে দিল রানা।

'না। ঠিক আছে, সত্তর হাজার ডলার।'

'এক দর, মি. ম্যাকমোহন।'

'এ আপনার অসম্ভব দাবি, মি. রানা!' মারমুখো হয়ে রানার দিকে এক পা এগোলেন তিনি। 'কেনা-বেচায় দরদাম হয়ই। আপনি এভাবে গোঁ ধরে থাকলে...'

'বাংলাদেশী টাকায় হিসাবটা বুঝতে আমার সুবিধে হয়,' বলল রানা। 'আপনি যদি ত্রিশ হাজার আইটেমই নেন, কিছুটা ছাড় দেয়া যেতে পারে। আমার হিসেবে দাম হয় বারো হাজার ছয়শো কোটি টাকা।'

'আমি আট হাজার কোটি টাকা দেব। প্লীজ, মি. রানা, এর বেশি দিতে হলে আমি ফকির হয়ে যাব।' ভাব দেখে মনে হচ্ছে রানার কাছে যেন ভিক্ষা চাইছেন ম্যাকমোহন।

'এক হাজার কোটি টাকা,' বলল রানা। হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার বলল, 'এক মিনিটের মধ্যে হ্যাঁ বলুন, তা না হলে বিদায় হোন।'

চেয়ারে বসে ধুঁকতে লাগলেন ম্যাকমোহন। গত পনেরো মিনিটে তাঁর বয়েস যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। ঠিক এক মিনিটের মাথায় মুখ তুললেন তিনি, জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার তাহলে আমার অ্যাকাউন্ট্যান্টকে ডাকি?'

এক গাল হেসে রানা বলল, 'শুভ কাজে দেরি কিসের!'

লন্ডন, রানার নিজের ফ্ল্যাট। স্টাডিরুমের ডেস্কে বসে সামনের দেয়াল ঢাকা প্যানেলিং-এর দিকে তাকিয়ে রয়েছে ও। ডেস্কের তলায় হাত গলিয়ে ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল-এর গোপন বোতামে চাপ দিল, প্যানেলের একটা অংশ নিঃশব্দে সরে গেল একপাশে, বেরিয়ে পড়ল ডিসপ্লে কেবিনেটের আর্মারড প্লেট গ্লাস। একই সঙ্গে আপনা থেকে জ্বলে উঠল সিলিঙের স্পটলাইট, চোখ ধাঁধানো রশ্মিগুলো পড়ল কেবিনেটে রাখা জিনিসগুলোর ওপর। কারাও মামোসের ডেথ-মাস্ক আর ডাবল ক্রাউনের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকল রানা।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর মনে হলো কি যেন নেই ওখানে। তারপর ডেস্ক থেকে টাইটার মূর্তিটা তুলে নিল ও, মুখের সামনে ধরে এমন সুরে কথা বলল, যেন নিজের সঙ্গেই আলাপ করছে। 'নিঃসঙ্গতা কি জিনিস, তুমি তা ভালই

বোঝো, তাই না? এ-ও বোঝো যে কাউকে ভালবেসে না পাওয়াটা কি যন্ত্রণাময় একটা অভিজ্ঞতা!'

স্ট্যাচুটা রেখে দিয়ে ফোনের দিকে হাত বাড়াল রানা, আর ঠিক তখনই ওটা বেজে উঠল। ভুরু কুঁচকে রিসিভারের দিকে তাকিয়ে থাকল ও। দু'বার রিঙ হলো, তারপর আরেকবার।

রিসিভার তুলল রানা। নিমাকে ফোন করতে যাচ্ছিল ও, অথচ বাধা পড়ল। 'হ্যালো?'

'রানা? রানা, আপনি?'

'ওহ্ গড! নিমা? আপনি?' নিমার গলা শুনে রানার শিরদাঁড়া বেয়ে রোমাঞ্চকর একটা শিহরণ নেমে এল।

'হ্যাঁ, আমি। ভেবেছিলাম আমার গলা পেয়েই রিসিভার নামিয়ে রাখবেন আপনি!' রুদ্ধশ্বাসে বলল নিমা।

'কেন, না! আমিই তো আপনাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম।'

'সত্যি?' উল্লসিত মনে হলো নিমাকে। 'কেন?'

'ডিরেক্টর হয়েছেন, কংগ্রাচুলেট করার জন্যে।'

'আপনি আমাকে ঠকিয়েছেন,' বলল নিমা, 'দশটা ক্রেট কম পেয়েছি আমরা।'

'জ্ঞানী এক লোক যেমন বলেছিল একবার, বন্ধুদের ঠকানো সবচেয়ে সহজ—ওরা বেঈমানী আশা করে না। আপনিও করেননি, আমিও না। কথাটার সত্যতা আপনার অন্তত বোঝা উচিত, নিমা।'

তিন সেকেন্ড চুপ করে থাকল নিমা। 'আপনি ওগুলো বিক্রি করেছেন, শুনেছি আমি। কানে এল শুধু মুকুটগুলোর জন্যেই ফ্রেড ম্যাকমোহন বিশ মিলিয়ন ডলার দিয়েছেন।'

'ত্রিশ মিলিয়ন,' শুধরে নিল রানা। 'তবে শুধু নীল আর নেমেস মুকুটের বিনিময়ে। এই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে লাল আর সাদা ক্রাউন সহ ডেথ-মাস্ক কেবিনেটে সাজানো রয়েছে।'

'সব আপনি একা নেবেন, কাউকে ভাগ দেবেন না, এ আমি বিশ্বাস করি না।'

'মডেল পাঁচটার কথা তুলছেন না কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওগুলো আপনি বিক্রি করবেন না, আমি জানি,' বলল নিমা। 'আমি যেমন চেয়েছিলাম উদ্ধার করা গুপ্তধন কারুরো মিউজিয়ামে থাকবে, আপনিও নিশ্চয়ই চেয়েছেন ওগুলো বাংলাদেশের মিউজিয়ামে থাকবে।'

'না, আমি তা চাইনি,' বলল রানা, একটু ম্লান সুরে। 'আমরা খুবই গরীব, আমাদের অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। কাজেই মিউজিয়ামের শোভা বাড়ানোর বিলাসিতা আমাদের সাজে না। নগদ টাকাই বরং বেশি দরকার।'

'তারমানে কি মডেলগুলোও আপনি বিক্রি করে দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা। 'এক হাজার কোটি টাকায়।'

'ওহ গড!'

কয়েক মুহূর্ত আর কোন কথা হলো না। তারপর নিমা জানতে চাইল, 'সব টাকা আপনি সরকারী কোষাগারে জমা দিচ্ছেন?'

'না,' বলল রানা। 'পাওনা শোধ করতে কিছু টাকা বেরিয়ে গেছে।'

'পাওনা মানে?'

'অ্যালান শাকি আর রুবিকে দিয়েছি পনেরো মিলিয়ন ডলার,' বলল রানা। 'বাকি সবার পাওনা মেটাতে আরও পনেরো মিলিয়ন ডলার বেরিয়ে গেছে।'

'শুনে খুশি হলাম,' বলল নিমা।

'কেন ফোন করেছেন বলুন, আমিও খুশি হই।' রানা হাসছে।

'কেমন আছেন আপনি? খুব জানতে ইচ্ছে করে, আমার ওপর এখনও রাগ করে আছেন কিনা।'

'কারও ওপর কোনও রাগ নেই আমার,' বলল রানা। 'দু'জনেই আমরা দু'জনকে ঠকাবার চেষ্টা করেছি, তবে ব্যক্তিস্বার্থে নয়। রাগ হওয়া তো দূরের কথা, আপনার নীতিবোধের প্রশংসা করি আমি।'

তারপর অনেকক্ষণ আর কোন কথা হলো না।

নিস্তব্ধতা ভাঙল রানাই, 'শুধু এই কথা জানার জন্যে ফোন করেছেন, আমি রাগ করে আছি কিনা?'

'না।'

'তাহলে?'

প্রায় তিন সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর নিমা বলল, 'আমি জানতে চাই, আপনি আমাকে বিয়ে করবেন?' রানার দম আটকানোর আওয়াজটা স্পষ্ট শুনতে পেল নিমা।

খুব নরম সুরে জিজ্ঞেস করল রানা, 'এরকম একটা, আপনারই ভাষায়, অসম্ভব কথা কেন আপনি ভাবছেন?'

'কারণ আমি উপলব্ধি করেছি আপনাকে আমি ভালবাসি,' জবাব দিল নিমা। 'আপনার কাছে এমন কিছু পেয়েছি··· যেটা···মানে···'

কিছুক্ষণ চিন্তা করল রানা, তারপর বলল, 'না, নিমা। কাজটা উচিত হবে না।'

'উচিত হবে না? কেন?' উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল শোনাল নিমার গলা। 'আমাকে আপনার ভাল লাগে না?'

'লাগে, অসম্ভব ভাল লাগে,' স্বীকার করল রানা। 'কিন্তু আমি মানুষটা ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে টাইপের, নিমা। তাছাড়া, আমার পেশা আমাকে কোথাও স্থির হয়ে বসতে দেয় না। এমন একটা দুর্ভাগা দেশে জন্মেছি, দেশের সেবায় নিজেকে পুরোপুরি উৎসর্গ করতে না পারলে পাপ হবে বলে মনে হয়। ঘরবাঁধা আমার হবে না কোনদিন।'

অপরপ্রান্তে নিমা কথা বলছে না।

এদিকে রানাও চুপ করে আছে।

নিস্তব্ধতা ভাঙল নিমাই, 'আপনি মহৎপ্রাণ মানুষ। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি।'

'আমি কি ব্যাখ্যা করতে পেরেছি, কেন আমাদের বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়?' নরম সুরে জানতে চাইল রানা।

'আপনার ব্যাখ্যা চিরকাল আমাকে অনুপ্রাণিত করবে,' বলল নিমা। 'কিন্তু আপনার সিদ্ধান্ত আজীবন কষ্ট দেবে। তবু আমি মেনে নিলাম।'

কি বলবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে থাকল রানা। অনেকক্ষণ পর শুধু বলল, 'ধন্যবাদ, নিমা।'

'তবু, একবার কি দেখা হতে পারে না?' গলা শুনে বোঝা গেল কান্না চেপে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করছে নিমা।

'কেন পারে না, আপনি বললেই কায়রোয় পৌঁছে যাব আমি।'

'আসবেন? সত্যি আসবেন? কাল বিকেলে একটা ফ্লাইট আছে।'

'এয়ারপোর্টে আপনি আমাকে নিতে আসবেন তো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বলল নিমা। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল, 'জানেন, আতাহার আবু কাসিমের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে? কোর্টে উনি স্বীকার করেছেন যে আমাকে মেরে ফেলাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।'

'শুনেছি,' বলল রানা। 'আপনি কি জানেন, ইথিওপিয়া সরকারের সঙ্গে একটা সমঝোতায় পৌঁছেছে শাফি? যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে সই করেছে ও। জেনারেল ইলেকশনে অংশ নেবে। কেয়ারটেকার সরকার গঠন করা হয়েছে, ওকে দেয়া হয়েছে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব। কেয়ারটেকার সরকারে রুবিকেও রাখা হয়েছে, কালচারাল মিনিস্টার হিসেবে।'

'কি বলছেন!'

'আরও শুনবেন? রুবিও আগামী ইলেকশনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, তাই প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে...'

'সব কথা এভাবে বলে ফেললে তো মুশকিল। কায়রোয় এসে কি করবেন?'

'কায়রোয় আমি আপনাকে দেখব, দু'চোখ ভরে। বিয়ে না করতে পারি, প্রেম করতে অসুবিধে কি?' হেসে উঠল রানা।

'ভুলে গেছেন, আমি আরবী মেয়ে? ও-সব প্রেম-ট্রেম হবে-টবে না। আমরা শুধু পরস্পরের বন্ধু হতে পারি, রানা।'

'জানি, এবং আপনার এই মনোভাবকেও আমি শ্রদ্ধা করি,' বলল রানা। 'কথা দিচ্ছি, চেষ্টা করব, আমি যেন আমাদের এই মধুর বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখতে পারি।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, রানা,' বলল নিমা। ওর হাঁফ ছাড়ার আওয়াজটা স্পষ্ট শুনতে পেল রানা। 'আপনি বাঁচালেন আমাকে!'

* * *